তিমির রাত্রি শেষে ভোরের সূর্যোদয় হবেই

নিরুপম সেন

২০১১, পশ্চিমবাংলার রাজনীতির মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। একটানা ৩৪ বছর শাসনের পর রাজ্য সরকারের বদল ঘটে গেল। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায়। এই দলটির একমাত্র নেত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দলটি ক্ষমতায় আসার পর গত কয়েকমাসেই আমাদের রাজ্যে ত্রাহি-ত্রাহি রব পড়ে গেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। মারপিট-হানাহানি-পুলিশের লাঠি—দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখাপড়া কার্যত শিকেয় উঠেছে। ইতিহাসে এই রকম সময়কে মাৎসন্যায় বলা হয়ে থাকে। আজ বাংলারও সেই দশা। যাঁরা সেদিন বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালকে তীক্ষ্ণ সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলেন তাঁরা বোধহয় আজকের পরিস্থিতিতে বুঝতে পারছেন যে রাজ্যটা কোন দিকে চলেছে। আর কে-ই বা চালাচ্ছে? বামফ্রন্ট শাসনকালে বিতর্ক হয়েছে কিন্তু সে বিতর্ক ছিল শিক্ষা নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে, জমি নিয়ে, শিল্প নিয়ে। আজকে আর এইসব বিষয় নিয়ে কেউ ভাবে না। শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। গাড়ির কারখানা চলে গেল রাজ্য থেকে। কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা লোপ পেয়ে গেল। একটা বিদ্যুতের কারখানা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়ে পড়ে আছে। দেখে যেন মনে হয় মহা-শ্মশান। একজনও লোক সেখানে নেই। প্রকল্পটির অকালমৃত্যু হয়েছে। এটি শুরু হয়েছিল কিন্তু মাঝপথে মিলিয়ে যায়। এখন এর পরিণতি নিয়ে কেউ ভাবে না। সে আছে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে।

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকল বিদ্যায় পারদর্শিনী। তাঁর শিক্ষা কী বিষয়ে সেটি এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ মানুষেরই অজানা, অন্ধকারে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণারতা ছিলেন তার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তিনি একটি সভায় গিয়েছিলেন, সভা চলাকালীন সময়ে একজন ব্যক্তি সভায় এসে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি প্রশ্ন করতেই মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা থামিয়ে প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্যে আঙুল তুলে পুলিশকে নির্দেশ দেন—মাওবাদী, কাজেই ওকে গ্রেপ্তার করুন। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার। ওই ব্যক্তি অচিরেই জেলে যান, কিন্তু হাল না ছেড়ে মানবাধিকার কমিশনে আবেদন করেন। দীর্ঘ শুনানির পর সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মতপ্রকাশ করেন, এ ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং রাজ্য সরকারকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকার জানিয়ে দেয় উচ্চ আদালতের ওই নির্দেশ তারা মানবে না।

উত্তরবঙ্গের একটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হন। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ছাত্রদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও তাদের জেল হয়। অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে ছাত্রদের জেল হয় না। পরিবর্তে হালকা ধারায় বেল হয় অর্থাৎ জামিন হয়ে যায়। দু-জায়গায় দু-রকম ব্যবস্থা। কৌতুকের ঘটনা হল কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী কোলকাতায় জনসভায় শ্রোতাদের পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষককে শ্রদ্ধা করতে, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক

কেমন হওয়া উচিত—সে বিষয়ে। তিনি নিজে একজন শিক্ষকের কাছ থেকে টিভি ক্যামেরার সামনে সম্মান গ্রহণ করছেন। সেই ছবি সারা রাজ্যে সম্প্রচার করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অবিচার-অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতার সমস্ত মাত্রা অতিক্রম করে এক সম্পূর্ণ নৈরাজ্য সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে। রাজ্যে শাসন বলে কোনো বস্তু অবশিষ্ট আছে বলে কেউ আর মনে করে না। বিরোধীদের সভা ও মিছিলের উপর নির্বিচারে হামলা চালানো হচ্ছে। যারা মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁদের মোহ ভাঙতে শুরু করেছে। এখন সকলে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে অতীতের সরকারের সঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকারের পার্থক্য কোথায়।

কিছুদিন আগেও যাঁরা পশ্চিমবাংলায় 'দলতন্ত্র' নিয়ে চিৎকার করতেন আজ তারা কী বলবেন? জানতে ইচ্ছা হয়। কিছুদিন বাদেই সারা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। হবে কি হবে না, কবে হবে, কোথায় আবেদন করতে হবে? কেউ কিছুই জানে না। কিন্তু রব উঠেছে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরির কথা। অথচ এই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বার বার শুনেছি সরকারের শূন্য ভাড়ারের কথা, আর প্রায় দেড় লক্ষ কোটি ঋণের কথা!

আজকের পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের সামনে বড় শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজজীবনে অবক্ষয়ের ধারা বহমান। এই পরিস্থিতিতে মতাদর্শের সংগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজবাদী মতাদর্শে সারা বিশ্বে কিছুটা পশ্চাদপসরণ ঘটেছে। তার থেকে এই ধারণা করা ভুল হবে যে এই অবস্থাটা স্থায়ী রূপ নেবে। পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভেই সমাজবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব, জন্ম ও বিকাশ। সুতরাং আজও এই ব্যবস্থার গর্ভেই জন্ম নেবে আগামী দিনের সংগ্রামের রূপরেখা। 'তিমির রাত্রি শেষে ভারের সূর্যোদয়' ঘটবেই। আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে সেই মহা সংগ্রামের জন্য যার মাধ্যমেই একমাত্র এই সূর্যোদয় ঘটানো সম্ভব। তাই শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে ব্যাপকতম মানুষকে এই সংগ্রামে সমবেত করতে হবে।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

পাঞ্জাবী সুন্দরম্

দত্ত সেন্টার, বর্ধমান

বিয়ের তসরের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবী, পায়জামা, শেরওয়ানি, পাগড়ি, নাগড়াই, বোরখা

Sl. No. 45

‘নবান্ন’ : এক জঙ্গি ধারার কৃষক আন্দোলন

অমল হালদার

অবিভক্ত বাংলায় কৃষক আন্দোলনের এক বিশাল ঐতিহ্য আছে। একই ঐতিহ্য বহন করে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা সহ বিভিন্ন রাজ্যের কৃষকসমাজ। সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ সহ বহু আন্দোলনের মধ্যমণি ছিল যে কৃষক, তৎকালীন ব্রিটিশ রাজত্বের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিল। বাংলার তেভাগা আন্দোলন উজ্জীবিত করেছিল তৎকালীন সময়ে বর্গাদার-ভাগিদারদের। পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ঠুর আক্রমণেও আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায়নি। এই সমগ্র আন্দোলন নিয়ে আমাদের দেশের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকরা বহু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, তা নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। কোন আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত, কোন আন্দোলন সংগঠিত তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আন্দোলনগুলি নিয়ে চর্চা করেছেন দেশের কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার সহ বহু চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী যা আজও আমাদের প্রেরণা দেয়। তেভাগা আন্দোলনের গান আজও মানুষের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বিতীয় বড় উপনিবেশ ছিল এই যুক্ত বাংলা। এই বাংলায় লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। জমিদার-জোতদারদের পোয়াবারো, আর কৃষকের সর্বনাশ ভয়ঙ্করভাবে শুরু হল এই বাংলাতে। এই ধরনের আক্রমণ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে তীব্র হয়নি। অবিভক্ত বাংলায় ব্রিটিশদের নীতির কারণে বারংবার নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো ভয়াবহ চেহারা। শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন সহ অন্যান্য পরিচালকের ছবিতেও ফুটে উঠেছে বাংলার কৃষকের ওপর নারকীয় অত্যাচার। একটু খাবারের জন্য হাড় জিরজিরে মা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে—‘‘মা, একটু ফ্যান দাও, কয়েকদিন পেটে দানাপানি পড়েনি।’’ কিংবা এক টুকরো রুটি নিয়ে কুকুরে মানুষে কাড়াকাড়ির দৃশ্যগুলি ভোলা যায় না। এক বড় অংশ জমিদারদের ব্যাভিচারী জীবন, ভোগবিলাস—অপরদিকে, ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকারময় জীবন—এই সব দেখতে দেখতেই বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে গড়ে উঠল কৃষকসভার মতো একটি সংগঠন যারা ব্রিটিশদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে শুধু বাংলায় নয়, সারা দেশে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করে।

দেশ স্বাধীন হল কিন্তু কৃষকদের ওপর শোষণের তীব্রতা কমলো না। ঢাকঢোল পিটিয়ে ভূমি-সংস্কার আইন হল কিন্তু জোতদার-জমিদারদের খুশি করতে তার কোনো প্রয়োগ হল না। ক্ষুধা, দারিদ্র্য দেশের নিরন্ন মানুষকে গ্রাস করল। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, ’৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন। ’৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে ৮০ জন মানুষকে কোলকাতার রাজপথে পুলিশ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। অনাহার, অর্ধাহারের এই ভুখা মিছিলের ওপর ডা. বিধান রায়ের পুলিশের এই নির্মম অত্যাচারে স্তম্ভিত হয়ে যায় সমগ্র পশ্চিমবাংলা। ’৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনেও পুলিশের গুলিতে কিশোর শহিদ নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইতের মৃত্যু সমগ্র বাংলাকে নাড়া দেয়। গণসঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত অজিত পাণ্ডের ‘ওগো নুরুলের মা’ কিংবা নাট্য আন্দোলনের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক উৎপল দত্তের ‘দিন বদলের পালা’ নাটক আমরা যারা ছোটোবেলায় দেখেছি আজও ভুলতে পারি না। ’৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পরই ’৪৪ সালেই ‘নবান্ন’ নাটক থেকেই দেশের প্রথিতযশা শিল্পীরা বাংলার কৃষকদের দুঃসহ জীবন যেভাবে তুলে

ধরেছিলেন তারই গণ্ডি বেয়ে এ দেশের গ্রুপ থিয়েটার ও যাত্রাপালাগুলি জমিদার, জোতদার ও মজুতদারদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা সৃষ্টিতে এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। আজকের প্রজন্মের ছাত্র-যুবরা সেদিনের শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকর্মীদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি। আজকে যাঁদের দেখছেন তাঁদের অধিকাংশই কেনা গোলাম, কাঁচা টাকায় তাঁদের মনুষ্যত্ব বিক্রি হয়ে গেছে। এরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে গর্ববোধ করে, মোমবাতি জ্বালায়, নাটকের ভাবনা বদলে দেয়, উদারীকরণ নীতির তীব্র কষাঘাত বুঝতে দেয় না, কৃষকের আত্মহত্যা নিয়ে অদ্ভুত নীরবতা দেখায়। অথচ এক সময় এদের বিবেক দারুন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। আজকে যখন বিবেকের জাগ্রত রূপ জনগণ দেখতে চায় তখন এই নীরবতা জনমানসে ঘৃণার উদ্রেক করে। মহিলাদের ওপর পাশবিক আক্রমণ কিংবা শিক্ষাঙ্গন যখন প্রবলভাবে আক্রান্ত তখন মোমবাতি নিয়ে মিছিল নয়, বন্দুকের মিছিল দেখে ভণ্ড বুদ্ধিজীবীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন।

সেদিনের দিনগুলিতে যাত্রাপালা, নাটক, গণসঙ্গীত শাসকের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরিতে যে সাহায্য করেছিল, সেই অবদানকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। গ্রামে গ্রামে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন একটা মাত্রা পেয়েছিল। এই লড়াই আন্দোলনের মধ্যেই আসে '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার। পশ্চিমবাংলার ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী হন কৃষক আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার। তাঁর জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে কৃষক আন্দোলনের বহু ইতিহাস নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। আজও কানে বাজে তাঁর বজ্রকঠিন উদ্দীপ্ত করা ভাষণ, যা শোনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ বসে থাকতেন। মাত্র ৫৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন। অনেক ৫০ বছর বয়স্ক মানুষরা তাঁর ভাষণ শোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা শুনেছি। প্রতিটি শব্দে, কথায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সেদিন দেখেছি বাঁধভাঙা স্রোতের মতো গ্রামের গরিবদের মিছিল, 'খাস জমি দখল করো, দখলে রেখে চাষ করো'—এই শ্লোগান কাকদ্বীপ, সোনারপুর, চৈতন্যপুর, বিজুর, কাজোরা থেকে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। জমিদার-জোতদারদের জমি দখল নিতে মাইলের পর মাইল হাঁটত গ্রামের কৃষক, যদিও সে জানত ওই জমি আমি পাব না। 'আমি' তখন 'আমরা' হয়ে গেছে। গরিবদের চেতনায় এসেছে অধিকারবোধ, মাথা উঁচু করে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার স্বপ্ন, দীর্ঘকাল জমিদার-জোতদারদের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সবই যেন একসূত্রে গাঁথা হয়ে ক্রমশ লম্বা হল কৃষক-খেতমজুরদের জঙ্গি মিছিল। কৃষক আন্দোলনের নেতারা বুঝতেন শুধু আইন করে ভূমি-সংস্কার হবে না, চাই সংগঠিত জঙ্গি ধারার কৃষক আন্দোলন। পুলিশ, আমলারা সব জমিদার-জোতদারদের পক্ষে, তাই লড়াই ছাড়া কোনো পথ নেই। এই আগুন জ্বালানো লড়াই আরও তীব্র হল '৬৯ সালে। 'খেতে কিষাণ, কলে মজুর, জোট বাঁধো তৈরি হও'—এই শ্লোগান যত তীব্র হয়েছে ততই দিল্লি কেঁপে গেছে, শুরু হয়েছে সরকার ভাঙার গভীর ষড়যন্ত্র।

১৯৬৯ সালের সরকারেরও পতন হল। তারপর সি.আর.পি. পাঠিয়ে শুরু হল গ্রামের জোতদারদের রক্ষা করার জন্য কৃষকদের ওপর তীব্র আক্রমণ, আক্রমণ শুরু হল কলে, কারখানায়। শ্রমিক-কৃষক ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তুললেন প্রতিরোধের শক্ত প্রাচীর। শাসকশ্রেণি আরও আক্রমণ বাড়িয়ে তুলল। '৭২ সালে অনুষ্ঠিত হল জাল-জোচ্চুরির বিধানসভা নির্বাচন। আক্রমণের মুখে জনগণের চুপ থাকা দেখে শাসকশ্রেণি মনে করল জনগণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জনগণ জবাব দিল '৭৭ সালের নির্বাচনে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এল। তখন হরেকৃষ্ণ কোঙার নেই, কৃষক আন্দোলনের আর এক অনন্য যোদ্ধা বিনয় চৌধুরী ভূমি সংস্কার মন্ত্রী হয়ে ভূমি সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন, বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষায় 'অপারেশন বর্গা' চালু হল, পঞ্চায়েতের নির্বাচন পুনরায় চালু হল, ভূমিহীন কৃষকদের পাট্টা দেওয়া শুরু হল। বাংলার কৃষকদের জীবনে শুরু হল পরিবর্তন। খাদ্যশস্যের উৎপাদন কয়েক বছরে ৬ গুণ বেড়ে গেল। '৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবাংলায় মানুষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে কৃষক সহ সর্বস্তরের মানুষকে কোনো অনাহার, অর্ধাহার কিংবা কোনো যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হয়নি। দ্রুত গতিতে বেড়েছে কৃষি উৎপাদন।

১৯৯০-এর দশকে উদারীকরণ নীতি শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত এই উৎপাদনের গতি বজায় থাকলেও পরবর্তীকালে উৎপাদনের হার কিছুটা হ্রাস পেতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার উদারীকরণ নীতি গ্রহণের পর দেশের সার কারখানা বন্ধ করে বিদেশ থেকে সার আমদানি শুরু হয়। কৃষিতে ভর্তুকি কমতে থাকে। সারের সাথে সাথে বীজ, কীটনাশকও বিদেশ থেকে আমদানি শুরু হয়। সার, বীজের দাম বৃদ্ধির ফলে কৃষিতে উৎপাদনব্যয় বাড়তে শুরু করে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও কৃষকের পাশে

দাঁড়ানোর ফলে কৃষি উৎপাদন অনেকটাই বজায় রাখতে সমর্থ হলেও সারা দেশের মতো এ-রাজ্যেও উদারনীতির প্রভাব ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করে। বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলি এই উদারনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে কৃষক জাঠা সংগঠিত হয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরাও রাস্তায় নামেন। গ্রামে গ্রামে সাংস্কৃতিক জাঠার মাধ্যমে উদারনীতির দানবীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজকে সচেতন করায় ব্রতী হন। শুধুমাত্র সভা সমাবেশ নয়, আক্রমণের রূপটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে কৃষি বিকাশের আন্দোলন শুরু হয়। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জীবাণু সার প্রয়োগ সম্পর্কে কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধি, কী পদ্ধতিতে ধান চাষ ইত্যাদি নানা কর্মসূচি কৃষক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। অজস্র আলোচনাসভা এবং হাতেকলমে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। উৎসাহী কৃষকের একটি ক্ষুদ্র অংশ এর দ্বারা সমৃদ্ধও হয়েছেন। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলিকে আরও জনমুখী করে গড়ে তুলতে কৃষকসভা তার ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে। সমাজের পিছিয়েপড়া অংশের মানুষ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হয়। গরিব পাড়ার মেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনা কিংবা সভাপতি হয়ে পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালনা—এগুলো ছিল একসময় স্বপ্ন। বামফ্রন্ট সরকারই এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটায়। গ্রাম্যসভাগুলিতে অতীতে গরিবদের ওপর আক্রমণ ও বামফ্রন্ট সরকারের সময়কাল নিয়ে বয়স্ক মানুষরা যখন কথা বলতেন আজকের প্রজন্মের ছেলেরা হতবাক হয়ে যেত। গ্রামের বয়স্করা বলতেন, ''গরিবদের মর্যাদা, গরিবদের অধিকারের পিছনে এই লাল ঝাণ্ডা, আমরা চিরদিন বাঁচবো না কিন্তু এই ঝাণ্ডাটা শক্ত করে ধরবি নতুবা আবার অধিকার কেড়ে নেবে।''

যত সময় এগিয়েছে অতীতের সংগ্রাম আন্দোলনের কাহিনি নতুন প্রজন্মের কাছে ক্রমশ ফিকে হয়ে গেছে। আত্মসমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা বলতে হয় আমরাও কৃষক আন্দোলনের কর্মীরা সদাজাগ্রত ছিলাম না। এক সময়ে গরিবপাড়ার সাথে যে জনসংযোগ ছিল ক্রমশ তাতে ঘাটতি দেখা যায়। এক সময়ে সাক্ষরতা আন্দোলন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে অভ্যাস ছিল সেখানেও মরচে পড়ে। উদারনীতির পর্ব থেকেই গ্রামাঞ্চলে এক নব্য ধনীর উদ্ভব হয়। এরা কেউ জমিদার বা জোতদার নয়, গ্রামে গরিবদের কোনো ঘৃণা এই অংশের মধ্যে নেই। বাড়িতে বেশ কয়েকজন চাকুরে এবং উচ্চহারে বেতন কিংবা বড় কোনো ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্য দিয়ে এরা গ্রামে বড়লোক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামে গ্রামে খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই অংশ প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করে না। গ্রামাঞ্চলে কৃষকনেতাদের সাথে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও বাড়তে শুরু করে। এই নব্য ধনী অংশটি গ্রামে সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে প্রতিপত্তি লাভ করার পর যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের দিকে এগোতে থাকে তখনই কিছু সমস্যা তৈরি হয়। সত্যিকারের ঘটনা হল আমরা এই সময়কালের ঘটনাবলী সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে রণকৌশল গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের বিরোধী অংশ এই ফাঁকগুলি পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। ধনী অংশটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত গরিবদের একটা অংশও ক্রমশ কৃষক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং শত্রু শিবিরের হাতিয়ারে পরিণত হয়। গ্রামে গ্রামে খেতমজুরের সংখ্যা কমে একটা অংশ যে ভিন্ন জীবিকা গ্রহণ করে অসংগঠিত শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন সেটাও সময়মতো নজরে আসেনি।

২০১১ সালে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পতন হল। একটি অঙ্গরাজ্যে একটি রাজনৈতিক দলের একটানা ৩৪ বছর টিকে থাকা সারা বিশ্বের কাছে এক নজিরবিহীন ঘটনা। ১৯৭৭ সালে সরকার পরিচালনার পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। পথ চলতে চলতে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে রাস্তা তৈরি করতে হয়েছে। কাজটা বড় কঠিন ছিল, কিন্তু আমাদের পূর্বসূরিরা যোগ্যতার সাথে এই মহান কাজ সম্পন্ন করে গেছেন।

সরকার পরিবর্তনের পর থেক গণতন্ত্রের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ নেমে আসে। বর্ধমান জেলাতেই দিলীপ সরকার, প্রদীপ তা, কমল গায়েন সহ ১৯ জন নেতা-কর্মী শহিদ হয়েছেন। অসংখ্য বামপার্টি ও গণসংগঠনের অফিসের ওপর আক্রমণ নেমে আসে। কর্মীদের ঘরবাড়ি লুঠ, অগ্নিসংযোগ, জরিমানা, নেতাকর্মীদের এলাকাছাড়া করার ঘটনা প্রতিদিনই বাড়তে থাকে। আজও চলছে মিথ্যা মামলা। কয়েক হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হন, শারীরিকভাবে আক্রান্ত কয়েক হাজার কর্মী। ১০০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়। কলে কারখানায় জীবিকাচ্যুত হন কয়েক হাজার শ্রমিক। শুধু দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও ডি.পি.এল

তাপবিদ্যুৎ কারখানায় পাঁচ হাজার ঠিকাদার শ্রমিক কর্মচ্যুত হন। মিটিং মিছিলের প্রতি নিষেধাজ্ঞা চলতে থাকে। বামপন্থীদের সভাসমাবেশে অনুমতি মেলে না। ইংরেজ আমলে ভারতীয়রা ছিল যেমন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, তেমনি এই আমলে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া বাকিরা সবাই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। একটানা ৩৪ বছর শান্তিতে বসবাস করার পর তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রশাসনের আক্রমণের চেহারা দেখে প্রাথমিক পর্বে অনেকেই সন্ত্রস্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন। যত সময় পেরিয়েছে, সরকারের প্রতি ক্ষোভ বেড়েছে সারদা সহ একাধিক কেলেঙ্কারিতে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা কমেছে। নির্বাচনের আগে দেয় প্রতিশ্রুতি মিথ্যাচারে পরিণত হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য বেড়েছে। মহিলাদের ওপর আক্রমণ তীব্র হয়েছে। আক্রান্ত কৃষক ও খেতমজুর, আক্রান্ত শ্রমিক সহ সাধারণ কর্মচারী, আক্রান্ত পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্র, আক্রান্ত শিক্ষক ও কর্মচারী, আক্রান্ত সর্বস্তরের মানুষ। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে আবার গড়ে উঠছে আন্দোলন সংগ্রাম। ক্রমশ তা প্রতিরোধ সংগ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। পঞ্চায়েত, পৌরসভা, লোকসভা নির্বাচনে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব জনগণ ভুলে যায়নি। ছাত্র সংসদ থেকে সমবায় পর্যন্ত সর্বত্র জোর করে ক্ষমতা দখল মানুষ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছেন। যত দিন যাচ্ছে শাসক পার্টির শীর্ষে বসছেন সমাজবিরোধী আর দুর্বৃত্তরা। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যারা এক সময় মিডিয়ার দৌলতে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তাঁদের সবার ঘরে ফেরার পালা শুরু হয়েছে।

আসলে আক্রমণের এই চারটি বছরে কৃষক আন্দোলন কখনও চুপ করে থাকেনি। গোপনে বা প্রকাশ্যে সমগ্র কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শস্যভাণ্ডার বলে খ্যাত বর্ধমান জেলায় এই চার বছরে ১০৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আত্মহত্যাকারী পরিবারের লোকজনকে নিয়ে মহিলা সমিতির সাথে যৌথ উদ্যোগে কৃষকসভা বর্ধমান শহরে গণঅবস্থান করে। সে খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৪ সালের ১৪ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে সংগঠিত হয় কৃষক জাঠা। পশ্চিমবাংলার ৪০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩৩ হাজার গ্রামে এই পদযাত্রা সংগঠিত হয়। কৃষকের ফসলের দাম, গরিবের কাজ—এইগুলো ছিল মূল দাবি। ফসলের দাম সহ অন্যান্য দাবিতে বর্ধমান শহরে ৬ এপ্রিল ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল সমাবেশ। প্রায় ৭০ হাজার মানুষ এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। ২ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরের মুচিপাড়া থেকে শুরু হয় বার্নপুর পর্যন্ত পদযাত্রা। শ্রমিকদের দাবির পাশাপাশি কৃষকরাও ফসলের দাম, গরিবদের কাজের দাবিতে পদযাত্রার সাথে মিলিত হয়। কয়েক হাজার মানুষ এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। আন্দোলন সংগ্রামে মানুষের এই অংশগ্রহণ ও জঙ্গি চেহারার ধারাবাহিক কর্মসূচি দেখে রাজ্য নেতৃত্ব নবান্ন অভিযানের ডাক দেয়।

২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযান কর্মসূচি পালিত হয়। প্রায় ৩ লাখের বেশি মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, জলকামান ব্যবহার করে, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। হাজারের বেশি মানুষ পুলিশের আক্রমণে আহত হন। বর্ধমান জেলার ৩৪৭ জন আহত হন। এই মিছিলে ছাত্র, যুব, মহিলা, অসংগঠিত শ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করে। কৃষক আন্দোলনের কর্মীদের সাথে ছাত্র, যুব, মহিলারা আহত হন। শতাধিক মহিলা কর্মী আহত হন। এই আক্রমণে কেউ দমেনি বরং জঙ্গি মেজাজ তৈরি হয়। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে। রাজ্য সরকারের প্রবল বাধা সত্ত্বেও এই ধরনের ধর্মঘটের সাফল্য আগে কখনও দেখিনি।

বামপন্থী কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনগুলির আহ্বানে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচিতে ১৭ দফা দাবি ছিল। দাবিগুলি নিয়ে আরও লড়াই চালাতে হবে। ধানের দাম নেই, আলুর দাম নেই, নেই পাটের দর। কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মাস থেকে ১০০ দিনের কাজ প্রায় বন্ধ। গরিবদের কাজ নেই। প্রভাব পড়ছে ব্যবসা বাণিজ্যে। অপরদিকে, জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, চাষের খরচ আরও বাড়বে। ডিজিটাল কার্ডের নামে বিপিএল তালিকা থেকে প্রায় ৪ কোটি মানুষের নাম বাদ দেওয়ার আশংকা থাকছে, আরও সর্বনাশ হবে।

মানুষের ঘুম ভাঙাতে সেদিন অনেক শিল্পী রাস্তায় নেমেছিলেন। আজও বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষ গণতন্ত্রের সপক্ষে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু শিল্পী-সাহিত্যিকও আজও মেরুদণ্ড সোজা রেখে গণতন্ত্রের পক্ষে, শোষণের বিরুদ্ধে, কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাকে সামনে রেখে কৃষক জীবনের নানা সমস্যাকে শহরের মানুষের সামনে তুলে ধরছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের যন্ত্রণা দেখে কৃষক আন্দোলনের গতিবেগ সৃষ্টির জন্য প্রখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাটক লিখেছিলেন 'নবান্ন'। ৭১ বছর পর কৃষক আন্দোলনের জঙ্গি রূপ দেখল আর এক 'নবান্ন'। এই 'নবান্ন'র লক্ষ্য ছিল কৃষক আন্দোলনের গতিকে রুদ্ধ করা। 'নবান্ন অভিযান'-এর জঙ্গি আন্দোলন আজকের পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন পর্বের সূচনা করবে।

With Best Compliments of

SATYAM SMELTERS

Ekra, Jamuria, Dist. Burdwan

Sl. No. 8

বিশ্বায়ন ও পুঁজির আদিম সঞ্চয়

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আন্তর্জাতিক চরিত্রের লগ্নিপুঁজির অবাধ বিচরণ ও মুনাফার সর্বোচ্চকরণের প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েই এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন। মার্কসীয় মতবাদ পুঁজি নিয়ে আলোচনা করেছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছে। পুঁজিবাদ বিকাশের ধারায় যখন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত হয়, তখন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-এর মৃত্যু হয়েছে। ভ্লাদিমির লেনিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মার্কসীয় মতবাদকে বিকশিত করলেন, সমৃদ্ধ করলেন। লগ্নি পুঁজির বৈশিষ্ট্য তিনি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি দেখালেন কীভাবে ব্যাঙ্কপুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনে লগ্নি পুঁজির উদ্ভব ঘটে।

বর্তমান সময়ে লগ্নিপুঁজির আরও বিকাশ ঘটেছে। একদিকে ব্যাপক আন্তর্জাতিকীকরণ ও তার সাথে কেন্দ্রীকরণের ফলে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য লগ্নিপুঁজির মধ্যে লক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের পর্বে এই বৈশিষ্ট্যগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পুঁজির আর্থিকীকরণ ব্যাপকভাবে ঘটেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগের তুলনায় ফাটকায় পুঁজির বিনিয়োগ ঘটছে ব্যাপকভাবে। দ্রুত মুনাফার সর্বোচ্চ বৃদ্ধির দিকে লগ্নিপুঁজি ধাবিত হচ্ছে।

পুঁজির এই মুনাফা-ব্যগ্রতা খুব বলিষ্ঠতার সাথে ধরেছেন ইংলন্ডের ট্রেড ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা টি জে ডানিং, যাঁর উদ্ধৃতি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কার্ল মার্কস দিয়েছেন, ''...দশ শতাংশ মুনাফার সন্ধান পেলে পুঁজির বিনিয়োগ যে কোনো স্থানে হবে, বিশ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিত হলে পুঁজি উৎসাহী হবে, পঞ্চাশ শতাংশ মুনাফার সন্ধান পেলে পুঁজি ইতিবাচক ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে, একশত শতাংশ মুনাফা পুঁজিকে যে-কোনো অপরাধের দিকে ঠেলে দেবে। এমনকি তার পরিণামে পুঁজির মালিকদের যদি ফাঁসিও হয়ে যায়, তাতে কিছু এসে যায় না।''

পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে চলার ক্ষেত্রে দু-টি পদ্ধতি কাজ করে। প্রথম পদ্ধতি হল উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার মাধ্যমে পুঁজির বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, জোর পূর্বক উৎখাত বা জবরদস্তিমূলক দমনকারীর মাধ্যমে পুঁজির বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পদ্ধতিকে পুঁজির আদিম সঞ্চয় বলে। আদিম সঞ্চয়কে একমাত্র ঐতিহাসিক দিক দিয়ে দেখলে তা সঠিক হবে না। জোর করে দখলদারির মাধ্যমে পুঁজির বৃদ্ধিকেই বলে পুঁজির আদিম সঞ্চয়। এটা হল প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন, নৃশংসতা হল এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদের উদ্ভবের সময়ে আদিম সঞ্চয় প্রক্রিয়াই ছিল প্রধান রূপ।

কার্ল মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজি থেকে তৈরি হয়, আবার উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্য দিয়ে পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে। পুঁজির সঞ্চয় ঘটে উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে, আবার উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অর্থ হল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পুঁজির ও শ্রমশক্তির অবস্থান পণ্য উৎপাদনকারীদের হাতে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করা সম্ভব পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের পূর্বে আদিম সঞ্চয়কে ধারণায় আনার মধ্য দিয়ে। এটাই ছিল শুরুর পর্যায়। আদিম সঞ্চয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কস আরও বলেছেন, ''আদিম সঞ্চয়ের ইতিহাসে, যে বিপ্লবগুলি পুঁজিপতি শ্রেণির গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালন করেছে সেগুলিকে যুগ সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করা হয়, বিশেষ করে সেই মুহূর্তগুলি যখন বিশাল সংখ্যক মানুষ হঠাৎ করে এবং জোরপূর্বক তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন থেকে উৎখাত হয়, শ্রমের বাজারে স্বাধীন ও অসংযুক্ত সর্বহারায় রূপান্তরিত হয়। কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের জমি থেকে উৎখাত, এটাই সমগ্র প্রক্রিয়ার ভিত্তি।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ কার্ল মার্কস রচনা করেছিলেন প্রায় ১৫০ বছর আগে। বর্তমানে পৃথিবীতে বিশ্বায়নের নামে যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনপর্ব চলছে, সেখানেও আমরা দেখি এই আদিম সঞ্চয় প্রক্রিয়া চলছে। একদিকে সরাসরি উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ প্রক্রিয়া ও অপরদিকে বর্বর-লুণ্ঠন পদ্ধতি অর্থাৎ আদিম সঞ্চয় প্রক্রিয়া—দুটোই জারি রয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তার বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস থেকে মতাদর্শগত একটি দলিল গ্রহণ করে। এই দলিলে বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়নের নামে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির কার্যধারা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে আদিম সঞ্চয় প্রক্রিয়া কীভাবে বিরাজ করছে তা সর্বস্তরে আলোচনা করা হয়েছে—

''...আদিম সঞ্চয় প্রক্রিয়া অতীতে নানা রূপ নিয়েছে; তার মধ্যে আছে সরাসরি উপনিবেশ স্থাপন। শ্রেণিশক্তিগুলির আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করছে কোনো বিশেষ মুহূর্তে আদিম সঞ্চয়ের আগ্রাসী রূপটি কী হবে, সেই ভারসাম্য পুঁজিবাদী নৃশংসতাকে কতটা প্রশ্রয় বা বাধা দিচ্ছে। সমকালীন সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্বের জনসংখ্যার সুবৃহৎ সংখ্যাগুরু অংশ পাশবিক আদিম সঞ্চয়ের ক্রমবর্ধমান নৃশংসতার দ্বারা আক্রান্ত। উন্নত দেশে, উন্নয়নশীল দেশেও।''

''পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষত, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যে-ধরনের আক্রমণে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিলগ্নিকরণ ও বেসরকারিকরণ হচ্ছে, তা আসলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের দখলদারির মাধ্যমে পুঁজির বেসরকারি সঞ্চয় ছাড়া কিছুই নয়। জল ও বিদ্যুতের মতো জনস্বার্থের সামগ্রী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো জনসেবামূলক

ব্যবস্থা, ক্রমেই বেশি করে পুঁজির বেসরকারি সঞ্চয়ের এলাকাভুক্ত হয়ে পড়ছে। খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ক্রমবর্ধমানভাবে বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে। বহুজাতিক বীজ ও বিপণন কোম্পানিগুলির কাছে কৃষিক্ষেত্রকে ক্রমেই উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বনির্ভর কৃষি কার্যত ধ্বংসের মুখে, কৃষকসমাজ গভীরভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। বাণিজ্য মাসুল প্রত্যাহার ও অবাধ বাণিজ্য চুক্তি চালু হওয়ার ফলে অনেক উন্নয়নশীল দেশে বি-শিল্পায়নের সূত্রপাত হয়েছে। পুঁজির অবাধ চলাচলের বিপ্রতীপে রয়েছে উন্নত দেশগুলির কঠোর অভিবাসন আইন, যার ফলে তীব্রতর হচ্ছে শোষণ ও অত্যাচার, বাড়ছে মুনাফা। অরণ্য, খনি, জল প্রভৃতির মতো সর্বসাধারণের সম্পদ ক্রমবর্ধিতভাবে দখল করা হচ্ছে ব্যক্তির সম্পত্তি হিসেবে।"

"...আদিম সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার এই আক্রমণ বৃহৎ দুর্নীতির এ-যাবৎ অজ্ঞাত পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।... সমকালীন সাম্রাজ্যবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই 'জবরদস্তি দখলদারির মাধ্যমে সঞ্চয়' যা পুঁজিবাদের 'আত্মসাতের মাধ্যমে সঞ্চয়'-এর থেকে স্পষ্টতই পৃথক।"

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদের শোষণের নতুন নতুন রূপ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বাইরের রূপ ও আকৃতি যাই হোক না কেন, 'আত্মসাতের মাধ্যমে সঞ্চয়' ও 'জবরদস্তিমূলক দখলদারির মাধ্যমে সঞ্চয়'—দুটোই শোষণের মূল রূপ হিসেবে বিরাজ করছে। জবরদস্তিমূলক দখলদারির পরিণতিতে আক্রান্ত সমগ্র পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নামে ভয়ংকর আগ্রাসন তথা পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে এই ক্ষতিগ্রস্ত-আক্রান্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপক ক্ষেত্র রয়েছে। এই শোষণভিত্তিক দমনমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে একমাত্র শোষিত বঞ্চিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

With best compliments of

BBC REFRACTORIES

Prop. ***Sanjay Santhalia***

Girmint (Majiara), Burdwan

MANUFACTURER OF FIRE BRICKS

Sl. No. 169

শ্রমজীবী মানুষ এগিয়ে আসছেন

অরিন্দম কোঙার

একুশ শতকে

প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী পুরনো বছর যাচ্ছে, নতুন বছর আসছে। বছর ছেড়ে দশক যাচ্ছে, দশক আসছে। শতকও যাচ্ছে, আবার শতকও আসছে। বিজ্ঞানের নিয়ম প্রকৃতি অনুসরণ করছে। পুরনো যাচ্ছে, নতুন আসছে। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন থেকে বিকাশ হচ্ছে। সামনের দিকে। এইভাবেই আমরা বিশ শতক থেকে একুশ শতকে এসেছি। একুশ শতকের প্রথম দশক পেরিয়ে দ্বিতীয় দশকে অবস্থান করছি।

জীব বিজ্ঞানের নিয়ম জীবজগতে কাজ করছে। গাছপালা, জীবজন্তু মরছে, আবার জন্মাচ্ছে। যেহেতু দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হয়, রূপান্তর ঘটে, তাই পরিবতনের শর্তে ভারসাম্য না থাকলে, বিপরীতমুখী চাপ বেশি হলে বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু সেটা নিয়মকে না-মানার জন্য নয়, বাইরের শক্তির চাপে নিয়মকে অস্বীকার করার জন্য। মানুষের মস্তিষ্কেরও পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন থেকে বিকাশ হচ্ছে। শেখার, জানার ও বোঝার ক্ষমতা বাড়ছে। জীবজগতে পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, অভিযোজন প্রক্রিয়ার বড় ভূমিকা আছে।

সমাজ বিজ্ঞানের আবার নিয়ম আছে, সেই নিয়ম কার্যকরও থাকছে। কিন্তু সমাজ ও প্রকৃতিতে নিয়ম একইভাবে কার্যকর হয় না, কারণ ''...একদিক থেকে সমাজ এবং প্রকৃতির বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে কেবল অন্ধ অচেতন শক্তিগুলি পরস্পরের উপর সক্রিয়, সেগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে দেখা দেয় সাধারণ নিয়মাবলী। ভাসাভাসা ভাবে দেখা অসংখ্য আপাত-আপতনের ক্ষেত্রেই হোক, বা যে-চরম ফলাফলের মধ্যে এই আপতনগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা প্রমাণিত হচ্ছে সেখানেই হোক, কোনো ঘটনাই সচেতন বাঞ্ছিত লক্ষ্যানুসারী নয়। পক্ষান্তরে, মানব-সমাজে প্রতিটি কর্মের কর্তা চেতনাবিশিষ্ট, তারা সংকল্প নিয়ে বা আবেগবশে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ক্রিয়াশীল; সচেতন উদ্দেশ্য ছাড়া, বাঞ্ছিত লক্ষ্য ছাড়া এখানে কোনো কিছুই ঘটে না।''—এঙ্গেলস (ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান) তবে এটা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক যে প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়েই বিজ্ঞানের এক অখণ্ড রূপ। মার্কস ও এঙ্গেলসের অভিমত, ''আমরা জানি একটা মাত্র বিজ্ঞান, ইতিহাস-বিজ্ঞান। ইতিহাসের দিকে দুটো দিক থেকে তাকিয়ে সেটাকে প্রকৃতির ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাসে ভাগ করা যায়। দিক-দুটো কিন্তু অবিচ্ছেদ্য; যতকাল মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে তাতে প্রকৃতির ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাস পরস্পরের উপর নির্ভর করে।'' (জার্মান ভাবাদর্শ)

মানুষের উৎপাদন করার ক্ষমতা বাড়ছে। সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। এক আবিষ্কার আর এক আবিষ্কারের সম্ভাবনা তৈরি করে দিচ্ছে। প্রযুক্তির প্রয়োগে যন্ত্রের উন্নতি হচ্ছে। জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটানোর সুযোগ বাড়ছে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে নিয়ম সেইভাবে কার্যকর হচ্ছে না। পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু বিকাশ হচ্ছে না। অর্থাৎ গোটা মানব সমাজ জীবনচর্চায়, জীবনচর্যায়, নান্দনিকতায়, মূল্যবোধে উন্নত হচ্ছে না, সামাজিক কাজকর্ম সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলছে না। কারণটা মার্কস দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ''...ধনতান্ত্রিক উৎপাদন যে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায় এবং বিবিধ প্রক্রিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে একটি সামাজিক সমগ্রতা গড়ে তোলে, তা কেবল সম্পদের মূল উৎস দুটিকে নিঃশেষিত করার মাধ্যমেই সম্পাদন করে; সেই উৎস দুটি হল—মৃত্তিকা ও শ্রম।'' (ক্যাপিট্যাল, প্রথম খণ্ড) মার্কস এইখানেই থামেননি। 'ক্যাপিট্যাল'-এর তৃতীয় খণ্ডে লেখেন, ''কিন্তু বাজার দামের ওঠানামার উপরে বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্যের চাষের নির্ভরশীলতা এবং দামের এই নিরন্তর ওঠানামার সঙ্গে এই চাষে রদবদল—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির গোটা মর্মবস্তু, যা পরিচালিত হয় আশুলাভের উদ্দেশ্যে—হচ্ছে কৃষিকর্মের সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ যাকে জোগাতে হবে বংশ পরম্পরা ধরে জীবনধারণের সমস্ত চিরকালের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহ।'' এতো ভারসাম্যহীন লুণ্ঠন যা সমাজকে নানা দিক থেকে দূষিত করছে। দূষণ চারিদিকে—দূষণ জলবায়ুতে, দূষণ মননে, দূষণ সংস্কৃতিতে, দূষণ খেলাধূলায়। চারিদিকে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা।

একটা গোলমেলে ব্যাপার। একদিকে প্রাচুর্য, অপরদিকে দারিদ্র্য। একদিকে বিলিওনিয়ার অর্থাৎ বর্তমান ভারতীয় মুদ্রায় অন্তত ৬,৫০০০ কোটি টাকার সম্পদের মালিক, অপরদিকে অনাহারে মৃত্যু। অর্থনীতির বিশ্বায়ন হচ্ছে অর্থাৎ সারা বিশ্বজুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে, কিন্তু সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ফল ভোগ করছে মূলত যাদের খুবই পুঁজির জোর আছে তারা। তাদের যেমন পুঁজির জোর আছে, তেমনি সমাজে তাদের দাপটও আছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া—কোথায় নয়?

নয়া উদারীকরণ নীতি চালু হয়েছে আমাদের মতো দেশে এবং সেই নীতি আরও জোরদার করছে দেশের সরকার। আসলে নয়া উদারীকরণ নীতি এসেছে অর্থনীতির বিশ্বায়নের সূত্রে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন একদিকে লুটের বিশ্বায়ন, অপরদিকে দারিদ্র্যের বিশ্বায়ন। নয়া উদারীকরণ নীতি একদিকে পুঁজির অবাধ লুটের জন্য উদারীকরণ, অপরদিকে দুর্দশা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদারীকরণ।

বিশ শতকে

এই অর্থনীতির বিশ্বায়ন, নয়া উদারীকরণ নীতি একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশ শতকের শেষ দশক থেকে। এই শতকের চারের দশকে স্থাপিত হয় বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, গ্যাটের মতো সংস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে খুব কম মানুষই এইসব সংস্থার নাম জানতো। বিশ শতকের শেষ দশকে সংস্থাগুলো বেশ পরিচিতি পায়। গ্যাটের সূত্র ধরে আবার পরিচিতি পায় ডাঙ্কেল প্রস্তাব। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের সূত্র ধরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা পরিচিত হয়। কারণ? মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই সংস্থাগুলো প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। কৃষিতে ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প, ব্যাঙ্ক ও বিমা, গণবন্টন ব্যবস্থা—সর্বত্র প্রভাব পড়ছে।

সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যে ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে এবং পুঁজির বেপরোয়া লুটে বিশ্বজুড়ে এমন এক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যাতে বিশ শতকের আটের দশক থেকে নানা দেশে মৌলবাদী শক্তি ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো মৌলবাদী শক্তি আবার সন্ত্রাসবাদী চেহারা নিয়েছে এবং একুশ শতকে সন্ত্রাসবাদ রীতিমতো আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্থানের প্রগতিশীল সরকারকে উৎখাত করার জন্য তালিবানদের যখন মদত যোগানো হয়, ওসামা বিন লাদেনকে ব্যবহার করা হয়, পাকিস্তানের মাধ্যমে অর্থ ও অস্ত্র পাঠানো হয়, তখন যাঁরা নির্লিপ্ত বা উল্লসিত হয়েছিলেন, এখন তাঁরা প্রমাদ গুনছেন। ইতিমধ্যে সামরিক অভিযানে ইরাক বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মেসোপটেমিয় সভ্যতার নিদর্শন হয় নষ্ট হয়েছে, নয় লুট হয়েছে। একই দশা আফগানিস্থানের। প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি গুলি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ইয়েমেন, তুরস্কের অবস্থাও সঙ্গীন। মিশর, লিবিয়া টালমাটাল। সিরিয়া, নাইজেরিয়ায় দমবন্ধ করা অবস্থা। পাকিস্তানেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত। মহিলাদের লেখাপড়া বন্ধ করার জন্য মালালা ইওসুফজাইকে (নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজেতা) গুলিবিদ্ধ করা হয়। ভারত ও বাংলাদেশেও মৌলবাদীরা সক্রিয়। একের পর এক যুক্তিবাদী পণ্ডিত মানুষ খুন হচ্ছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘোঁট পাকাচ্ছে আর তার পরিণতিতে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের একটার পর একটা দেশ সন্ত্রাসবাদী হামলায়, মার্কিনি ক্ষেপণাস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, অসহায় মানুষ একটু আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি করছে, তুরস্কের তিন বছর বয়সের শিশু আয়লান কুর্দির নিথর দেহ শেষ পর্যন্ত সমুদ্রতটের বালিতে আশ্রয় পাচ্ছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল ভারতবর্ষ। স্বাধীনতার জন্য জোরদার লড়াই চলে। কিন্তু সব ঠিকঠাক হয়নি। তাই বিশ শতকের প্রাক-দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসন-মুক্ত ভারতবর্ষ হয়েছে দু-টুকরো—ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান থেকে আবার এক টুকরো বেরিয়ে গেছে—বাংলাদেশ। গোটা প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার বিপদ থেকে যায়, বিপদ থেকে যায় সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের। বাস্তবে এইসব বিপদ বেড়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের ঠোকাঠুকি চলছে, রক্তারক্তিও হচ্ছে। ভারতে দারিদ্র্য আছে, অনাহার আছে, বেকারি আছে, নিরক্ষরতা আছে, পাকিস্তানে আরও বেশি আছে। কিন্তু দু দেশের পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতা হচ্ছে, ক্ষেপনাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

এইসব বিপদ বেড়ে গেল বিশ শতকের শেষ দশকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর। সমাজতন্ত্র ভাঙলো, দেশ ভাঙলো। প্রতি-বিপ্লব জিতলো। এই শতকেরই দ্বিতীয় দশকে বিপ্লব জিতেছিলো। জিতেছিলো রাশিয়ায়। রাশিয়া পরিণত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ে উঠছিল সমাজতন্ত্র। মিটেছিল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, কাজ, শিক্ষার চাহিদা। বেশ এগোচ্ছিল দেশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খেলাধূলা, নাচেগানে নজর কেড়েছিল। অর্থনেতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখছিল। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ভরসা পাচ্ছিল। কিন্তু সেখানে প্রতি-বিপ্লব দেশটাকে তছনছ করে দিল। গত শতকের শেষ দশকে। অথচ শতকের শুরুর দশকে আক্রমণের মধ্যেও চলেছিল বিপ্লবের প্রস্তুতি। যার শুরুটা হয় উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে।

উনিশ শতকে

উনিশ শতকের শেষ দু-দশকে রাশিয়ায় সমাজ বিজ্ঞানের একটা তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া বাড়তে থাকে। সেই তত্ত্বটা হচ্ছে মার্কসবাদ। তত্ত্বটা হচ্ছে দুনিয়াটাকে পালটানোর তত্ত্ব। তত্ত্বটা হচ্ছে মানুষের উন্নত থেকে উন্নততর, সুন্দর থেকে সুন্দরতর বাসযোগ্য দুনিয়া গড়ে তোলার তত্ত্ব। শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করার তত্ত্ব। উদ্‌গাতা—মার্কস! নিজে দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেছেন, কিন্তু গোটা মানব সমাজের দারিদ্র্য-মুক্তির জন্য তত্ত্ব হাজির করেছেন। সহায়তা করেছেন এঙ্গেলস।

মার্কসবাদ

প্রত্যেক মানুষের জীবনদর্শন আছে। মানুষ সচেতন বা অচেতনভাবে সেই দর্শন অনুসরণ করে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, অবশ্য অচেতনভাবে তার জীবনদর্শন অনুসরণ করে। কিন্তু মার্কসবাদ হচ্ছে এমন একটা দর্শন, যাকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োগ করতে না পারলে মার্কসবাদ নিষ্ফলা। আর মার্কসবাদ প্রয়োগ করতে গেলে সেই দর্শন জানতে হয়, বুঝতে হয়। মার্কসবাদের চর্চা, মার্কসবাদ প্রয়োগের চর্চা নিয়মিত করতে না পারলে মার্কসবাদ অনুসরণে গোলমাল হয়ে যেতে পারে এবং হয়ও। যেমনটা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে, বেশ বড় আকারে। সেখানে তো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে সরে গিয়ে গুরুতর বিচ্যুতি ঘটানো হয়।

উনিশ শতকে প্রবলভাবে ছিল ভাববাদ, মাঝে মাঝে উকিঝুঁকি মেরেছে বস্তুবাদ। তারই মাঝে আসে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ—মার্কসবাদ। লেনিন মার্কসবাদ সমৃদ্ধ ও প্রয়োগ করেন বিশ শতকে। 'মার্কসবাদ' হয়ে দাঁড়ায় 'লেনিনবাদ'। তাই একুশ শতকের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন—'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ'। এখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উনিশ শতক থেকেই ওঠে। কিন্তু প্যারি কমিউন (১৮৭১)-এর পতন থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব রুশ বিপ্লব (১৯১৭) দিয়েছে। ফ্যাসিবাদের উত্থান (১৯২২-৩৩) থেকে উঠে আসা প্রশ্নের জবাব তো দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৪৫)। এই বিজয়ে দুনিয়ায় শক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে যায়। একের পর এক বিপ্লবের বিজয়, সমাজতন্ত্রের সাফল্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমশ স্পষ্ট করে তোলে।

কিন্তু তারপরই বিপর্যয়। ১৯৯১ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্বের বিলোপ। সুতরাং জোরদার প্রশ্ন উঠেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিয়ে, সমাজতন্ত্র নিয়ে। ভারতেও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই এগোচ্ছে না। এখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সমাজতন্ত্র তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারছে না। আসলে আপনা-আপনি আগ্রহ সৃষ্টি হয়না, আগ্রহ সৃষ্টি করতে হয়। আর এইখানেই থাকছে বড় ঘাটতি। সমাজ বিজ্ঞানের নিয়ম কার্যকর করায় মানুষের একটা বড় ভূমিকা থাকে। উৎপাদন

প্রক্রিয়ায়, সম্পদের মালিকানায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষের মধ্যে বিপরীতমুখী অবস্থান আছে, শ্রেণিগত ফারাক আছে। শোষক শ্রেণি—শোষিত শ্রেণি, শাসক শ্রেণি—শাসিত শ্রেণি। সব সময়েই দ্বন্দ্ব চলছে। সেই দ্বন্দ্ব—শ্রেণি সংগ্রাম।

আমাদের দেখে নেওয়া যাক যে আমাদের চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে এবং তা যে সামগ্রিক চেহারা নিচ্ছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তার ব্যাখ্যা দিতে পারছে কি-না? বেশি না, আমরা এখানে বিপুল মার্কসবাদী সাহিত্যের কেবলমাত্র একটা অংশ, 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি। মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রথম দিকের রচনা। ছোটো রচনা। সাধারণ আকারের মাত্র ২৩ পাতার। প্রকাশিত ১৮৪৮ সালে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির ঘোষণাপত্র। সেখানে পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে যে-সব অভিমত আছে, তার কয়েকটা হচ্ছে—

(১) ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে এরা (বুর্জোয়ারা) বিনিময় মূল্যে পরিণত করেছে, আর অসংখ্য অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার জায়গায় এরা খাড়া করেছে একটা মাত্র ব্যবস্থার স্বাধীনতা—তা হল বিবেকশূন্য (unscrupulous) অবাধ বাণিজ্যের স্বাধীনতা।

(২) প্রতিটি বৃত্তি যাকে মানুষ এতকাল সম্মান করে এসেছে, যাকে সশ্রদ্ধ ভীতিপূর্ণ মর্যাদার চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণি তার সব কিছুর মাহাত্ম্যই শেষ করে দিয়েছে। চিকিৎসক, আইনজীবী, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী—সবাইকেই এরা পরিণত করেছে নিজেদের বেতনভুক মজুরি-শ্রমিকে।

(৩) বুর্জোয়াশ্রেণি পরিবার প্রথার ভাবালু ওড়নাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে পরিণত করেছে নিছক টাকাকড়ির সম্পর্কে।

(৪) উৎপাদনের যন্ত্রপাতিতে (instruments) অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি টিকে থাকতে পারে না। ... আগেকার সমস্ত যুগের সঙ্গে বুর্জোয়া যুগের পার্থক্য এই যে, এ যুগে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কে অনবরত রদবদল ঘটছে, অনিশ্চয়তা আর উত্তেজনা হয়েছে চিরস্থায়ী।

(৫) নিজেদের তৈরি মালের অবিরাম ক্রমবর্ধমান বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। সর্বত্র এদের ঢুঁ মারতে হচ্ছে, সর্বত্র গিয়ে শেকড় গেড়ে বসতে হচ্ছে, সর্বত্র স্থাপন করতে হচ্ছে যোগসূত্র।

পুঁজিবাদী সমাজ সম্পর্কে ১৮৪৮ সালের এই মূল্যায়ন ও মন্তব্য ২০১৫ সালে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে তো সাহায্যই করছে। তবে উনিশ শতকের পুঁজিবাদ আর একুশ শতকের পুঁজিবাদ একই চেহারায় নেই এবং মার্কসবাদী ধারণায় তা থাকতেও পারে না। মার্কসবাদ নিজেই তো সৃজনশীল বিজ্ঞান, কোনো আপ্তবাক্য (dogma) নয়। বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণই মার্কসবাদের প্রাণস্বরূপ। মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবিতকালেই নতুন নতুন ঘটনা ঘটার জন্য, গবেষণালব্ধ নতুন নতুন তথ্য পাওয়ার জন্য 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর মর্মবস্তুকে অপরিবর্তিত রেখে কোথাও কোথাও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন। তাঁদের মতে, ''গত ২৫ বছরে অবস্থার যত পরিবর্তনই ঘটে থাকুক না কেন ম্যানিফেস্টোর মূল নীতিগুলি মোটের ওপর আগের মতোই আজও সঠিকই রয়েছে। এখানে-ওখানে সামান্য কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারে হয়ত উন্নতি করা যায় মাত্র। ম্যানিফেস্টোর মধ্যেই একথা বলা আছে, মূলনীতিগুলির বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ নির্ভর করবে, সবসময় এবং সর্বত্র, সে সময় যে ঐতিহাসিক অবস্থা বিরাজ করছে তার ওপর।'' (১৮৭২ সালে জার্মান সংস্করণের ভূমিকা)

আবার একুশ শতকে

সাম্রাজ্যবাদের দাপট রয়েছে। তা সত্ত্বেও ২০০৭ সাল থেকে পুঁজিবাদের বেশ বড় ধরনের সংকট দেখা দেয় যা থেকে সে এখনও বেরিয়ে আসতে পারে নি। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, প্রশ্নও উঠছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রভাব কমছে না, দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদের প্রভাব কমছে না, বরং বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখলে বলতে হয় যে এইসব প্রভাব বাড়ছে। আসলে মানুষের কাছে কার্যকরী বিকল্প অনেকটাই অনুপস্থিত থাকছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, উৎকট ভোগবাদিতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধর্মীয় বিশ্বাস বাড়ছে। আরও বিপজ্জনক যে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বাড়ছে, মৌলবাদী শক্তি সন্ত্রাসবাদী শক্তির চেহারা নিচ্ছে।

আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে বর্তমানে এর ব্যতিক্রমী কোনো চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বেদনাদায়ক হচ্ছে কৃষকের

আত্মহত্যা, বেকারি, কারখানা বন্ধ, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সমাজে অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে, জ্ঞানীগুণী মানুষের মধ্যে সেই-রকম প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের ছাত্রী খুন, অধ্যাপিকা লাঞ্ছিতা, গৃহবধূর উপর পাশবিক অত্যাচার, কলেজে স্বঘোষিত মাতব্বরদের নজরানা দিতে না পারায় ভর্তি হতে না-পারা ছাত্রী আত্মঘাতী—এইসব ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের বিবেক সেইভাবে জাগ্রত হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এমনটা হওয়ার কথা নয়। অবিভক্ত বাংলা থেকে বিভক্ত বাংলায় বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকরা তো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, সরকারের অকাজ-কুকাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, রাস্তায় নেমেছেন।

তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন, অবিভাবকত্ব করেছেন। মুকুন্দদাস, নজরুল ইসলাম তো কারারুদ্ধও হয়েছিলেন। অনেকেরই সাহিত্যকর্ম নিষিদ্ধ হয়েছিলো। ইউরোপে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিলে সেই পরাধীন ভারতবর্ষেই বিশ শতকের তিনের দশকে প্রতিবাদে সামিল হন কবি রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু, কথাসাহিত্যিক প্রেমচন্দ, পত্রিকা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিশ শতকের চারের দশকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে অনাহার মৃত্যুরোধে, দাঙ্গার চক্রান্ত ব্যর্থ করতে আত্মপ্রকাশ ঘটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের। স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মাঝখানে স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ। এটাই তো পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিকদের ঐতিহ্য।

সেই ঐতিহ্য আজ কিছুটা ম্লান। তারই মাঝে অবশ্যই প্রেরণাদায়ক যে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক অরাজকতার বিরুদ্ধে, নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন, লুম্পেনরাজের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছেন। গ্রামে-গ্রামান্তরে চলে যাচ্ছেন। সরকারের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করছেন। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের কিছু কিছু কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন, এমনও কোনো কোনো শিক্ষাবিদ, চিত্রশিল্পী, নাট্যশিল্পী বর্তমান সরকারের কাজের প্রতিবাদ করছেন। বংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে এই ভূমিকার সাযুজ্য থাকছে।

পশ্চিমবঙ্গের এখন যা পরিস্থিতি, তাতে কর্তব্য হচ্ছে—যাঁরা মনে করছেন যে গণতন্ত্র আক্রান্ত, মহিলারা লাঞ্ছিত, শিক্ষার আঙ্গিনা কলুষিত, তাঁদের একজোট হতেই হবে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শামিল হতেই হবে। যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দোদুল্যমানতা, দীর্ঘসূত্রতা থাকবে, তত অশুভ শক্তি চেপে বসবে।

আশার কথা, এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছেন। তাঁরা মানুষের অধিকারের দাবি তুলছেন, রাজ্য সরকারি দপ্তর 'নবান্ন' অভিযান করছেন, দমন-পীড়নের মুখোমুখি হচ্ছেন, সাধারণ ধর্মঘট করছেন। সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটে শামিল হচ্ছেন। শিক্ষক-কর্মচারীরাও ক্রমশ যুক্ত হচ্ছেন। তবে ভয় ও প্রলোভন মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে এখনও বেশ প্রভাবিত করে রাখছে। আসলে কেবল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নয়, সারা দেশেই বিপদ বাড়ছে। বিপদ স্বার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে, বিপদ ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে, বিপদ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে। সব মিলিয়ে বলা যায় দেশের সাংবিধানিক কাঠামো আক্রান্ত হচ্ছে। তাই শ্রমজীবী মানুষকেই তো এগিয়ে আসতে হবে এবং তাঁরা আসছেন। আর এটাই তো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা।

With Best Compliments of

Global Innovative Vision of Egalitarian Society

A NON-PROFIT INITIATIVE

Guskara, Burdwan
E-mail : gives.cf@gmail.com

Sl. No. 69

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন

(প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ)

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে শ্রমিক আন্দোলন কী ও কেন? অত্যন্ত সহজ কথায় বলা যায় যে, শ্রমিকেরা নিজেদের অধিকার রক্ষা ও বাঁচার তাগিদে পুঁজিপতি মালিকের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। শ্রমিক কে? যে ব্যক্তি শারীরিক ও বুদ্ধি-কৌশলের বিনিময়ে কলকারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়ে মালিকের উৎপাদন ও মুনাফায় সহায়তা করেন তিনি শ্রমিক এবং শ্রমদানের বিনিময়ে জীবিকা বা জীবন ধারণের জন্য কিছু পারিশ্রমিক লাভ করেন। তাহলে বিরোধটা কোথায় এবং আন্দোলনের কারণ কী? বিরোধের অন্তর্নিহিত কারণ হল শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকের যে ন্যায্য পাওনা তা থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করে মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সঞ্চয়। বঞ্চনা করা ও মুনাফা বৃদ্ধির মানসিকতা থেকেই উৎপীড়ন ও শোষণ শুরু হয়। অনন্যোপায় শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মালিক বা পুঁজিপতির শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়—যাকে আধুনিক পরিভাষায় 'শ্রমিক আন্দোলন' আখ্যা দেওয়া হয়।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থায় দু-ধরনের শ্রমিক নিয়োগের কথা জানা যায়—(১) কৃষি শ্রমিক ও (২) কুটির শিল্প ও বস্ত্রশিল্প শ্রমিক। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার সামন্ততান্ত্রিক পুঁজি ব্যবস্থার কালের সমাপ্তি ঘোষণা হল এবং ধনতান্ত্রিক পুঁজি সেই স্থান দখল করল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এমন একটি নতুন শ্রেণি সৃষ্টি করল যারা উৎপাদনে সহায়তা করবে না, কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে সাহায্য করবে। ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব ও ভারতের পরাধীনতার কাল প্রায় একই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুরু হল এবং এই বন্দোবস্তের ফলে এক কথায় কৃষকের ভূমির ওপর অধিকার ভোগের সকল শর্ত রদ হয়ে গেল। মোগল আমলে যারা রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ছিল, তারাই হল চিরকালের জন্য জমির মালিক। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে পত্তনি আইন চালু হওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদন পর্যায়ে স্তরবিন্যাস ঘটল। কৃষি ও ভূমিরাজস্ব বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল গভীর। ধনী ও অবস্থাপন্ন ভারতীয়রা যেন তাদের সঞ্চিত পুঁজি চিরাচরিত প্রথা বজায় রেখে ভূমিতে বিনিয়োগ করে এবং তারা যেন শিল্পবিপ্লবের উদ্‌ভাবনকারীদের অনুসরণ করে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ের দিকে না ঝোঁকে। দেশীয় জমিদার শ্রেণির সহায়তায় ইংরেজগণ সুতি ও রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য যে-কোনো ধরনের উৎপীড়ন করতে পিছুপা ছিল না। স্থানীয় তাঁতিদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলল, যাতে তারা স্বাধীনভাবে বস্ত্র উৎপাদন করতে না পারে। বস্ত্র উৎপাদকগণ কৃষি শ্রমিক ও বস্ত্র উৎপাদনের শ্রমিকে পরিণত হল। লক্ষ করার বিষয় এই যে ১৭৬২ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে কটি কৃষিবিদ্রোহ হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল দেশীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমিদার ও ইংরেজদের শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে কলকারখানায় শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা নীলবিদ্রোহের আলোচনার সার্থকতা কোথায়। ভারতবর্ষের শিল্পশ্রমিকের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে শতকরা ৯০ ভাগ শিল্পশ্রমিক এসেছিল কৃষিজীবী পরিবার থেকে। এই সকল শিল্পশ্রমিকদের পিতা ও পিতামহরা কোনো-না-কোনোভাবে কৃষিজ দ্রব্য বা কুটির ও বস্ত্র শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার বা উৎপীড়িত হয়েছিল। তাদের অতীত স্মৃতিই অতি সত্বর তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তা না হলে কোন সাহসে সামান্য পালকির বাহকেরা পাঁচু সর্দারের নেতৃত্বে গাড়োয়ান ও ঘাটমাঝিদের সহায়তায় লালবাজারের সামনে দিনের পর দিন অবস্থান ধর্মঘট করতে সাহস পেত?

ভারতে ব্রিটিশ যৌথ পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হল রানিগঞ্জে কয়লা উত্তোলন ও রেলওয়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং এই দুটি ক্ষেত্রে প্রচুর শ্রমিকেরও প্রয়োজন ছিল। এদেশে শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে। অধিকাংশ শ্রমিকেরা এসেছিল গ্রাম থেকে শহরে এবং অশিক্ষা, জাতপাত, ধর্মীয় কুসংস্কার ও আধা-সামন্ততান্ত্রিকতার উপর বিশ্বাস থাকার দরুন শ্রমিকদের মধ্যে চেতনার বিশেষ অভাব ছিল। সেজন্য প্রথম প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে রেলপথের যথেষ্ট অবদান ছিল। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে স্যার রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসনের উদ্যোগে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই সংস্থার এজেন্ট নিযুক্ত হন। ১৮৫০-এর ডিসেম্বর মাসে ল্যান্ড অ্যাক্ট পাশ হওয়ায় জমি অধিগ্রহণ এবং রেললাইন নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং সংগঠিত শিল্পে রেলওয়ে সংস্থার কর্মচারীরা হল প্রথম শ্রমিক শ্রেণি পর্যায়ভুক্ত। একসঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে রেলপথ নির্মাণ শুরু এবং হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ২৪ মাইল দূরত্বে প্রথম রেলপথ চালানোর কথা হলেও একটি দুর্ঘটনার জন্য প্রথম হওয়ার গৌরব থেকে পূর্বাঞ্চল বঞ্চিত হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইঞ্জিন ও কোচ নিয়ে দু-খানি জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসার সময় গুডউইন নামে যে জাহাজে কোচ বোঝাই হয়েছিল সেটি বঙ্গোপসাগরের মোহনার কাছে ডুবে যায় এবং ইঞ্জিন বোঝাই জাহাজটি ভুলক্রমে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। অথচ কোচ ও ইঞ্জিন বোঝাই জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ে বোম্বাই-এ

পৌঁছেছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল বোম্বাই থেকে পুণা পর্যন্ত প্রথম রেলপথ চালু হল এবং পরবর্তী বছর ১৫ আগস্ট হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেল পরিবহণের কাজ শুরু হল।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ছোটো ছোটো কারখানা গড়ে উঠলেও ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়কালকে ভারতের আধুনিক শিল্প বিকাশের যুগ বলা যায়। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রমিক সংগঠন ও নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ১৮১৮ সালে কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য ৩ আইন নামে একটি কালাকানুনের প্রচলন করা হয় এবং কোম্পানি সুবিধা মতো কলকারখানা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য প্রায়ই ৩ আইন প্রয়োগ করত। প্রথম পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল কাজের সময় মালিকের অবমাননাকর ব্যবহার ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে। ব্রিটিশ সরকার প্রণীত কুলি আইনের দ্বারা বাগিচা শিল্প শ্রমিকের অমানবিক কাজের শর্ত নির্ধারিত হত। বাগিচা শ্রমিকেরা ছিল অর্ধ ক্রীতদাস এবং এই শ্রমিকেরা ছিল ব্রিটিশ মালিকদের সম্পত্তি। রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রণীত 'কুলিকাহিনী' গ্রন্থ পাঠ করলে বাগিচাশ্রমিকদের ওপর হৃদয়বিদারক উৎপীড়নের কথা জানা যায়।

নিম্নবর্ণিত তুলনামূলক তালিকা থেকে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের প্রত্যহ কাজের সময় সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যায়।

বস্ত্রশিল্প	প্রত্যহ	১৮ ঘণ্টা
ময়দা	প্রত্যহ	২০ ঘণ্টা
পাটকল	প্রত্যহ	১৬ ঘণ্টা
বস্ত্রশিল্পে শিশু	প্রত্যহ	১৪ ঘণ্টা
প্রেস	এক টানা	৭ দিন
চা বাগিচা	আমৃত্যু ব্যারাক থেকে বের হওয়ার নিয়ম ছিল না।	

রয়্যাল কমিশন অন লেবার বা হুইটলি কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—শ্রমিকেরা যতক্ষণ না অক্ষম হয়ে পড়ত ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হত। কাজে অক্ষম হয়ে পড়লেই সেই শ্রমিককে ছেঁড়া কাপড়ের মতো পরিত্যাগ করে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করা হত। এইরূপ ভয়াবহ পরিবেশে শ্রমিককে কাজ করতে হত।

শ্রমিক আন্দোলনের ধারাবাহিক বিবরণ

১৮৫০ রেলপথ ও ইটখোলার পত্তন।

১৮৫১ বোম্বাই-এ বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৩ পশ্চিমাঞ্চলে রেলপথের প্রথম প্রবর্তন (বোম্বাই-পুণা) ১৬ এপ্রিল

১৮৫৪ পূর্বাঞ্চলে রেলপথের প্রবর্তন (হাওড়া-পাণ্ডুয়া) ১৫ আগস্ট

১৮৫৪ রিষড়ায় পাটকল প্রতিষ্ঠা।

১৮৬০ চাকুরির চুক্তিভঙ্গ আইনের প্রবর্তন।

১৮৬২ মে মাস। আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে হাওড়া স্টেশনে ১২০০ শ্রমিকের ধর্মঘট। উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারী একজন বাঙালি কেরানিকে অপমান করায় পরদিন ধর্মঘট এবং সাহেবের ক্ষমা প্রার্থনা।

১৮৬৭ ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা।

১৮৭০ শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বরাহনগরে শ্রমজীবী সংঘের প্রতিষ্ঠা ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৭২ সমাজ সংস্কারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক বোম্বাই-এ শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন

১৮৭৩ বোম্বাই-এ প্রেস কম্পোজিটরদের ধর্মঘট। মাদ্রাজ থেকে কম্পোজিটর এনেও এই ধর্মঘট ভাঙা যায়নি।

১৮৭৪ শশীপদ কর্তৃক 'ভারত শ্রমজীবী' প্রকাশ ও বরাহনগর অর্গানাইজেশন-এর প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৭ মজুরি বৃদ্ধির জন্য নাগপুরে এম্ড্রোস মিলে ধর্মঘট।

১৮৭৯ কারখানা কমিশনের অনুসন্ধান শুরু। ভারতীয় কারখানা শ্রমিকদের জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল-মালিকদের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার।

১৮৮১ প্রথম কারখানা আইন পাশ।

১৮৮৪ এন.এম. লোখান্দের (স্টোরকিপার) নেতৃত্বে ৫৩০০ শ্রমিকের সমাবেশ এবং দাবি করা হয় যে সাপ্তাহিক ১ দিন ছুটি, দুপুরের আহারাদির জন্য ৩০ মিনিট বিরতি, কাজের সময় ও মজুরি দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় চাই।

১৮৮৫ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (বোম্বাই, ৩০ ডিসেম্বর)

১৮৯০ লোখান্দের নেতৃত্বে ১০ হাজার শ্রমিকের সমাবেশ। মারাঠী ভাষায় 'দীনবন্ধু' নামক শ্রমিক স্বার্থ সম্পর্কিত পত্রিকা প্রকাশ। কলিকাতায় 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার' প্রকাশ শুরু। লোখান্দের দাবি বোম্বাই মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন মেনে নিল। তিনি 'বোম্বাই মিল হ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন' নামক শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮১ কারখানা (সংশোধন) আইন পাশ।

১৮৯৫ চটকলের শ্রমিকরা 'ইন্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৬ প্লেগ রোগের সংক্রমণ দূরীকরণের জন্য লোখান্দে বোম্বাই-এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হওয়ায় বোম্বাই মিল হ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৯৬ জি.আই.পি. রেলওয়ের সিগন্যালার্স সমিতির প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৭ অ্যামালগামেটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড বার্মার প্রতিষ্ঠা। তবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয় ব্যতীত অন্য কেউ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারত না।

১৮৯৯ সিগন্যালার্স সমিতির ঐতিহাসিক ধর্মঘট শুরু। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় সরাসরি সমর্থন শুরু করেন। তবে ধর্মঘটের বিশেষ ব্যাপকতা ছিল না। শ্রমিকনেতা ও রাজনৈতিক নেতারা অনুভব করলেন যে, শ্রমিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে উভয় আন্দোলনকে জোরদার করা যাবে। শ্রমিকরাও দেশের প্রথম শ্রেণির নেতাদের শ্রমিক আন্দোলনের প্রেরণাদাতা মনে করে সুযোগ হাতছাড়া করল না।

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য আন্দোলন। প্রেসে ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট। ভারত সরকার শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ায় ধর্মঘটে সাফল্য। বোম্বাই-এ সুতাকলে ধর্মঘট—মহিলা শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার ও শিল্পশ্রমিকদের বেত্রাঘাত।

১৯০৫-০৮ স্বদেশি বয়কট আন্দোলনের সমর্থনে ভারতের কলকারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করে। বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপত রাই-এর মতো নেতারা একই সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ায় পরস্পর আরও কাছাকাছি এসে পড়ল এবং শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হল। কয়েক মাসের ব্যবধানে ডাক, প্রেস, রেলওয়ে,

বস্ত্রশিল্প, চটকল ও কলিকাতা কর্পোরেশনে ঝাড়ুদারদের ধর্মঘট প্রবল আকার ধারণ করে।

১৯০৬ জামালপুরে রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য গুলি চালানো হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোং শ্রমিক ধর্মখট ও ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা। এই ইউনিয়নের পুরোভাগে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

১৯০৮ কাঁকিনাড়া জুটমিলে ধর্মঘট ভাঙার জন্য গুলি চালিয়ে একজনকে হত্যা করা হয়।

বোম্বাইয়ে ছ-দিন ধর্মঘটের জন্য লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এটি হল একটি প্রথম ঘটনা যাতে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য একজন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল।

১৯১০ কাজের সময় বেঁধে দেওয়ার জন্য বোম্বাই-এর বস্ত্রকলে ধর্মঘট। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকদের উন্নতি বিধানের জন্য কয়েকটি সমাজ সংস্কার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কামগড় হিতবর্ধক সভা, সোশ্যাল সার্ভিস লিগ ও সার্ভেন্ট অব ইন্ডিয়া সোসাইটি।

১৯১১ কারখানা (সংশোধন) আইন প্রণয়ন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক ১২ ঘণ্টা ও শিশুশ্রমিক ৬ ঘণ্টা কার্য।

মহিলা শ্রমিকদের রাত্রে কর্মে নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হল।

১৯১২ বস্ত্রশিল্পে মজুরি বিন্যাসের দাবিতে ধর্মঘট।

১৯১৪ মুকুন্দলাল সরকার কর্তৃক কলিকাতায় ক্লার্কস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গঠন এবং তিনি একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করায় প্রয়াসী ছিলেন। এই সময় পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ছিল এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার বড়ই অভাব অনুভূত হয়।

১৯১৪-১৮ প্রথম মহাযুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল।

১৯১৭ অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যে ভারতীয় শ্রমিকদের অনুপ্রেরণা লাভ।

১৯১৭ আমেদাবাদে অনসূয়া বেন সারাভাই-এর নেতৃত্বে আমেদাবাদ বস্ত্র শিল্পে শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন গঠন।

৫০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন ও ধর্মঘট। গুজরাতে প্লেগ শুরু হওয়ায় শ্রমিকদের স্থান ত্যাগ। মালিকরা ২০ শতাংশ প্লেগ বোনাস মঞ্জুর করেন। কিন্তু প্লেগ আতঙ্কের সমাপ্তি ঘটায় বোনাস বন্ধ। আন্দোলন ভীষণ আকার ধারণ করায় গান্ধীজির মধ্যস্থতা এবং ৩৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি।

১৯১৭ ফেব্রুয়ারি মাসে করাচির নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের কারখানায় ধর্মঘট। জুন মাসে জি.আই.পি. রেলওয়ে ও প্যারোলের রেল কারখানায় ধর্মঘট। রেল শ্রমিকেরা বোম্বাই লেবার অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে। সেপ্টেম্বর মাসে ৩৫ দিন ব্যাপী রেল ধর্মঘট ও ১৮ দিন ধরে বোম্বাই ডাক বিভাগে ধর্মঘট।

১৯১৮ প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ।

১৯১৮ শ্রমিক আন্দোলনের স্মরণীয় বছর। গান্ধীজি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বাকিংহাম ও কর্নাটক বস্ত্র মিলের শ্রমিকদের সংগঠিত করে বি.পি. ওয়াদিয়া মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন গঠন করেন। এই বৎসর কলিকাতা পৌরসভা, বোম্বাই বস্ত্রকল, খড়গপুর ও লক্ষ্ণৌ-এ রেল কারখানা, মাদ্রাজে ট্রাম ও বস্ত্রশিল্পে ধর্মঘট হয়। হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯১৯ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও ভারতের সদস্যভুক্তি। বস্ত্রশিল্পে ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিকদের ধর্মঘটে ঐতিহাসিক সাফল্য ও মজুরি বৃদ্ধির দাবি আদায়। ডিসেম্বর মাসে ৭৫টি কারখানায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের বোম্বাই-এ সম্মেলন। উক্ত দৃষ্টান্তে মাদ্রাজ, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে শ্রমিক সংগঠনগুলি কাছাকাছি চলে আসে।

১৯২০ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং সংস্থার প্রথম সভাপতি লালা লাজপৎ রাই ও প্রথম সম্পাদক দেওয়ান চমন লালা।

বি.পি. ওয়াদিয়ার নেতৃত্বে বাকিংহাম কর্নাটক মিলে ধর্মঘট। চুক্তি ভঙ্গ ও ধর্মঘটের কারণে যে ক্ষতি হয়েছিল তার জন্য মিল মালিকের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টে হামলা। পর বৎসর হাইকোর্টের রায়ে ৭৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে ওয়াদিয়া ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই রায়ের প্রেক্ষাপটে এন.এম. যোশী এগিয়ে এলেন।

১৯২১ এন.এম. যোশী ট্রেড ইউনিয়ন বিল প্রস্তুত করে সরকারের কাছে পেশ করেন ও সরকার ওই বিল গ্রহণ করেনি।

ঝরিয়াতে এ.আই.টি.ইউ.সি-র দ্বিতীয় অধিবেশন।

১৯২৩ ওয়ার্কমেন কমপেনসেশন আইন, ১৯২৩ পাশ।

৪২ শতাংশ বোনাসের দাবিতে সুরাটের সুতাকলে ধর্মঘট এবং আমেদাবাদ বস্ত্র শিল্পে ৫৬টি মিলে দু-মাস ধরে ধর্মঘট।

১৯২৪ যোশী পুনরায় সরকারের কাছে ট্রেড ইউনিয়ন বিল পেশ করেন।

বোম্বাই-এ মজুরি কমানোর আশঙ্কায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘটে যোগদান এবং শ্রমিকদের উপর গুলি চলে।

১৯২৫ বোম্বাই-এ বস্ত্রশিল্পে পুনরায় ধর্মঘট ও শ্রমিকদের সাফল্য লাভ। রাওয়ালপিন্ডির রেল কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট। বোম্বাই সুতাকলে শ্রমিক সংগঠন ও ৪০ হাজার শ্রমিক এর সদস্য হয়।

১৯২৬ ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৬ পাশ হয়। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন যেন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে তার জন্য ট্রেড ডিসপুট অ্যাক্ট ও পাবলিক সেফ্‌টি অ্যাক্ট চালু করা হল।

১৯২৭ আই.এল.ও-তে যোগদানের প্রশ্নে এ.আই.টি.ইউ.সি-তে মতপার্থক্য।

১৯২৮ রয়েল কমিশন অন লেবার বা হুইটলে কমিশন গঠন। ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ে সাইমন কমিশন গঠন এবং সারা ভারতের শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধভাবে কমিশন বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভে যোগদান। কমিশনকে বোম্বাই-এ কালো পতাকা প্রদর্শন।

১৯২৮ জামশেদপুরে টাটা কোম্পানির ইস্পাত কারখানায় ৫ মাস ধর্মঘট। লিলুয়ার রেলকারখানায় ধর্মঘটি শ্রমিকদের

ওপর গুলি চালানোর ফলে একজন শ্রমিকের মৃত্যুতে বিক্ষোভ এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকনেতা সিঙ্গারভেল্লু ও মুকুন্দ লাল সরকারকে গ্রেপ্তার করে।

১৯২৯ কলকাতার শহরতলিতে চটকলে ধর্মঘট ৬ ঘণ্টা কাজ বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং ৬ মাস ধর্মঘট চলার পর শ্রমিকরা সফল হন। পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স জারি।
নাগপুরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এ.আই.টি.ইউ.সি.-র ১০ম অধিবেশন শুরু। মতপার্থক্যের জন্য সংস্কারপন্থী নেতারা অধিবেশন থেকে বের হয়ে আসেন এবং ডিসেম্বর মাসে দেওয়ান চমনলাল, এন.এম. যোশী ও ভি.ভি. গিরির নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে একটি নতুন সংস্থা গঠিত হয়। এই বছর ১৪১টি শ্রমবিরোধ ঘটে।

১৯৩১ হুইটলি কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে দেখা গেল কয়েকটি সংস্কারমূলক সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই নেই। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ। মানবেন্দ্র রায়, বি.টি. রণদিভে ও এস.বি. দেশপাণ্ডে এ.আই.টি.ইউ.সি. থেকে পৃথক হয়ে অল ইন্ডিয়া রেড ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন।

১৯৩২ রেড ট্রেড ইউনিয়ন থেকে পৃথক হয়ে মানবেন্দ্র রায় ও তাঁর অনুগামীরা অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন।

১৯৩৩ ফেব্রুয়ারি মাসে রেল শ্রমিকদের কয়েকটি ইউনিয়ন মিলিত হয়ে ন্যাশনাল ফেডারেশন অব লেবার নামক একটি নতুন সংগঠনের সৃষ্টি করে। কিন্তু দু-মাসের মধ্যে ভি.ভি. গিরি, গুরুস্বামী ও যমুনাদাস মেহতার চেষ্টায় ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও সদ্যসৃষ্ট ন্যাশনাল ফেডারেশন অব লেবার মিলিত হয়ে ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করে।
এই বছর ১৬৬টি শ্রমবিরোধ দেখা দেয়।

১৯৩৫ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন বা ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ পাশ হয়।

১৯৩৬ রেড ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে এই অধিবেশনে।

১৯৩৬ পেমেন্ট অব ওয়েজেস আইন, ১৯৩৬ পাশ।

১৯৩৭ কংগ্রেস-শাসিত ৭টি প্রদেশে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট বৃদ্ধি পায়।

১৯৩৮ ভি.ভি. গিরির প্রচেষ্টায় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা কয়েক মাসের মধ্যে ব্যর্থ হয়।

১৯৩৮ এমপ্লয়মেন্ট অব চিলড্রেন আইন, ১৯৩৮ পাশ।

১৯৩৯-৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৯৪০ আর্বিট্রেশন আইন, ১৯৪০ পাশ।

১৯৪২ আগস্ট আন্দোলন

১৯৪৬ ইন্ডিয়াস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট (স্ট্যান্ডিং অর্ডার) আইন, ১৯৪৬ পাশ হয়।

১৯৪৭ ইন্ডিয়াস্ট্রিয়াল ডিসপুট আইন, ১৯৪৭ পাশ হয়।

১৯৪৭ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন এবং সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সভাপতি হন।

১৯৪৭ ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

With best compliments of

A
Well Wisher

Sl. No. 125

সংগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন

রথীন রায়

স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশক দেশে সর্বক্ষেত্রেই বিকাশের প্রবণতা ছিল সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং প্রগতিমুখী। কিন্তু, অভিমুখ ছিল দেশে পুঁজিবাদ গড়ে তোলা। ফ্যাসিবাদের পতন, শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উত্থান, অর্থনৈতিক বিকাশে সমাজতন্ত্রের পথে চমকপ্রদ অগ্রগতি, দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলির সাফল্য দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে উদ্বেলিত করেছিল।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যেসব দেশে শ্রমিকশ্রেণি নেতৃত্বে এসেছিল সেইসব দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্প সমাজতান্ত্রিক/জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যেসব দেশে বুর্জোয়ারা নেতৃত্বে এসেছিল, সেখানে পুঁজিবাদী পথে বিকাশের পথই গ্রহণ করা হয়।

আমাদের দেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। কংগ্রেস যেহেতু ভূস্বামী ও বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি, তারা পুঁজিবাদ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইউরোপের মতো পুঁজিবাদ গড়ে তোলার ক্ল্যাসিকাল পথে হাঁটা সম্ভব ছিল না। একদিকে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, অন্যদিকে ভূস্বামী প্রভাবিত ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করা জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে ছিল খুবই বিপজ্জনক, কারণ সেটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পর্যবসিত হতে পারত। সে কারণে ভূস্বামীদের সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছিল। স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ার শ্লোগানের আড়ালে নানা জনবিরোধী নীতির প্রয়োগে পুঁজির শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও অনুকূল ছিল। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ জয়ের পর পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ভাগ হয়। সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে নিয়ে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নির্যাস ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। নেহরুর নেতৃত্বে ভারত ছিল অন্যতম নেতা। আবাদি কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ার কথা বলে কংগ্রেস। শাসকশ্রেণির স্বার্থে জোট-নিরপেক্ষতা ব্যবহার করা হয়েছে দর-কষাকষি করে দুই শিবিরের কাছ থেকেই সাহায্য আদায় করার জন্য।

অর্থনীতির বিকাশে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সূচনাপর্বে পরিকল্পনা রচনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সঙ্গে ছিলেন ডা. অশোক মিত্রের মতো একগুচ্ছ প্রগতি-মনোভাবাপন্ন যুব অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ। স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ার স্বার্থে জোর দেওয়া হয়েছিল বুনিয়াদি—ভারি শিল্পে। ইস্পাত কারখানা, মেশিন বিল্ডিং কারখানা, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে। এসব ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন অকৃপণ সহযোগিতা করেছে। শাসকশ্রেণির দরকষাকষি খেলায় সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকেও সহযোগিতা আদায় করেছে। সেজন্যই দুর্গাপুর, রৌরকেল্লায় ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিয়েছে। কিন্তু, কোনো মৌলিক শিল্পে নয়। সীমান্তে রাস্তাঘাট নির্মাণ, মিলিটারি হার্ডওয়্যার ইত্যাদি কেনা—এইসব ক্ষেত্রে ঋণের টাকা ব্যয়িত হয়েছে। এই ঋণ সাহায্য বাবদ খরচকে বলে Open-end expenditure। এতে পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ থাকে না। এই প্রক্রিয়া উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতির জন্ম দিয়েছিল।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে অনেকেই সমাজতন্ত্রের সোপান হিসেবে দেখেছিলেন। দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি এগুলিকে ব্যবহার করেছিল পুঁজির ভিত্তি শক্তিশালী করার স্বার্থে। এখন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দুর্বলতা, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, উদারনীতি, ফিনান্স ক্যাপিট্যাল-এর সাথে দেশে শাসকশ্রেণিগুলির সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থী অবস্থান, কর্পোরেট হাউসগুলির হাতে পুঁজির বিপুল কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। এই সময়কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটেছে—তার সুফল দেশের সাধারণ মানুষের ভোগে লাগেনি। বহুজাতিক সংস্থা ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি আরও বেশি উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করে স্ফীত হয়েছে। বর্তমানে বৃহৎ পুঁজির দাবিতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন তারা শক্তিশালী। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে আর তাঁদের বিরোধ নেই। মুনাফার ভাগ-বাটোয়ারায় বিশ্বাসী। উদারবাদী অর্থনীতির যুগে বিশ্বজোড়া বৃহৎ পুঁজির দাবি—রাষ্ট্রের অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন শেষ হয়েছে। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে।

১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের ওপর দমন-পীড়ন ছিল লাগামছাড়া। পুলিশ ভেরিফিকেশনের রিপোর্টেই চাকরি চলে গিয়েছিল শত শত বাম মনোভাবাপন্ন শ্রমিকের। শাসকশ্রেণির অনুমোদিত আইএনটিইউসি ভিন্ন অন্য কোনো ইউনিয়ন করা যেত না। বেতন ছিল অত্যন্ত কম। শ্রমিকের ওপর কাজের বোঝা ছিল মাত্রাতিরিক্ত। ফলে উৎপাদনপদ্ধতি ছিল অনেক বেশি কায়িক শ্রমসাধ্য। পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিতান্তই পক্ষপাতদুষ্ট। বাসস্থানের সমস্যা ছিল প্রকট। এই সকল অবিচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। যুবক শ্রমিকরা সংগঠিত হতে থাকে।

নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের নব্য শ্রমিকরা ছিল শ্রমিক হিসেবে প্রথম প্রজন্মের। যদি দুর্গাপুর ইস্পাতকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়, তবে নব্য এই শ্রমিকদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সময়ের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ছিল আধুনিক। আধুনিক শিল্পে শিক্ষিত শ্রমিকের

দরকার ছিল। এই শিক্ষিত শ্রমিকরা ছিল সদ্য ছাত্রাবস্থা থেকে আসা। সেই সময় ছাত্র আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে উত্তাল। খাদ্য আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলন, বন্দিমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি অসংখ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আসা যুব সম্প্রদায়। কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবাংলার শহরাঞ্চল থেকেই মূলত এরা এসেছিল।

দ্বিতীয় অংশটি পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে আসা কৃষক পরিবারের মানুষজন। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে ঐতিহ্যবাহী কৃষক আন্দোলন থাকলেও পশ্চিমাঞ্চলে তার প্রভাব ছিল না। জমির সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এদের চরিত্র ছিল দ্বৈত। কারখানায় শোষিত হলেও গ্রামে খেতমজুর বর্গাদারের শোষক, অত্যাচারী, পশ্চাৎপদ মানসিকতা ও প্রতিহিংসার দর্শনে প্রভাবিত। সেই কারণেই প্রতিক্রিয়ার শক্তি বাঙাল-ঘটি বিভাজন করতে পেরেছিল শ্রমিকদের মধ্যে। তৃতীয় ভাগটি হল দেশের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত অবঙ্গভাষী শ্রমিক। ওইসব অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বল থাকার কারণে, জাতপাতের রাজনীতির প্রাবল্য হেতু বিভুঁই-এ শাসকদলের সঙ্গে থাকাই শ্রেয় মনে করেছে তারা। পরবর্তীকালে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে, শুরু থেকেই বামবিরোধী শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল।

এই শক্তি সমাবেশকে নিয়েই বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় অসংখ্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। ম্যানিং বোনাস, প্রোমোশন, কর্তৃপক্ষের অভব্য আচরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিভাগে বিভাগে অসংখ্য আন্দোলন হয়েছে। অটোমেশনের বিরুদ্ধে আবার কারখানার স্বার্থে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবাংলায় যতগুলি ধর্মঘট হয়েছে সবগুলিই সাফল্যের সাথে পালিত হয়েছে।

দুটি ঐতিহাসিক ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করতেই হয়। একটি ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে লাগাতার ধর্মঘট। দুর্গাপুর ইস্পাতে, ক্যান্টিনে পর্যাপ্ত ভাতের জন্য ও ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল, ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রভৃতির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। জেনারেল ম্যানেজার অফিসে দাবি-সনদ জমা দিতে বিক্ষোভ সমাবেশে বিনা প্ররোচনায় বর্বরোচিত লাঠিচার্জ করা হয়। বহু শ্রমিক আহত হয়। শহিদ হন কমরেড জব্বর। পরের দিন প্রতিবাদে ধর্মঘট হয় সমগ্র দুর্গাপুরে। ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আশিস সেনগুপ্ত। লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়। কয়েকদিন চলার পরেই পুলিশি সন্ত্রাস, কংগ্রেস ও কর্তৃপক্ষের চক্রান্ত ইত্যাদি নানা কারণে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে শুরু করে। এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আসা শ্রমিকদের মধ্যে।

এই অভিজ্ঞতা থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়। ইউনিয়ন থেকে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আজ দুর্গাপুর মহকুমা জুড়ে কৃষক সংগঠন গড়ে উঠেছে। লাউদোহা এলাকায় পরবর্তীকালে কৃষক কর্মীরাই কোলিয়ারি শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ছিল ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী বিপুল আন্দোলনের শরিক ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকরাও। দুর্গাপুর ইস্পাতে অটোমেশনের বিরুদ্ধে, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স মোতায়েন করার বিরুদ্ধে, কারখানার স্বার্থে ও সম্প্রসারণের দাবিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম সংগঠিত হয়।

১৯৭০ সালে রাজ্যে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের শুরুতে দুর্গাপুরের শ্রমিকশ্রেণির ধর্মঘট ছিল ঐতিহাসিক। এ.বি.এল-এর জঙ্গলে একটি মৃতদেহকে অজুহাত করে রবিন সেন, দিলীপ মজুমদার সহ সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মামলায় জড়ানো হয়েছিল। ১৫০জন সিপিআই(এম) নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। তাঁদের মধ্যে অনেককে জেলে পোরা হয়েছিল। দীর্ঘস্থায়ী কারফিউ, বিপুল প্যারামিলিটারি ফোর্সের অত্যাচার শ্রমিকশ্রেণির মনোবল ভাঙতে পারেনি। ইস্পাতনগরীর রাস্তায় ব্যারিকেডের যুদ্ধ হয়েছিল। শ্রমিক পরিবারের মহিলাদের ভূমিকা ছিল বীরত্বপূর্ণ।

ধর্মঘট তুলে নেওয়ার পর শুধুমাত্র ইস্পাত কারখানায় ৭৫০০-র বেশি শ্রমিককে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। চার্জশিটের উত্তর লিখে দিয়েছিলেন সুধাংশুকান্ত আচার্য। ইস্পাতে মাত্র একজন শ্রমিককেই ছাঁটাই করতে পেরেছিল কর্তৃপক্ষ। মানস মুখার্জি ছাঁটাই হয়েছিলেন। এ.বি.এল, গ্রাফাইট, ইন্দো-আমেরিকান প্রভৃতি ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থায় অনেক সিপিআই(এম) নেতাকর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। তাঁদের পুনর্বহালের দাবিতে পরবর্তীকালে আবার ধর্মঘট করতে হয়েছিল।

সেই সময়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রামই পরিচালনা করেনি। অন্যান্য অংশের গণতান্ত্রিক মানুষকেও সংগঠিত করেছে। কৃষক ছাড়াও মহিলা, ছাত্র, যুব, সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রেই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছিল।

বিভিন্ন এলাকায় প্রগতিশীল পুস্তকের পাঠাগার তৈরি হয়েছিল। অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ইউনিয়নের মিটিংগুলিতে দীর্ঘ রাজনৈতিক বিতর্ক, পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক আলোচনা হত। সংশোধনবাদ ও সঙ্কীর্ণতাবাদ নিয়ে তীব্র মতাদর্শগত বিতর্ক সংগঠিত হত। কর্মীদের মধ্যে বই পড়ার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। বেনাচিতির ন্যাশনাল বুক এজেন্সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পরিস্থিতির কারণেই কর্মীদের মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল শক্তিশালী। সে কারণেই কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু, পুলিশ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের অত্যাচার, গুণ্ডবাহিনীর সন্ত্রাস উপেক্ষা করেই আন্দোলন-ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। সাসপেনশন, বেতন কাটা, ইত্যাদির তোয়াক্কা না করেই।

আজকে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দুর্বলতায় শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে। পুঁজি, কাঁচামালের উৎস এবং বাজার তাঁদের দখলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে বিপুল পুঁজির অধিকারী। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে ব্যবহার করে নিজেদের শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর। বিরোধিতা করলে সামরিক হস্তক্ষেপ এখন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের হাত ধরে ক্রমসঙ্কুচিত বাজার প্রসারিত করার চেষ্টা চলছে। কিছু অংশের আয় বাড়ানো হয়েছে। নাগরিক সমাজ তৈরি হয়েছে। সমাজে মধ্যবিত্ত অংশও স্ফীত হয়েছে। ভোগবাদী দর্শন এখন সর্বগ্রাসী। জনগণের ব্যাপক অংশ প্রান্তিক মানুষে পরিণত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ নিজের ছাঁচে সমাজকে গড়ে তুলতে চাইছে।

পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম দুর্বল। দুর্বল আমাদের দেশও। উন্নয়ন যা হচ্ছে তার অভিমুখ ধনিকশ্রেণির দিকে। এই উন্নয়ন উদারনীতির পথ ধরেই। শপিং মল হচ্ছে, ফ্ল্যাটবাড়ি

তৈরি হচ্ছে, অতীতের সিনেমা হলের পরিবর্তে ছোটো ছোটো বিলাসবহুল মাল্টিপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। বিনোদনের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সংগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে শ্রমিকদের আয় বেড়েছে কয়েক গুণ। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মোটর সাইকেল। অনেকেরই মোটরগাড়িও আছে। সন্তানসন্ততিদের ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানোর অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। কেরিয়ার তৈরির জন্য হুড়োহুড়ি। বহুজাতিক ব্র্যান্ড-এর পোশাকে সজ্জার বাহার।

আধুনিকীকরণের ফলে কারখানায় কায়িক শ্রম অনেক কমে গিয়েছে। শ্রমিকের সংখ্যা বিপুলভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জবশেডিং হচ্ছে ব্যাপকভাবে। ঠিকাশ্রমিকদের দিয়ে সেই কাজ করানো হচ্ছে।

আন্দোলন ধর্মঘটে সাধারণভাবে অনিচ্ছা। বলা হয় একদিনের বেতন অনেক বলে ধর্মঘট করতে চাইছে না। কাটা বেতন কম বা বেশি এটা আপেক্ষিক সময়ের প্রেক্ষিত।

মূল বিষয় শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। যখন ভোগবাদ, ধর্মান্ধতা, বিভিন্ন কুসংস্কারকে উস্কানো হচ্ছে, প্রতিক্রিয়ার সমস্ত শক্তি যখন শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে, সেই প্রেক্ষিতে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনায় যতটা যত্নবান হওয়া দরকার সেটা করা হয়নি। ৩৪ বছর রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থাকায় আপাত শান্তির পরিবেশে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করার ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ভোগবাদ, প্রতিক্রিয়ার দর্শনের আক্রমণের বিরুদ্ধে দ্বিগুণ গুরুত্ব দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির দর্শনের চর্চা হয়নি।

আমাদের ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রধান কর্তব্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণিকে সচেতন করার জন্য যে ক্ষেত্রগুলিতে মনোনিবেশ প্রয়োজন তা হল—

(ক) রাজ্যস্তরে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে বিলগ্নিকরণে কেন্দ্রীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদী ও কর্পোরেট হাসউগুলির চাপে বদ্ধপরিকর। কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের মতো বুনিয়াদি শিল্পের শেয়ার বিক্রির ঘোষণা করেছে সরকার। এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার ও আন্দোলন সংগঠিত করা জরুরি। শাসকশ্রেণিগুলির মুখোশ খুলে দেওয়া দরকার। এই সর্বনাশা নীতির বিপদ সম্পর্কে জনগণের সমস্ত অংশকে সচেতন করতেই হবে।

(খ) স্থায়ী পদে ঠিকাশ্রমিক নিয়োগের অথবা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত বেড়ে চলেছে। সরকার পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করছে। এটা একটা ঔপনিবেশিক বর্বর প্রথা। শ্রম আইন ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে এই শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা শুধু ঠিকা শ্রমিকদের জন্যই নয়, সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের জন্যও প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে সংগঠিত শ্রমিকের সন্তানকে ঠিকা শ্রমিকই হতে হবে।

(গ) মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। প্রান্তিক মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এর কারণ হচ্ছে—খাদ্যশস্যের অবাধ ফাটকাবাজি ও আগাম বাণিজ্য। কর্পোরেট হাউসগুলি এই ব্যাবসায় নেমে পড়েছে। কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। অপরদিকে ক্রেতাকে দিতে হবে বিপুল মূল্য। এই ফাটকাবাজি ও আগাম বাণিজ্য কেন, কার স্বার্থে? মুখোশ উন্মোচন করা একান্ত প্রয়োজন। না হলে দেশ আবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে।

(ঘ) শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য এপিএল/বিপিএল করা হচ্ছে। গুদামে চাল-গম পচে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও সেই খাদ্যশস্য গরিব মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়নি। শ্রমজীবী মানুষের জন্য নানা কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু গণবন্টন ব্যবস্থার কাঠামোটাকেই ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

(ঙ) দেশের আর্থিক সংকটে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও কৃষক। সার বীজ কীটনাশকের দাম ক্রমবর্ধমান। পেট্রোপণ্য ও বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির ফলে সেচের খরচ ক্রমেই গরিব ও মাঝারি কৃষকের সাধ্যাতীত। দেশের সার কারখানাগুলি বন্ধ করে বিদেশ থেকে সার আমদানি, মার্কিন বহুজাতিকের বন্ধ্যা বীজ আমদানির ফলে কৃষকের নিজস্ব বীজ সংরক্ষণ প্রায় বাতিল হওয়ার মুখে। উৎপাদন খরচ বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও ফসলের লাভজনক দর পাচ্ছে না কৃষক। নিজের উৎপন্ন ফসলই বেশিদামে বাজার থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষক চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষক অন্য জীবিকায় আগ্রহী। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে কৃষককে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কৃষক মহাজনি ঋণের খপ্পরে পড়েছে। সব মিলিয়ে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। পশ্চিমবঙ্গেই গত ৪ বছরে শতাধিক কৃষক আত্মহত্যা করেছে। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের জন্য লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন প্রান্তিক কৃষক কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত হয়ে শহরাঞ্চলে কাজের খোঁজে চলে আসছে। কৃষকের সঙ্কটকালে শ্রমিকশ্রেণিকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে। কৃষকের সমস্যাকে শ্রমিকশ্রেণির মিত্র সংগ্রহের সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে।

(চ) বর্তমানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একদিকে যেমন সংগঠিত শিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা কমছে, অপরদিকে অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে বিপুল সংখ্যক কৃষিশ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে শ্রমের বাজারে ভিড় বাড়াচ্ছে। এরই মধ্যে যারা একটু লেখাপড়া জানে, তারা ট্রাক্টর চালক বা মেকানিক হচ্ছে। প্রান্তিক মানুষরা দিন গুজরানের জন্য যে-কোনো কাজ বেছে নিচ্ছে। মালিকেরা ইচ্ছেমত মজুরি দিচ্ছে। উদারবাদী অর্থনীতির কারণে মানুষের জীবনধারার ধারা পাল্টাচ্ছে। গ্রামে নব্য ধনী তৈরি হয়েছে। তারা ব্যাপক হারে মোটর সাইকেল ব্যবহার করছে। শহরের উঠতি ধনীরা ঠিকাদারি, প্রেমোটারি ইত্যাদি করে চার চাকার গাড়ি ব্যবহার করছে। তার জন্য গ্রামের মাথায় রাস্তার ধারে অসংখ্য গ্যারাজ, হাওয়া মেশিন ইত্যাদি হচ্ছে। সেখানে প্রান্তিক মানুষরা কাজ খুঁজে নিচ্ছে। হাইওয়ের ধারে ধারে কত ধাবা, রাস্তার হোটেল—সেখানেই এরা কাজ করছে। রিক্সা, ভ্যান, মোটরভ্যান, তাঁত, বিড়ি, অটো, টোটো এসব তো আছেই। এই অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা সংগঠিত শ্রমিকের থেকে অনেক বেশি। অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে দুর্বলতা থাকলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশই ব্যাহত হবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে সংগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকদের, এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনাও কঠিন হবে। তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবঙ্গেই তার উদাহরণ রয়েছে। অসংগঠিত শিল্পশ্রমিকদের মাসিক বেতন সর্বনিম্ন ১৫,০০০ টাকা, সামাজিক সুরক্ষা, পেনসন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকা ফাটকা বাজারে খাটানো প্রভৃতি সব বিষয়ই উদারনীতির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অঙ্গ। সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৌঁছানো কর্তব্য।

(ছ) বর্তমানে সংগঠিত শিল্প—যেমন কয়লা, ইস্পাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে মজুরি সংক্রান্ত আলোচনা কেন্দ্রীয়ভাবে হয়। সেইসব ব্যবস্থায় সাধারণ শ্রমিকদের সরাসরি যোগ থাকে না। অনেকটা

মরসুমি। এই সব কেন্দ্রীয় আলোচনায় বিভাগীয় সমস্যাগুলি স্থান পায় না। সেই কারণে এইসব বিভাগীয় সমস্যা যা সাধারণ শ্রমিকদের দৈনন্দিন সমস্যা সেগুলি নিয়ে দাবিসনদ তৈরি ও আন্দোলনের রাস্তায় যাওয়া উচিত। আদায়যোগ্য দাবির আন্দোলনে সাফল্য নিচের তলায় ঐক্য ও মনোবল এবং মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করে।

(জ) একই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এবং অগ্রগতি ঘটানোর জন্য গঠনমূলক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রস্তাবাদি তৈরি করে, সব ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে ব্যাপক মঞ্চ তৈরি করা প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব, আইডেনটিটি পলিটিক্স, প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ সমস্ত ধরনের পশ্চাৎপদ দর্শনের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শিল্পশ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে হবে। নেতৃত্ব দিতে হবে সাম্রাজ্যবাদ, উদার অর্থনীতির আক্রমণ এবং দেশের শাসকশ্রেণির শ্রমজীবী স্বার্থবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে। মনে রাখতে হবে শ্রমজীবী অংশের তারাই অগ্রসর অংশ। দরকষাকষির ক্ষমতাও তাদের বেশি। আজকের সংকটকালে গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়, কারণ পুঁজিবাদকে আঘাত করার ক্ষমতা তাদেরই বেশি।

With best compliments of

Chandan Chakraborty

Agent : **LICI**, Branch No. 1
G. T. Road, Asansol, Dist. Burdwan

Residence
S.B. Garai Road, Barafkal More, Asansol

Sl. No. 76

With Best Compliments of

A
Well Wisher

Sl. No. 60

বাংলায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ-বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ

আমিনুল ইসলাম

বাংলায় ১৭৫৭-১৮৫৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ-বিরোধী বহু কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, যার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। মনে হয় কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মনোযোগের অভাব, উপাদানের স্বল্পতা ও বিশ্লেষণের জটিলতা ইত্যাদি ছিল এর অন্যতম কারণ। আমরা সরকারি নথিপত্র ও জেলা গেজেটিয়ারগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচ্য সময়ে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহগুলোর একটি তালিকা তুলে ধরছি : ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), ত্রিপুরার শামসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক-তাঁতির সংগ্রাম (১৭৭০-১৮০০), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), নীল ও নীলচাষির সংগ্রাম (১৭৭৮-১৮০০), মালঙ্গীদের বিদ্রোহ (১৭৮০-১৮০৪), রেশমচাষির সংগ্রাম (১৮৭০-১৮০০), আফিমচাষির বিদ্রোহ (১৭৮০-৯৩), রংপুর কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), যশোহর-খুলনার কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৪ ও ১৭৯৬), বীরভূমের বিদ্রোহ (১৭৮৫-৮৬), বীরভূম-বাঁকুড়ার বিদ্রোহ (১৭৮৯-৯১), বাখেরগঞ্জের সুবান্দিয়া কৃষক বিদ্রোহ (১৭৯২), চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮-৯৯), মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৮১৬), ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), সন্দ্বীপের তৃতীয় বিদ্রোহ (১৮১৯), ময়মনসিংহের প্রথম পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৪-৩৩), ময়মনসিংহের হাতিখেদা বিদ্রোহ (১৮২৫), তিতুমিরের বিদ্রোহ (১৮৩১), ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-৮২), ফরাজি বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৭), ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৪৪-১৮৯০), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬)।

এই বিদ্রোহগুলো গুরুত্ব ও আকারে সমান ছিল না। কোনো কোনো বিদ্রোহ ছিল খুবই স্থানিক ও ক্ষণস্থায়ী। আমরা সেই কটি বিদ্রোহকে আলোচনার জন্য নিয়েছি যেগুলো ছিল খুবই ব্যাপক, সুসংগঠিত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ত্রিপুরায় শামসের গাজীর বিদ্রোহ, ১৭৬৭-৬৮

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার রওশনবাদ পরগনার শামসের গাজীর নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল তা বহু দিক থেকে কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ত্রিপুরারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের অধীনে থেকে পরগনার সমস্ত চাষির দুর্দশার শেষ ছিল না। শামসের দেরি না করে ত্রিপুরারাজের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে নিজেকে রওশনাবাদের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন। এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সকলে তাঁর ডাকে সমবেত হল।

শামসের গাজীর বিদ্রোহ জমিদারের স্বাধীন সত্তায় আঘাত হানে এবং তার আর্থ-সামাজিক স্বার্থকে বিপন্ন করে তোলে। বিদ্রোহীদের সাথে এক সম্মুখ যুদ্ধে জমিদার নাসির মাহমুদ নিহত হন। শামসের গাজী জমিদার-কন্যাকে স্ত্রী-রূপে গ্রণ করেন। ত্রিপুরার রাজা এই বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে তাঁর দেওয়ানকে (মন্ত্রী) একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। এক ভয়ানক যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য বর্তমান রাজধানী আগরতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা পূর্বের রাজধানী উদয়পুর অধিকার করেন।[১] এতে অত্র অঞ্চলের উপর শামসের গাজীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কালবিলম্ব না করে ত্রিপুরার রাজাকে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেন এবং নিজেকে রওশনাবাদ চাকলার স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। তাঁর নামে রাজস্ব আদায় শুরু হয়। তাঁর এই স্বাধীনতা ঘোষণায় জনগণ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। এই নিরিখেই সম্ভবত নোয়াখালি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ শামসের গাজীকে 'Valient son of the soil' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

ত্রিপুরার রাজাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করায় প্রায় সমগ্র অঞ্চলের ওপর শামসের গাজীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য অত্যাচারী জমিদারগণ তখন নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যান। এমতাবস্থায় তিনি একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রণয়ন করেন।

শামসের গাজী স্বাধীনতা ঘোষণার পর তাঁর রাজ্যের সকল দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে, এমনকি ক্রীতদাসদেরও বিনা মূল্যে জমি বন্টন করেছিলেন। তিনি রাজস্বের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে দরিদ্র প্রজাদের কোনো কর দিতে হত না। প্রত্যেক পরগনায় একজন করে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। তাঁর প্রশাসনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন নিযুক্ত হন। এতে প্রশাসনের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ''শামসের সমতল ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরগনার একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্য হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল। ধর্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন তাঁহার দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী) আর খণ্ডলনিবাসী হরিহর ছিলেন তাঁহার নায়েব-দেওয়ান। ইঁহাদের উপর রাজস্বের ভার ন্যস্ত ছিল।''[৩]

শামসের গাজী যখন তাঁর অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামো সংগঠনে ব্যস্ত তখন ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য হারানো রাজ্য ফিরে পাবার জন্য বাংলার নবাব সাইফুদ্দৌলার শরণাপন্ন হন।

শামসের গাজীর নেতৃত্বে প্রজা-বিদ্রোহের সংবাদ সম্পর্কে নবাব আগেই অবহিত ছিলেন। নবাব কৃষ্ণ মাণিক্যকে ত্রিপুরার বৈধ রাজা বলে ঘোষণা করেন। তাঁকে সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে শামসের গাজী পরাজিত হন এবং বন্দি হন। ১৭৬৮ সালে বিদ্রোহের অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হয়। শামসের গাজীর পরাজয় ও হত্যার মধ্য দিয়ে যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য হারানো রাজ্য পুনরায় ফিরে পান। কৃষ্ণ মাণিক্যের শাসনকালে ১৭৬৯ সালে ত্রিপুরাতে ঔপনিবেশিক শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এইভাবে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে এক নতুন পথ নির্দেশ করে শামসের গাজীর বিদ্রোহের অবসান ঘটে। বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকার রওশনাবাদ চাকলায় বাড়তি রাজস্ব ধার্য না করাতে ত্রিপুরার রাজাকে নির্দেশ দেন। এইভাবে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়।

সন্দ্বীপের বিদ্রোহ, ১৭৬৯

বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা একটি বৃহৎ দ্বীপ হচ্ছে সন্দ্বীপ। ১৭৬০ সালে ইংরেজি কোম্পানি সন্দ্বীপসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের কর্তৃত্ব লাভ করে। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে জমিদারগণ তাদের দেয় রাজস্ব স্থানীয় সরকারি ইজারাদারের নিকট প্রদান করতেন। খিদিরপুরের ঘোষাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুল ঘোষাল ছিলেন এ সময়ে সন্দ্বীপের ইজারাদার। তিনি ছিলেন বাংলার গভর্নর হ্যারি ভেরস্টের সদর দপ্তরের কেরানি ও বানিয়ান। গভর্নরের কৃপায় ১৭৬৩ সালে গোকুল ঘোষাল বেনামিতে সন্দ্বীপের ইজারাদারি লাভ করেন।[৪] ইজারাদার হিসেবে তাঁর নিজের হাতেই ছিল সন্দ্বীপের সমস্ত শাসন ও বিচার ক্ষমতা। এ সুযোগে তিনি ইচ্ছেমতো এবং যথেচ্ছভাবে কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে জমিদার ও কৃষকশ্রেণির সমন্বয়ে ১৭৬৯-এ সন্দ্বীপ বিদ্রোহ দেখা দেয়।

প্রথম আবু তোরাপ চৌধুরী গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন নলিকিনের সাথে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এ সুযোগে গোকুল সন্দ্বীপের সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে ওঠেন। তার অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে এবার কৃষকদের প্রতিরোধ আরম্ভ হয়। সন্দ্বীপের কৃষকগণ প্রথমে সর্বত্র সভা-সমাবেশ করে সরকারি খাজনা বন্ধ করে দেয়। গোকুল ঘোষালের পেয়াদা ও পুলিশ খাজনার জন্য ঘরে ঘরে হানা দিয়ে কৃষকদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা দলবদ্ধভাবে এ কাজে বাধা দেয়। এতে গোকুল ঘোষালের বাহিনীর সঙ্গে স্থানে স্থানে কৃষকদের খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ হয়। একটি খণ্ডযুদ্ধে জমিদার মুহম্মদ ফইম নিহত হন। ১৭৬৯ সালে শেষ সরকারি সৈন্যদল সন্দ্বীপে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহ দমনের নামে নিরীহ জনগণের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। বিদ্রোহীরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহ নির্মূল হয়েছে মনে করে ইংরেজ বাহিনী সন্দ্বীপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এই সুযোগে বিদ্রোহীরা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আরও ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়।

মুর্শিদাবাদের রেভেন্যু বোর্ড জোনাথান ডানকান নামক এক কর্মচারীকে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সন্দ্বীপে প্রেরণ করে। ডানকান দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর রেভেন্যু বোর্ডকে জানান যে, কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছরই রাজস্বের হার বৃদ্ধি করা ছিল সন্দ্বীপ বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।[৫] কোম্পানি সরকার এই তদন্ত রিপোর্ট গ্রহণ করে। তদন্তের ফলে কোম্পানির দালাল গোকুল ঘোষালের পতন ঘটে। সকল জমিদারদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হয়। এতে সন্দ্বীপে শান্তি ফিরে আসে। কৃষকরা এই বিদ্রোহে জয়ী হয়।

দিনাজপুর-রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, ১৭৮৩

সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের সমকালে সংগঠিত হয়েছিল দিনাজপুর-রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩)। দিনাজপুরের নাবালক জমিদারকে পরিচালনার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেবী সিংহকে ১৭৮০-তে এজেন্ট নিযুক্ত করে। এই দেবী সিংহ আবার রংপুরের বিরাট অঞ্চলে ১৭৮১-৮৩ সালে কোম্পানির ইজারাদার নিযুক্ত হন। ইজারাদারি পেয়ে দেবী সিংহ ভাড়াটে লোকের সাহায্যে কৃষকদের উপর জুলুম শুরু করে দেয়। খাজনার নামে অবৈধ কর আদায় করতে থাকে। করভারে জর্জরিত কৃষকরা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়ে আবেদন পেশ করে। তা সত্ত্বেও দেবী সিংহ ভাড়াটে লোক মারফৎ পাঁচ আনা হারে এক ধরনের বে-আইনি খাজনা ও তিন আনা হারে বাটা কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে থাকে। বছরে জমে থাকা খাজনা ও বাটার ওপর আরও দু-আনা হারে কর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কৃষক ও গরিব মানুষরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭৮৩-তে দেবী সিংহের সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরের কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই আশেপাশের জেলাগুলিতে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করে।[৬]

রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ দমনে কোম্পানির সরকার ব্রিটিশ সামরিক অফিসার ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠায়। বিদ্রোহী কৃষক ও সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে বিদ্রোহী কৃষকরা পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষে ৬০ জনের বেশি বিদ্রোহী কৃষক প্রাণ দিয়েছিল ও ১৫ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়।

সরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায়, এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন গ্রামের মোড়লেরা (বসুনিয়া)। শত শত মোড়ল নিজ নিজ অঞ্চলে কৃষকদের সমবেত করেছিল। এক লক্ষ কৃষক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। মোড়লদের গ্রেপ্তার করতে গেলে গ্রামের সাধারণ কৃষকেরা সৈন্যদের ঘিরে ফেলত এবং বন্দিদের ছিনিয়ে নিয়ে যেত। কৃষকরা এগিয়ে গিয়ে বলত—ওরা যদি দোষী হয়, তবে আমরাও দোষী। বিদ্রোহীদের যখন জিজ্ঞেস করা হত—তাদের নেতা কারা? উত্তরে তারা বলত—আমরাই বিদ্রোহী, আমরাই আমাদের নেতা। হিন্দু-মুসলমান মোড়লেরা একযোগে এই বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল। প্রায়ই দেখা যেত তারা একজন হিন্দুকে তাদের নবাব বলে অভিহিত করেছে, আবার একজন মুসলমানকে দেওয়ানের পদে বসিয়েছে। উল্টোটাও ঘটেছে।

বিদ্রোহের নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনায় দুটি বিষয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ—নেতা মনোনয়ন ও নেতৃত্বের প্রকৃতি। রংপুর কৃষক বিদ্রোহে ধীরাজ নারায়ণ, শেখ কেনা সরকার, রামপ্রসাদ সর্দার, নুরুলউদ্দীন, দয়াশীল, ভূদারো বসনিয়া, বুড়ো বসনিয়া, শেখ হাবসী, শেখ কাবিল, রহমত, আলিবর্দী, দয়ারাম দাস, হরনারায়ণ দাস, রাম দাস, বানেশ্বর দাস ও ইসরাইল খান প্রমুখ স্থানীয় বসনিয়াদের নেতৃত্ব লক্ষ করা গেলেও ধীরাজ নারায়ণ, শেখ কেনা সরকার ও নুরুলউদ্দীন ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রথম নেতা ও বিদ্রোহীদের মনোনীত 'নবাব'। অবশ্য নুরুলউদ্দীনের ভূমিকা ছিল অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। সরকারি বিবরণীতে বলা হয়েছে, সম্মানিত 'নবাব' উপাধি ধারণ করে রাজমুকুটশোভিত নুরুলউদ্দীন স্বাধীনতার সনদ নিয়ে আবির্ভূত হন। তবে সমস্ত নথিপত্র ও উপাত্ত যা ইঙ্গিত করে তা

হল—রংপুর বিদ্রোহে কৃষকগণই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, বিদ্রোহী কৃষকগণের নেতা মনোনয়ন এবং তাকে 'নবাব' উপাধি প্রদান, মুঘল সরকার কাঠামোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্রোহী কৃষকশ্রেণি সনাতনী ব্যবস্থায় ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল।

রংপুরের কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বের প্রকৃতি ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। সম্ভবত কৃষকগণ আপন মনোজগতের সীমিত গণ্ডিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ পেতে চান। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের পূর্বাবস্থা প্রতিষ্ঠার চেতনা সমন্বিত। সেক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য তারা একদিকে নির্বাচিত নবাবকে নজরানা প্রদান করে আনুগত্য প্রকাশ করে, অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক অনুসরণের পুনরাবৃত্তি কামনা করে।

যাই হোক, এক সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা সমবেতভাবে নুরুলউদ্দীনকে তাদের পরিচালক নির্বাচিত করে তাঁকে 'নবাব' বলে ঘোষণা করে। নুরুলউদ্দীন উত্তরবঙ্গের কৃষকদের এই বিদ্রোহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে দয়া শীল নামক একজন প্রবীণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। নুরুলউদ্দীন এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা দেবী সিংহকে কর না দেওয়ার জন্য আদেশ জারি করলেন এবং বিদ্রোহের ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের ওপর বিশেষ চাঁদা ধার্য করলেন। এইভাবে উত্তরবঙ্গের সমস্ত কৃষক একত্রিত হয়ে দেবী সিংহের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং এই অঞ্চল থেকে ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল।[৭]

বিদ্রোহে কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সহজাত প্রক্রিয়ায়, ধর্মের ভিত্তিতে নয় : ''In fact the village people participated in the revolt irrespective of their caste, community and creed. Neither caste distinction nor communal differences obstructed the march of events.''[৮] এই বক্তব্যে নরহরি কবিরাজ রংপুর কৃষক বিদ্রোহকে, একটা শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যেখানে জাতি ও সম্প্রদায়ের কোনো ভূমিকা ছিল না। তাঁর এই বক্তব্য সমর্থনযোগ্য, কিন্তু এই বক্তব্য নরহরি কবিরাজের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য থিসিসের[৯] বিরোধী। কেননা ঐক্য বলতে বোঝায় মতৈক্য, আর মতৈক্যে থাকে চেতনা। রংপুর কৃষক বিদ্রোহে যখন কোনো সম্প্রদায়গত চেতনা ছিল না, তখন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্ন অবাস্তব। সরকার গঠনে হিন্দু-মুসলমান অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় আন্দোলনের ফলশ্রুতি, যেখানে যে বসনিয়া প্রভাবশালী ছিলেন সেখানে তিনিই 'নবাব' বা 'দেওয়ান' হয়েছেন। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে বা ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার কোনো প্রকার অভিপ্রায় ছিল না। নিম্নবর্গ গবেষক রণজিৎ গুহ রংপুরের বিদ্রোহীদের তৎপরতাকে নেতিবাচক চৈতন্য ও অতিদেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন[১০] যা বিচার সাপেক্ষ। কেননা রংপুরের বিদ্রোহী কৃষকগণ আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে ইংরেজ শাসনকে তাদের দুর্গতির জন্য দায়ী করেন এবং ইংরেজ কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। কোম্পানির কর্মচারী প্যাটারসন রংপুরের এই বিদ্রোহকে সাধারণ জনগণের বিদ্রোহ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কোম্পানির নথিপত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদিও এই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর করে যে, রংপুর বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃষকদেরই সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জমিদারদের অংশগ্রহণ এবং বসনিয়াদের নেতৃত্ব প্রদান মূলত কৃষকদের সাথে অভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। জমিদার-বসনিয়া ও কৃষক অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণি-দুটির শক্তি ও স্বার্থ এক নয়, কিন্তু ১৭৮৩ সালের বিদ্রোহে এই শ্রেণি-দুটির ঐক্য হয়েছিল দেবী সিংহের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে। শোষক ও শোষিতের ভিত্তিতে যেখানে চালিকাশক্তি কৃষক সম্প্রদায়কে সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে দেবী সিংহ বিরোধী প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পথ খুঁজে পান জমিদার ও বসনিয়াগণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রংপুরের এই বিদ্রোহকে শ্রেণিসংগ্রাম বলা চলে। তবে সম্পূর্ণভাবে বর্তমানের কালের চেতনায় নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সীমিত গণ্ডিতে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্বার্থবাদী ও নিপীড়িত শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ চেতনার বিচারে।

কোম্পানি কর্তৃপক্ষ রংপুর কৃষক বিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণির অংশগ্রহণকে লক্ষ করে অস্থির হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ১৭৮৩ সালে সরকার একটি রেগুলেশন জারি করে। এই আইনের আওতায় রংপুর কৃষক বিদ্রোহের প্রতি সরকার এক দ্বৈত নীতি গ্রহণ করে। প্রথমে কোম্পানি সমঝোতামূলক নীতি গ্রহণ করলেও বিদ্রোহ দমনে তাদের ব্যর্থতায় পরবর্তীতে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করে। বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও ক্ষিপ্রতা এত বেশি ছিল যে, কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রংপুরে অবস্থান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সময় রংপুরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায়ে নিপীড়ন ও অত্যাচারকে বিদ্রোহের প্রধান কারণ মনে না করে কোম্পানির নমনীয় নীতিকে বিদ্রোহের প্রধান কারণ বলে বিবেচনা করে এবং দমন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। অন্যদিকে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেয় যে, পুনরায় উত্তেজনার সহায়ক হয়, এমন কার্যক্রম থেকে যেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিরত থাকে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাজস্ব বিষয়ে অসন্তোষ দূরীকরণের জন্য বারবার কালেক্টরের জেলা পরিদর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গ্রামপ্রধান বা বসনিয়া যারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রতি অতি সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে বসনিয়াদের গ্রেপ্তার ও জনসমক্ষে ফাঁসি দানের নির্দেশ দেওয়া হয়। অপরদিকে বিদ্রোহী কৃষকদের অভিযোগ মেনে নিয়ে তাদের শান্ত রাখার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই বিদ্রোহের অন্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এর প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে সরকারের মধ্যে দুটি মতের সৃষ্টি হয়। প্যাটারসন তদন্ত রিপোর্টে বিদ্রোহের জন্য দেবী সিংহ ও কালেক্টর রিচার্ড গুডল্যাডের কর্মকাণ্ডকে দায়ী করা হয়।[১১] কিন্তু কোম্পানি কর্তৃপক্ষ একে ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তদন্ত অভিহিত করে তা গ্রহণ করেনি। অপরদিকে ১৭৮৪-৮৫ সালে রংপুর কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে দেবী সিংহ ও গুডল্যাড নির্দোষ প্রমাণিত হয়। সরকার নিজ স্বার্থে পরবর্তী রিপোর্ট গ্রহণ করে।[১২]

রংপুরের এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে 'আসল তুমার জমার' অভাবনীয় পরিবর্তন ও মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি ছিল সাধারণ কৃষকদের নিকট অকল্পনীয়। ১৭৮৩-র রংপুর বিদ্রোহ ছিল কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রথম ঐক্যবদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ও সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে তারা কোম্পানি সরকারকে নতুন নীতি নির্ধারণে ও রাজস্ব নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল। সুতরাং রংপুর কৃষক বিদ্রোহকে বাংলার পরবর্তী কৃষক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে।

ময়মনসিংহের পাগলপন্থী কৃষক বিদ্রোহ, ১৮২৪-৩৩

১৮২৪ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর অঞ্চলের কৃষকেরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেরপুরের জমিদাররা ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী। তারা কৃষকদের কাছ থেকে 'খরচা', 'আবয়াব' প্রভৃতি নানা ধরনের বেআইনি কর আদায় করত। দশসালা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায় যে, জমিদাররা নামমাত্র খাজনায় এই জমিদারি

উপভোগ করত, অথচ বেআইনি কর হিসেবে তারা কুড়ি হাজার টাকা কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করেছিল। করম শাহের নেতৃত্বে কৃষকেরা এই অত্যাচারের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। করম শাহ স্থানীয় হাজংদের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

করম শাহ প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং শিষ্যকরণে তাঁর কোনো জাতিভেদও ছিল না। তাঁর ভক্তদের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, গারো, হাজং প্রভৃতি সব ধর্মের লোকই ছিল। করম শাহ স্বীয় বিবেকের অনুশাসন মেনে চলতেন এবং অন্যান্য ফকিরদের মতো নিজেকে পারস্য কায়দায় দিওয়ানা বা মস্তান না বলে পাগল বলে আখ্যায়িত করতেন। এর জন্য তাঁর মতবাদ পাগলপন্থী মতবাদ নামে পরিচিত। করম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু শাহ বা টিপু পাগল পাগলপন্থী বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। টিপু পাগলের সময়ে প্রথমে জমিদার এবং পরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পাগলপন্থীদের সশস্ত্র যুদ্ধ বাঁধে।

যুদ্ধের প্রধান কারণ প্রজাদের ওপর জমিদারের অকথ্য অত্যাচার। প্রজারা ইংরেজ সরকারের নিকট এহেন অত্যাচারের প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ইংরেজ সরকার এ ব্যাপারে প্রজাদের কোনোরকম সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন প্রজারা আর কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে টিপু পাগলের শরণাপন্ন হয়। নির্যাতিত প্রজাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল টিপুর শিষ্য। টিপু পাগল তাঁর শিষ্যদেরকে বলে দেন যে, চিরাচরিত হারের ঊর্ধ্বে কেউ যেন খাজনা না দেয়। তাঁর ডাকে সকলেই সাড়া দেয়। অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে টিপু পাগলের নেতৃত্বে তারা ১৮২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি জমিদারদের বাড়ি লুট করে এবং জমিদারদের কয়েকজন গোমস্তাকে হত্যা করে। জমিদারগণ প্রাণরক্ষার্থে পালিয়ে কালিগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট ড্যাম্পিয়ার সাহেবের কাছারিতে আশ্রয় নেয়। পাগলপন্থীরা শেরপুর শহর দখল করে। টিপু পাগল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে ওই অঞ্চলের শাসক হিসেবে প্রচার করেন। পরে তিনি ইংরেজদের হাতে পরাজিত ও বন্দি হন। কিন্তু ইংরেজ সরকার পাগলপন্থীদের প্রবল চাপের মুখে টিপুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। টিপুর নামে রাজস্ব আদায় শুরু হয়। কার্যত টিপু শাহ সর্বসাধারণের নেতা নির্বাচিত হন।[১৩] তারা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাবি তোলে যে, তারা জমিদারি অত্যাচার এবং শোষণ ও উৎপীড়ন মানতে রাজি নয়। ম্যাজিস্ট্রেট সবরকম বেগার, আবয়াব ও বাড়তি খাজনা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। ১৯২৫-এর এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে জমিদার ও তাদের সহায়ক বাহিনীর সাথে বিদ্রোহী কৃষকশ্রেণির প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলে। ইতোমধ্যে সরকার বুঝতে পারে যে, কৃষকশ্রেণির আন্দোলনের প্রথম কারণ অন্যায় ভূমিকর আরোপ এবং এ প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে। এর সমাধানকল্পে সরকার একটি সংক্ষিপ্ত তদন্ত শেষে নতুনভাবে খাজনার হার পুনঃনির্ধারণ করেন। কিন্তু পরিবর্তিত এই ব্যবস্থাতেও বিদ্রোহী কৃষকরা দুটি কারণে খুশি হতে পারেনি। প্রথমত, সরকারি তদন্তে নির্যাতিত কৃষকদের কাছ থেকে কোনো প্রকার তথ্য নেওয়া হয়নি এবং দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহে মৃত্যুবরণকারী কৃষকদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

১৮৭২ সালে সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের অপরাধে পুনরায় টিপুকে বন্দি করা হয়। প্রজা ও পাগল বিদ্রোহ ধীরে ধীরে প্রবল আকার ধারণ করে। ১৮৩৩ সালে পাগলপন্থী ও টিপুর অনুগত বাহিনী আবার শেরপুরের জমিদার বাড়ি ও কাছারি লুট করে সকল সরকারি ভবন ও পুলিশ স্টেশন জ্বালিয়ে দেয়। জানকু পাথর ও দুবরাজ পাথর নামক দু-জন গারো সর্দার এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। শেরপুর থেকে গারো পাহাড় পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলকে পাগল রাজ্য বলে ঘোষণা করা হয়। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কোম্পানিকে ঢাকা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য আনতে হয়। কোম্পানির সৈন্যরা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায় এবং পাগলপন্থীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেয়। কোম্পানির সৈন্যদের ব্যাপক সন্ত্রাসের মুখে পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে যায়। এ পর্বে বিদ্রোহীরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাবি আদায়ের পন্থা অবলম্বন করে। তাদের পক্ষে দাবি আদায়ের জন্য উজির সরকারকে উকিল নিযুক্ত করে ময়মনসিংহে পাঠানো হয়। আদালতের লড়াইয়ে তাদের হাত শক্ত করার জন্য কলকাতা থেকেও একজন অ্যাটর্নি আনা হয়।[১৪] এ সময়ে লক্ষ করা যায়, কৃষকরা দাবি আদায়ে হিংসার পথ পরিহার করে আইন-আদালতের আশ্রয় নেয়। বিগত দিনের চেয়ে কৃষকশ্রেণি এখন জমিদার ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংলাপে বেশি সিদ্ধহস্ত। সম্মিলিত চাঁদার মাধ্যমে কৃষকরা ময়মনসিংহ শহরে আইন লবি প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৮৩৩ সালের পরও তারা সুসংগঠিত অবস্থায় সংঘবদ্ধভাবে আদালতের মাধ্যমে প্রতিরোধ চালিয়ে যায়।

আসলে টিপু ছিলেন নিপীড়িত প্রজাদের একজন মুক্তির দিশারী। অত্যাচারিত জনগণকে তিনি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেন। তিনি প্রকৃত অর্থে ছিলেন জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন তেজস্বী নেতা। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ারে (বৃহত্তম ময়মনসিংহ) টিপুকে কৃষকনেতা রূপে অভিহিত করা হয়েছে। টিপু শাহের শিষ্যসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও অধিক।

ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ ছিল সাধারণ রায়ত সমর্থিত জমিদারি শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘটিত স্থানীয় হিন্দু মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহ। পাগলপন্থী নেতাদের মধ্যে টিপু শাহ ও জরিপ শাহ পাগলের কথিত অলৌকিক ক্ষমতা (কেরামতি) স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর কৃষকদের আস্থা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও শাসন কাঠানোর মধ্যে সৃষ্ট শোষণ-বলয় থেকে কৃষকদের আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের দৃঢ় প্রত্যয়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ময়মনসিংহ বিদ্রোহ কোনো ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন সব ধর্মের ও বর্ণের। বিদ্রোহীদের সামাজিক পরিচয় ছিল এরা উপজাতীয়, নানা বর্ণের হিন্দু ও নানা পেশার মুসলমান। তারা গোষ্ঠী পরিচয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর হলেও সকলের রণভাষা ছিল বাংলা। তাদের ধর্ম কখনো সংগ্রামে কোনো ইস্যু তৈরি করেনি। তাদের বিদ্রোহের মতাদর্শ ছিল মূলত উৎপাদন সম্পর্কে ও শোষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিদ্রোহীরা সামাজিকভাবে মোটামুটি অভিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ছিল বলে মনে করা হয়। পরিশেষে এটা বলা যায় যে, এই বিদ্রোহটি ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রপুষ্ট জমিদারদের শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি গণআন্দোলন। বিদ্রোহের ফলে সরকার কৃষকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত এই বিদ্রোহের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''...পূর্ব বাংলার ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে সংঘটিত পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ... যাদের সহযোগিতাতে ঘটেছিল তাদের মধ্যে মুসলমানরাই ছিল নেতৃত্বে, কিন্তু এই কারণে এই কৃষক সংগ্রামগুলিকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যায় না। জেনে রাখা ভালো যে পাগলপন্থীদের বিদ্রোহে মৈমনসিংহের গারো, হাজং প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিগুলিও উল্লেখ্য অংশ নিয়েছিল এবং ওই উপজাতিদের ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমতলবাসী কৃষকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ও সাম্যের আদর্শ জাগিয়ে তুলেছিলেন

দরবেশ করম শাহ ও তাঁর পুত্র পাগলা টিপু।... সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম প্রান্তিক জনোত্থানগুলি... ব্রিটিশ বিরোধী নির্যাতিত ও প্রবঞ্চিত জনসাধারণের বা দৃঢ়ার্থে কৃষক সমাজেরই সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং ধর্মীয় বিভেদ সত্ত্বেও সেকালে কৃষক সমাজের মধ্যে যে অকপট ও আন্তরিক সামান্য সামাজিক বন্ধন ছিল তারই অকাট্য প্রমাণ।"[১৫]

সিরাজগঞ্জের কৃষকবিদ্রোহ, ১৮৭২-৭৩

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহেও (১৮৭২-৭৩) হিন্দু ও মুসলমান কৃষক যৌথভাবে যোগ দিয়েছিলেন। কৃষকদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম, কিন্তু নোত ছিলেন হিন্দু কৃষককর্মী ঈশানচন্দ্র রায়। ইনি বিদ্রোহী রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। বিদ্রোহী কৃষকেরা জমিদারের কর-খাজনা বন্ধ করে সরাসরি জমিদারি ব্যবস্থা অবসানের দাবি তুলেছিল। পাবনার বিদ্রোহ বগুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকের মনে দারুন ভীতির সঞ্চার করেছিল।

এই প্রজা বিদ্রোহে নিপীড়িত প্রজারা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়েছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে জমিদারশ্রেণির স্বার্থপুষ্টতার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে এই সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছিল—'When a Hindu ryot of any village refuses to join the rebels, his house is plundered. Should the rescuant ryot be a Muhammedan, his house is broken into and the inmates are beaten.'[১৬]

পত্রিকাটি আরও লিখেছিল, 'There is no end to the troubles of the zamindars. The servants of many of them, washermen and barbers inclusive, have left their service and they cannot get their articles of food from any of the shopkeepers of the villages. For want of care the crops in the fields are being ruined, the premises have not been cleansed and are consequently covered with jungle for want of coolies and they have to row their boats themselves to fetch their articles from distant hats. The Mahajans seeing their miserable condition, refuse to lend them money. It can therefore be easily imagined how difficult it would be for them to carry out Mr. Nolan's suggestion involving as they do much expenses.'[১৭]

তৎকালীন বঙ্গভাষার সাময়িক পত্রিকাগুলি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা ফলাও করে ছাপিয়েছিল। ১৮৫৭ সালে লেফটেন্যান্ট গভর্নর রিচার্ড টেম্পল তাঁর সরকারি প্রতিবেদনে পূর্ববঙ্গের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে 'লিগস্ অ্যান্ড ইউনিয়নস্' বলে বর্ণনা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি কৃষকদের সংগঠিত অভিব্যক্তি লক্ষ করেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. *নোয়াখালি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*, ১৭৬৭, পৃ. ২৩
২. সিরাজুল ইসলাম (স.), *বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস : চিটাগাঁও*, খণ্ড-১ (১৭৬০-৮৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭৭৮, পৃ. ৫০
৩. কৈলাস সিং, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১২৫
৪. রাজকুমার চক্রবর্তী, *সন্দ্বীপের ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২; জুলফিকার হায়দার, *বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৮৪
৫. জোনাথান ডানকান, *কয়ারি ইন্টু ডিস্টারবেনসেস ইন সন্দ্বীপ, বেঙ্গল রেভিনিউ প্রসিডিংস*, ১ অগস্ট, ১৭৮০, রেঞ্জ-৫০, খণ্ড-২৬
৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আব্দুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১৭-২৬
৭. নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, পুঁথিপত্র, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫২২
৮. নরহরি কবিরাজ, এ পিজান্ট আপরাইজিং ইন বেঙ্গল, পিপলস পাবলিশিং হাউস, নিউ দিল্লি, ১৯৭২, পৃ. ৩৯
৯. নরহরি কবিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১০. রণজিৎ গুহ, *এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অব পিজান্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*, অক্সফোর্ড প্রেস, দিল্লি, ১৯৮৩, পৃ. ১৮
১১. ইম্পিচমেন্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস, খণ্ড-১, পৃ. ১৯৫; দেখুন নরহরি কবিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
১২. তদেব, পৃ. ৭৫
১৩. হরচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুর বিবরণ, ১২৭৯ সন, কলকাতা, পৃ. ১০৭
১৪. ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, এপ্রিল-জুন ১৯৮৫, পৃ. ১০৩, দেখুন আব্দুল বাছির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
১৫. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৪২-৪৩
১৬. *Amrita Bazar Patrika*, 25-26 June, 1873
১৭. *Amrita Bazar Patrika*, 18 July, 1873

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমুদ্রগড় সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

(শাখা : সিংহজুলী) পোঃ : সমুদ্রগড়, জেলা : বর্ধমান, ফোন : ০৩৪৫৪-২৬৬২৫৬, ২৬৬৫২২

আমাদের পরিষেবা

• ন্যায্য দরে ভেজালহীন সারের ব্যবস্থা। • ব্যাঙ্কে সকল প্রকার ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। • কম সুদে চাষিদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। • অভাবী চাষিদের পাট ক্রয়। • মিনি ডিপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা। • হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। • হাস্কিং মিলে ধান ভাঙানোর ব্যবস্থা। • কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবাহী প্রকল্প রূপায়ণে এই সমবায় সর্বদা সজাগ।

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় *সভাপতি*
সাহাদুল খান *সম্পাদক*
আব্দুল হামিদ সেখ *ম্যানেজার*

Sl. No. 98

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বর্ধমান কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

ওল্ড কোর্ট কম্পাউন্ড, বর্ধমান
দূরভাষ : ০৩৪২-২৬৬২৩৯০, ২৬৬৫৭১২

১৯৪১ সাল থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদানে নিয়োজিত অগ্রণী সমবায় প্রতিষ্ঠান

উল্লেখযোগ্য ঋণ প্রকল্প

স্থায়ী চাকুরিজীবী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহজ শর্তে বাড়ি তৈরি ও বাড়ি মেরামতের জন্য ঋণ যে-কোনো ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ঋণ, রাইস মিল, এস.আর.টি. ও ডেয়ারি প্রকল্প, পোলট্রি প্রকল্প, মৎস্য প্রকল্প, ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার ক্রয়, মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীদের (এস.এইচ.জি.) ঋণ।

শাখা অফিস : বর্ধমান ও সেহারাবাজার ■ সাব অফিস : আসানসোল ও দুর্গাপুর

শ্রীগঙ্গাধর পাল
চেয়ারম্যান

Sl. No. 4

সিপিআই(এম) একবিংশ পার্টি কংগ্রেস

কিছু কথা ও কিছু ভাবনা

আভাস রায়চৌধুরী

সাম্প্রতিক কয়েক বছর বামপন্থীদের নির্বাচনী পরাজয় ও বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র বামবিরোধী প্রচারমাধ্যম ও বামবিরোধী শিবির উল্লাসে ঘোষণা করছে এরাজ্য থেকে বামপন্থার দিন শেষ। শুধু এই প্রচারের প্রভাবেই নয়, বাস্তব নির্বাচনী ফলাফলে বামপন্থার অনুসারী মানুষের মধ্যেও এক গভীর উদ্বেগের জন্ম হয়েছে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘ তিন দশকের বামফ্রন্ট সরকারের অবসানের পর সিপিআই(এম) নির্বাচনী পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করে। এবং তাকে সংশোধনের পথে সমগ্র পার্টিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। নেতৃত্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে রাজ্যের শ্রমজীবী জনগণের সাথে যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে তাকে অতিক্রম করতে হবে দ্রুত। এই নির্দেশনার সারমর্ম শুধুমাত্র মানুষের মাঝে যাওয়া, দিন প্রতিদিন শ্রমজীবী ও সাধারণ পরিবারগুলির সাথে শিথিল হওয়া যোগাযোগকে পুনরুদ্ধারই নয়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও সংগঠক রূপে এই জরুরি কাজ তো আমাদেরই করতে হবে। তবে জনগণের সাথে কমিউনিস্টদের নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যম হল জনজীবনের জীবন-জীবিকার সংগ্রাম গড়ে তোলা। বিশেষত সরকার গঠনের পরই বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী, তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে পড়ছিল। সর্বস্তরে সংগঠকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশের বিহ্বলতা অতিক্রম করে পার্টি আবার আন্দোলনের পথে চলতে শুরু করে। ইতিমধ্যে মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার বড় অংশেও তৃণমূল সরকারের বিরোধী প্রচার শুরু হয়, বিশেষত চিটফান্ড কেলেঙ্কারি এবং গণতন্ত্রের ওপর আঘাতের ঘটনাগুলি সম্পর্কে।

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের এ পর্যন্ত সব থেকে বড় নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটে। তৃণমূলবিরোধী মানুষের এমনকি অতীতের নির্বাচনগুলিতে বামপন্থীদের সমর্থনকারী অসংখ্য মানুষ এ রাজ্যে বিজেপিকে সমর্থন করেন। প্রাক্‌নির্বাচনী প্রচারপর্বে তৃণমূল ও বিজেপি—উভয়ের তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রভাব, তৃণমূল-বিরোধী মানুষের বামপন্থীদের প্রতি অনাস্থা ইত্যাদি অনেকগুলি কারণ বিশ্লেষণে উঠে আসে। কিন্তু ২০১৪-র নির্বাচনী বিপর্যয় শুধু এ-রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশের মধ্যে কেবলমাত্র একটি লোকসভা কেন্দ্র ছাড়া সর্বত্র বামপন্থীদের জনসমর্থন কমে যায়। এখানে উল্লেখ করা জরুরি, ২০১১-র পর পশ্চিমবঙ্গে কোনো নির্বাচনেই অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে মানুষ ভোট দিতে পারেননি। ফলে এ-রাজ্যে বামপন্থীদের সমর্থন কমার অন্যান্য কারণগুলির সাথে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের উপাদানটি রয়েছে। কিন্তু দেশের অন্যত্র? বিশেষত, কেরালাতেও বিজেপি-র উল্লেখযোগ্য সমর্থন বৃদ্ধি ঘটে, যেখানে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরেও বামপন্থীরা ধারাবাহিক ও তীব্র আন্দোলনের মধ্যই রয়েছে এবং ঐ রাজ্যের মানসিকতায় সরকার পরিবর্তন স্বাভাবিক ঘটনা। আরও একটা বিষয়ের স্পষ্ট উচ্চারণ জরুরি। নির্বাচনী জয়, কিংবা পরাজয়

কমিউনিস্টদের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য নয়, কমিউনিস্ট পার্টি শুধু ভোটের পার্টি নয়। এ দেশের বাস্তবতায় এখনো শ্রমিকশ্রেণিকে সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ নিতে হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ভোটের পার্টি না হলেও নির্বাচনী বিপর্যয় জনসমর্থন কমার অন্যতম মাপকাঠি। শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের সমর্থন কমার কারণ বিশ্লেষণ কমিউনিস্ট পার্টিতে হয়। সিপিআই(এম)-এর তীব্র বিরোধীরাও কখনো সততার সাথে অভিযুক্ত করতে পারবেন না যে কমিউনিস্ট পার্টি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মনিরপক্ষেতার প্রশ্নে আপস করে, কমিউনিস্ট পার্টি দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের উদরপূর্তিতে সাহায্য করে। বরং কমিউনিস্টরাই দেশের সাবভৌমত্ব, দেশের সম্পদ, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও দেশের শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে সংগ্রাম করে। তা হলেও কেন জনসমর্থন হ্রাস? তবে কি পার্টি যে রাজনৈতিক পথে সংগ্রাম করছে তাতে কোনো দুর্বলতা আছে? সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করে পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলের পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে। সেই অনুযায়ী একবিংশ পার্টি কংগ্রেসে (১৪-১৫ এপ্রিল, ২০১৫, বিশাখাপত্তনম) দু-দশক ধরে চলা নয়া উদারনীতি পর্বে গৃহীত রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা করে বর্তমান কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে সিপিআই(এম)।

এই পর্যন্ত বলা প্রতিটি শব্দই সচেতন পাঠকমণ্ডলীর জানা। এখন এ-রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের চরিত্র রাজ্যবাসী দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট, দেড় বছরে দিল্লির সুদিনওয়ালার প্রকৃত অভিমুখ দেশবাসী বুঝতে পারছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এ রাজ্যের নবান্ন অভিযান এবং ২ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটে এ রাজ্যে, এ দেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন আবার শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। বেশ কিছু সময় ধরে রাজ্য ও দেশে শ্রমিকশ্রেণি সহ শ্রমজীবী মানুষের অসংখ্য ছোটোবড় আন্দোলনের পথ ধরেই রাজ্য ও দেশে শ্রমজীবী মানুষের এই সংগ্রামগুলি আক্রমণের সামনেও ছিল অকুতোভয়। এই সংগ্রামে অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সাথে সিপিআই(এম)-এর ভূমিকাও অন্যতম প্রধান। সিপিআই(এম) সঠিকভাবেই ডাক দিয়েছে দেশ থেকে বিজেপি, রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে সরাতে। এই কাজ এই মুহূর্তের করণীয় এবং এই কাজে কোনো শিথিলতা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব ও আন্দোলনের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ সৃষ্টি করবে। ফলে সকল বামপন্থীর সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হবে। ঠিক এইখানে এসে একবিংশ পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক কৌশলগত লাইনের পুনর্মূল্যায়ন ও নির্ধারিত করণীয়কে মনে রাখতে হবে, নচেৎ পুনর্মূল্যায়নে যে ভ্রান্তিগুলি উঠে এসেছে তা অনতিক্রম্য হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মতোই আমাদেরও লক্ষ্য দেশের বর্তমান শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্য থেকেই এ প্রশ্নের উদ্ভব ও সমাধান ঘটেছে যে স্বাধীন ভারতে যদি দেশীয় শাসকশ্রেণির শোষণশাহী বজায় থাকে তবে দেশের শ্রমজীবী ও অশোষক শ্রেণিগুলি স্বাধীনতার স্বাদ পাবে না। স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় থেকেই এ দেশে কমিউনিস্টরা স্বাধীন ও শোষণহীন ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে সংগ্রাম করছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বর্তমান অবস্থায় সিপিআই(এম) মনে করে এদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক নয়, আবার প্রকৃত নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতার পথ ধরে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছতে পারে। সিপিআই(এম) মনে করে দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করতে হবে। ইউরোপে পুঁজিবাদের ঊষালগ্নে যে কাজ বুর্জোয়ারা করেছে সে কাজ এ দেশে আজ শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ক্ষেতমজুর, মধ্যবিত্ত সহ দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ-বিরোধী জনগণের জোটকে বাস্তবায়িত করতে হবে। ভারতের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বলা হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, আর শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবী মোর্চার নাম হল জনগণতান্ত্রিক মোর্চা। এই শসস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সিপিআই(এম)-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা হল এদেশের বর্তমান স্তরে সিপিআই(এম)-এর মূল লক্ষ্য। ভারতীয় বিপ্লবের এই রণনীতিগত লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মতো সিপিআই(এম)-কেও রণকৌশল গ্রহণ ও কার্যকর করতে হবে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতিগত লক্ষ্যের দিকে এগোতে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সময়ে যে রণকৌশল নিতে হয় তা হল সিপিআই(এম)-এর রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন। এই লাইনের মূল লক্ষ্য দেশের বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থায় এক বামগণতান্ত্রিক বিকল্প উপস্থিত করার সংগ্রাম গড়ে তুলতে বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করা।

১৯৭৮ সালে সিপিআই(এম)-এর দশম পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক রণকৌশল রূপে বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চার লাইন ঘোষণা করা হয়। আটাত্তর পরবর্তীতে দেশের রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যায়। আড়াই বছরের মধ্যে জনতা সরকারের পতন। ১৯৮০-তে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল বিজেপি-র আত্মপ্রকাশ, যা সর্বভারতীয় পরিধিতে কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক দল। ১৯৮০তে সরকারে ফিরে এসে ইন্দিরা গান্ধীও হিন্দু মৌলবাদী শক্তির সাথে আপসের পথ ধরেন, পাঞ্জাবের আকালি আন্দোলনকে ভাঙতে প্রথমে আরও উগ্রপন্থী শক্তিকে মদতদান এবং পরে অপারেশন ব্লুস্টার এবং ১৯৮৪তে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার ঘটনা। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী, ভারতে নয়া উদারনীতির বীজ রোপণ। রাজীব সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ যত বেড়েছে ততই সরকার হিন্দু ও মুসলমান—উভয় মৌলবাদের সাথে আপসের পথ ধরেছে। এই পথেই হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির পক্ষ থেকে রামমন্দির ইস্যুতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং ওই পর্বের ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। একই পর্বে জাতীয় রাজনীতিতে একক দলের শাসন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রাম জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। ফলে এই পর্বে বামগণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্য গড়ে তোলা জরুরি হয়ে ওঠে এবং এটাই হয়ে যায় অন্তর্বর্তী রাজনৈতিক শ্লোগান।

সিপিআই(এম)-এর ষোড়শ কংগ্রেসে বামগণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যের শ্লোগান সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, যা পরিচিত হয় তৃতীয় বিকল্প নামে। পার্টি কংগ্রেস সতর্ক করেছিল তৃতীয় বিকল্প শুধুমাত্র কোনো নির্বাচনী আঁতাত নয়, অভিন্ন কর্মসূচিতে একগুচ্ছ নীতিতে সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপি-র বিকল্প গড়ে তোলা। সংগ্রামের পথে নির্বাচন এলে নির্বাচনী লড়াই হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হল অভিন্ন কর্মসূচিতে জনগণের জীবনজীবিকার স্বার্থে একগুচ্ছ নীতিতে সংগ্রাম গড়ে তোলার বাস্তবায়ন হল না। বাম দল ছাড়া গণতান্ত্রিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ দল বলতে বোঝায় বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলি। যারা আসলে আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত এবং এখনও করে। এই আঞ্চলিক দলগুলি নির্বাচনী জোট ছাড়া

ধারাবাহিক আন্দোলনে আগ্রহী হয়নি এবং সিপিআই(এম) সহ অন্যান্য বাম দলগুলির এমন স্বাধীন শক্তির বিকাশ সর্বভারতীয় স্তরে ঘটেনি যে আন্দোলনের চাপে তাদের টেনে আনা সম্ভব হয়। ফলে পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে অকংগ্রেসি ধর্মনিরপেক্ষ সমঝোতা ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে ঘোষিত তৃতীয় বিকল্প থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বামপন্থীদের রাজনীতি চর্চার ত্রুটিতে বামগণতান্ত্রিক মোর্চার অনুসারী হিসেবে তৃতীয় বিকল্পের আহ্বান কার্যত অকার্যকর হয়েই থেকে গেল। সিপিআই(এম)-এর বিংশ কংগ্রেস রাজনৈতিক রণকৌশল হিসেবে তৃতীয় বিকল্পের ধারণাকে বাতিল করে। পার্টির একবিংশ কংগ্রেস দশম কংগ্রেসে গৃহীত বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রণকৌশলগত লাইনকেই পুনরায় বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির রণনীতির অনুসারী রণকৌশল রূপে নির্ধারণ করেছে।

ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস থেকে গৃহীত রাজনৈতিক কৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা করে একবিংশ কংগ্রেস বলেছে, এ পর্যন্ত গৃহীত রাজনৈতিক কৌশলগত লাইন চলতি পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে এবং আশু বিপদ মোকাবিলায় রণকৌশল ও কর্মধারা স্থির করতে সাহায্য করেছে। যেমন ১৯৯৬-এ কংগ্রেস ও ২০০৪-এ বিজেপিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে; বিভেদপন্থা, উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দিক নির্দেশ করতে; কেরালা, ত্রিপুরায় বামপন্থী সরকার গঠন করতে এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারকে সংহত করতে; দেশে শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যগঠনে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সিপিআই(এম)-এর লক্ষ্যের বিচারে এই কাজগুলিই চূড়ান্ত নয়। ফলে একবিংশ কংগ্রেস তীব্র আত্মসমালোচনা করে বলেছে রাজনৈতিক রণকৌশলের অভ্যন্তরীণ কিছু ত্রুটি ও ঘাটতি এবং প্রয়োগের ঘাটতি আমাদের স্বাধীন শক্তির বিকাশ ঘটায় নি। যার ফলে আমাদের রণনীতির অনুসারী রণকৌশল রূপে বামগণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের দিকে এগোনো যায়নি। একবিংশ কংগ্রেস মনে করে রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগের সময়ে কখনো কখনো ভুল মূল্যায়ন কিংবা ত্রুটি ফেলে আসা সময়ে আমাদের নির্বাচনী কৌশলেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যা নির্বাচনী অসাফল্য থেকে জনবিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পার্টির রণকৌশলগত লক্ষ্যের দিকে এগোনোর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

একবিংশ পার্টি কংগ্রেস বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সম্পর্কে মূল তিনটি বিষয়বস্তু উপস্থিত করেছে—

(ক) জাতীয় স্তরে বুর্জোয়া দলগুলির থেকে পৃথক ও তাদের নীতির বিরোধী রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে ওই সমস্ত দলগুলির প্রভাবে থাকা শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষকে ফিরিয়ে আনা যায়।

(খ) বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে প্রাণবন্ত করতে হলে যে শ্রেণি ও জনগণকে সমবেত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক দলের সরকারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে। কারণ তৃতীয় বিকল্পের ব্যর্থতায় দেখা গেছে যে-কারণে আঞ্চলিক দলগুলি নির্বাচনী সমঝোতা ছাড়া যুক্ত আন্দোলনে অনাগ্রহী ছিল তা হল নয়া উদারনীতির বর্তমান পর্বে আঞ্চলিক বুর্জোয়ারাও নয়া উদারনীতির চক্রের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছে, এরাও নিজ নিজ রাজ্যে সরকারে থেকে এই জনবিরোধী নীতিকেই বেপরোয়াভাবে প্রয়োগ করছে (যেমন, এ রাজ্যে তৃণমূল সরকার) এবং এরা সব সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সাথেই থাকতে চায়, সেক্ষেত্রে কোনো রাজনীতিগত নীতি বাধা হয় না ওদের কাছে

(গ) ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া দলগুলিকে নিয়ে জাতীয় স্তরে বিকল্প গঠনের সর্বভারতীয় লাইন অনেক সময় রাজ্যগুলিতে বামগণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে নির্বাচনী কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে পার্টির স্বার্থে ও বামগণতান্ত্রিক শক্তির জোটের স্বার্থে কেন্দ্রীয় কমিটি গৃহীত রাজনৈতিক কৌশলগত লাইনের মধ্যে থেকে রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনী কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে নমনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এখানে সচেতন বা অবচেতন ভ্রান্তি সম্পর্কে গোটা পার্টিকে সতর্ক থাকতে হবে।

একবিংশ পার্টি কংগ্রেস যখন পার্টির রণকৌশলের পর্যালোচনা করছে তখন দেশে এই প্রথমবার সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী শক্তি একক শক্তিতে ভারত রাষ্ট্রকাঠামো দখল করেছে। এই শক্তি কংগ্রেসের ছেড়ে যাওয়া নয়া উদারনীতিকেই আরও বেপরোয়াভাবে কার্যকর করতে চাইবে। ফলে দেশের ক্ষমতায় এখন কর্পোরেট হিন্দুত্ববাদী শক্তি। ইতিমধ্যেই দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ নির্মাণের উৎসস্থলগুলি এই সাম্প্রদায়িক শক্তি নিজের মতো করে গড়ে নিতে তৎপর। এই অবস্থায় সিপিআই(এম)-এর রাজনৈতিক রণকৌশলগত আহ্বান হল সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়াই কেবলমাত্র নির্বাচনী রণকৌশল এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ঐক্যবদ্ধ লড়াই নয়; লড়াইকে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে জীবন-জীবিকার সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে। পার্টি আহ্বান জানিয়েছে সব ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্যাপক মঞ্চ গড়ার। এখানেও রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের সতর্কতা হল এই ব্যাপক মঞ্চ কোনো নির্বাচনী আঁতত নয়। কৌশলগত লাইন বলছে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা হিন্দুত্ববাদী শক্তি সহ সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—সর্বস্তরে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এরই অনুসারী হল জাতপাত, সামাজিক নিপীড়ন, লিঙ্গবৈষম্য ও পরিচিতিসত্তার রাজনীতি-বিরোধী সংগ্রামগুলি। যেগুলি স্বতন্ত্র অথচ বামগণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

সব মিলিয়ে রাজনৈতিক কৌশলগত লাইন ঘোষণা করেছে বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে, বামগণতান্ত্রিক কর্মসূচিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এই বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চরিত্র সম্পর্কে আরও ভাবার অবকাশ রয়েছে। তবে এই লক্ষ্য অর্জনে বাম-ঐক্যকে আরও প্রসারিত ও গভীর করতে সিপিআই(এম)-কে আরও বেশি ভূমিকা পালন করতে হবে। এই কাজ অসম্ভব যদি না পার্টির স্বাধীন ভূমিকা বৃদ্ধি পায়, পার্টির স্বাধীন শক্তি ও গণভিত্তি কিংবা কার্যকর যুক্তফ্রন্টের কৌশল কিছুই সম্ভব নয়। ফলে রাজনৈতিক কৌশলগত লাইনের মূল সাংগঠনিক আহ্বানটি হল পার্টির স্বাধীন শক্তি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করা। এ কাজে সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত উভয় পথেই আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। উভয়ের সমন্বয় ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই আজকের ভারতীয় সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অনুশীলন। এ কাজে রাজনৈতিক সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে পার্টির সকলেরই।

এই রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে একবিংশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাইন ঘোষণা করেছে বিজেপি ও মোদি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল একই সাথে সাম্প্রদায়িকতা ও নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আক্রমণের বর্শাফলক বিজেপি-র দিকে তাক করা কিন্তু নয়া উদারনীতি ও তার যাবতীয় কুফলের স্রষ্টা কংগ্রেস-বিরোধিতা অব্যাহত। পার্টি স্পষ্ট উচ্চারণ করেছে, কংগ্রেসের সাথে কোনো ধরনের বোঝাপড়া বা নির্বাচনী জোট হবে না। আগেই উল্লেখ

করেছে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ ধরে বামগণতান্ত্রিক শক্তিকে শক্তিশালী করতে হলে আঞ্চলিক দলগুলি পরিচালিত সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য নিজেদের স্বাধীন শক্তিকে বৃদ্ধি করা, শক্তিশালী করা, প্রসারিত করা। বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্রবিন্দু হল বামদলগুলি, তাদের অনুসারী শ্রেণি ও গণসংগঠনগুলি। এর সাথে বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীগণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ছড়িয়ে থাকা সমাজতন্ত্রীদের, ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশ, আদিবাসী দলিত মহিলা সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলিকে জোটবদ্ধ করতে হবে ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রামের বৃহত্তর বামগণতান্ত্রিক মোর্চায়। এই বামগণতান্ত্রিক মোর্চার কর্মসূচির লক্ষ্য হবে বুর্জোয়া-জমিদার সমাজরাষ্ট্রকাঠামো-বিরোধী, নয়া উদার অর্থনীতিবিরোধী এবং শ্রমজীবী ও সাধারণ জনগণের জীবনজীবিকার আশু দাবিগুলির অনুসারী। যেহেতু এই সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু বামপন্থীরা, আরও স্পষ্টভাবে বললে কমিউনিস্টরা, ফলে এদেশে কমিউনিস্টদের বামপন্থীদের শক্তিশালী ভিতিগুলিকে রক্ষা করতে হবে। তাই একবিংশ পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের ওপর নয়া উদারনীতির সমর্থক ও প্রয়োগকারী এবং শ্রমজীবী মানুষের শত্রু স্বৈরাচারী তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছে।

সিপিআই(এম)-এর চরিত্র সর্বভারতীয়। তাই এই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক লাইনকে আমাদের রাজ্যে প্রয়োগ করতে উপযুক্ত সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট। এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক ও প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য স্বৈরাচারী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে সরানো এবং তৃণমূলের সর্বব্যাপী আক্রমণ থেকে রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকাকে রক্ষা করা। ব্যাপক ও বৃহত্তর গণআন্দোলন ও শ্রেণি আন্দোলনের পথ ধরেই এই প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। অসংখ্য ছোটোবড় আন্দোলনের পথ বেয়ে নবান্ন অভিযান ও সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সাফল্য বাড়তি গতি আনবে এ রাজ্যে বামপন্থার শক্তিতে, উৎসাহিত হবেন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষেরা, আতঙ্কিত হবে তারা যারা বামপন্থার পরিসমাপ্তি ঘোষণায় উল্লসিত ছিল। ফলে আগামী স্বৈরাচারী শাসক ও রাজনৈতিক লুম্পেনদের আক্রমণ আরও তীব্র হবে। ফলে আগামীদিনের লড়াইটা আরও কঠিন, আরও দীর্ঘস্থায়ী। সিপিআই(এম)-এর সংগঠক, সমর্থকরা যদি মনে করেন আগামী সংগ্রামটা শুধু ২০১৬-র নির্বাচন, তবে পুনরায় রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার শিকার হবেন। অবশ্যই ২০১৬ একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। সে সময়ের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে পার্টি-ঘোষিত বুর্জোয়া জমিদারি ব্যবস্থায় বামগণতান্ত্রিক বিকল্প উপস্থিত করার চলমান শ্রেণি ও গণআন্দোলনের গতি, গুণ ও ধারাবাহিকতার ওপর।

পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন বা রাজনৈতিক লাইন হল একটা তাত্ত্বিক কাঠামো। এই তাত্ত্বিক কাঠামো দিনপ্রতিদিনের ছোটোবড় প্রতিটি প্রচার, প্রচার আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রয়োগযোগ্যতা ব্যতীত কোনো তত্ত্বের কোনো অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। এটা সব সময় মনে রাখতে হবে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে কোনো তাত্ত্বিক বোঝাপড়া ব্যতীত কোনো সচেতন আন্দোলন সংগ্রামও গড়ে ওঠে না। যারা শুধু তত্ত্ব চর্চা করেন কিংবা তত্ত্ব আর করণীয় কর্তব্যের বিভাজন ঘটান তাঁরা কেউই মার্কসবাদী নন। লেনিন বলেছিলেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব সম্পন্ন হয় না। আবার লেনিনই রুশ দেশে মার্কসবাদের প্রাণভোমরা তত্ত্ব ও প্রয়োগের মিলন ঘটিয়েছিলেন। ইতিহাসের পাতায় যা উজ্জ্বল হয়ে আছে, দু-চারটে লেনিন মূর্তি ভেঙে শ্রমজীবী মানুষের দর্শনের এই অমর কীর্তিকে বিলোপ করা যায় না।

আজ নয়, কাল নয় একদিন না একদিন এ দেশেও বিপ্লব অনিবার্য। এ দেশে বিপ্লব আসন্ন নয়, দিকচক্রবালে তার কোনো ইঙ্গিত নেই এখন। এই ভেবে কেউ যদি ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সাথে বর্তমান সময়ের প্রাথমিক ও দীর্ঘস্থায়ী কাজগুলির সম্পর্কচ্যুতি ঘটান তবে তা হবে মতাদর্শগত তরলতা ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক দিয়ে আটকে রাখা যাবে না। বিশ্বব্যাপী সম্পদের ভয়ঙ্কর কেন্দ্রীভবন আর দুনিয়ার পথেপ্রান্তরে প্রতিদিন অমানবিক শোষণ বঞ্চনা অপুষ্টি আর অনাহারের ক্রমবর্ধমান গতিকে শেষ পর্যন্ত কতদিন কেমনভাবে একই সাথে ধরে রাখবে পুঁজিবাদ তা এখনই বলা শক্ত, তবে যা অনিবার্য তা হল এই অসম বাঁধন ছিঁড়ে যাবেই। শব্দ ও বাক্যগুলি কি আবেগের সীমা ছাড়িয়ে গেল? গেলে যাক্। আবেগ ছাড়া বিপ্লবী হওয়া যায় নাকি? তবে বিপ্লবী আবেগ স্বতঃস্ফূর্ততার ডাকে সাড়া দেয় না, পথ চলে মতাদর্শের আলোতে আর শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর আস্থা আর দায়বদ্ধতায়।

একজন কমিউনিস্ট কর্মীর ভূমিকার মূল্যায়ন কীসে হবে? শুধু বর্তমান কাজে? তা তো কিছুটা বটেই। তবে প্রতিটি কমিউনিস্ট কর্মী, বিপ্লবীর ভূমিকার আসল মূল্যায়ন হল বর্তমান কাজে সে সচেতনভাবে ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব ও উপাদান সৃষ্টি করতে পারছে কিনা। এটাই বোধহয় ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বিক্রমপুর কোল্ড স্টোরেজ

পোঃ বোহার, জেলা : বর্ধমান

আলু বীজ সংরক্ষণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 3

মোদির প্যাটেল প্রীতি এবং সংঘ পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি

সেখ সাইদুল হক

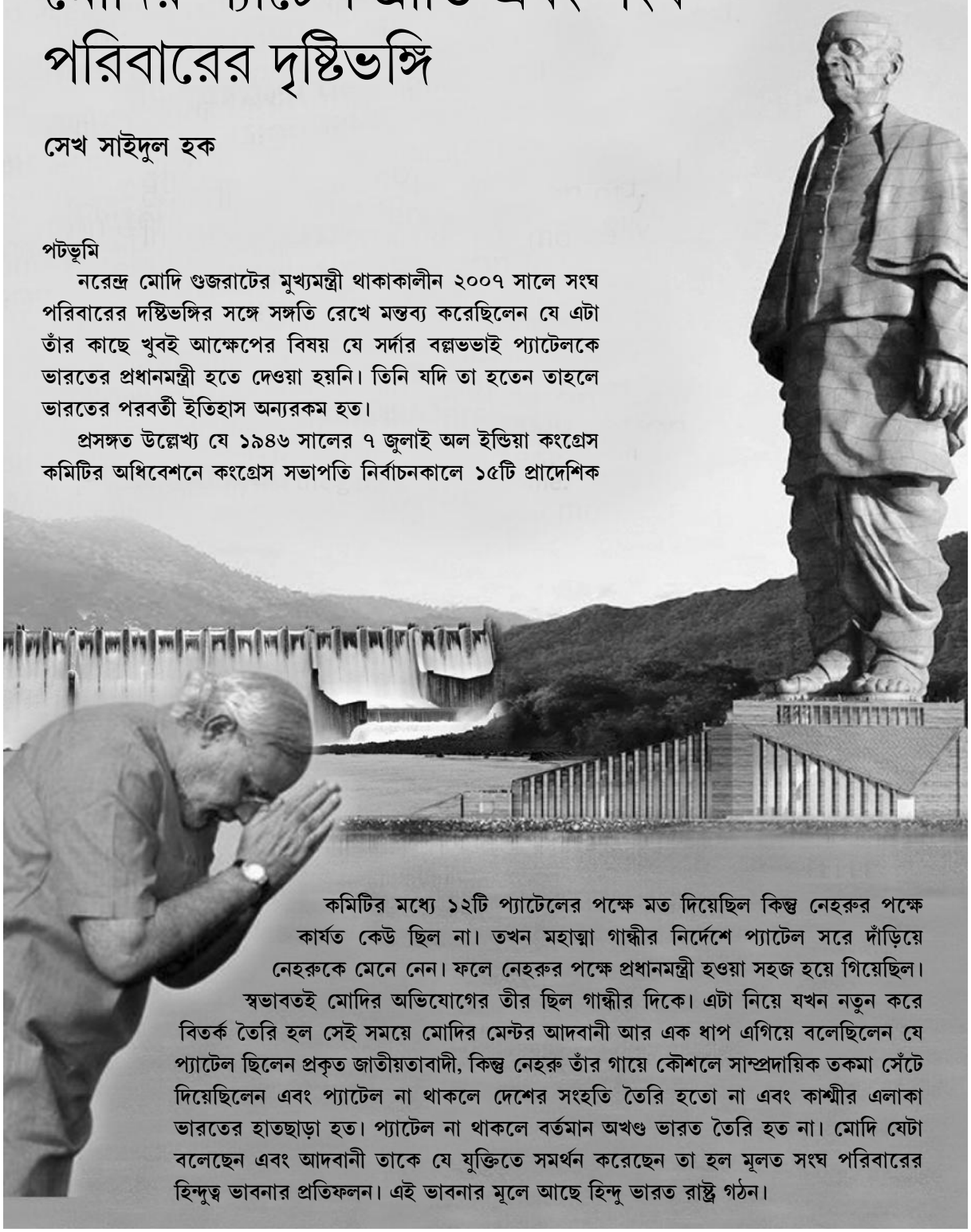

পটভূমি

নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৭ সালে সংঘ পরিবারের দষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মন্তব্য করেছিলেন যে এটা তাঁর কাছে খুবই আক্ষেপের বিষয় যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে দেওয়া হয়নি। তিনি যদি তা হতেন তাহলে ভারতের পরবর্তী ইতিহাস অন্যরকম হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৪৬ সালের ৭ জুলাই অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনকালে ১৫টি প্রাদেশিক কমিটির মধ্যে ১২টি প্যাটেলের পক্ষে মত দিয়েছিল কিন্তু নেহরুর পক্ষে কার্যত কেউ ছিল না। তখন মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে প্যাটেল সরে দাঁড়িয়ে নেহরুকে মেনে নেন। ফলে নেহরুর পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হওয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই মোদির অভিযোগের তীর ছিল গান্ধীর দিকে। এটা নিয়ে যখন নতুন করে বিতর্ক তৈরি হল সেই সময়ে মোদির মেন্টর আদবানী আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন যে প্যাটেল ছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী, কিন্তু নেহরু তাঁর গায়ে কৌশলে সাম্প্রদায়িক তকমা সেঁটে দিয়েছিলেন এবং প্যাটেল না থাকলে দেশের সংহতি তৈরি হতো না এবং কাশ্মীর এলাকা ভারতের হাতছাড়া হত। প্যাটেল না থাকলে বর্তমান অখণ্ড ভারত তৈরি হত না। মোদি যেটা বলেছেন এবং আদবানী তাকে যে যুক্তিতে সমর্থন করেছেন তা হল মূলত সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ব ভাবনার প্রতিফলন। এই ভাবনার মূলে আছে হিন্দু ভারত রাষ্ট্র গঠন।

সংঘ পরিবারের ভাবনার নির্যাস হল যদি পশ্চিমি ঘেঁষা আধুনিক মার্কা নেহরু প্রধানমন্ত্রী না হতেন তাহলে হিন্দু ভারত গঠনের প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হতে পারত। তাই সংঘ পরিবারের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে মোদি প্যাটেলের মাধ্যমে সংঘ পরিবারের সম্মিলিত ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন। প্যাটেলকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপিত করছেন যেন গান্ধী নন, তিনিই জাতির জনক। তবে বলা যায় এটা করছেন যতখানি না প্যাটেলকে ভালোবেসে তার চেয়েও বেশি হল নেহরু ও তাঁর উত্তরাধিকারকে আক্রমণের লক্ষ্যে। সংঘ পরিবার সবসময় প্যাটেল-এর পদক্ষেপগুলিকে হিন্দুত্বের ভাবনা থেকে মুল্যায়ন করে এসেছে এবং তারা তা করেছে নেহরুর কর্মদক্ষতা, কর্মধারার পাশে প্যাটেলকে বসিয়ে তাঁদের মধ্যে তুলনা টেনে। মোদি সেই পথের পথিক। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদি যে নর্মদা নদীর সাধুবেট দ্বীপে প্রচুর অর্থব্যয়ে প্যাটেলের ১৮২ মিটার উচ্চ (বর্তমানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ) মূর্তি বসাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেটাও হল সংঘ পরিবারের সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। এটা দেখানো যে নেহরু ও তাঁর পরিবার প্যাটেলকে কোনো মর্যাদা দেয়নি। অথচ তাঁদের মতে আধুনিক ভারত গঠনে (পড়ুন হিন্দু ভারত গঠনে) প্যাটেল হলেন আদর্শ পুরুষ। সংঘ পরিবার যেভাবেই ভাবুক, এটা ঘটনা যে স্বাধীন ভারত গঠনে প্যাটেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সেটা করেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই। তথাপি রাষ্ট্র গঠনে তাঁর ভাবনা ও কর্মধারা নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এতে সাম্প্রদায়িক শক্তি রসদ পেয়েছে।

নেহরু-প্যাটেল বিতর্ক

এটা ঠিকই যে দুজনেই ছিলেন কংগ্রেসি। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত উভয়েই কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই একত্রে কাজ করেছেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারে একজন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যজন উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একসাথে কাজ করেছেন। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে রবার্ট ট্রামবল 'New York Times' পত্রিকায় নেহরু-প্যাটেল যুগলবন্দী সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে বোঝাতে চেয়েছেন দু-জনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীলতার ক্ষেত্রে পার্থক্য

থাকলেও কিন্তু সেই পার্থক্যকে অনেকক্ষেত্রে অতিনাটকীয় করে দেখানো হয়েছে। রাজমোহন গন্ধীও তাঁর প্যাটেলের ওপর লেখা বই 'Patel: A Life' (১৯৯০)-এ উল্লেখ করেছেন যে গান্ধী হত্যার পর তাঁরা নিজেদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলিকে সরিয়ে রেখে একসাথে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে গান্ধী হত্যার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে নিষিদ্ধও ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিরোধ চাপা থাকেনি। দু-জনের চিঠিপত্র ও পদক্ষেপেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধী হত্যার কয়েক মাস পূর্বে নেহরু গান্ধীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন—"It is true that there are not only temperamental difference between Sardar and me but also differences in approach with regard to economic and communal matters." নেহরু পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মৃদুলা সারাভাই প্যাটেলের সমালোচনা করলে প্যাটেল তা সহ্য করতে না পেরে ১৯৪৭ সালের ৭ জানুয়ারি গান্ধীকে একটি আবেগজড়িত চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে মৃদুলা ব্যক্তিগত কুৎসায় নেমে এটা প্রচার করছেন তিনি জওহরলাল-এর অধীনে কাজ করতে চান না এবং একটি পৃথক পার্টি গঠন করতে চান। প্যাটেল-কন্যা মনিবেন সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন যে মৃদুলা সারাভাই এবং পদ্মজা নাইডু রফি আহমেদ কিদোয়াই-এর সাথে হাত মিলিয়ে তাঁর পিতাকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছেন, যার ফলে তিনি মানসিক পীড়া পেয়েছিলেন এবং তাঁর স্বার্থের ক্ষতি হয়েছিল।

১৯৪৬ সালেরই ৭ জুলাই পুনরায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার পর ১০ জুলাই নেহরু সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবসমূহের এবং জিন্নার দাবির ওপর যে মতামত দিয়েছিলেন তাতে বিরক্ত হয়ে প্যাটেল (তিনি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবসমূহের পক্ষে ছিলেন) একটি চিঠিতে নেহরু সম্পর্কে ডি পি মিশ্রকে লিখেছিলেন—"...though the President has been elected for the fourth time, he often acts with childlike innocence which puts us in great difficulties quite unexpectedly."

স্বাধীনতা সংগ্রামে নেহরুর ভূমিকাকে প্রশংসা করলেও তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ ও কার্যাবলীকে প্যাটেল অনেক ক্ষেত্রে মানতে পারেন নি। তাই তিনি লিখেছেন—"He has done many things which have caused us great embarrassment. His action in Kashmir, his interference in the Sikh's election to the Constituent Assembly, his press conference immediately after the AICC are all acts of emotional insanity and it puts tremendous strain on us to set matters right." [Dr. P.N. Chopa (ed.) *The Collected Works of Sardar Vallabhbhai Patel*]. প্যাটেল মৌলানা আজাদকে পছন্দ করতেন না, তাঁর মতামতকেও সমর্থন করতেন না এবং তাঁকে চতুর রাজনীতিবিদ (Shrewdest statesman) বলে অভিহিত করতেন।

১৯৫০ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্যাটেল পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনকে সমর্থন করেন। পুরুষোত্তমদাস ছিলেন একজন হিন্দুত্ববাদী যিনি হিন্দু রক্ষা দল গঠন করেন। কিন্তু প্যাটেল এর মধ্যে কোনো দোষের কিছু দেখেন নি। অপর দিকে নেহরু মনে করতেন পুরুষোত্তম ছিলেন সাম্প্রদায়িক। তাই নেহরু প্রতিদ্বন্দ্বী আচার্য জে বি কৃপালনীকে সমর্থন করেন। নির্বাচনে পুরুষোত্তমদাস বিজয়ী হন। কিন্তু তারপর ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে প্যাটেলের মৃত্যু ঘটলে নেহরুর চাপে পুরুষোত্তমদাস পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা

দু-জনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য পুনরায় সামনে নিয়ে আসে।

নেহরু-প্যাটেলের মতপার্থক্যের মূল বিষয়গুলি

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নেহরু গান্ধীর কাছে প্রেরিত পত্রে লিখেছিলেন প্যাটেলের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের মূল বিষয় ছিল দুটি ক্ষেত্রে—১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং ২. সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে। এর সাথে এটা বলা যায় যে রাজনীতিগতভাবেও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। সেই সব বিষয়গুলি আমি আলোচনায় আনতে চাইছি এই কারণে যে এইসব বিষয়ে প্যাটেলের বক্তব্যকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ সমর্থন করে এসেছে এবং এখনও করে চলেছে। মোদির প্যাটেলপ্রীতির কারণও নিহিত আছে এইসব বিষয়ে প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থানকে ঘিরে। তাই অন্য আরও কিছু বিষয়ে প্যাটেলের মননশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনার আগে মূল পার্থক্যের বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

১. ***অর্থনৈতিক বিষয়ে পার্থক্য***

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জনগণের জন্য সামাজিক পরিষেবা ও সহযোগিতা বাড়ানো। তাঁর ভাবনা ও তার বাস্তবায়ন নিয়ে বিতর্ক আছে। তথাপি বলা যায় নেহরু সোভিয়েত পরিকল্পনা কমিশন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা অনেকখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের অবাদী অধিবেশনে তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন যে তাঁর সরকারের অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের (Socialistic pattern)। তাঁর অর্থনৈতিক নীতি ছিল মিশ্র অর্থনৈতিক নীতি যেখানে সরকারি পুঁজি ও ব্যক্তিপুঁজি হাত ধরাধরি করে চলবে এবং মূল ভারি শিল্পগুলি রাষ্ট্রপুঁজি নির্মাণ করবে ও তার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি-পুঁজির কারখানা বিকাশলাভ করবে।

অন্যদিকে প্যাটেল বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে পুরোপুরি পুঁজিবাদী। তিনি সমাজতান্ত্রিক ভাবনার পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন এবং ব্যক্তিপুঁজিকে বিকশিত করার কথা বলতেন। তিনি মনে করতেন পুঁজিবাদকে তার কুৎসিত চেহারা থেকে মুক্ত করা সম্ভব (to be purged of its hideousness)। তিনি ছিলেন একজন দেশীয় গুজরাতি যিনি স্বামীনারায়ণ হিন্দু ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ব্যক্তি-উদ্যোগ ও ব্যক্তি-পুঁজিকে কখনও ঘৃণার চোখে দেখতে চাইতেন না। জি ডি বিড়লার সাথে তাঁর সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। তিনি মার্কসবাদীদের তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং শ্রেণি সংগ্রামকে ঘৃণা করতেন। তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব তিনি পাশ করাতে দেননি।

২. ***রাজনৈতিক মতপার্থক্য***

রাজনীতিগতভাবে পার্থক্যের মূল বিষয় ছিল কাশ্মীর এবং হায়দ্রাবাদকে ঘিরেও, এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়ে। নেহরু কাশ্মীরের প্রশ্নে সরাসরি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার পক্ষপাতী ছিলেন না। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্নে তিনি চাইতেন ভারতভুক্তির সাথে সাথে রাজা হরি সিং সেখ আবদুল্লাকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করুক। তিনি চাইতেন কাশ্মীরে ইসলামিক পরিচিতিও (Islamic Identity) বজায় থাকুক। প্যাটেল এগুলি সমর্থন করতেন না। ভারতে থাকা বা না থাকার বিষয়ে তিনি কাশ্মীরী জনগণের গণভোট (Plebiscite) গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানকে রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে যাওয়ারও তিনি বিরোধী ছিলেন। কাশ্মীরী আদিবাসীদের বিদ্রোহ দমনে তিনি নেহরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্রুত সেনা নামিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন ১৯৪৮ সালের ভারত-পাক যুদ্ধে কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান দখল করতে পেরেছিল তা হল নেহরুর অপরিণামদর্শিতার ফল। তাই তিনি পাকিস্তানের পাওনা ৫৫ কোটি টাকা আটকে দিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে আগে পাকিস্তান কাশ্মীর ও সে-দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগণের প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা করুক তারপর টাকা দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত গান্ধীকে হস্তক্ষেপ করতে হয় সেই টাকা দেওয়ার জন্য। হায়দ্রাবাদের নিজাম যেহেতু মুসলিম ছিলেন তাই নেহরু হায়দ্রাবাদ রাজ্যের রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি পুলিশি হস্তক্ষেপে না গিয়ে আলাপ-আলোচনায় রাজনৈতিক মীমাংসা চাইছিলেন। প্যাটেল তার বিরোধিতা করে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করেন যাতে রাজাকার বাহিনীকে দমন করা যায় এবং হিন্দু জনগণকে রক্ষা করা যায়। পরে হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তি সুনিশ্চিত হয়।

তিব্বতের প্রশ্নে চীনের প্রতি নেহরু কঠোর মনোভাব ও অবস্থান পছন্দ করতেন না। নেহরু মনে করতেন যে তিব্বতের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেখানে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মর্যাদা থাকা দরকার। কিন্তু তার জন্য সেখানকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এবং চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্যাটেল উল্টো মত প্রকাশ করতেন এবং নেহরুর এই দোদুল্যমানতাকে তিনি পত্র লিখে বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেন নি। অপরদিকে নেহরু ছিলেন অনেকটাই আন্তর্জাতিকতাবাদী। ইজরায়েল কর্তৃক প্যালেস্টাইনে দমনপীড়নের জন্য নেহরু ইজরাইলকে স্বীকৃতি দিতে চাননি। প্যাটেল এ বিষয়ে সরাসরি নেহরুর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি জোটনিরপেক্ষ অবস্থানের বিরোধী ছিলেন।

১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্টদের ক্ষমতাদখলকে প্যাটেল মানতে পারেন নি। তিনি মনে করতেন এর ফলে চীন আরও আগ্রাসী হবে এবং ভারতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে। পাশাপাশি এদেশের কমিউনিস্টরা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে (তেলেঙ্গানার লড়াই তখনও চলছে)। নেহরু এই মত পোষণ করতেন না। বিদেশ সচিব ওয়াই ডি গুনদেবিয়া তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন যে কেরলে কমিউনিস্ট সরকার হওয়ায় বিদেশ দপ্তরের অফিসারদের একটি সভায় তিনি যখন তাঁর বক্তব্যে জানতে চান যে আগামী দিনে যদি কমিউনিস্টরা দিল্লির ক্ষমতায় বসে তাহলে সর্বভারতীয় সার্ভিসের অফিসারদের ক্ষেত্রে কী ঘটবে, তখন নেহরু বলেন, কমিউনিস্টরা ভোটে জিতে দিল্লিতে ক্ষমতায় বসবে এটা মনে করছেন কেন? কমিউনিস্টরা যা করতে চায় তা আমরাও করতে পারি। ভারতের কাছে কমিউনিস্টরা বিপদ নয়, বিপদ হল দক্ষিণপন্থী উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি।

৩. ***সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য***

হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান প্রসঙ্গে নেহরুর সাথে প্যাটেলের রাজনীতিগতভাবে সবচেয়ে বড় মতপার্থক্য ছিল। নেহরু মনে করতেন স্বাধীন ভারতে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা হল বড় বিপদ যা ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। সেই কারণে এ দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণকে রক্ষা করা হবে প্রধান কর্তব্য। পাশাপাশি তিনি চাইতেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং হিন্দু মহাসভার মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনসমূহকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে।

অপরদিকে প্যাটেল মনে করতেন যে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ হল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও নির্যাতন। প্যাটেল-কন্যা মনিবেন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু জনগণের ওপর আক্রমণ

তাঁকে সর্বদা ব্যথিত করত। তিনি মনে করতেন এ বিষয়ে ভারত সরকারের অবশ্যই কিছু করণীয় আছে। কিন্তু নেহরু সে বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। তাই পাকিস্তানের সাথে ১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে এটা লেখা হয়েছিল উভয় দেশ নিজ নিজ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে, কিন্তু কোনো দেশ অন্য দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। প্যাটেল এই ধরনের ঘোষণার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সেই মত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদি নির্যাতনের কারণে পূর্ব বাংলার হিন্দুরা চলে আসতে বাধ্য হন তাহলে যেন পাকিস্তানকে চাপ দিয়ে তাদের কাছে তাদের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছেড়ে দেবার দাবি জানানো হয়, যেখানে ওই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। নেহরু সেটা মানেন নি। পাকিস্তান থেকে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপক মাত্রায় উদ্বাস্তু আগমন প্রসঙ্গে প্যাটেল বলতেন নির্যাতনের কারণেই আসতে বাধ্য হচ্ছেন, অপরদিকে নেহরু মনে করতেন যে নির্যাতনই একমাত্র কারণ ছিল না, অন্য কারণগুলি হল সেখানকার অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করতে না চাওয়ার মনস্তত্ত্ব।

উভয়ের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য ছিল স্বাধীন ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে। নেহরু মনে করতেন যে এদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের পুরোপুরি ভারতীয় হিসেবেই দেখতে হবে। অপরদিকে প্যাটেল চাইতেন তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে, কেননা তাদের মধ্যে বহিঃশত্রুরা মিশে আছে কিংবা তাদের মননশীলতায় অন্য উপস্থিতি কাজ করছে। প্যাটেল তাঁর লখনউ বক্তৃতায় মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁককে সাবধান করে বলেছিলেন যে ভারতে বসবাসকারী মুসলিমদের ভারতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ঘোষণাপত্র দিলেই হবে না, সেই ঘোষণাপত্রের সপক্ষে তাদেরকে নির্দিষ্ট প্রমাণপত্র দিতে হবে। নেহরু এর বিরোধিতা করেছিলেন। শেষে গান্ধীকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং মুসলিমদের আনুগত্যকে সন্দেহের চোখে দেখার জন্য তিনি প্যাটেলকে তিরস্কারও করেন। এখানে উল্লেখ্য যে প্যাটেলের ওই লখনউ বক্তৃতা মন দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা কতখানি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে যায়। আরএসএস-এর অন্যতম রূপকার মাধবরাও সদাশিব গোলওয়ালকার ১৯৩৮ সালে লেখা তাঁর গ্রন্থ 'We or Our Nationhood Defined' (বইটিকে বলা হয় আরএসএস-এর বাইবেল) -এ লিখেছেন—''বিধর্মীদের বিশ্বাসের পরিবর্তনের সাথে দেশের প্রতি আবেগ ও আন্তরিকতা বিদায় নিয়েছে। তারা এই দেশের শত্রুদের আপনজন ভাবছে। বিদেশের কোনো জায়গাকে তারা পবিত্রস্থান মনে করে। তাদের শুধু বিশ্বাস নয়, জাতীয় পরিচিতির পরিবর্তন ঘটেছে।'' সেই কারণেই আরএসএস তথা তার রাজনৈতিক দল বিজেপি-র চিন্তাবিদ ও কর্মকর্তারা সংখ্যালঘু মুসলিমদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে বিদেশি শত্রুর এজেন্ট লুকিয়ে আছে বলে প্রচার চালিয়ে গোটা সম্প্রদায়কে নিশানা করেন। সত্য কথা বলতে কি, ভারত ইতিহাস নির্মাণকে সংঘ পরিবার যে দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছে তার দ্বারা প্যাটেল অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সংঘ পরিবারের ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যা হল ভারত যুগযুগ ধরে একটি অখণ্ড ভূমি ছিল এবং তার একটি অখণ্ড সত্তা ছিল (As a territorial entity and as an essence)। আর এই সত্তা ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু এটা হল ইতিহাস-বিকৃতি। প্রকৃত ইতিহাস তা বলে না। কিন্তু প্যাটেল আরএসএস-এর এই ধরনের ভারত নির্মাণ ভাবনার সাথে সবটা না হলেও অনেকাংশে সহমত পোষণ করতেন। তাই আরএসএস-এর প্রতি তিনি কঠোর মনোভাব নিতে চাইতেন না।

অপরদিকে নেহরু প্রথম থেকেই চাইতেন আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে কেননা এরা ফ্যাসিবাদী শক্তি। কিন্তু প্যাটেল সেটা মানতে চাননি। গান্ধী হত্যার পর এক প্রকার চাপে পড়ে তিনি আরএসএস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্যাটেলকে এই বক্রোক্তি শুনতে হয় যে গান্ধীর নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেন নি। এটা নিয়ে বিতর্ক আছে। বিষয়টিতে পরে আরও কিছু আলোকপাত করব। এক্ষেত্রে এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সেই সময়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলদেব সিংহকে প্যাটেল ১৯৪৭ সালের ৭ অক্টোবর পত্র লিখে বলেছিলেন—''The sooner we issue instructions to provincial governments to take action for disarming the Muslim element (in the Special Army Constabulary), the better.'' আর এই পত্র উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে আরও উৎসাহিত করেছিল। দাঙ্গার আগুনও উসকে দিয়েছিল।

□

মোদির প্যাটেলপ্রীতি ও হিন্দুত্ব ভাবনা

স্বাধীনতার পরপরই প্রায় ৫০০ করদ রাজ্যকে (Princely States) ভারতের সাথে জুড়ে ভারতের অখণ্ডতাকে বাড়ানোতে নিঃসন্দেহে প্যাটেলর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেটাকে খাটো না করেও এটা বলা যায় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনাকালে এবং স্বাধীনতার পর যে আড়াই বছর তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন সেই সময়কালে তাঁর কর্মধারার মধ্যে হিন্দু ভাবনা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। তিনি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বাই-এর মেরিন ড্রাইভে চৌপট্টি বিচের পাশে তিনি প্রাণসুকলাল মফতলাল হিন্দু সুইমিং পুল উদ্বোধনে কোনো দ্বিধা করেন নি। সেটা কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য তৈরি হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত মুসলিমদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। নেহরু এই ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন না। কিন্তু প্যাটেল এতে গর্ববোধ করতেন। প্যাটেল নিজেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলতে দ্বিধা করতেন না। স্যর আরচিরল্ড নাই (A. Nye) যিনি মাদ্রাজ প্রদেশের শেষ গর্ভনর ছিলেন তাঁকে ভারতের প্রথম ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯৫১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি (প্যাটেলের মৃত্যুর পর) ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি গোপন রিপোর্ট পাঠান, যেখানে লেখেন—''As an orthodox Hindu he did not disguise his communal syspathies. He had special and secret private arrangements with the RSS leaders...''

এই ভাবনাচিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে নরেন্দ্র মোদিও নিজেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলতে গর্ব বোধ করেন। সংঘ পরিবার এবং তার সেবক মোদি বিলাপ করেন যে গান্ধী প্যাটেলকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দিয়ে সঠিক কাজ করেন নি। কিন্তু মোদি বা সংঘ পরিবার একবারও বলে না যে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যাতে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হতে না পারেন তার জন্য প্যাটেল উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কেননা রাজাগোপালাচারী একজন ধার্মিক হিন্দু হলেও দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁকে প্যাটেল মনে করতেন হিন্দু হয়ে 'হাফ মুসলিম'। তাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তাঁরই মতো হিন্দুত্ব ভাবনা সমর্থনকারী

নেহরু-সি. রাজাগোপালাচারী-প্যাটেল

রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্থির করেন। সর্বপল্লী গোপাল তাঁর নেহরুর ওপর লেখা জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—নেহরু পত্র লিখে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অনুরোধ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী না হতে। কিন্তু প্যাটেলের পরামর্শে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর প্যাটেল রাজেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে প্রচার করেন এবং কংগ্রেস কমিটির সমর্থন লাভ করেন। বাধ্য হয়ে নেহরুকে পিছিয়ে আসতে হয় এবং তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মেনে নিতে বাধ্য হন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি হয়ে বিধিবদ্ধ ক্ষমতার বাইরেও হস্তক্ষেপ শুরু করলে প্রধানমন্ত্রী তা নিবৃত্ত করতে বাধ্য হন। গ্রানভাইল অস্টিন সঠিকভাবেই তাঁর পুস্তক 'The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation' [OUP]-এ লিখেছেন—"President Rajendra Prasad on several occasions attributed to his office enormously greater power than those given by the Constitution."

আরএসএস এবং তার রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি এটা প্রচার করে যে নেহরু নয়, প্যাটেল ছিলেন বলেই বর্তমান অখণ্ড ভারত গড়া গেছে। তিনি ৫০০-র বেশি করদ রাজ্যকে ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই ভূমিকাকে নিশ্চয়ই মান্যতা দিতে হবে। কিন্তু অন্যদের ভূমিকাকে খাটো করা যাবে না। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এ জি নুরানি তাঁর একটি লেখায় এ নিয়ে বিস্তারিত চর্চা করেছেন। করদ রাজ্যগুলির এই ভারতভুক্তি সম্পর্কে তাঁর *White Paper on Indian States*-এ প্যাটেল-এর কৌশলগত পদক্ষেপগুলির সমর্থনে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সেই সময়ের মন্ত্রিপরিষদের সচিব ভি পি মেনন তাঁর 'Integration of the Indian States' গ্রন্থে যে তথ্য তুলে ধরেছেন এবং এ নিয়ে এইচ ডি হাডসন তাঁর পুস্তক 'The Great Divide'-এ যা আলোকপাত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। মনে রাখতে হবে দুইটি পর্যায়ে এই ভারতভুক্তি হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ভারতভুক্তি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে Part-B States হিসাবে তাদের পুনর্গঠন ও অন্তর্ভুক্তিকরণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্যাটেলের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্রে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ও ভি পি মেনন-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্যাটেল চেয়েছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে গেলে ওইসব করদ রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করবে এবং তখন তিনি সামরিক হস্তক্ষেপ করবেন। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন এতে রক্তক্ষয় হবে, তার চেয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করাটা ভালো হবে। সেক্ষেত্রে রাজন্যবর্গকে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। ভি পি মেনন বাস্তবতার নিরিখে তা মেনে নেবার জন্য প্যাটেলকে পরামর্শ দেন। প্যাটেল তখন দাবি করেন যে তিনি ছোটো-বড় ৫৬৫টি Princely States-কেই চান (full basket of apples)। মাউন্টব্যাটেন এবং মেনন নেহরুর সাথে আলোচনা করেন। নেহরুর সাথে পরামর্শ করে তাঁরা তখন প্যাটেলকে বোঝান যে অন্তত ৪-৫টা ছাড় দিতেই হবে, নাহলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। প্যাটেল তখন সেটা মেনে নেন। তাই ওই রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির প্রশ্নে অন্যদের ভূমিকাকে ছোটো করা যাবে না—বিশেষ করে নেহরু, মাউন্টব্যাটেন ও মেননের ভূমিকা।

গান্ধী হত্যা

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গান্ধীর নিরাপত্তা রক্ষা ও হত্যা নিয়ে নানা বিতর্ক এসেছিল। এ নিয়ে অনুসন্ধান কমিটিও হয়েছিল। সেই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন প্যাটেল। তাই এ প্রশ্ন উঠেছিল যে তিনি যদি এ বিষয়ে পূর্বেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন তাহলে হয়তো গান্ধীহত্যা আটকানো যেত। সেই সময় এই প্রশ্ন তুলেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ সহ আরও কেউ কেউ। বিচারপতি জে এল কাপুর-এ রিপোর্টের (Report on the Commission of Inquiry into the Conspiracy to Murder Mahatma Gandhi) ১৬২ পাতায় উল্লেখ আছে যে জেপি বলেছিলেন, যদি কংগ্রেসি মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবককে মদত না দিতেন কিংবা তাদের অনুষ্ঠানে হাজির না থাকতেন তাহলে এই সাম্প্রদায়িক সংগঠন উৎসাহিত হত না এবং গান্ধীহত্যা ঘটত না। তাঁর মতে প্রার্থনাসভার সময় গান্ধীকে লক্ষ করে বোমা ছোঁড়ার পর যদি প্রশাসন ঠিকমতো ব্যবস্থা নিত তাহলে ১০ দিন পর গান্ধীহত্যাকাণ্ড ঘটত না। প্রসঙ্গত, ছয় বার গান্ধীর ওপর আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি *Bombay Chronicle* জে.পি-র মন্তব্য উদ্ধৃত করে লিখল যে, তিনি চেয়েছিলেন এমন একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে মুক্ত।

ঠিক কী ঘটেছিল? অনেকেই আমরা তা জানি। ১৯৪৮ সালের ২০ জানুয়ারি গান্ধীকে লক্ষ করে তাঁর প্রার্থনাসভায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। মদনলাল ধরা পড়ে এবং ৫৪ পাতার স্বীকারোক্তি দিয়ে জানায় সে একা নয়, অন্যরা ছিল (one of a group of killers) এবং তারা প্রত্যেকেই ঘটনার পূর্বে সাভারকারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রসঙ্গত এই সাভারকার হলেন নরেন্দ্র মোদির আদর্শ পুরুষ। Lary Collins এবং Dominique Lapierre তাঁদের

'Freedom at Midnight' (১৯৭৬) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন পুলিশ জানতে পারে কারা কারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং পুলিশ যদি তৎপর হত তাহলে পূর্বেই নাথুরাম গডসেকে ধরতে পারত। তাহলে সাভারকারের এই ভাবশিষ্যের হাতে ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ গান্ধীকে প্রাণ হারাতে হত না। হতার পর সাভারকারের কথা সামনে এলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। প্যাটেল সেটা চাননি। অথচ প্যাটেল নেহরুকে বলেছিলেন যে, গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রের তদন্তের বিষয়ে তিনি দৈনন্দিন খোঁজখবর রাখছেন। অথচ আর এস এস ও হিন্দু মহাসভা এবং তাঁর প্রাণপুরুষ সাভারকারের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে কোনো খবরই পেলেন না। আর এই প্যাটেলই ১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারি গান্ধী হত্যার ২৪ দিন আগে আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শ্রীনগরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটলে সেই সময়ের জনসংঘ ও সংঘ পরিবার নেহরু ও আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তুলেছিল। অথচ গান্ধীর নিরাপত্তা ও হত্যা নিয়ে বিতর্কে এরা নীরব ছিল। বলা যায় যে এদের মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক শক্তি গান্ধীহত্যার তিন দিন আগে দিল্লির কনট প্লেসে প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিলেন যে গান্ধীকে সরতে হবে যদি তিনি হিন্দু-মুসমিল ঐক্যের পক্ষে প্রচার করেন।

আর এস এস ও হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে প্যাটেল

মোদির প্যাটেল-প্রীতির বড় কারণ হল আর এস এস ও হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি। প্যাটেল চেয়েছিলেন এই দুই সংগঠনের লোকেরা কংগ্রেসে যোগদান করুক, যাতে তাঁর ক্ষমতা আরও বাড়ে এবং নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বাতাবরণকে ভেঙে ফেলা যায়। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ প্যাটেলের বক্তৃতার যে সংকলন প্রকাশ করেছে সেখানে ৬৪-৬৯ পাতায় তাঁর বক্তব্য দেখলেই তা স্পষ্ট হবে। তিনি সরাসরি বলেছেন—''I invite the RSS to join the Congress and not to weaken administration by creating unrest in the country... I appeal to RSS to use their wisdom and work judiciously... I appeal to the Hindu Mahasabhaites to join the Congress." এই দুটি সংগঠন সম্পর্কে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাই নেহরুর প্রতি বক্রোক্তি করে প্যাটেল লিখেছেন—''In the Congress those who are in power feel that by virtue of authority they will be able to crush the RSS. By danda you cannot suppress an organization. Moreover, danda is meant for thieves and dakus. After all RSS men are not thieves and dacoits. They are Patriots. They love their country. Only their trend of thought is diverted." গান্ধী হত্যার পর তিনি এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কেননা বৃহৎ জনমত এই সংগঠনগুলিকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। প্যাটেলও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—''There is no doubt in my mind that the extreme section of the Hindu Mahasabha was involved in the conspiracy. The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of the government and state.'' (Sardar Patel's correspondence, p. 323)

অথচ তিনিই আবার ১৯৪৯ সালের ১০ নভেম্বর নেহরু যখন বিদেশে ছিলেন তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রভাব খাটিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব পাশ করালেন যাতে আর এস এস সদস্যরা কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে। আরএসএস সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল Walter Anderson এবং Shridhar Damle কর্তৃক লিখিত 'The Brotherhood in Saffron' (১৯৮৭) এঁরা লিখেছেন যে প্যাটেল আরএসএস-এর প্রাণপুরুষ গোলওয়ালকারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন যাতে তিনি কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা হরি সিংহকে ভারতভুক্তির ব্যাপারে বোঝান। প্যাটেল মনে করতেন কাশ্মীর হল একটি 'Hindu State, situated in Muslim surroundings'। ওখানকার ব্যাপক মুসলিম জনগণকে তিনি রাজ্যের অংশ বলে মনে করতেন না এবং কাশ্মীরকে বারবার বর্ণনা করতেন হিন্দু রাজ্য হিসেবে। হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রেও, যখন সেখানে মুসলিমদের ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়েছিল তখন পণ্ডিত সুন্দরলাল যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্টকে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কে এম মুনসিকে হায়দ্রাবাদ পাঠান ভারতের 'এজেন্ট জেনারেল' করে।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে অবস্থান সম্পর্কে

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সেই সময় ঘটে চলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলির ক্ষেত্রে (অগস্ট ১৯৪৬ কলকাতা দাঙ্গা, ১৯৪৬ অক্টোবরে নোয়াখালি দাঙ্গা, অক্টোবর ১৯৪৬-এ বিহার দাঙ্গা) প্যাটেল হিন্দু ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। বিহার দাঙ্গার ক্ষেত্রে পুলিশ যখন দাঙ্গাকারী হিন্দুদের ধরপাকড় শুরু করে, তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন প্রশাসন মুসলিমদের পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দুদের লাঞ্ছনা করছে। তিনি চেয়েছিলেন যে-সব মুসলিম আতঙ্কে দিল্লি ছেড়ে পাকিস্তান চলে গিয়েছিল তারা যেন আর ফিরে না আসে এবং যারা রয়ে গেল তারাও চলে যাক। দুর্গাদাস সম্পাদিত 'Sardar Patel's Correspondence' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তিনি ১৯৪৮ সালের ৪ মে থেকে নেহরুকে এই বলে পত্র লিখে সতর্ক করেছিলেন যে, পাকিস্তান থেকে মুসলিমদের ফিরে আসা বন্ধ করা না গেলে শুধু শরণার্থী নয়, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তৈরি হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, মুসলিমরা দিল্লি ছেড়ে চলে না গেলে পশ্চিম থেকে যে অ-মুসলিম শরণার্থী আসছে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমনকি জনগণের অভিমত বলে তিনি ১৯৪৭ সালে ২ নভেম্বর নেহরুকে লিখলেন— ''People are openly clamouning as to why Muslims are allowed to go about in peace openly in the streets of Delhi and other towns." নেহরু উত্তরে বলেছিলেন যে আমরা সকলে ইতোমধ্যে দু-তিন মাস আগে বসে সিদ্ধান্ত করেছি যে দিল্লি শহরের যেগুলি মূলত মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকা ছিল সেগুলি মুসলিমদের জন্যই সংরক্ষিত রাখা হবে। যখন পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর শরণার্থী ভারতে আসতে শুরু করল তখন ১৯৫০ সালের অক্টোবরে তিনি নেহরুকে লিখলেন, পাকিস্তানকে এটা জানানো হোক যে যদি এত শরণার্থী আসে তাহলে সমসংখ্যক মুসলিমকে পশ্চিমবাংলা থেকে পূর্ববঙ্গে (পাকিস্তানে) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নেহরু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন যে এই ধরনের ভাবনা দেশের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর কেননা এটা আমাদের ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানকে ধ্বংস করবে। আর আমরা কোনো হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করতে চাইছি না।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের নেহরু গোপন নোট পাঠিয়ে বললেন, আমরা মুসলিমদের তাড়িয়ে দিতে চাই না, বরং তাদেরকে ভারত রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দিয়ে রাখতে চাই। তিনি লিখলেন, ''If Hindus think in terms of domination, cultural or otherwise, over-

others, this would not only be against our own respected professions, but would naturally displease other and smaller minorities in India'' [S. Gopal and Uma Iyengar, *The Essential Writings of Nehru*, OUP, 2003]" এইসব থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় কেন সংঘ পরিবার নেহরুকে ঘৃণা করতে এবং প্যাটেলকে পূজা করতে শেখায়।

মোদির অবস্থান

সংঘ পরিবারের একনিষ্ঠ সেবক এবং প্রচারক হলেন মোদি। প্যাটেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি নিজেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বলতে বেশি গর্ব বোধ করেন। ২০০৭ সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি মাঙ্গালোরে মোহন ভাগবতের উপস্থিতিতে আরএসএস-এর একটি সভাতে বলেছিলেন, ''The nation and Hindus are one. Only if Hindus develop will the nation develop. Unity of Hindus will strengthen the nation.'' (August 11, 2007) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে বিজেপি যখন সামনে আনতে চাইছে তখনও তিনি প্যাটেলের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ''I am a Hindu Nationalist. So, yes, you can say I'm a Hindu nationalist because I'm a born Hindu'' *Indian Express*, July 17, 2013 সুতরাং মোদির প্যাটেলপ্রীতি হল মূলত তাঁর হিন্দুভাবনার প্রতিফলন, যার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের হিন্দুত্বের আদর্শকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তিনি মাঙ্গালোরে আরএসএস সভায় গর্ব করে বলেছিলেন, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত করতে চান হিন্দু সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। আর সেই লক্ষ্য পূরণে প্যাটেলই হলেন তাঁর প্রেরণা—যিনি আদর্শ ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। অবশ্য এর মানে এটা বলতে চাইছি না যে তিনি বা সংঘ পবিার গোলওয়ালকার কিংবা সাভারকার অপেক্ষা প্যাটেলকে তাদের আদর্শ পুরুষ হিসেবে দেখেন। গোলওয়ালকার ও সাভারকার—এঁরা দুজনেই হিন্দুত্বের ভাবনাকে আদর্শগত ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই ভাবনারই উত্তরসূরী হলেন নরেন্দ্র মোদি। সংঘ পরিবারের আদর্শে লালিত পালিত মোদি সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তারই মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন প্যাটেলের কাজকর্মের মধ্যে। প্যাটেলকে মূলধন করে মোদি ও সংঘ পরিবার তাদের দেশপ্রেমকে প্রচারে আনতে চাইছেন। তাই তিনি বলেছেন, প্যাটেল প্রধানমন্ত্রী হলে ভারত ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হত।

আমরা যদি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মোদি সরকারের পদক্ষেপগুলিকে বিচার করি তাহলে এর কারণ বুঝতে পারব। গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি হিন্দু ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই রাজ্য চালিয়েছেন। গুজরাতকে হিন্দুত্বের ল্যাবরেটরি বানিয়েছিলেন এবং ২০০২ সালের সংগঠিত দাঙ্গাতে রাষ্ট্র কর্তৃক মদত দান করেছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে গুজরাত মডেলের প্রচার করেন তা হল কর্পোরেটদের মদত দানের মডেল।

এখন মোদি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর তখ্‌তে আসীন। গত এক বছরেরও বেশি সময় তাঁর কাজের মূল্যায়ন যদি করি তাহলে দেখব কীভাবে এই এক বছরে সাম্প্রদায়িক শক্তি আরএসএস ও তার শাখা সংগঠনগুলি মাথা চাড়া দিয়েছে। আরএসএস-এর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দ্য অর্গানাইজার' ঘোষণা করেছে গত এক বছরে ভারতে হিন্দু ভাবনার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। মোহন ভাগবত বলেছেন, ৮০০ বছর পর আবার হিন্দু রাজ্য ফিরে এসেছে। ওই পত্রিকা লিখেছে যে জাতীয় স্তরে সত্যিকারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি ঘটেছে মনস্তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগতভাবে। প্রকৃত অর্থে গত এক বছরে বিজেপি সরকার কী কেন্দ্রে, কী রাজ্যে আরএসএস কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার দিকে এগিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দুত্ব মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে ও হচ্ছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের মদত দেওয়া চলছে। রাষ্ট্রীয় পুঁজির কারখানাগুলিকে খতম করে বৃহৎ ব্যক্তিপুঁজির কারখানাকে নানা উৎসাহদান করা হচ্ছে। শ্রম আইনকে শিথিল করা হচ্ছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি ভারতকে ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী করে তুলেছেন। জোট-নিরপেক্ষতার অবস্থানকে বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালি আরও বাড়িয়েছেন। মার্কিন প্রভু এবং এদেশে তাদের সাকরেদ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করতে একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। এই কাজে রাজ্যের একটি দলকে বর্তমানে দোসর হিসেবে সাথেও পেয়েছেন। এই কাজে যাতে জনরোষ তাঁর বিরুদ্ধে না যায় তাই সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে জনগণের মধ্যে বিভেদ বিভাজনের রাজনীতি করছেন। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছেন। কেননা তাঁর এই অবস্থান সংখ্যালঘু মৌলবাদীদের জোট বাঁধতে উৎসাহিত করছে।

With best compliments of

ALLIED ELECTRICALS & SWITCH FUSES

[An ISO 9001:2008 Certified Company]

ENGINEERS MANUFACTUERS FABRICATORS

LT SWITCHGEAR • CONTROL PANEL • STEEL FABRICATED ITEM

Office
62/1A, Netaji Subhas Road
2nd Floor, Room No. 16
Kolkata-700 001

Works
Baidyapur, Burdwan
West Bengal
Ph. (03454) 245234, 245108

Fax : 033-226895586, E-mail : allied1963@yahoo.co.in, Visit us at : www.alliedswitchgears.com

Sl. No. 134

With best compliments of

R I T U S H R E E

...for perfect colour printing at affordable price

54/1, Kachari Road, Burdwan
Ph : 0342-3290718

Sl. No. 129

মুঠোয় পতাকা হয়ে যায় বাঘছাল

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

যে পথে চলেছো সে পথ নয়কো ঠিক
ভুল লণ্ঠনে যায় না কিছুই চেনা
রহস্যময় মনে হয় চারদিক
জীবন নয় কো সস্তা মূল্যে কেনা।

দু-চোখে স্বপ্ন হীরের মশাল জ্বালে
অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
হাওয়া খেলা করে ভাঙা নৌকার পালে
দাঁড় টেনে যাও গুটিয়ে নিয়ো না হাত।

কদিন থাকবে শুধু আলেয়ার খেলা
নির্ভুল পথ ছিঁড়ে কুয়াশার জাল
জলে ভেসে যায় আজ আগুনের ঢেলা
মুঠোয় পতাকা হয়ে যায় বাঘছাল
কারা হাতে দিল রঙিন ইস্তাহার
বাঘের দুচোখ ছিঁড়ে সাঁটে পোস্টার।

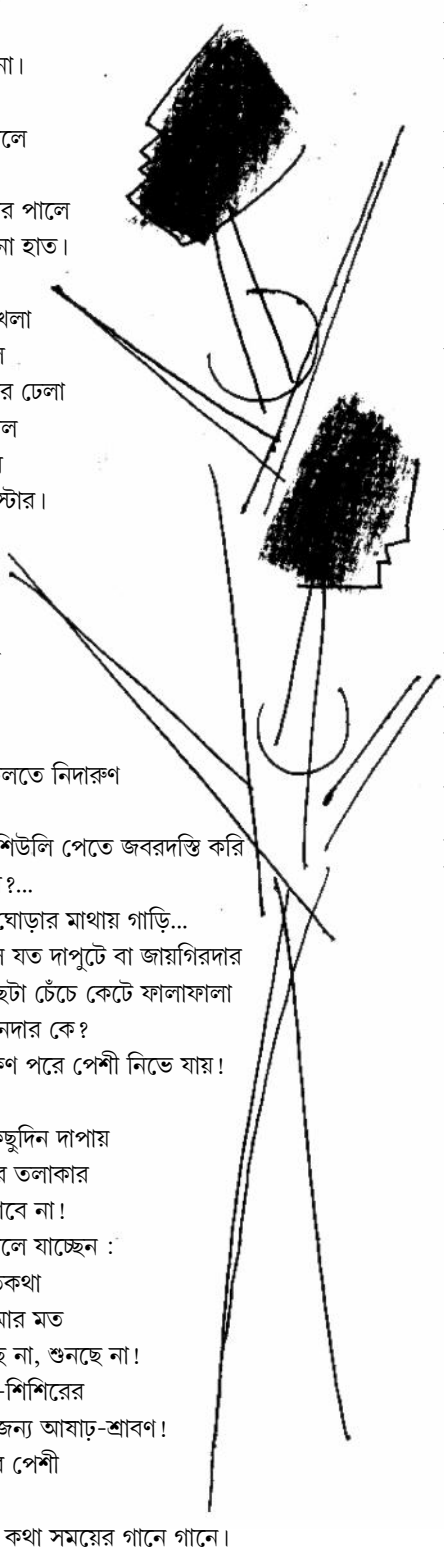

নিয়মের হাতে হাত রেখে

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

অনেক সময় সংসারে চলতে-চলতে নিদারুণ
ভুল হয়ে যায়...
কঠোর কঠিন গ্রীষ্মের সকালে শিউলি পেতে জবরদস্তি করি
কোথায় শিউলি কোথায় শিশির?...
ঘোড়ার পিছনে গাড়ির বদলে ঘোড়ার মাথায় গাড়ি...
ঘোড়া বেচারা কী করে? তা সে যত দাপুটে বা জায়গিরদার
হোক না কেন সমগ্র খেজুর গাছটা চেঁচে কেটে ফালাফালা
করলেও বৈশাখে রসের যোগানদার কে?
পেশী-ফুলিয়ে হম্বিতম্বি; কিছুক্ষণ পরে পেশী নিভে যায়!

ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতা কিছুদিন দাপায়
মাটি কিঞ্চিৎ ডেবে যায়; আবার তলাকার
রক্তে মাটি ভেজে, কিছু করা যাবে না!
তিনি পেল্লায় মাইক লাগিয়ে, বলে যাচ্ছেন :
আমি যা বলছি শুনুন! যেন ব্রতকথা
ধান-দুব্বো হাতে আমরা... আমার মত
সবার তাই মত! কেউ তাকাচ্ছে না, শুনছে না!
নানা প্রশ্ন এসে বিঁধছে, শিউলি-শিশিরের
জন্য ঘোরতর শীত; ইলিশের জন্য আষাঢ়-শ্রাবণ!
ঘোড়ার সামনে গাড়ি! মাইকের পেশী
নিস্তেজ হয়ে আসে;
কোলাহল তো বারণ হল এমন কথা সময়ের গানে গানে।

সেই দুর্গাপুর

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

মিথ্যা তো অমর নয় কালের নিগড়ে
ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে, অচিরে হারায়
আস্থা বাড়ে প্রতিদিন ব্যাকুল অঞ্চলে
সতর্কেই ঘোরাফেরা বিষণ্ণ পাড়ায়।

আরো আলো আসে ঘরে দিন-দিন বাড়ে
চলাফেরা ইতিউতি আশঙ্কা স্তিমিত
চায়ের দোকানে বসে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে
কেউ নয় আজ আর তেমনটা ভীত।

এবার ঘোরার দিন এসে গেছে আজ
ঘুরেই দাঁড়াতে হবে সমস্ত অঞ্চলে
খুনীরা ভয়েই থাকে জানে অপরাধ
কোথাও নিস্তার নেই মৃত্যু পলে-পলে।

ঐ দেখ আবার জাগে সেই দুর্গাপুর
বিজয় মিছিলে ওঠে তার দীপ্ত সুর।

'সেই দুর্গাপুর' বলার মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে। তা হচ্ছে লড়াই সংগ্রামের। উল্লেখযোগ্য শুরুটা হয় ১৯৬৬-র ৫ আগস্ট। দাবি ছিল সি.ই.ডি-র ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের ও বোনাসের। এই আন্দোলন করতে গিয়ে বহু শ্রমিক-কর্মচারী আহত হয়। শহিদ হয় দু-জন। প্রথম জনের নাম কমরেড জব্বর। দ্বিতীয় জনের নাম কমরেড আশিস দাশগুপ্ত। এরপর ধর্মঘট শুরু। ধর্মঘট চলে ন-দিন ধরে। অতঃপর সাফল্য আসে। সে সাফল্য ছিল অশ্রু ও আনন্দের।
গান্ধীমোড়ে মহা সমাবেশ। জড়ো হয়েছে বহু মানুষ। সেই প্রতিবাদী সমাবেশের ছবি প্রকাশিত হয় গণশক্তি পত্রিকায়। সেই ছবি দেখে উৎসাহিত হয়ে লেখা হয় এই কবিতাটি; তারিখ : ৮ জুলাই, ২০১৫

বিষণ্ণ প্রবাস ছেড়ে

জিয়াদ আলী

আমাদের হয় তো-বা ফুরায়ে গিয়েছে সব কথা
রাতের জ্যোৎস্না যেন বারান্দায় খুব ম্রিয়মান
অহল্যার মতো তুমি হয়ে আছো নিশ্চল প্রতিমা
মেঘের ভিতরে বৃষ্টি শুধু শুধু করে আনচান।

ভালোবাসা ফিরে গেছে দরজায় ঝোলানো তালা দেখে
প্রকৃতি অনেক দিন উষ্ণায়নে বৃষ্টিহীন হলে
এভাবেই চাতকেরও ক্রমশ নৈরাশ্য বেড়ে যায়
বিষণ্ণ প্রবাস ছেড়ে আমিও এবার যাবো চলে।

অনেক সমুদ্র আর পাহাড় পেরিয়ে চলে যাবো
যাবতীয় গোছগাছ পুরাতন স্মৃতি দিয়ে দু-হাতে জড়াবো।

নারাজ

শ্রীজাত

রাস্তা তাদের বন্ধু ছিল ভালই
মিছিল নিয়ে বেরিয়েছিল যারা
আজ তাহলে ভাবতে হবে কেন
রাস্তা কেবল তোমার কাছেই নারাজ।

নিশান হাতে যে কোনও লোক হাঁটে
নিশানা কার, সেটাই ছিল কথা
জানতে তুমি, তির ছোটাতে পারো
তবুও তোমার সহায় নীরবতা।

চুপ থাকারও অনেক মানে হয়।
যখন ছিল দাঁড়িয়ে কথা বলার—
ভয়ের কাছে হার মানলে জেনো
হাঁটাই হবে। হবে না পথ চলা।

কে জানে কোন দিগন্তে হারালো
দিনের শেষে আর ফেরেনি তারা...
আজ তাহলে ভাবতে হবে কেন
রাস্তা কেবল তোমার কাছেই নারাজ।

পিগমিরা লিখছে

অংশুমান কর

লম্বা মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই
লম্বা হতে চায় যে সব মানুষ
আমরা তাদের ইচ্ছেকে সম্মান করি
কিন্তু আমরা লম্বা হতে চাই না
শুধু বাড়তে চাই সংখ্যায়
ছড়িয়ে পড়তে চাই মাঠে-প্রান্তরে, গ্রামে নগরে,
পাহাড়ে-বন্দরে
আর ফড়িং-ঘাস-পিঁপড়েদের বলতে চাই
আমরাও মানুষ, বিশ্বাস করো
সব মানুষের হাতই ইয়াব্বড় বড় থাবা নয়
সব মানুষের পা-ই নয় পর্বতের সাইজের এক-একটা
বুলডোজার
বিশ্বাস করো
আমরাও মানুষ
মানুষ মাত্রই এক একজন দৈত্য নয়!

চাঁদ দেখবার বন্ধু

পিনাকী ঠাকুর

ঘর বাঁধা হল না যাদের, যারা শুধু
চাঁদ দেখবার বন্ধু
সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট কাটতে কাটতে
চিনে বাদামের খোসা ভেঙে
মানুষের জঙ্গলে নির্জনতা খুঁজে
যাদের যৌবন ধূসর হয়ে এল
তাদের জন্য আজ আনন্দের খবর—
পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে অ্যাস্ট্রয়েড!

কেন

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসি বলে
বিষাদ অশ্রুতে ধুয়ে যায় মলিনতা,
আঁধারে পূর্ণিমা হাসে।

ভালোবাসি বলে চোখে পড়ে
তাহাদের কিশোরী দু-চোখে
লোনাজল ঝরা অবিরল...
তবু ভোরবেলা
শিশিরেই স্নান করে ঝরা ফুল
মাটিকে অঞ্জলি দেয়।
ভালোবাসি বলে তবুও আবার
ঘুম ভাঙাবার গান গাই।

আমাদের নিভৃত দিন,
আমাদের একান্ত রাত
কাটে—
ভালোবাসি বলে
ঝরে যাওয়া শীর্ণ পাতাও
বড়ো যত্নে বুকেতে জড়াই।

ভালোবাসি বসে
চোখের নদীতে অবিরল
জল ঝরলেও
হাসিমুখে দু-হাত বাড়াই।

কবির গল্প

পার্থ রাহা

আকাশের দিকে দেমাকে ঘাড় উঁচু
ময়দানবের বানানো স্কাইস্ক্র্যাপারের চূড়ো
ময়দানের ওপারে
আর এপার জুড়ে
বাদামের খোলার ভেতর জমাট হৃদয়
খুঁজতে খুঁজতে
মনে হল
তার মাথায় ছায়া দেবার মত
এখনো তেমন কোনো আশ্রয় নেই।

ঘাসের জাজিম মাড়িয়ে সুখী বোকা মানুষটা
'ডল পুতুল' মেয়েটার পাশে
পাঁচু ছোনেদের মত ঠোঁটের দুপাশে
দু আঙুলে
বাঁশি বাজাতে গিয়ে
তার মনে হল
এমন সুখী সুখী সময়
আর নিবিড় বসার মতন
এখনো তেমন কোনো সঙ্গিনী নেই

এখন কেউ আর কথা বলে না
কথার বিস্বাদ ফেনায় ডুবে থাকে
কমপিউটারে, পি.সি. স্ক্রিনে কবিতার শব্দ
বানাতে বানাতে
মনে হল তার
বহুদিন হয়ে গেল
এখনো তেমন কোনো কবিতা লেখেনি

কেন সে লিখবে?
বুকভরা অক্সিজেন নেওয়া বাতাস
চারিদিকে জোনাকির আলো নেই
প্রতিবাদের বিদ্যুৎ নেই ভেবে
ভেবো না সে নেই
সে, অর্থাৎ সেই কবির
ঘাসের জাজিমে
নকসা আঁকা কাঁথার মতন
লাল আর হলুদ পলাশ নিয়ে
নাড়াচাড়া
নাড়াচাড়া
করতে করতে
মনে হল তার
এই তো সময়
একবার তার ডাক পেলেই সাড়া দেবে
আজ কাল পরশুর হাজার জনতা।

জিজ্ঞাসা

অরবিন্দ সরকার

আমাদের ইচ্ছা ভালো থাকি
ফসল ফলাই
গান গাই
অথচ প্রতি মুহূর্তে দাহবৃক্ষের ডালপালায়
ঘর বাঁধি।

অমরা সকলে আছি
কিন্তু তুব কেন প্রস্থানে
উন্মেষণ?

পরাবাস্তব এবং হৃদয়তান্ত্রিক পদ্য

বিদ্যুৎ ভৌমিক

ক.
চোখের কাছে অচেনা সর্বনাশ
ভেতর থেকে দৃশ্যের বিচ্ছেদ
মনের মধ্যে যন্ত্রণার অলি-গলি
নামহীন যত কান্নার নির্দেশ!
এখন থেকে অন্তরে তুমি থাক; কিংবা অতলে হৃদয় মেলে রাখ
এই বেলা যদি স্পর্শে ওঠো কেঁপে, আকাশ থেকে বৃষ্টি আসুক ঝেপে
গভীরের সুখ সময়ের পথ ধরে
চলতে-চলতে কোন অতলান্ত ভোরে
স্বপ্নের কথা নিজেকে বলতে-বলতে ঘুম ভেঙে যায় নিজের অজান্তে!

খ.
কোথায় যেন পুড়ছে অচেনা স্মৃতি
মিথ্যে-মিথ্যে বিষণ্ণ দুটি চোখ
কোথায় যেন নামহীন পৃথিবীতে
ভরে আছে যত মৃত্যুর প্রতিশোধ!
হঠাৎ যদি ফুল-পাখি-চাঁদ দেখে; সময়ের সাথে একা-একা পথ চলি
কবিতার কাছে আশ্রয় খুঁজে নিয়ে তিন প্রহরের যন্ত্রণা তাকে বলি!
এসব কথা আত্মায় ঘোরে-ফেরে; তবুও কেন মন বোঝে না তাকে,
চতুর্দিকের অগণন স্মৃতিগুলো আদিগন্ত ভালোবাসা হয়ে থাকে।

গ.
চলে যাব বলে চোখ ভিজে আসে জলে
চুপচাপ শুধু নীরবতা নিয়ে থাকি
চেনা-অচেনায় অনেকেই কাছে থাকে
মৃত্যুর পাখি করে যায় ডাকাডাকি!
নতুন করে আসব আবার ফিরে; ডাকবে কাছে নতুন নামে যখন
সেই পুরাতন স্মৃতির ফাঁকে-ফাঁকে আগের আমিকে
পড়বে কি মনে তখন?

সময়

মলয় রায়

মাঠে মাঠে সমস্ত যুবতী ধানশিষ
পথ ছোটে আলপথে।
সময়ের ধারাপাত মুখস্থ করে
অজস্র শিশু। কণ্ঠে কলকল।

শিকড় প্রত্যাশী পাখিদের পেটে
প্রহর গোনে রাঙা বটফল।

বুকের আগুনে ফোটে শপথ
সৈনিকের পোষাক পরে নেয়
আমার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ।

খুন্তিতে ভাত তুলে
চেনা হাতে মা টিপছে
ভাতের বয়স।

'সে' যখন ছিল

(প্রথিতযশা অধ্যাপক-সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় ঘোষের প্রয়াণে)

মিলনেন্দু জানা

'সে' যখন ছিল—
তখন মনে হত সবই ঠিক—সবই জীবন্ত—
চলছে সবই ঠিকঠাক—থাকবেও দীর্ঘ তাঁর ছায়া;
আজ 'সে' নেই—
মনে হয় মিথ্যে সবই,
মিথ্যে 'দরজা' খোলার শব্দও।

'সে' যখন ছিল—
তখন একঝাঁক রোদ লুফে
কত সহজেই রাত ভেঙে দাঁড় করানো যেত
ভোরের সূর্য!
তখন, বাঁশি বাজলে মনে হত
এখনই শিউলির ডাল ভরবে কানায় কানায়—
কিন্তু, আজ?
'সে' নেই—
তাই অতি সহজেই আর মাতায় না বাঁশি,
বৃষ্টির শব্দে
গানও জমায় না দেদার উঠোন!
দরজায় টোকা দিলে
একবুক হাসি এসে বলে না : এসো!
'সে' যখন ছিল—
তখন মনে হত, সবই স্নিগ্ধ—সবই সঙ্গীত—;
আজ 'সে' নেই
মনে হয়, সবই ভারি, সবই দীর্ঘতর—
জটিল প্রশ্নে সাঁটা পাঞ্জাবিও।

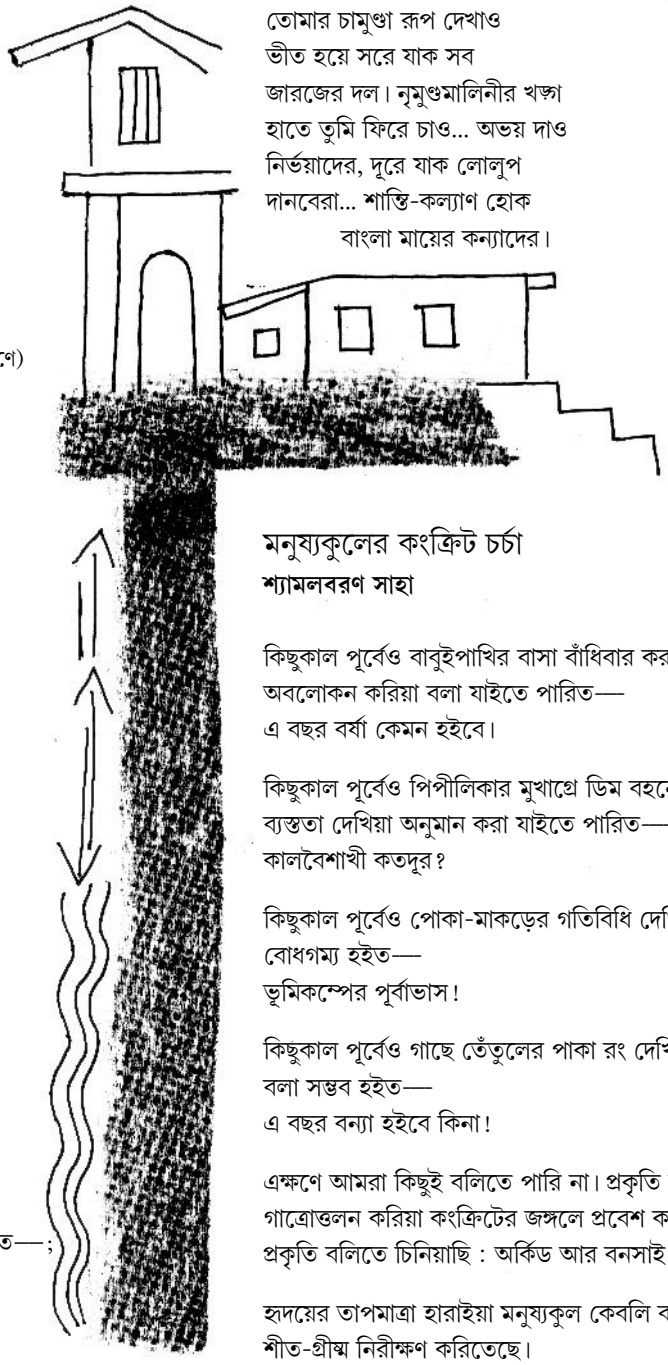

নির্ভয়া

সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়)

রক্তের নদীতে স্নান করে ধর্ষক শুদ্ধ
হতে চায়... আর কত রক্ত বইবে তুমি
নদী! একে একে বিসর্জন হয় তোমার
বুকে, একজন যায় তরঙ্গ ওঠে
তরঙ্গ পড়েও যায় কিছুদিন পর...
তুমি আর কত ধর্ষিতার কান্না শুনবে
বাংলা মা! একবার ঘুরে দাঁড়াও
তোমার চামুণ্ডা রূপ দেখাও
ভীত হয়ে সরে যাক সব
জারজের দল। নৃমুণ্ডমালিনীর খড়্গ
হাতে তুমি ফিরে চাও... অভয় দাও
নির্ভয়াদের, দূরে যাক লোলুপ
দানবেরা... শান্তি-কল্যাণ হোক
বাংলা মায়ের কন্যাদের।

মনুষ্যকুলের কংক্রিট চর্চা

শ্যামলবরণ সাহা

কিছুকাল পূর্বেও বাবুইপাখির বাসা বাঁধিবার করণকৌশল
অবলোকন করিয়া বলা যাইতে পারিত—
এ বছর বর্ষা কেমন হইবে।

কিছুকাল পূর্বেও পিপীলিকার মুখাগ্রে ডিম বহনের
ব্যস্ততা দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারিত—
কালবৈশাখী কতদূর?

কিছুকাল পূর্বেও পোকা-মাকড়ের গতিবিধি দেখিয়া
বোধগম্য হইত—
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস!

কিছুকাল পূর্বেও গাছে তেঁতুলের পাকা রং দেখিয়া
বলা সম্ভব হইত—
এ বছর বন্যা হইবে কিনা!

এক্ষণে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। প্রকৃতি হইতে
গাত্রোত্তলন করিয়া কংক্রিটের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছি।
প্রকৃতি বলিতে চিনিয়াছি : অর্কিড আর বনসাই!...

হৃদয়ের তাপমাত্রা হারাইয়া মনুষ্যকুল কেবলি ব্যারোমিটারে
শীত-গ্রীষ্ম নিরীক্ষণ করিতেছে।

আপনাকে

সুনির্মল কুণ্ডু

আপনাকে কোনোভাবেই ঘরের মানুষ বলব না, কাছের মানুষও আজকাল
তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না, যতই আগলে রাখি, সতর্ক
হয়েছি কিংবা হইনি সে-কথা মনে করে বললেও হবে উত্তাল
হঠাৎ বৃষ্টির জল... অফিসফেরত রাস্তা এবং বিতর্ক
যা হামেশাই হয়ে থাকে চায়ের স্টলের ঠেকে চা-টা গরম খেলে।

বাস্তবে কেরানি বা ঠিকে মজুর হবার সহজ সুযোগটা যাতে হাতছাড়া না-হয়...
কেউ যাতে না-বলতে পারে লাঞ্চটা যা হয়েছে সেন্ট্রাল জেলে
লক-আপের ভেতরটা তার সাথে মানানসই, কেবল যারা গুডবয়
হতে তখনও শেখেনি—লেখায়নি নিজের নামটা মস্তানির দলে—
যারা গণতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে কত মানুষকে বানাল লাশ বা শহিদ...
যাদের পকেট ভারি করতে তোলাবাজির টাকা—রোজগারটা সেই ছলেবলে—
যারা নতুন চোখে নতুন ব্যাচের গুডবয় যেন সবে গজানো উদ্ভিদ...

এরা মহীরুহ হবে—নাকি হবে না?
অ্যাতো বড়বাড়ন্ত সুখ বেশিকাল সবে না—
ওদের আয়ুর রেখা কার রোমালে চাপা?
ওদের মুখের ভাষার বাতাসে হার মেনে বসে আছে ধাপা!

সব মানুষকেই—ধরুন আপনাকেও, ইস্কনের সন্ন্যাসী ভাবতে পারি...
সব মানুষকেই—ধরুন আপনাকেও, পাড়ার স্তম্ভই বলতে পারি...
যা পারি না—আপনাকে ঘরের মানুষ বলতে...
যা পারি না—আপনার কথায় ভরসা রেখে চলতে...

এখন শ্রাবণের বাতাসও শেষ হয়ে এল,
হিমেল মেজাজে সকালের পক্ষীকুল উড়ে গেল
তৃণে
কেবল আপনার কথা শুনে গণতন্ত্র লুকিয়ে পড়ে কঠিন আস্তিনে!

মৃত্যুঞ্জয়

অমিত কাশ্যপ

আমার কোনও হাত নেই, ছিল হয়তো
এখন জগন্নাথ, দেখতে যাই সব, তবুও
ইশারায় দিক দেখাই কই
চারিদিক আমাকে চেপে ধরে

এভাবে আমার দিন-রাত, রাতই বেশি
অন্ধকার ক্রমশ গ্রাস করে, বলার মতো কথা
তাও অন্ধকার গ্রাস করে, চলে ফিরে বেড়াই
ওই বেড়াই, চারিধারে অদৃশ্য বেড়া

শোনার কত কিছু ছিল, বধির তো নই
বোধিসত্ত্বর মতো জরা দেখি, জ্বালা দেখি
বার্ধক্য তো এক প্রকার বন্ধন
মৃত্যু না হয়েও, মৃত্যুঞ্জয় আখ্যায় ভূষিত হই

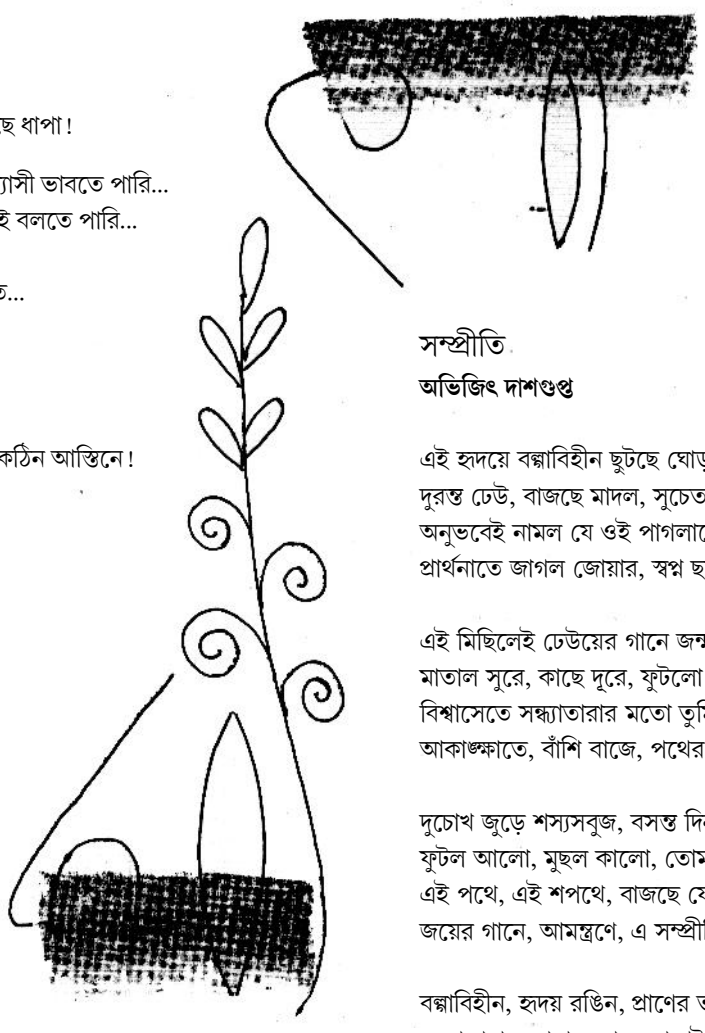

গান্ধারকন্যা

সঞ্চয়িতা কুণ্ডু

স্বামী-স্ত্রীর কানামাছি খেলা শেষ হয় না
ছেলেরা দুঃশাসন দুর্যোধন হয়
একে তো স্নেহ!
অন্ধে অপত্য...
যদিও কুরুক্ষেত্রে প্রত্যেকেই রথী
একমাত্র তুমি গান্ধারকন্যা
নিয়তির তলদেশে অন্ধত্বের ভান!

চোখ খুললে যুদ্ধ
চোখ বুজলে যুদ্ধ
যুদ্ধ চাওনি
তিলে তিলে যুদ্ধ সাজালে।

সম্প্রীতি

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

এই হৃদয়ে বল্গাবিহীন ছুটছে ঘোড়া
দুরন্ত ঢেউ, বাজছে মাদল, সুচেতনায়
অনুভবেই নামল যে ওই পাগলাঝোরা
প্রার্থনাতে জাগল জোয়ার, স্বপ্ন ছড়ায়

এই মিছিলেই ঢেউয়ের গানে জন্মভূমি
মাতাল সুরে, কাছে দূরে, ফুটলো পলাশ
বিশ্বাসেতে সন্ধ্যাতারার মতো তুমি
আকাঙ্ক্ষাতে, বাঁশি বাজে, পথের আভাস

দুচোখ জুড়ে শস্যসবুজ, বসন্ত দিন
ফুটল আলো, মুছল কালো, তোমার স্মৃতি
এই পথে, এই শপথে, বাজছে যে বীণ
জয়ের গানে, আমন্ত্রণে, এ সম্প্রীতি

বল্গাবিহীন, হৃদয় রঙিন, প্রাণের ভাষা
সন্ধ্যাতারায়, মায়া জড়ায়, জ্বালাই বাতি
পাগলাঝোরা, আত্মহারা, যাওয়া আসা
দুহাত ধর, জীবন গড়, পথের সাথী।

আজব দেশের আসল কথা

নলিনীরঞ্জন সরকার

এমন আজব দেশের কথা শুনেছ কি কেউ
হেথায় মস্তানরা মানুষ মারে পুলিশ গোনে ঢেউ
ছাত্রনেতার শাসনে শিক্ষকের গায়ে ব্যথা
শিক্ষকগিন্নি ভয়ে কাঁপেন কইতে নারেন কথা।

রাজামশায় রেগে বলেন শিক্ষকদেরই দোষ
নিরীহ ছাত্রদের উপর কেন তাদের রোষ
শিক্ষকরা রাজনীতি করে পেটে বিদ্যা নাই
ছাত্ররা ভুল ধরলে অপমানে করে কেবল কামাই।

আজব দেশের রাজামশায় করেন কেবল বড়াই
তাঁর চেয়ে বেশি বিদ্যাবুদ্ধি কোনো শিক্ষকের নাই
এদের আবার কথা শোনার কী আছে তোমরা বলো
আমি হলাম রাজা আমার কথামত পিছন পিছন চলো।

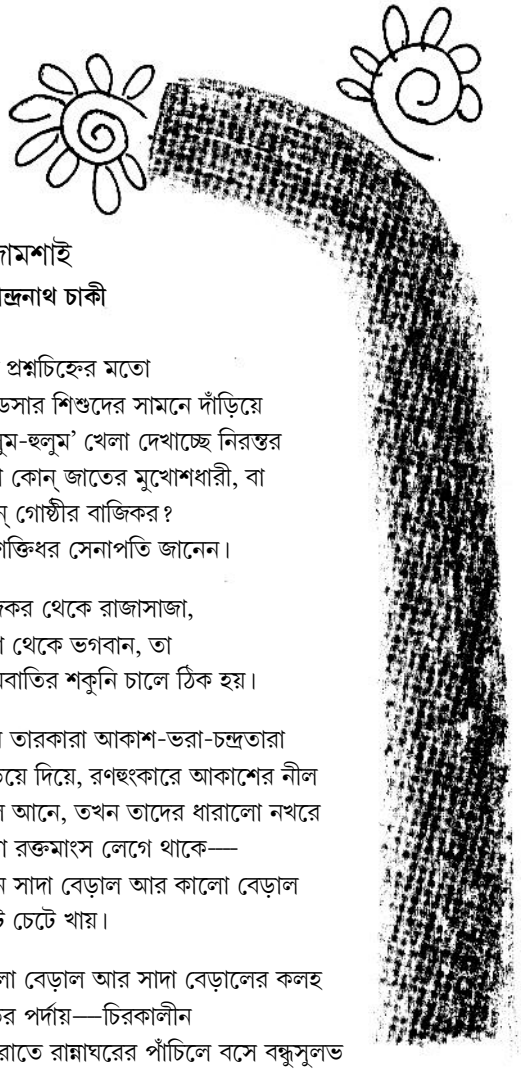

রাজামশাই

গিরীন্দ্রনাথ চাকী

যারা প্রশ্নচিহ্নের মতো
হাড্ডিসার শিশুদের সামনে দাঁড়িয়ে
'হালুম-হুলুম' খেলা দেখাচ্ছে নিরন্তর
তারা কোন্ জাতের মুখোশধারী, বা
কোন্ গোষ্ঠীর বাজিকর?
তা শক্তিধর সেনাপতি জানেন।

বাজিকর থেকে রাজাসাজা,
রাজা থেকে ভগবান, তা
মোমবাতির শকুনি চালে ঠিক হয়।

যখন তারকারা আকাশ-ভরা-চন্দ্রতারা
নিভিয়ে দিয়ে, রণহুংকারে আকাশের নীল
তুলে আনে, তখন তাদের ধারালো নখরে
ছেঁড়া রক্তমাংস লেগে থাকে—
তখন সাদা বেড়াল আর কালো বেড়াল
চেটে চেটে খায়।

কালো বেড়াল আর সাদা বেড়ালের কলহ
টিভির পর্দায়—চিরকালীন
মাঝরাতে রান্নাঘরের পাঁচিলে বসে বন্ধুসুলভ
রুই মাছের মাথা আধাআধি ভাগ করে খায়।

তুমি যাকে স্পর্শ করো

মণিশংকর রায়

তুমি যাকে স্পর্শ করো
সে কখনও ফেরে না আর
সকাল বিকাল শুধু মৃত্যুর ছায়া
প্রবাহিত জলের ভাসানে

এখানে নারীর বিবর্ণ দেহে
দলবদ্ধ হিংস্র শকুনের ঠোঁট
অসহায় দ্রৌপদীর শাড়ির ভাঁজে অবৈধ অন্ধকার
ধর্ষণের বিষণ্ণ প্রহর মধ্যরাতে মায়ের শরীরে
চারিদিকে অশালীন আদিম উল্লাস
জামিনযোগ্য ছাড়পত্রে উদ্ধত উলঙ্গ বিলাস

বস্তুত এই বসন্তে
বিনষ্ট আত্মার মতো অর্বাচীন সব
তুমি তাই একবার ছুঁয়েছো যার শরীর
সে কখনও ফেরেনি আর

প্রতিদিন যুদ্ধ

সজল শ্যাম

চল্লিশ বছর আগের দৃশ্য আতঙ্ক ফিরে আসছে আবার,
প্রতিবাদহীন স্বর; শুধু অন্তরেতে জ্বালা চারিদিকে ভয়ের প্রহর!
অভিমান রাগ ঘৃণা প্রতিদিন প্রতিদ্বন্দ্বী সময়কে ঘিরে,
যতদিন যায় ফিরে আসে রক্ত উন্মাদ স্মৃতি,
প্রাচীন বৃক্ষের কাছে গেলে হয়তো পাব সংবাদ,
এখন বাতাসে শস্যগন্ধ নেই, সম্রাজ্ঞীর নেই কোনো প্রীতি!
আজও হয়তো মেঘ ঘনীভূত হলে—
রবীন্দ্রনাথ বাদ যাবে; সুকান্ত নজরুলও বাদ,—
রণস্থল ঘিরে আছে সত্তরের রাক্ষুসে সব হাত!

আগুনে পুড়েছে, ফাটল ধরেছে ছাদ,
পুড়ে যাওয়া বই সাগরের ছবি নয় শুধু,—
ছন্দ কেটেছে পুড়ে যাওয়া মুখ মধু!
বঙ্কিমরেখা ভূর্জপত্রে লিখে গেছে সব নাম,
লজ্জা পেয়েছে ভোরের সূর্য; অগ্নিকে বলে থাম।

সেদিন ফিরছে মুখভঙ্গিতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে সাথে,
ফিরে আসছে দুঃস্বপ্নের চতুর আকাশ অংহকারী বড়,
জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র পাগল,—বন্ধুরা হাত ধরো।
ফ্লেক্সে-কাটআউটে ছদ্মবেশী শ্বাপদের আনাগোনা;
শিরোনামে ঈগলনখর,
তবু বদ্বীপ ঘিরে পলিমাটির তৃষ্ণা নিয়ে জেগে আছে বীজের অন্তর!

আশা এই প্রতিদিন যুদ্ধ করে মাথা তোলে শ্বাসমূল
বাঁচিয়ে লবণ লহর।

পাস্‌কেল ভাই

সুকমল ঘোষ

আমাদের স্কুলের পাস্‌কেল ভাই। বেঁটে কুচকুচে কালো আদুর গায়ে
যখন জল আনতে যেত টিউবকলে; হাত আর বুকের পেশিগুলোয়
সকালের সোনালি রোদে, ঠিকরে বেরিয়ে আসত জন হেনরির হাতুড়ির ঝংকার।

সেই ছোট্টবেলা থেকে পাস্‌কেল ভাইকে দেখে আসছি, স্কুল বারান্দা,
ক্লাসরুম, হেডস্যারের ঘর, টিচার্স রুম; সব পরিপাটি করে সকাল
আটটার মধ্যেই তৈরি হয়ে নিত; কেননা, তারপরেও অরো অনেক
কাজ; ঘণ্টাটা বাঁধতে হবে, সমস্ত ক্লাসরুমের দরজাগুলো খুলতে হবে।
বৃষ্টি মাপার যন্ত্রটাকে জিওগ্রাফি রুমের বাইরের মাঠতে বসাতে হবে।
ল্যাবরুমে ব্যাঙ আরশোলা আর টিকটিকিদের পৌঁছে দিতে হবে...।

দুপুর হলেই চুপিচুপি গিয়ে বসত সামনের বুড়ো বটগাছটার নিচে বাঁধানো
চাতালে। সেখান থেকেই ছেলেমেয়েদের খুনসুটি, মাস্টারদের এক ক্লাস থেকে
আর এক ক্লাসে যাওয়া, টুক করে ক্লাস টেনের কোনো ছেলের জানালা গলে
পালিয়ে যাওয়া...।
এই ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। তার মাঝে চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে
থাকা... এমনই ছিল দিন কাল মাসের পর মাস...

সেদিনটা ছিল পরীক্ষার ফাইনাল রেজাল্ট বেরুনোর দিন। মিষ্টি রোদে ভরে
ছিল স্কুলের বাইরের প্রাঙ্গণ। পাস্‌কেল ভাই ছিল চাতালেই বসে। হঠাৎ,
মাথায় ফেটি বাঁধা একদঙ্গল ছেলে রে রে রে রে রে ধেয়ে গেল টিচার্স
রুমের দিকে। হুল্লোড়, কানে আঙুল দেওয়া খিস্তির বান আর বরাহের চিৎকারে
টেনে হিঁচড়ে বার করে আনল এক দুই তিন... ষোল জন মাস্টারমশাইকে;
সবার শেষে হেডস্যার। ঘাড়ের পেছনে ধাক্কা দিতে দিতে এনে ফেলল প্রাঙ্গণে।
জান্তব উল্লাসে চিৎকার করে জানান দিল—''এসব শিক্ষক প্রধান শিক্ষক-টিক্ষক
চলবে না, পাশ ফেল বলে দুটো শব্দ এখন আর চলবে না। একটাই শব্দ থাকবে—
পাশ... সবাই পাশ... ফুল পাশ। কোনো শালা যদি টুঁ শব্দ করে, সে শালাদের
একদম ডিমের পোচ বানিয়ে মুরগির পেটে সাঁটিয়ে দেব।''

হাজার ছাত্রের জোড়া চোখ, হাজার ছাত্রীর জোড়া চোখ নিশ্চল স্থির। ঠক্‌ঠক্ করে
কাঁপছে শরীর।

পাস্‌কেল ভাই বসে থাকতে পারেনি বটগাছের চাতালে। পেতলের ঘণ্টা আর
হাতলটাকে নিয়ে বুনো মোষের গতিতে ছুটে এসেছিল ফেটিবাঁধা ছেলেগুলোর দিকে;
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, হাতের ওইটুকু সম্বল নিয়ে। চিৎকার করে উঠেছিল : তোমরা
কি মানুষ, না জানোয়ার!

খোলা মাঠে চিৎ শুয়ে পাসকেল ভাই। মাথায় জমাট রক্ত চাপচাপ। থ্যাঁতলানো মুখ
চোখ থেকে তখনো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে প্রতিরোধের আগুন।
স্থির, আকাশের দিকে চিৎ শুয়ে পাস্‌কেল ভাই। বুকের কোলে শক্ত মুঠোয় ধরে থাকা
পেতলের ঘণ্টা আর হাতল।

পাসকেল ভাই, আমরা দুঃখিত। লজ্জিত। ঘৃণায় শিউরে উঠছে শরীর। হাত মুঠো
নিশপিশ করছে পা; তবুও
তোমার জন্যে কিছু করতে পারিনি।

পরদিন সকালে স্কুলের প্রেয়ার গ্রাউন্ডে, এই প্রথম অন্য একটা প্রেয়ার গান হল—
''আমি ভয় করব না, ভয় করব না; দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।''

পড়ছে মনে মাকে

সতীরঞ্জন আদক

পাখির ডাকে ঘুমটা ভাঙে
পুবের আকাশ দেখছি রাঙে।
ঘাসফুলেরা নাড়ছে মাথা
ঝিলিক মারে গাছের পাতা,
একটু ঘুরে আসি।

এই তো কাছে নদীর চরে
গাঙ শালিকে জটলা করে।
একটা ছেলে পড়ার ফাঁকে
হিজির বিজির ছবি আঁকে,
ঝরে খুশির রাশি

মাঠ পরেছে ঘাসের জামা
রৌদ্র এসে দিচ্ছে হামা
হাওয়া দোলে হলুদ ধানে
এসব খবর কেই বা আনে
চুপটি করে থাকে

জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি
ভাবছি কাছে কাউকে ডাকি
কিন্তু কে আর দেবে সাড়া
সবাই বলে কাজের তাড়া
পড়ছে মনে মাকে।

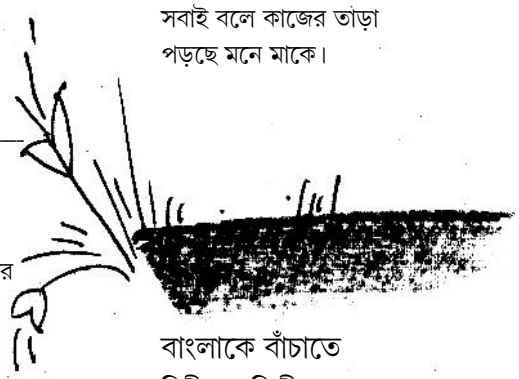

বাংলাকে বাঁচাতে

দিলীপ কালিন্দী

ঠগে ঠগে ঠুকাঠুকি হবে জানি একদিন
ঠকবাজ, রকবাজ, ঢপবাজ চিনে নিন
চিনলেও বিপদ আছে না থাকলে দাদারা
দলহীন মানুষেরা দেয় শুধু ইশারা।
গরিবেরা দল বাঁধে শুধু বেঁচে থাকতে
ধনীরা দল বাঁধে শুধু ধন লুটতে
খুন, জখম রাহাজানি—
অহরহ ঘটছে
সান্ত্রীরা দূরে বসে
শুধু মজা লুটছে।
এ হেন রাজত্বে বাঁচা বড় দায় রে
বাংলাকে বাঁচাতে ঘোর লড়াই চাই রে।

অসংগতি

পরিমল ঘোষ

মিডিয়ার খবরে জানা গেছে :
কোনো এক দেশে স্বল্পমেধারাই সমাদৃত বলে
শাসন চলে নাকি গায়ের জোরে।
সেখানে প্রশাসনে উচ্চপদে বসা মানুষজন
শিরদাঁড়ার জোরেই চলে, মস্তিষ্কে খামতি আছে;
তাই সত্যি-মিথ্যের গোলমাল পাকিয়ে
তারা কথা বলে যায় এলোমেলোভাবে।
কিছু বাড়তি সুবিধে ভোগের জন্যে
দেশের আমলা ও সুবিধাভোগীর দল নাকি
তাদের আগলে রাখে, সামলে-সুমলে রাখে।

মিডিয়ার খবরে সম্প্রতি জানা গেল :
সেখানে এখন নাকি দেখা দিয়েছে বিপত্তি।
অপমানিত মেধাসম্পন্ন মানুষজন বে-পরোয়া হয়ে
আঙুল দেখাচ্ছে শাসকদের অসংগতির দিকে,
জনগণের চোখেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে সব।
গুণ্ডামি-তোলাবাজি-হুমকিতে আর কাজ হচ্ছে না,
জনতা সব অত্যাচার ও ভয়কে অগ্রাহ্য করে
ক্রমে সোচ্চার হয়ে উঠছে দিকে দিকে,
তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ এখন
ছড়িয়ে পড়ছে পথে-ঘাটে-ময়দানে।

কীটাণু

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

নিজের মুখের দিকে তাকাতে পারি না;
ভারি ঘেন্না হয়
এক অণুকীট যেন নোংরার রসদে বেঁচে আছি—
নিশ্চুপে, মহাশয়।

কিশোর কিশোরী যত দ্যাখে আর হাসে
বীভৎসার প্রতিবাদে অনেকেই যখন বাঙ্ময়—
কেবল আড়াল খুঁজি, না হই চিন্তিত যেন;
ন্যুব্জ শিরদাঁড়া বেয়ে নামে হিমস্রোতময় ভয়।

অঙ্গে অন্তরে শত ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সন্ন্যাসিনী
চলে গেলে কিছু অন্তরালে
কোতোয়াল চিহ্নিত করে প্রতিবাদী কিছু শিশুদের
এসবই নীরবে দেখি গোপনে আড়ালে।

নিমগ্ন তখনও ভাবি আর কী কী হত
আর কী না হলে।

তেনার বিশ্ব-বাংলা ঝলমলায়মান ঝলাৎ

অজয়রঞ্জন বিশ্বাস

চোখের সামনে দেখছেন যদি গোড়াতেই গোলমাল
ভদ্রজনের শুভ্র পোশাক কর্দমে মাখামাখি
বর্ষা-আকাশে ঝকমকে রঙধনুটি হঠাৎ
বীভৎসতম ফাঁকি
বিশেষ রঙটি ছাড়া যে তেনার দুনিয়া-ই বেসামাল
পান থেকে চুন খসলে তখন আপনি-আমি-আমরা
জগৎ-সংসার সমস্তই নস্যাৎ
তেনার-ই বিশ্ব-বাংলায় গেরাম-শহর ঝলমলে অঞ্চল
আপনার-আমার বিচারবুদ্ধি সমস্তটাই ভণ্ডুল কুপোকাৎ।।

ভাঙড় অঞ্চলে : বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব : ক্লাস-এইট পাস :
ডিগ্রি কলেজ পরিচালন-সমিতির সুযোগ্য সভাপতি
জাগ ছুঁড়ে মেরে অবাধ্য-এক অধ্যাপিকার চোয়াল ভাঙেন
অর্থাৎ গুণ্ডামিতেই সুদক্ষ অনায়াস
তেনার বিশ্ব-বাংলার কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে একচ্ছত্র ছাত্রবাহিনী
অধ্যক্ষ পেটায় (রায়গঞ্জ) : অধ্যাপক-আধিকারিক পেটায় (কোলকাতা)
এবং ঝড়ে বেধড়ক লাঞ্ছনা অপমান
তেনার বিশ্ব-বাংলার শিক্ষাঙ্গন জুড়ে দাপাচ্ছে শুধু
অন্ধ দম্ভ অপদংস আত্ম-ধ্বংসায়মান।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-সমাজ নিজস্ব পথ খুঁজবেই
নিজের স্বপ্নে মশগুল হবে : নিজের বাচন বলবে এবং নিজের সত্য বুঝবেই
কিন্তু তেনার বিশ্ব-বাংলায় শিক্ষায়তনে তেনাকেই শুধু কুর্নিশ করতে হবে।
অমান্য করলে চাবকে লাল করে দেয়া হবে!!!
হতে পারে হামলা : মিথ্যা মামলাতে নাজেহাল
ইচ্ছা-বা-প্রয়োজনে কাউকে করতে হবে রক্তাক্ত অথবা হত্যা
স্বপন কোলে শৌভিক হাজরা কৃষ্ণপ্রসাদ জানা
এবং আরও অনেক বেসামাল বেয়াড়াকে
যথাযোগ্য নিয়মে শায়েস্তা করতেই হয় অগত্যা।।
পরিণামে তেনার বিশ্ব-বাংলায় জমি-খেত-খামার
ভরে উঠছে সোনার ফসল-হলেও ফল্‌স্—
ধন-ধান্য এবং টসটসে লিচু-আম :
বারাসতের সুটিয়া-কামদুনি-বীরভূমের পাড়ুই নির্যাতিতা সাত্তোর
কিছু সুপ্রাচীন কিছু আধুনিকোত্তর
গৌরবে হুল্লোড় করুন : তুলে ধরুন ডান্ডা-ঝান্ডা-গ্ল্যামার
সিনেমা-স্টার ক্রিকেট-স্টার চাইলে পাবেন বুদ্ধিজীবী-কবি-স্টার
ওই দেখুন লাল-পন্থী মিছিল ভেঙে পিছলে পৌঁছান সভাস্থলে
দুর্বোধ্য কবিতা ছেড়ে তেনার পদ্মাসন মোছেন
সুবোধ্য সুগন্ধ রুমালে।
মাথায় মুকুট-মাল্য পেলেন
কিন্তু মল্লিকাফুলের গন্ধহীন স্মৃতিহীন ঝলমলে এই মাল্য,
হে কবি, কী মূল্যে কামালেন???

শিক্ষা

শেখ জয়নাল আবেদীন

আর নেই দরকার লেখাপড়া—কারবারটাই
কারখানা সহ চাই বাবুঘাটে দিতে বিসর্জন
সাজাও বোতল-টাকা সব-কটা তেলেভাজা ঠাঁই
বুঝে গেছি সারকথা—শিক্ষা হল যমের মরণ।

হাতে থাক লাঠি-রড ধর আর চালাও কেত্তোন
চেয়ার থাকবে খালি খসে যাক দেয়ালের ইট
পূর্ণ থাক কোষাগার পিয়ো জিয়ো যে যার মতোন
পুলিশের কোলে চেপে দোল খাও নীল সাদা ছিট।

বিরোধী আসামি হবে ধর্ষিতা হবেও বুড়ি-বুনি
আগামীতে আমরাই—রেকর্ডের সেই গান শুনি।।

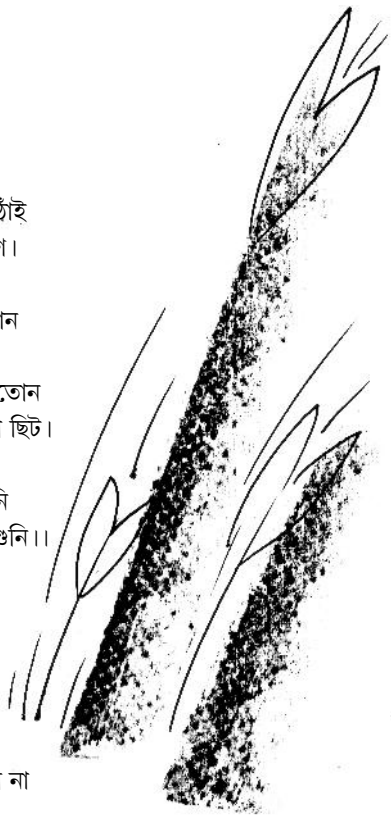

একটি ভবিষ্যতের ধ্বংসাবশেষ

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

আমার একাকীত্বের কোনো সান্ত্বনা জন্ম নিল না

সান্ত্বনা শব্দটিতে ভর করার একমাত্র যোগ্যতা আছে ঘৃণার
ঘাসের আগায় জড়িয়ে থাকা আপাত নিরীহ একটি ফুলের
রাক্ষসজন্ম সম্পূর্ণ হল, গাভী চোখের রাজনীতিবিদ নিজেকে পাল্টে নিল
ধূর্ত শেয়ালের মতো, সিঙ্গুরের মাটিতে বসে গেল কর্ণের রথের চাকা
সুদর্শন অসমাপ্ত বৃত্তের কাছে রেখে দিল রক্তহীন লাশ

ঘৃণা শুয়ে রইল পাশ ফিরে, আমার চূড়ান্ত গভীরে কোনো প্রতিবাদ
অন্তঃসত্ত্বা হয়ে উঠল না। আমার পরিমিতি বোধ, ত্রিকোণমিতি
পলিটিক্যালি কারেক্ট পাখিন হৃদয় অভিশাপ মেখে নিয়ে
নরক লেপে দিল নিকোনো উঠানে

ছঁচচৌকো

অলক জানা

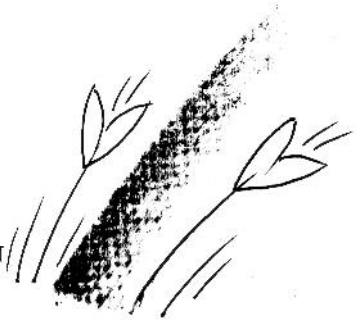

মাটির দেওয়াল, ভেতর ঘর সেরে
উঠোনে চৌকো টানছে মা—
নোনা-মাটি গোবরের দাগ
শ্রীমঙ্গল এখন দলে দলে ফিরছে ঘরে।
আগামিকাল কোজাগরী-লক্ষ্মীব্রত, কুলুঙ্গিতে রাখা
খুবই-এর অন্তর ভরা নৈবেদ্য পৌষের ধান
তৃষ্ণার্ত দেওয়াল-ঘরে উড়ছে এখন ভেজা শুভেচ্ছার গন্ধপুর।

অচ্ছে দিন

সেবন্তী ঘোষ

জলের ছাপ মাড়িয়ে
উঠে এসেছে ও,
খিদের ভাত লুটে
মড়াই বেঁধেছে ও,
মাঠে ফেলা আলুর অনাদরের মতো
তুলো পাট আর দাম না পাওয়া টমেটোয়
রাত-বিরেতে টোকা, ফিসফাস, পাচার লাশ!
কে বন্ধু, কী সুযোগ, ঝোপ বুঝে কোপ
বাঁধানো ব্রিজের নিচে মৃত নদীর হাড়গোড়
আর দশপ্রহরণধারিণী ফেঁদেছো গল্পের ঢেউ—
এমন হিমঘর বানাতে পারনি
যেখানে গন্ধ চাপা দিতে পার!
নুহ্-এর নৌকায় রোশনাই, ফেরেববাজি—
আসছেন আমাদের ঈশ্বর, নতুন সঙ্গে নিয়ে—

দিদি কাহন

সমর সাহা

মিথ্যায় মিনে করা
জঞ্জাল সরকার,
উৎসবে ভরপুর
মারে টাকা করে ধার।
'চাব্কায়' মুখে মুখে
ঢপ দিতে জুড়ি নাই,
টাকা দিয়ে মান কেনে
ডক্টর দিদিভাই।
সারদায় টাকা লুট
খেটে খাওয়া গরিবের,
জমি দিয়ে রাজনীতি
পোয়াবারো ফোড়েদের।
গরিবের টাকা খেয়ে
জেলে থাকে মন্ত্রী,
টুপটাপ পদসেবা
পদলোভী সান্ত্রী।
বেকার মাথা খোঁটে
চাকরির দরজায়,
'টেট' করে সভাসদ
ব্যাগ ভরে ঘুষ খায়।
পাহাড় আর জঙ্গল
কী যে হাসি হাসছে!
উন্নয়ন বাঁশিটি
দিবানিশি বাজছে।
যান দিনি লন্ডন
টেম্স নদী ডাকে যে,
ষোলতে আবার ফিরি
এই বর মাগে সে!

সময়

বিশ্বনাথ কয়াল

দিনের বেশিটা প্রাত্যহিকী কিছুটা সময় যদিও
রয়ে গেছে, সন্ধেরাত বিনোদনে কেটে যাবে;
চাঁদে মাথা রেখে মেঘেরা স্থির ঘুমিয়ে গেলে
রাতের গভীরে আজও অজানা রয়ে যায়
তারারা কোথায় নিয়ে যাবে
ভোরের আলো এখনও অনেক বাকি।

কখনও রাত এমন স্পষ্ট হয়
তেলের কুপিজ্বলা মধ্য রাতের বাউল মেলা
চিহ্নবিহীন নগর শহর
জন্মভিটে উঠোন সদর কৃষ্ণপক্ষে চাদর ঢাকা,
ভোরের আলোয় যদিও অজানা থাকে
পরের সকাল কোথায় নিয়ে যাবে।

স্বপ্ন যখন স্বপ্ন নয়, স্পষ্ট শরীর
স্পর্শহীন শব্দহীন নারী ও পুরুষ,
তারাগুলো জলের ভিতর—নাচের মতো
সাপের মতো ঢেউ খেলানো—কিসের ছবি,
অনিশ্চিতে ভোরের আলো পরের সকাল
উলঙ্গ পৃথিবী জানে জারজ সময়।

দাবানল

নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুলে যেতে চাই আমি—সেই সব, সেই সব
বিবর্ণ বিকেল, এখন সায়াহ্ন উঁকি দিচ্ছে
অপরাহ্ন এঁকে যাচ্ছে অদ্ভুত ঈশারা, প্রশ্নচিহ্ন
বুকে ও চিবুকে, সেই তার, আসন্ন সন্ধ্যায়
রাত্রি আসে নিঃশব্দে—বেড়ালের মতো
চুপি চুপি, একা একা, প্রসন্ন প্রবাসে।
নাভিমূলে তৃষ্ণা অনাবিল :
কবি—হতবাক, ভ্রান্ত, বিপর্যস্ত, মুক ও বধির

প্রত্যন্ত প্রদেশ জুড়ে ঝিঁ-ঝিঁ ডাক শুরু হয়,
পোড়া রাতে, আধপোড়া রুটি—তাও চেটেপুটে খায়
প্রতীক্ষায় থাকে—ঐ আসছে নিরন্ন স্বকাল—

ঝড় ওঠে তপ্ত সানুদেশে উথালপাথাল
রাত জাগে—বল্মীক বসুধা, আদিম জিজ্ঞাসা

তৃষ্ণা নয়—তৃষা ডাকে, সেই অনির্বাণ ক্ষুধা
দেহমন ঝালাপালা করে—বিপন্ন আসব
দাউদাউ জ্বলে ওঠে ভয়াল খাণ্ডব—

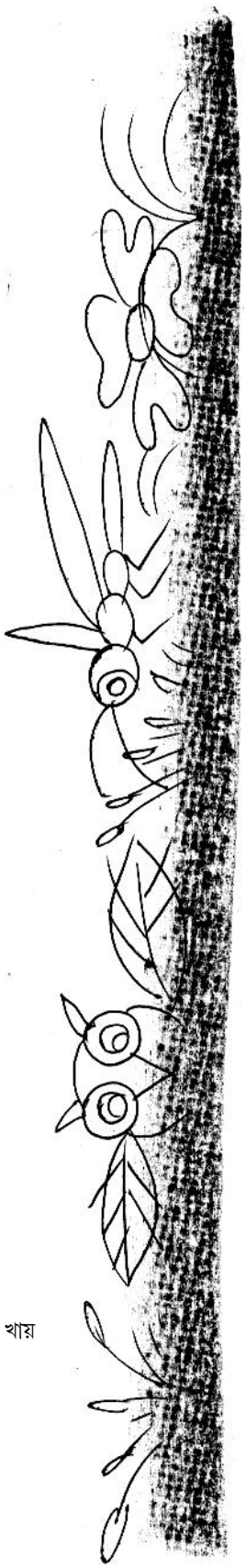

আবহ

গোবিন্দ গোস্বামী

ভালোবাসার রোজনামচায়
প্রতিদিন নতুন অক্ষর
লেবুপাতা করমচার ছড়া
মিটুলি রাঙানো পুতুলের কাপড়
পোষা ময়নার শেখানো বুলিতে
দূর কুটুমের আপ্যায়ন
লাউডগায় কাচপাখায় লাল ফড়িং
চোরকাঁটায় বেঁধা ফ্রকে
গড়িয়ে যায় অলস দুপুর
জলকে চলার রবীন্দ্রনাথ
মেটে কলসি কাঁখে খিড়কি পুকুর
শস্তার সাবানে গোপন ঢেউ
শুকনো কলাপাতার পোড়া বাসনায় লেপে
দারিদ্র্যের ছাইমাখা উজ্জ্বল মাথা ঘষা
কলমিশাক কাঁচা আমের টক
আউশ চালের ভাতে কলাইকরা থালায়
অন্নপূর্ণার সাজানো ব্যঞ্জন
খিদের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে
চাঁদের উপচে পড়া জ্যোৎস্নায় ভেসে ওঠা বাঁশবাগান
স্বপ্নে জাগা কাজলাদিদির জলভরা চোখ
ঠাকুমার জপের মালায় হারানো রূপকথা
জেগে থাকে দুধভাতের সনাতন শ্লোক
ভালোবাসার রোজনামচায়
প্রতিদিন নতুন অক্ষর।

রাতের কার্পেট

কালিদাস ভদ্র

রাতের কার্পেটে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছি

জ্যোৎস্নায় স্নান সেরে লক্ষ্মীপেঁচা
নেমে আসে আলপথে
উচ্ছ্বাসে কিশোরী ধান নাচে
ভোর গেয়ে নিমগ্ন হাওয়া
হেঁটে যায় বর্গা পাওয়া জমি বেয়ে

মাটির বেহালায় রাখালির সুর শুনে
চঞ্চল ঘাসের বুকে
ছুটে আসে গামছাবাঁধা মুখ
এলোমেলো কার্তুজ খোল
বিস্তৃত ধানক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে

রাতের কার্পেটে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছি
অবাক বিস্ময়ে দেখি
রক্তের ছিটে লেগে
খয়েরি লাল আজ নুয়ে পড়া
নীল-সাদা আকাশেরও চিবুক...

দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা ও দুনিয়া পাল্টানো বইগুলি

মইনুল হাসান

> All historical experience confirms the truth that man would not have attained the possible unless time and again he has reached out for the impossible.
>
> *—Max Weber (1918)*

শুনতে খানিকটা আশ্চর্য লাগবে। কিন্তু লেখাটা খুব সম্প্রতি চোখে পড়েছে। ব্রিটেনের এক বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা হুইটেকার আলমানাক তাঁর একটা লেখাতে জানাচ্ছেন, ''জার গদিচ্যুত। তার বদলে এসেছে কেরেনস্কি। এই নবজাত স্বাধীনতা অবশ্য অবিমিশ্র আনন্দের ব্যাপার হয়নি। কেননা পরস্পরবিরোধী নানা দলের আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে শাসন-ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত অচলপ্রায়। শোনা যাচ্ছে জনৈক এক উইলিয়ানভ লেনিন ক্ষমতা দখল করেছেন। একজন সাব অলটার্ন নিযুক্ত হয়েছেন দেশের প্রধান সেনাপতি।'' ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ব্যাপার বলা হচ্ছে—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতোমধ্যেই সেখানে যে দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন ঘটে গেছে তার বিস্তারিত বিবরণ ঐতিহাসিকদের কাছে নেই সেটা জানাই যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর যুগান্তকারী ঘটনা রুশ বিপ্লব। বিংশ শতাব্দী জুড়ে ছিল ঘটনার ঘনঘটা—বহু বৈচিত্র্যময় ঘটনার সম্ভার। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ। মানবসভ্যতার নিকৃষ্টতম শত্রু ফ্যাসিবাদের পরাজয়। ১৯৪৯ সালে চিন বিপ্লব। আবার চিনে ঘটলো সাংস্কৃতিক বিপ্লব ১৯৬৫-৬৯ সালে। ১৯৫৪ সালে ভিয়েতনাম। দিয়েন বিয়েন ফু। ভিয়েতমিনের কাছে ফরাসিদের পরাজয়। টন টন বোমা ফেলেও কব্জা করা যায়নি ভিয়েতনামকে। সাম্রাজ্যবাদীরা নাকানি চোবানি খেয়েছে। এমনকি মার্কিন দেশে যুবরা ভিয়েতনামের যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছে। ভিয়েতনামের সমর্থনে লম্বা লম্বা মিছিল করেছে। ১৯৫৯ সালে বাতিস্তার পতন। সারা পৃথিবী জানলো চে গেভারা আর ফিদেল কাস্ত্রোর নাম। কিউবায় বিপ্লব। আমেরিকার নাকের ডগায়। সংগঠিত হল বিপ্লব। কামাল আতাতুর্ক তো আর এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেললেন। সুলতানের বিদায় বাজনা বেজে উঠল। শেষ হয়ে গেল খেলাফত। ১৯২৩ সাল। জন্ম নিল তুরস্ক সাধারণতন্ত্র। শ্লোগান উঠলো 'উত্‌রো নেকাব'। খুলে পড়লো ফেজ টুপি আর বোরখা। তুর্কিরা সেজে উঠলো পাশ্চাত্যের পোশাকে। লেখাপড়াতে এল বিরাট পরিবর্তন। আরবি হরফের বদলে এল রোমান হরফ। কাজি নজরুল ইসলাম, এতদূর, এই বাংলায়, আনন্দে তিনলাফ দিয়ে বলে উঠলেন—''কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই।''

ভারতবর্ষকে বাদ দিই কী করে? এত বড় বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশ। হরেক কিসিমের মানুষের ছড়াছড়ি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। আইন অমান্য, অসহযোগ ও আগস্ট বিপ্লব। যে অর্থে আমরা পূর্বতন ঘটনাগুলিকে বিপ্লব বলি সে অর্থে এগুলো বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু জনগণের বিপুল অংশগ্রহণ নতুন ইতিহাস তৈরি করেছিল। গান্ধীজির সাফল্য তো এখানেই যে তিনি রাজনৈতিক নাটকে মানুষকে কুশীলব করে তুলতে পেরেছিলেন। অন্যধারাটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার বুক চিরে সারা বাংলায় সাধারণ কৃষকরা রাস্তায় নেমেছিল তেভাগা আন্দোলনে। জমিদার অংশের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন প্রাথমিকভাবে প্রবাহিত হলেও, মূল ধারার ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল তাকে পুষ্ট করেছিল। সেই সঙ্গে ডাক-শ্রমিকদের আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি সারা ভারত নাড়িয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ভারতে পরাধীনতার অবসান শতাব্দীর বড় ঘটনা সন্দেহ নেই।

শুধুমাত্র ইতিবাচক দিক দিয়ে এই আলোড়ন হয়েছে তাই না, উল্টো দিকের বা উল্টো স্রোত যে হয়নি তা নয়। এই তো ইতিহাস। না হলে ইতিহাস এত দ্বান্দ্বিক, এত বৈচিত্র্যময় হবে কেন? আফগানিস্তানের ঘটনা তারই তো প্রমাণ। ১৯২৯। খানিকটা তুরস্কের ঘটনার প্রায় পুনরাবৃত্তি হয়েছিল সেখানে। ধর্মান্ধ মৌলবাদের হাতে সিংহাসন হারালেন আমির আমানুল্লা। সেই কবেকার কথা। আফগানিস্তানের মাটি আজও অশান্ত। মৌলবাদীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পুরাতন সব ঐতিহ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে বহ্ন্যুৎসব হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী দাঁড়িয়ে থাকা বামিয়ান, বুদ্ধমূর্তিগুলি ছিল আমাদের সংস্কৃতির পাহারাদার। সহনশীলতা আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। বাচ্চাদের মুখে দুধের যোগান নেই, নারীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নেই। কিন্তু দেশকে 'ঐতিহ্য-নগ্ন' করে ফেলতে এতটুকু হৃদয় কাঁপল না তাদের। ত্রিশ দশকের ইউরোপ কেমন অশান্ত ছিল আমরা সকলেই তা জানি। ইতালি, স্পেন, জর্মানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মুসোলিনি, হিটলারের

হুঙ্কার। সারা পৃথিবী তাদের পায়ের তলায় থাকবে এই নিষ্ফল হুঙ্কারের আস্ফালন। পৃথিবী দেখল রক্তের বন্যা। পৃথিবী দেখল হিংস্রতা কাকে বলে। পৃথিবী দেখল মানবতার অপমান কাকে বলে। আমাদের পৃথিবীকে নিঃস্ব করে দিতে চাইলেও মানুষের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যর কাছে এমন অমিতশক্তিশালীও পরাজিত হল। ইতিহাসের চাকা কাদা থেকে আবার রাজপথে প্রতিষ্ঠিত হল।

সেই কবে ফরাসি বিপ্লব হয়েছে। আমরা তো জানি, তার জন্যই পৃথিবী পাল্টে গেছে। সাম্য মৈত্রী ন্যায় স্বাধীনতার আবহমান কালের আকাঙ্ক্ষাগুলি হাজার হাজার গুণ বেড়ে গেছে মানুষের জীবনে। নতুন করে পৃথিবী গুছিয়ে নিয়েছে তার সমাজ। মূল ভিত্তি তো গণতন্ত্র। আর বহুত্ববাদ। ফরাসি বিপ্লব, কত কতদিন যে আমাদের আলোড়িত করবে তার হিসেব করা মুশকিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দী তখন মাত্র মধ্যগগন অতিক্রম করেছে। কেঁপে উঠল ফরাসি দেশ। ১৯৬৮। কেঁপে উঠল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। নানা রকমের দাবি। তার মধ্যে প্রধান—পাঠ্যক্রম পাল্টাতে হবে। রীতিনীতি পাল্টাতে হবে। মিথ্যা নিয়মকানুনের ঠাটবাট চলবে না। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী জমায়েত হল ক্লাসঘর ছেড়ে বাইরে। শুধুমাত্র নিজেদের শিক্ষাক্রম আগাপাশতলা পরিবর্তন করার জন্যই তারা শ্লোগান দিল না। আগামী প্রজন্মের এই মুখগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই শ্লোগান দিল ভিয়েতনাম থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা হাত ওঠাও। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। পিতৃতন্ত্র নিপাত যাক। পথে পথে গড়ে উঠল ব্যারিকেড। শোন নদীর জলের মধ্যে তখন বাড়তি ঢেউ খেলে যাচ্ছে। নদীর দু-ধার তখন মুক্তাঞ্চল তৈরি হয়ে গেছে। পুরো চত্বর যৌবনের দখলে। কোনো শক্তিই তাদের ঠেকাতে পারবে না। পারেও নি। কী দুঃসাহস! না, সাহস! ব্যানার দেওয়া হল 'রেভোল্যুশন, আই লাভ ইউ।' ছেলে-মেয়েরা টি শার্টে এই শ্লোগান লিখে ঘুরতে লাগল। —'আনবাটন ইওর ব্রেন অ্যাজ অফেন অ্যাজ ইওর ফ্লাই।'—'ইট ইজ ফরবিডেন টু ফরবিড।' দাবি উঠল ধনতন্ত্র একমাত্র সমাজব্যবস্থা নয়। অন্য ব্যবস্থাও সম্ভব। অন্য সমাজ পৃথিবীতে সম্ভব। সোভিয়েত রাশিয়াই তার প্রমাণ। শোষণ মুক্তির পক্ষে জীবন্ত জেহাদ। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার তৎকালীন ঘরানাটাও তাদের পছন্দ নয়। অন্য কিছু চাই। ৩০ লক্ষ শ্রমিক ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছিল। পৃথিবীতে অনন্যসাধারণ এই ঘটনা। দ্য গল তখন দিশেহারা এবং কম্পমান। তিনি দেশপ্রেমের শ্লোগান তুলেছেন। রক্ষণশীল এবং দক্ষিণপন্থীদের রাস্তাতে নামিয়েছিলেন। শোন নদীর ঢেউ ততদিনে পৌঁছে গেছে ইতালি, পশ্চিম জার্মানি এবং ব্রিটেনে। কমিউনিস্ট পোল্যান্ড, চেক এবং ফ্যাসিস্ট স্পেন বাকি থাকল না। প্রাগে বসন্ত এল বলে ঘোষণা হল। পোস্টার পড়ল। সমাজতন্ত্রকে মানবিক করে তুলতে হবে। আবির্ভূত হল আকেজান্ডার ডুবচেক। মুক্তির হাওয়া বইতে লাগল। সমাজতন্ত্র মানে কোনো মৌলবাদী কাজ নয়। সমাজতন্ত্র বহু চিন্তার বিকাশ। শতফুল বিকশিত হওয়ার বাস্তব ভিত্তি। খোলামেলা আলোচনা, সংবাদপত্র হবে সংবাদপত্র, পার্টি বুলেটিন নয়; শিল্পসাহিত্য নাটক হবে সৃজন, শ্লোগান নয়। নাটককে আগে নাটক হতে হবে। পোলান্ডের ছাত্ররা পিছিয়ে থাকল না। তারাও দাবি তুললো তাদেরও একটা ডুবচেক দরকার। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে যা হয়েছিল তাই হল। প্রাগে নামল রুশ ট্যাঙ্ক। সমাজতত্ত্ববিদরা পৃথিবী জুড়ে দু-তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। ঠিক হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে না। যুক্তির শেষ নেই। তবে মোটামুটি সবাই একমত হলেন—রাস্তা একটা নয়, লক্ষ্য ঠিক রেখে প্রয়োগে রকমফের করা দরকার। মহান নেতাদের কথা মানা দরকার। বিপ্লব স্যুটকেসে করে রপ্তানি করা যায় না। মানুষ যে মানুষ সেটা আগে বোঝা দরকার। বিপ্লবে মানুষই প্রধান যন্ত্রী।

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া রক্ষা পেল না। ১৯৮৫-৮৬ সালে সেখানেই ক্ষমতায় এল আর এক ডুবচেক। মিখাইল গরবাচেভ। আমাদের ভাষণের শব্দতালিকায় ঢুকে গেল দুটি আনকোরা নতুন শব্দ—গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রৈকা। খোলামেলা আলোচনা। মুক্ত সমাজ চাই। নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। পূর্ব ইউরোপের মতোই পালাবদল হয়ে গেল চেকোস্লোভাকিয়ায়। এবার বড় পরিবর্তন এল সোভিয়েত ইউনিয়নে। কোনো বাইরের আক্রমণ ছাড়াই ১৫ টুকরো হয়ে গেল এতবড় সাম্রাজ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে, যুদ্ধেও যা দাঁড়িয়ে ছিল। যেন এক লহমায় ভেঙে পড়ল। দেশের মধ্যেও তখনই কেউ রাস্তায় নামল না। আমাদের তো মন খারাপ। সোভিয়েত নেই। আমাদের চ্যালেঞ্জও বটে। এই রাজ্যে আমরা তখন যুব আন্দোলনের কর্মী। আমাদের তখন প্রধান কাজ কী করে সাধারণ যুবদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন যে সমাজতন্ত্রের অবাস্তবতা প্রমাণ করে না। সমাজতন্ত্রেও সব শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবসান হবে না। মার্কসীয় তত্ত্বের ভুল প্রয়োগ হওয়া অসম্ভব নয়। ব্যক্তিমানুষের চাহিদার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করতে হবে। সমাজতন্ত্র মানে দারিদ্র্যের সমতা নয়, প্রাচুর্যের সমতা।

এই আলোচনার মধ্যে একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিলাম প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর বাড়িতে। তাঁর কথাগুলো আজও মনে আছে। রুশ বিপ্লব পরবর্তী আর সব সফল বিপ্লবের ব্যতিক্রম। কারণ অন্য সব বিপ্লবের উপসংহার ঘটেছে প্রতিবিপ্লবে। যেমন সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবের পরিণাম স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন। বাস্তিল দুর্গ পতনের অর্ধ শতাব্দী পরে কেউ মনে রাখেনি রাজহত্যা বা জাঁকবাদের ত্রাসের রাজত্ব। কিন্তু রুশ বিপ্লবে ছিল অন্য জিনিস। কারণ ডয়েশচার মনে করেছেন প্রতিবিপ্লবের আর সম্ভাবনা নেই। অধ্যাপক ত্রিপাঠী বলেছিলেন, কী আশ্চর্য, ওই কথার মাত্র ২৪ বছর পর ১৯৯১ সালের ঘটনা। সমাজতন্ত্রের পতন। গর্বাচভের প্রস্থান। ইয়েলৎসিনের উত্থান। ডয়েশচারের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে। চোখের সামনে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল স্তালিনের বিশাল সাম্রাজ্য। একশৈলিক পার্টি। আর্থিক/প্রযুক্তির আকাশচুম্বী সাফল্য এক পলকে শেষ হয়ে গেল। কালোবাজারির মরশুম শুরু হয়ে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আই এম এফ-এর সামনে রাশিয়া দাঁড়ালো ভিখারি বেশে। বড় বড় শিল্প চলে গেল বেসরকারি হাতে। অধ্যাপক ত্রিপাঠী বলেছিলেন, ১৯১৭ সাল বিপ্লব হলে ১৯৯১ প্রতিবিপ্লব। যদিও তা ঘটেছে নীরবে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী নয়'। (১৯৯৪)

।। ২।।

বিংশ শতাব্দীর এই যে তুলকালাম কাণ্ডগুলি এর পিছনে আছে দার্শনিক ভিত্তি। তত্ত্বের সমাহার। সেই তত্ত্বের ব্যবহার। সমাজে এমন দেখা গেছে সমাজের বিরাট উথাল-পাথাল অবস্থা কোনো সময় তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। আবার তত্ত্ব দিয়ে সমাজ উথালপাথাল হয়েছে। আমার অনেক সময় মনে হয় পুরো বিষয়টি ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। আজকের লাতিন আমেরিকা নতুন তত্ত্বের উদ্‌গাতা। সমাজতন্ত্র চাই। তার জন্যই লড়াই। কিন্তু তাদের মতো। ভোট হবে। বহুত্ববাদের চর্চা কম হবে না। একটার পর একটা লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বামপন্থীরা জিতেছে। সমাজতন্ত্র বলতে আমাদের মনে যে গড়া সৌধটা গড়ে ওঠে সেটা থেকে অনেক আলাদা। চিন কিন্তু বিশাল দেশ। সমাজতান্ত্রিক দেশ। বিপ্লব হয়েছে। কিন্তু বাজারি অর্থনীতিকে আহ্বান করেছে। বিশাল সংখ্যক মানুষের

মুখে খাবার জোটানো প্রধান কাজ। সেই সঙ্গে সার্বিক উন্নয়ন। সেইসব ঘটনাবলীর মধ্যেই বেরিয়ে আসতে, নথিভুক্ত হচ্ছে নতুন তত্ত্ব। কার্ল মার্কস-এর কথাটি বার বার উচ্চারিত হয়—পৃথিবীর ব্যাখ্যা হয়েছে বারবার, নানাভাবে, কিন্তু আসল কাজ হল তা পরিবর্তন করা। মার্কস গ্যেটে-র খুব ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—তত্ত্ব ধূসর, জীবন সবুজ। জীবন প্রতিষ্ঠার জন্যই তত্ত্বের আগমন।

সব তত্ত্বের সমাহার আছে পৃথিবী বিখ্যাত বইগুলোতে। সেই পুস্তকরাশি নিয়েই কিছুটা আলোচনা করব—যেগুলো পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে। যে পাল্টানো পৃথিবীর কথা আগে উল্লেখ করেছি। সারা পৃথিবীর জঞ্জাল পুড়িয়ে তাকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে—এই অভিপ্রায় নিয়েই আমাদের পথচলা। বই একটা দেশলাইকাঠি। এই জঞ্জালে আগুন ধরিয়ে দেবে। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাবে। নতুন পৃথিবী গড়ার পথ বাতলে দেবে। আমার শুধু নয়, আমার মতো বহুজনের মনে হয় বই-এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা আস্ত আগ্নেয়গিরি। যে-কোনো সময় লাভা উদ্‌গিরণ করবে। বিস্ফোরণ ঘটাবে। সমাজ পাল্টে দেবে। লেনিন বলেছিলেন, কামান ধ্বংস করেছে ফিউডালিজমকে, কালি ধ্বংস করবে এই পচা সমাজকে। লেনিন-এর রচনাবলী নিয়েই প্রথমে কয়েকটা কথা সেরে নিতে চাই। বিপুল তাঁর রচনাসম্ভার। শেষ কয়েকবছর অসুস্থ ছিলেন। তখন লেখালেখি তেমন করতে পারেন নি। লেনিন অনেক দিন বেঁচে থাকেন নি। আবার নিজে আন্দোলন গড়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগঠন বা পার্টি গড়েছেন, হাতে-কলমে পার্টি ও সরকার চালিয়েছেন। তার পরও যা লিখেছেন তা বিস্ময়কর। প্রথম যে রচনাবলী সরকারিভাবে প্রকাশিত হল চিঠিপত্রসহ তা ৬৩ খণ্ডের। এখনও নিজের গ্রন্থাগারে সময়মত বিশাল গ্রন্থরাজি নেড়েচেড়ে দেখি। অবাক হই। কোনো বিষয়ই বাকি রাখেননি। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য—সব। তার মধ্যেই খোঁজ নিচ্ছেন মায়াকোভস্কি কেন অনেকদিন কবিতা লিখছেন না। পলিটব্যুরোর সভা শেষ করে নিজের সরকারি আবাসে যাবার সময় হানা দিচ্ছেন মায়াকোভস্কির বাড়ি। একই রকম ঘটনা ম্যাক্সিম গোর্কিকে নিয়ে। খোঁজ নিচ্ছেন গোর্কি নতুন কিছু লিখলেন কি না।

দুটি বই আমাকে দারুনভাবে আকর্ষণ করে। 'কী করিতে হইবে' (১৯০৪) এবং 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'। হরদমই একথাটা আমাদের শুনতে হয় কার্ল মার্কস বলেছিলেন বিপ্লব হবে শিল্পোন্নত দেশে। কিন্তু হল সেটা অনুন্নত এবং ইউরোপের উঠোন হিসেবে চিহ্নিত রাশিয়ায়। কেন? যদিও ১৮৮০ সালে মার্কস রাশিয়ায় বিপ্লব হওয়ার সম্ভাবনা নজর করেছিলেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ায় হওয়া সম্ভব এটা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু প্রধান কারণ লেনিন। সময়ের পাঠ নিতে তিনি ভুল করেননি। সময়ের আয়না দিয়ে তিনি অনেক দূর দেখতে পেয়েছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব। এটা হবে শ্রমিক ও কৃষক সহ সমস্ত নিপীড়িত মানুষের বিপ্লব। রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া সম্ভব নয়। ১৯০৫ সালেও তিনি বুঝে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-র সময় সাম্রাজ্যবাদীদের হাবভাব তিনি বুঝে নিতে পেরে পরিস্থিতির সার্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। উন্নত দেশগুলির মধ্যে রাশিয়াকে চিহ্নিত করলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটা দেশ হিসেবে। কিন্তু রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। কারণ ব্যাখ্যা করলেন লেনিন। যে দেশে কৃষকরা বেশি সংখ্যায় বিদ্যমান এবং অত্যন্ত গরিব, চার্চ সরকারের হাতে একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে, গণতন্ত্র প্রকৃত অর্থে নেই বললেই চলে, রাষ্ট্র এক্ষেত্রে থেকেও না থাকার মতো। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দেওয়া অসম্ভব বা অলীক নয়। বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে লেনিন লিখলেন, 'কী করিতে হইবে'। পার্টি সম্পর্কে লেনিনের অন্যতম মৌলিক রচনা। সংক্ষেপে এই বইয়ের কথাগুলি তুলে ধরলে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা হবে। রুশ দেশের শ্রমিকশ্রেণির কিছু গোষ্ঠী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলছে তাতে সমস্ত শ্রেণির নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে না। লেনিন এই কথাগুলো বইতে লিখেছেন। দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থান সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণির এবং শ্রমিকশ্রেণির পার্টির যে জ্ঞান থাকা দরকার তাতে ঘাটতি আছে—সে সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন লেনিন। শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রাম অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা নিয়ে পথ চলছে সে কারণে তাদের পক্ষে নিজেদের উদ্যোগে ব্যাপক চেতনা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। নিজেদের মতো করে চলতে দিলে শ্রমিকশ্রেণি বুর্জোয়াদের মতো করে চলতে লাগবে। তার সুযাগ রাখা চলবে না। লেনিন দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন, হয় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ আর না হয় বুর্জোয়া ভাবাদর্শ—দুটোর একটা বেছে নিতে হবে। এর মধ্যে আলাদা কিছু থাকবে না। কোনো তৃতীয় মতাদর্শ সম্ভব নয়। লেনিন মনে করতেন 'নন-ক্লাস' কেউ নেই। অবার 'অ্যাবাভ ক্লাস'-ও কেউ নেই। পার্টির ভূমিকা কী এবং পার্টির দায়িত্ব কী সে ঠিক করতেই সময়ের এক জটিল মুহূর্তে এই মৌলিক বইটি লিখলেন তিনি। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের পর আর বইটি লেনিন প্রকাশ করেন নি। কারণ তখন তো অন্য সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। তার সমাধান খোঁজা শুরু হয়েছে। তবে এই বইটি স্তালিনের সময় আবার ছাপা হয়। স্তালিন নিজে মুখবন্ধ লেখেন। বইটির তাত্ত্বিকমূল্য বিবেচনা করে সেটি সোভিয়েত রাশিয়ায় পঠিত হতে থাকে। সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টিতেই বইটির আদর আছে। অন্ধকারে পথ খোঁজার চাইতে এক খণ্ড 'কী করিতে হইবে' থাকা জরুরি বলেই কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে। তবে ভুলে গেলে চলবে না পার্টি গঠন পর্বে কর্তব্য নির্দেশ করতে এই বই লেখা হয়েছে। শতবর্ষ পেরিয়েও প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে সেটা।

লেনিন নিজের মধ্যে ভাঙাগড়া বুঝতে পারতেন। বহু মতামত বাতিল করে নতুন মতের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। তার জন্য সাহায্য নিয়েছেন সারা পৃথিবী থেকে নিয়ে আসা দারুন বইগুলো। লেনিনের নিজস্ব গ্রন্থাগারে মূলত কোন বইগুলো থাকতো তা নিয়ে একটা বড় প্রবন্ধ হতে পারে। তা ছাড়া তাঁর ছিল অসম্ভব অনুসন্ধানী মন আর শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা। তখনও বিপ্লব হয়নি। যে-কোনো সময় হবে। ১৯১৯ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ফিনল্যান্ডের রাজলিব দ্বীপে বসে লিখলেন একটি ছোটো পুস্তিকা 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'।

১৯১৬ সাল পর্যন্ত লেনিনের মৌল ধারণা ছিল ধনতান্ত্রিক রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লব পরিচালিত হবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে। বিপ্লবের লক্ষ্য তখন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। রাশিয়ায় বিরাট কৃষক সমাজ, তাদের সঙ্গে মৈত্রী করা হবে কি না, তা নিয়ে মতভেদের অন্ত ছিল না। লেনিন হলেন প্রথম মার্কসবাদী যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে কৃষকদের যে গুরুত্ব আছে সেটা স্বীকার করে নেন। ইতিহাস বিচারে দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপে সংগ্রামে মার্কসবাদীরা লিবারেলদের যে ভূমিকা দিতে চান, লেনিন কৃষকদেরও ঠিক সেই ভূমিকায় রাশিয়াতে দেখতে চান। তাত্ত্বিক কারণেই 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' একটি গুরুত্বপূর্ণ বই।

কমিউনিস্টদের প্রধান কাজ বিপ্লব সমাধা করা। বিপ্লবের প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। এই কাজ কমিউনিস্ট পার্টির সামান্য কয়েকজন মানুষকে নিয়ে করা যায় না। ব্যাপক অংশের মানুষকে সংগঠিত করতে হয়। রাষ্ট্রযন্ত্রে যারা যারা আছে তারা নিজের স্বার্থ

রক্ষা করতে তৎপর হয়। ফলে ব্যাপক অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নানা শ্লোগানে তাদের নিয়ে মোর্চা গঠন করতে হবে। শ্রমিক এবং কৃষকরাই সেই মোর্চার ভিত্তি হবে। ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণি যেহেতু বিপ্লবী শ্রেণি, তারাই হবে এই আন্দোলনের নেতা। এভাবেই সব মানুষ যখন চাইবে, বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করবে, মানুষ পুরনো কায়দায় শোষিত হতে চাইবে না, তখন বিপ্লবের ডঙ্কা বাজবে। সময়ই বড় জহুরি।

লেনিনের আরও শিক্ষা যে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করেই সেটাকে চালানো যায় না। আমলাতন্ত্র, মিলিটারি সহ নানা বিষয় আছে যেগুলোকে ঠিকঠাক করে নিতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে রাষ্ট্রদখল হল মানেই সব শ্রমিকশ্রেণি পার্টির নির্দেশে চলবে তা নয়। সামাজিক সূচকগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। সরকারে তখনই শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব কায়েম করা মুশকিল আছে। এ নিয়ে চর্চা হয়েছে প্রবল। লেনিনের মনেও প্রশ্ন ছিল কীভাবে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারিত। সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টদের সামনে বইটি দিশা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আজকের সময়ে আবার এই তাত্ত্বিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদীদের শুধু নয়, সমস্ত সমাজতাত্ত্বিকদের, পুস্তক পাঠকদের অগ্রাধিকারের তালিকাতে রাখতেই হবে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'।

আগেই উল্লেখ করেছি চলার পথে লেনিন বারবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর মত বদল করেছেন। রাষ্ট্র উচ্ছেদের বদলে তিনি তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন। সংসদীয় ব্যবস্থা রাশিয়ায় চলতে থাকে। শ্রমিকশ্রেণির অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের ওপর পার্টির প্রাধান্য প্রকট হতে থাকে। ১৯১৭ সালের আগে লেনিন একদলীয় শাসনের কথা বলেননি। একটা দলের অধীনে রাষ্ট্র থাকবে তাও বলেননি। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত ছিল অন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আমলাতন্ত্র, যুদ্ধকালীন কমিউনিজম—সব কিছু মিলিয়ে 'পার্টির নেতৃত্ব'র ওপর নির্ভর করতে লেনিন বাধ্য হলেন। আমলাতন্ত্রের বিকাশের জন্য 'একশিলা' নকশাটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাশিয়ায় বিপ্লবের আগে যে স্বৈরতন্ত্র চলত, আস্তে আস্তে সোভিয়েত দেশেও তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। পরে পার্টিও যে আমলাতন্ত্রের খপ্পরে চলে যাবে লেনিন নিশ্চয় সেটা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাই ঘটল। এই ঘটনাগুলোই পুরো পরিস্থিতিকে নিয়ে গেল ১৯৯১ সালের দিকে।

বিংশ শতাব্দী ছিল বর্ণময়। আগেই বলেছি। লেখা হয়েছে বহু বহু মহাগ্রন্থ। যাঁরা লিখেছেন তাঁরাও সমাজের বুকে দাগ রেখে গেছেন। মাও-জে-দং, ফিদেল কাস্ত্রো, হো চি মিন-এর মতো নেতারা কেবলমাত্র নিজের দেশে সফল বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাই না, বিপ্লবের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। গড়ে উঠেছে এক একটা রাজনৈতিক পুস্তক। প্রয়াত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর বর্ণময় বিপ্লবীরা। বেঁচে আছেন কাস্ত্রো। এখনও সামরিক পোষাক আর রাইফেল তাঁকে টানে। কিন্তু বয়স তাঁকে রেহাই দেয়নি। সমস্ত কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। পুরোনো দিনের মতো গমগমে গলায় পাঁচ ঘণ্টা তো দূর অস্ত। বিপ্লবের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র চৌত্রিশ। পিঠে বন্দুক নিয়ে এক টানা কুড়ি দিন হাঁটতে পারতেন। পরশু খেয়েছেন কিনা মনে করতে পারতেন না। আজ সে দিন অস্ত গেছে। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো বেঁচে আছেন, বিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্য বয়ে একবিংশ শতাব্দীতে বর্ণময় হয়ে।

একবিংশ শতাব্দী মার্কসবাদীদের কাছে অনেক নতুন তত্ত্ব নিয়ে এসেছে। পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে নানাভাবে। চিরায়ত গ্রন্থগুলিই আমাদের নতুন পৃথিবী গড়ার পথ দেখাবে।

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সেনেরডাঙ্গা রাজরাজেশ্বর হিমঘর প্রা. লি.

সেনেরডাঙ্গা, বহরকুলি, বর্ধমান

Sl. No. 139

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষ : বাঙালি সৈনিকের যুদ্ধ-সাহিত্য

সুমিতা চক্রবর্তী

তারিখটি ছিল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই। এই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের একশো বছর আগে শুরু হয়েছিল সেই যুদ্ধ। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সেই যুদ্ধ আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম মহাযুদ্ধ বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নামে অভিহিত। নির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ কারণ একটা ছিল। কিন্তু প্রকৃত কারণ ছিল শিল্প-বিপ্লবের ফলে শক্তিশালী হয়ে ওঠা বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাম্রাজ্য বিস্তারের এবং বিত্তবান হয়ে ওঠবার বাসনা। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড খানিকটা ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং খানিকটা প্রতিযোগিতার রাস্তায় বিশ্বের দুর্বলতর দেশগুলির উপর সাম্রাজ্য স্থাপনের এবং বাণিজ্য বিস্তারের প্রয়াসে ছিল তৎপর। বিশ শতকের প্রারম্ভ-লগ্নে সেই তৎপরতা অনেকটাই প্রকাশ্য সমর-লিপ্সায় পরিণত হয়। এই ভিত্তিভূমি এবং চালচিত্র যখন প্রস্তুত তখনই ঘটে গেল প্রত্যক্ষ অগ্নি-সংযোগ। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি-র যুবরাজ আর্চ ডিউক ফ্রানৎস ফার্দিনান্দ গিয়েছিলেন বসনিয়া-র রাজধানী সেরাজেভো শহরে। সেখানে গ্যাভ্রিলো প্রিন্সেপ্ নামে এক যুবক তাঁকে হত্যা করেন। গ্যাভ্রিলো ছিলেন যুগোস্লাভিয়া-র জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য। অস্ট্রিয়ার স্লাভ অধিবাসীরা সার্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছিলেন এবং সেই দাবিতে গড়ে তুলেছিলেন আন্দোলন। সেই কারণে অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দোষারোপ করেছিল সার্বিয়া-কে। প্রথমে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এগারোটি দাবি সংবলিত এক চিঠি পাঠায় সার্বিয়া-কে। সার্বিয়া দুটি দাবি পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করে এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। সে-সব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং আক্রমণ করে সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি তখন যে-কোনো অছিলায় পরস্পরকে আক্রমণ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। দু-দিনের মধ্যেই সার্বিয়াকে সমর্থন জানায় রাশিয়া। তার প্রতিক্রিয়ায় ১ অগস্ট তারিখে জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। দু-দিন পরেই ৩ অগস্ট তারিখে জার্মানি ফ্রান্স-এর বিরুদ্ধেও ঘোষণা করে যুদ্ধ। অথচ জার্মানির দিক থেকে এই যুদ্ধে নেমে পড়বার কোনোই কারণ ছিল না।

ফ্রান্স এবং ব্রিটেন-এর একটি মৈত্রী ছিল। ফলে ফ্রান্স আক্রান্ত হলে চুক্তি অনুসারে ব্রিটেনও ৪ অগস্ট যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। অথচ সেই মুহূর্তে ফ্রান্স ও ব্রিটেন—কেউই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না।

যুদ্ধের সময়ে ন্যায়-নীতি মানে না প্রায় কোনো দেশই। বেলজিয়াম ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কিন্তু ফ্রান্স আক্রমণ করতে গিয়ে জার্মানি তার সেনাবাহিনী চালিয়েছিল বেলজিয়াম-এর ওপর দিয়ে। বেলজিয়াম-এর ওপর শুরু হল জার্মান সৈন্যদের অত্যাচার। ছোটো দেশ বেলজিয়াম-কে যুদ্ধ করতেই হল। এবং ১৩ অগস্ট পর্যন্ত তারা জার্মান সেনাবাহিনীকে আটকে রাখতেও সমর্থ হল। সেই অবকাশে নিজেদের অনেকটা গুছিয়ে নিতে পেরেছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম বলি ছিল নির্দোষ, নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র দেশ বেলজিয়াম।

পূর্ব ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার দেশগুলি ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ভাবে জড়িয়ে পড়ে এই যুদ্ধে। প্রথম মহাযুদ্ধের দুটি পক্ষকে অভিহিত করা হয় সেন্ট্রাল ফোর্স বা কেন্দ্রবাহিনী এবং অ্যালায়েড

ফোর্স বা মিত্রবাহিনী নামে। সেন্ট্রাল ফোর্স-এর প্রধান শক্তি ছিল জার্মানি এবং অ্যালায়েড ফোর্স-এর প্রধান শক্তি ছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেন। বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন কারণে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে তুরস্ক অর্থাৎ ওটোমান সাম্রাজ্য (১৯১৪) এবং বুলগেরিয়া (১৯১৫) যোগ দেয় জার্মানি তথা কেন্দ্র-বাহিনীর পক্ষে। তুরস্ক যোগ দেবার ফলে যুদ্ধ বিস্তৃত হয়ে যায় ককেশাস, মেসোপটেমিয়া এবং সিলাই অঞ্চলে। অপরপক্ষে ইতালি (১৯১৫), পোর্তুগাল (১৯১৫), রুমানিয়া (১৯১৬) যোগ দেয় মিত্রবাহিনীর পক্ষে। যুদ্ধের শেষের দিকে, ১৯১৭-তে মিত্রবাহিনীর পক্ষে যোগ দেয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চিন। এই ভাবেই ইউরোপ-এর শক্তিগুলির প্রাথমিক দ্বৈরথ এশিয়াতেও ছড়িয়ে যায়।

জার্মানি প্যারিস-এর দিকে অগ্রসর হবার পথে বাধা পাবার ফলে সেই সীমান্ত-রেখা বরাবর গড়ে ওঠে পশ্চিম রণাঙ্গন বা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। ভূগর্ভে বিস্তীর্ণ ট্রেঞ্চ কেটে চলতে থাকে দীর্ঘকালীন যুদ্ধ। অন্যদিকে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করবার ফলে সেই প্রান্তের যুদ্ধাঞ্চলকে বলা হয় পূর্ব রণাঙ্গন বা ইস্টার্ন ফ্রন্ট। যুদ্ধের শুরুতে পূর্ব-প্রস্তুতি থাকায় জার্মানি কিছুটা সফল হয়। কিন্তু ক্রমেই ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়া গড়ে তোলে উপযুক্ত প্রতিরোধ। এক সঙ্গে দুটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালানো জার্মানির পক্ষে অসুবিধাকর হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে পরাস্ত করে।

যুদ্ধের গতি-প্রকৃতিতে একটি বড়ো পরিবর্তন আসে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে। রুশ বলশেভিক পার্টির বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার জারতন্ত্রের পতন হয়। রাশিয়াতে নতুন রাষ্ট্রনীতি সহ নতুন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটে লেনিন-এর নেতৃত্বে। এই নতুন শাসনতন্ত্রের ভিত্তি ছিল সমাজতন্ত্রবাদ। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারাই সংগঠিত হচ্ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের সঙ্গে কোনো সংযোগ রাখতে চায়নি সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র। ফলে মিত্রবাহিনীর জোট থেকে রাশিয়া বেরিয়ে আসে। যুদ্ধে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে।

যুদ্ধ ক্রমে শেষ হবার দিকে অগ্রসর হয়। কেন্দ্র-বাহিনী পরাস্ত হতে শুরু করে। ছোটো দেশগুলি অস্ত্রত্যাগে বাধ্য হয়। জার্মানিতে শুরু হয়ে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি অস্ত্র ত্যাগ করে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর; জার্মানি অস্ত্র ত্যাগ করে ১১ নভেম্বর। সূচিত হয় অ্যালায়েড ফোর্স-এর জয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

এই যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কী? মিত্রবাহিনীর অন্যতম প্রধান সদস্য ব্রিটেন-এর উপনিবেশ ভারত এই যুদ্ধে যোগদান করতে একরকম বাধ্যই ছিল। সেই বাধ্যতার দিকটিই প্রথমে দেখা যাক। ব্রিটিশ শাসকের সেনাবাহিনীতে ছিল একাধিক ভারতীয় রেজিমেন্ট। শিখ, জাঠ এবং গোর্খা রেজিমেন্ট-এর ওপর অনেকটাই নির্ভর করত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র। প্রথমেই একটি ভারতীয় ব্রিগেড প্রেরিত হয় তুরস্ক-এ ইউফ্রেটিস নদীর মুখে তেল কোম্পানির পাইপ-লাইন রক্ষা করবার জন্য। তুরস্ক যুদ্ধ ঘোষণা করলে সরকারের আরও দুটি রেজিমেন্ট সেখানে যায় এবং পৌঁছয় মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত। ভারতের সেনাবাহিনীতে ব্রিটিশের তুলনায় ভারতীয় ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারত থেকে পাঠানো হয় আশি হাজার ব্রিটিশ এবং দু-লক্ষ তিরিশ হাজার ভারতীয় সৈন্য। ভারতে রাখা হয়েছিল মাত্র পনেরো হাজার সেনাকে। উপরন্তু পূর্ব-সীমান্তের রণাঙ্গনে ভারত থেকে পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসকদের একটি দল। তার অন্যতম সদস্য ছিলেন বাঙালি চিকিৎসক ডাক্তার শিশিরপ্রসাদ সর্বাধিকারী। পরে, মুক্তি পেয়ে ডাক্তার সর্বাধিকারী লিখেছিলেন একটি স্মৃতিকথা—নাম 'আভি লে বাগ্‌দাদ'। এছাড়াও সমকালের কোনো কোনো পত্রিকায় বাঙালি সৈনিকের সঙ্গে চিকিৎসক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের দলের সঙ্গে প্রেরিত ব্যক্তিদের কিছু কিছু স্মৃতিচিত্র ও দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের শেষে সেগুলির কয়েকটি উল্লিখিত হল।

ভারতীয় তথা বাঙালি মানসের সঙ্গে এই যুদ্ধের ছিল বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক।

ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ১৯১৪-র ৪ অগস্ট। স্বাভাবিকভাবেই ভারতেও যুদ্ধাবস্থা ঘোষিত হয় ৫ অগস্ট তারিখে। সংবাদপত্রের ওপর জারি হয় অর্ডিন্যান্স। তার উদ্দেশ্য ছিল সরকার-সমর্থিত যুদ্ধের সংবাদ প্রচার করা। ভারতে তখন জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে প্রায় তিরিশ বছর। কংগ্রেস-এর নেতৃবৃন্দও কোনো ব্যাপারে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করবার মতো পরিস্থিতি গড়ে নিয়েছেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হতেই, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-এর বার্ষিক অধিবেশন ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঘোষিত হয় যুদ্ধে যথাসম্ভব সাহায্য করবার নীতি। গান্ধীজি, সরোজিনী নাইডু, বালগঙ্গাধর টিলক—সকলেই বলেছিলেন যে, ভারত-সম্রাটের দুর্দিনে ব্রিটিশ-শক্তিকে নিঃশর্ত সহায়তা দানই ভারতের কর্তব্য।

এর মূলে অনেকটাই ছিল একটি রাজনৈতিক প্রত্যাশা। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আভাস দেওয়া হয়েছিল যে, যুদ্ধে জয় হলে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যদানের প্রতিদান স্বরূপ ভারত পাবে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' তথা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। তখন বলা হয়েছিল 'স্বরাজ'। গান্ধীজি বিশ্বাস রেখেছিলেন এই কথায়। কিন্তু যুদ্ধশেষে যখন ঔপনিবেশিক শাসকেরা কথা রাখেনি তখন ভারতীয়দের মনে জেগেছিল যথেষ্ট ক্ষোভ। গান্ধীজির সিদ্ধান্তের প্রতিও অনেকে বিরূপ হয়েছিলেন। এই ক্ষোভেরই প্রকাশ ছিল কাজী নজরুল ইসলামের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার পঙক্তিতে—''আমরা তো জানি আনিতে স্বরাজ পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস।'' গান্ধীজিও প্রথম মহাযুদ্ধের পরে শুরু করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-এর এই ঘোষণা ব্রিটিশ শাসকের আচরণে কোনো শোভনতা নিয়ে আসেনি। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে না জানিয়েই ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ জারি করা হয় 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'। সন্দেহের বশে যে-কোনো ভারতীয়কে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ রাখা চলতে থাকে অবাধে। সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য ভারতীয়দের ওপর জোর করা হয়, চাপ দেওয়া হতে থাকে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবার ওপরেও। ফলে পরিস্থিতিগত কারণে—ঔপনিবেশিক শাসক তথা মিত্রবাহিনীকে সমর্থন করলেও ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ক্ষোভ বেড়ে যেতে থাকে।

ভারতীয় রাজনীতিতে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই জেগে উঠেছিল সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মকাণ্ড। 'অনুশীলন দল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০২-এ। 'যুগান্তর দল' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল ১৯০৬-এর মধ্যেই। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ উত্তাল হয়েছিল ১৯০৫-এ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ১৯১১-তে এই প্রস্তাব রদ হওয়ায় বাঙালি নিজেদের আন্দোলনের সাফল্যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থানের অনুষঙ্গে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল ১৯০৮-এ। আর একবার আবেগে মথিত হয়েছিল সারা দেশ।

বিপ্লবীরা কংগ্রেস-সমর্থক ছিলেন না। ব্রিটিশ প্রভুর কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন প্রার্থনা করাও পছন্দ ছিল না তাঁদের। তাঁরা চেয়েছিলেন

সরাসরি বিপ্লবী উত্থান। যুদ্ধ শুরু হলে তাঁদের মনে হল যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেন যখন এই যুদ্ধ নিয়ে কিছু বিব্রত তখনই বিপ্লবী উত্থানের যথার্থ সময়। সত্যিই তাঁরা একটি উত্থানের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। সেই সময়ে আমেরিকা ও কানাডায় ছিলেন অনেক প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী। বিশেষ করে প্রবাসী শিখদের মধ্যে চলতে থাকে বিপ্লবের পরিকল্পনা। জার্মানি ব্রিটেন-এর প্রতিপক্ষ হওয়ায় তাঁরা জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমেরিকায় ১৯১৩-তে প্রতিষ্ঠিত হয় গদর পার্টি। বাংলার বিপ্লবীদের নেতা তখন ছিলেন রাসবিহারী বসু এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন নামেই ছিল যাঁর পরিচয়। বিপ্লবের দিন স্থির হয় ১৯১৫-র ২১ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন সামরিক ছাউনিতে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছিল যোগাযোগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুপ্তচরেরা সন্ধান পাওয়ায় সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। অনেকটা এই কারণেই 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট্' চালু করে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। নামমাত্র বিচারের পর কারো কারো ফাঁসি হয়; অনেককেই কারাবন্দি করে রাখা হয় দীর্ঘ মেয়াদে—আন্দামানে এবং বাংলার বিভিন্ন জেলে। এই ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দেই বুড়িবালাম নদীর তীরে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় বাঘা যতীনের। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সংগ্রাম ও মৃত্যুও বাঙালির মনে সৃষ্টি করেছিল গভীর ভাবাবেগ।

এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই আমরা পেয়েছিলাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বাঙালি সৈনিকদের। তার আগে চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ এবং দপ্তরকর্মী রূপে সেনা-বিভাগে বাঙালিরা ছিলেন কিন্তু অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে নয়। বাঙালিকে সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করবার আইন ছিল না। এই সময়ে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন বাঙালিরাই। বাঙালি যুদ্ধ-বিগ্রহে অপারগ—এই ধারণা ভাঙতে চেয়েছিলেন তাঁরা। প্রথমত মনে করেছিলেন যে, অস্ত্রশিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ ভবিষ্যতে বাঙালির উপকারে আসবে। গঠিত হল 'বেঙ্গলি ডাব্‌ল্ কোম্পানি', পরে জন্ম হয় 'ফর্টিনাইন্থ্ বেঙ্গলি রেজিমেন্ট'। এই সৈনিকদের মধ্যেই একজন দেখা দিলেন বাংলার অন্যতম সাহিত্যিক রূপে।

কাজী নজরুল ইসলামের সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার বিবরণ বহুপঠিত আমাদের। রানিগঞ্জ শিয়ারসোল রাজ স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র নজরুল এবং তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের একটি দিনে দেখলেন স্টেশনে একটি ট্রেনে করে বাঙালি যুবকেরা চলে গেলেন যুদ্ধে। উদ্বেলিত হৃদয়ে তাঁর নাম লেখালেন যুদ্ধে যাবার জন্য। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল চলে গেলেন প্রশিক্ষণ শিবিরে লাহোর এবং করাচিতে। শৈলজানন্দ যেতে পারলেন না। পথে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সরলাদেবী চৌধুরাণী।

সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুল

সৈনিক বেশে নজরুল

এই সেনা-শিবিরই বস্তুত সাহিত্যিক কাজী নজরুল ইসলামকে যথার্থভাবে গড়ে তুলেছিল। প্রথমত, এখানেই তিনি জানলেন দেশ-বিদেশের রাষ্ট্র এবং বিশ্বজোড়া যুদ্ধটির প্রকৃত পরিস্থিতি। আইরিশ বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, সাম্যবাদ, লাল ফৌজ-এর কথা শুনলেন প্রথম। আন্তর্জাতিক মানসিকতার প্রথম পাঠ নিলেন এখানেই। ধর্মীয় গোঁড়ামির অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করলেন অন্তর থেকে। দ্বিতীয়ত, এখানেই তিনি মৌলবি সাহেবের কাছে ভালো করে শিখলেন ফারসি। পড়লেন হাফিজ্-এর কবিতা। সঙ্গীতচর্চাতেও ছেদ পড়ল না। দেশ-বিদেশের সঙ্গীতের সঙ্গে এখানেই তাঁর পরিচয় ঘটে। তৃতীয়ত, এই সেনা-শিবিরেই অবকাশ পূরণে শুরু হল তাঁর নিয়মিত সাহিত্য-চর্চা—গদ্য এবং কবিতা।

পশ্চিম এশিয়ার, বিশেষ করে তুরস্কের যুদ্ধ-সীমান্তে কী ঘটছে তার সংবাদ-সূত্রে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কেও আগ্রহ জেগেছিল তাঁর। সেই সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যে স্বাভাবিক বন্ধন-অসহিষ্ণু, বিদ্রোহী মানসিকতা তাকেই কবিতায় রূপায়িত করবার প্রেরণাও তিনি পেয়েছিলেন এই যুদ্ধ-শিবির থেকেই।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় সরাসরি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ পাওয়া না গেলেও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'অগ্নিবীণা'-র কবিতাগুলিতে যে উদ্দীপ্ত সংগ্রামী মনোভাব এবং অজস্রবার যুদ্ধ-সংক্রান্ত ইমেজের প্রয়োগ তাকে বাংলা কবিতায় প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী' ইত্যাদি কবিতা রণক্ষেত্রের প্রতিধ্বনিকে বাংলা কবিতায় ঝংকৃত করে তুলেছিল।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা 'কামাল পাশা'। গ্রিস-এর সঙ্গে তুরস্ক-এর যুদ্ধে বিজয়ী তুরস্ক-এর নেতা কামাল পাশাকে সংবর্ধনা দান উপলক্ষে রচিত এই কবিতায় সৈনিকদের মার্চ করবার দৃশ্য এবং

শৈলী চমৎকার ফুটে উঠেছে। কবিতার মধ্যেই আছে লেফ্‌ট-রাইট, কুইক মার্চ, লেফট হুইল, রাইট হুইল, ফরওয়ার্ড, হল্ট, অ্যাজ ইউ ওয়্যার ইত্যাদি শব্দও। সমস্ত কবিতাটি রচিত হয়েছে সেনাবাহিনীর মার্চ করার সুরেই।

'অগ্নিবীণা'-র আর একটি কবিতা 'আলোয়ার'। অতীত ইতিহাস থেকে তুলে নেওয়া এক যুদ্ধ-বন্দির মর্ম-যন্ত্রণার বাণী। কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌-এর কারাগারে গ্রিস ও তুরস্ক-এর যুদ্ধের কালের এক কল্পদৃশ্য এই কবিতার অবলম্বন।

'রণভেরি' কবিতাটি লিখিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই প্রসঙ্গে। পূর্বসীমান্তে গ্রিস-এর সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল তুরস্ক সরকারের। সেই যুদ্ধে ভারত থেকে দশ হাজার সৈনিক পাঠাবার প্রস্তাব শুনে লিখিত এই কবিতা—

মোরা সৈনিক, মোরা শহিদান বীর বাচ্চা!
মরি জালিমের দাঙ্গায়!
মোরা অসি বুকে বরি হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই।
ওরে আয়!
ওই মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণভেরি শোনা যায়!!!

বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'শাত্‌-ইল-আরব' নামের কবিতাটি। 'শাত-ইল-আরব' এক নদীর নাম। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের সময় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে জেনারেল টাউনসেন্ড-এর নেতৃত্বে তুরস্ক-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য পাঠানো হয় ভারতীয় বাহিনী। কিন্তু বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছেও তুর্কিদের আক্রমণে ভারতীয় সেনাবাহিনী পরাস্ত হয় এবং তুর্কিদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে একটি দুর্গে বন্দি হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। পরে জেনারেল টাউনসেন্ড ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিল আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় কবি লিখেছেন—

'কূত-আমারা'র রক্তে ভরিয়া
দজলা এনেছে লোহুর দরিয়া;
উগারি সে খুন তোমাতে দজলা নাচে ভৈরব 'মস্তানি'র।

ত্রস্তা-নীর
গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,—'শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর!'
দজলা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

'কূত-আমারা' হল সেই স্থান যেখানে জেনারেল টাউনসেন্ড বন্দি হন। কবি কবিতাটির পাদটীকায় এই অর্থনির্দেশ নিজেই করে দিয়েছেন। দজলা টাইগ্রিস নদীর নাম এবং ফোরাত হল ইউফ্রেটিস নদী। শাত-ইল-আরব নদীতে এই দুটি নদীর জল এসে মিশেছে। লক্ষণীয় যে, এই কবিতায় মিত্রবাহিনীর বিরোধী শক্তি তুরস্ক-এর বীরত্বের প্রসঙ্গই এসেছে। নজরুল প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেবার বাসনাকে লালন করলেও ব্রিটিশ শাসকের কাছে নিজের আনুগত্যকে বাঁধা দেননি।

কথাসাহিত্যে মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ নজরুল এনেছেন আরও সরাসরি। সবসুদ্ধ তিনটি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। প্রথম উপন্যাস 'বাঁধনহারা'-র গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ। ধারাবাহিকভাবে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ ১৯২১-এ; নজরুলের বয়স তখন বাইশ। সমগ্র উপন্যাসটি পত্র-রীতিতে রচিত। দুটি মুসলমান পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরকে চিঠি লিখেছেন। মাঝে মাঝে পত্র-লেখক ও প্রাপক রূপে অন্য কোনো বান্ধবীও আছে। প্রধানত লেখাটি প্রেমভাবনা-ভিত্তিক সামাজিক উপন্যাস। একটি পরিবারের যুবক নূরুল হুদা গেছে যুদ্ধে। সেই যুদ্ধের সেনা-প্রশিক্ষণ শিবিরে সে আছে নজরুলের মতোই। সেখান থেকে লেখা চিঠিতে মাঝে মাঝে আছে নিজের অতিবাহিত দিনগুলির ছবি। এমনই একটি চিত্র পাই বন্ধু মনুয়র-কে লেখা পত্রে—

> গান হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দুচারজন সমঝদার টেবিল, বই, খাটিয়া যে যা পেয়েছেন সামনে, তাই তালে বেতালে অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলেছেন। এক একজন যেন মূর্তিমান 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। আবার দু একজন বেশি রকমের রসজ্ঞভাবে বিভোর হয়ে গোপাল রায়ের অনুকরণে—'দাদা গাই দেখ্‌সে, শা...তোর কি হোলোরে' ইত্যাদি সুমধুর বুলি অবিরাম আওড়িয়ে চলেছেন। ...সঙ্গে সঙ্গে বুটপট্টিপরা পায়ে বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য!

সরাসরি যুদ্ধ-প্রসঙ্গ খুব বেশি আসেনি উপন্যাসটিতে। প্রণয়-জনিত ভাবাবেগের সুরই বেশি। কিন্তু নূরুল-এর চিঠিতে যুদ্ধের পরিণামে ধ্বংস, মৃত্যু, জীবন সম্পর্কে উদাসীনতার উক্তি এসেছে বারবার।

'বাঁধনহারা'-কে বলা যেতে পারে যুদ্ধ-প্রসঙ্গ সংবলিত প্রথম বাংলা উপন্যাস। সরাসরি যুদ্ধ না হোক; যুদ্ধ-প্রস্তুতিব্যস্ত, সমরোদ্যত দেশের ও সৈনিকদের মানসিকতা এই উপন্যাসে জ্বল জ্বল করে উঠেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে সৈনিকের জীবন, আধুনিক কালের যুদ্ধের বাতাবরণ নজরুলের লেখার আগে কোথাও-ই নেই। উনিশ শতকীয় উপন্যাসগুলিতে পাঠান-মোগলের সঙ্গে রাজপুত-মহারাষ্ট্রীয়দের যুদ্ধ বর্ণনা আছে। অতীত ইতিহাস থেকে কল্পনা তায় গড়ে নেওয়া। যুদ্ধ নিয়ে, সৈনিক-জীবন নিয়ে বাংলা উপন্যাসের প্রসঙ্গে মনে পড়ে দুটি মাত্র নাম—বরেন বসুর 'রংরুট (১৯৫১) আর দেবেশ দাশের 'রক্তরাগ' (১৯৫৬)। দুটিতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছে অবলম্বন। দুটি উপন্যাসই নজরুলের অনেক পরে লেখা।

'বাঁধনহারা' উপন্যাস থেকে নূরুলের তথা লেখক নজরুলের সৈনিক জীবনের কয়েকটি চিত্র তুলে দেওয়া গেল—

> আজকাল খুব বেশি প্যারেড করতে হচ্ছে। দুদিন পরেই আহুতি দিতে হবে কি না! আমি পুনা থেকে বেয়নেট যুদ্ধ পাশ করে এসেছি। এখন যদি তোমায় আমার এই শক্ত শক্ত মাংসপেশীগুলো দেখাতে পারতাম।... এখন আসি। 'রোল কলের' অর্থাৎ হাজিরা দেবার সময় হল। হাজিরা দিতে এসে বেল্ট, ব্যান্ডেলিয়র বুট, পট্টি (এসব হচ্ছে আমাদের রণসাজের নাম) দস্তুর মতো সাফ-সুতরো করে রাখতে হবে। কাল প্রাতে দশ মাইল 'রুট মার্চ' বা পায়ে হন্টন।
>
> হ্যাঁ, তারপর আমায় কি করতে হয় শোন। সামনের একটা ছোট্ট তালতমালহীন পাহাড় বারকতক দৌড়ে (ডবল মার্চ করে) প্রদক্ষিণ করে আসা—সেই দৌড়নোর মাঝে মাঝে 'ডবল টাইম' করা বা শিব ছাড়া যে সৈনিকেও তাণ্ডব নৃত্য করতে পারে, তা দেখিয়ে দেওয়া।—মধ্যে পরিখা-নল ডিঙিয়ে মর্কট-প্রীতি প্রদর্শন করা ইত্যাদি।
>
> তারপর বেলা এগারোটা-বারোটায় যে আকাঁড়া রেঙ্গুনি চালের সফেন ভাতের মণ্ড আর আ-ছোলা আলুর ঘেঁট খেতে পাই, তা দেখে আমরা বলদের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জীব বলে ত মনে হয় না।... সকালে একবার ভেলি গুড় দিয়ে তৈরি এক হাতা যা চা পাই, তা না বলে দিলে বহু গবেষণাতেও কেউ চিনতে পারবে না যে, এ আবার কোন্ চীজ!...অতক্ষণ খাবি খাওয়ার পর ঐ জাব খাওয়াই তখন পরম উপাদেয়,অমৃত বলে বোধ হয়। তারপর একটু বাদেই পাথর কুড়ানো, ভাঙানো, আবার সন্ধ্যায় ঐ রকম প্যারেড বা গোষ্ঠবিহার এবং আরো কত বিশ্রী-সুশ্রী কাজ। ...তবু কিন্তু বুক ফুলিয়ে বলচি বেড়ে আরামেই আছি।

উপন্যাসের মতোই নজরুলের গল্পেও যুদ্ধ-প্রসঙ্গ আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্পেই বেশি আছে বলে মনে হয়।

তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'ব্যথার দান'-এর প্রথম গল্প 'ব্যথার দান' ('বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', মাঘ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। সেই গল্পে নায়ক ও প্রতিনায়ক দুজনেই গেছে যুদ্ধে। তারও আগে প্রকাশিত তাঁর 'হেনা' (পূর্বোক্ত পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) গল্পের নায়কও গেছে যুদ্ধে—একেবারে ফ্রান্স থেকে আফগানিস্তান এই গল্পের স্থান বিস্তার। 'ঘুমের ঘোরে' ('নূর', ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) গল্পে নায়ক আজহার প্রণয়িনীকে বন্ধুর হাতে সমর্পণ করে যুদ্ধে গেল। দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'রিক্তের বেদন'-এর 'রিক্তের বেদন' ('নূর', বৈশাখ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) গল্পে একদল সৈনিক যুদ্ধে যাচ্ছে। তাঁর নিজেরই যুদ্ধে যাবার অনুভূতি এখানে—''জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে এ কি অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালিরা—আমার ভাইরা।'' যুদ্ধে যাবার পথ এই গল্পে পাই—সালার, অন্ডাল, মধুপুর, লাহোর, নৌশেরা, কুর্দিস্তান, কারবালা। এই গল্পে অবশ্য যুদ্ধের বিবরণ খুবই ভাসাভাসা। কার সঙ্গে কার যুদ্ধ খুব পরিষ্কার বোঝা যায় না। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' ('সাওগাত', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) নজরুলেরই আত্মকাহিনির অংশ। এক পল্টন যুবক বিবৃত করছে নিজের কথা। এতেও আছে সৈনিক-জীবনের প্রসঙ্গ ও বিবরণ।

'হেনা' গল্পটি সর্বাধিক উল্লেখ্য। হেনা নামের তরুণী তাকে ভালোবাসে না—এই জেনে নায়ক সোহরাব চলে গেছে প্রথম মহাযুদ্ধে একেবারে ফ্রান্স। সেখানে ভার্দুন-এর ট্রেঞ্চ থেকে সে লিখছে নিজের কথা। লুইস গান, রাইফেল, বোমাবর্ষণ চারিদিকে। তৃষ্ণার্ত সৈনিক মৃত বন্ধুর জলের বোতল থেকে তৃপ্তি করে জল খায়। বন্ধুর মৃত্যু নিয়ে ভাবার সময় নেই। বিস্তৃত যুদ্ধবর্ণনা। গোর্খা আর গাড়োয়ালি সৈন্যদের বীরত্বের প্রশংসা—''এদের কুকরি দেখলে জার্মানরা রাইফেল ছেড়ে পালায়।'' যুদ্ধের ক্যাম্প-এও সাদা আর কালো-বাদামি সৈনিকদের মধ্যে বিভেদ করা। ব্রিটিশ সৈনিকদের শৃঙ্খলাবোধের গুণগান। এসব নিজে না দেখলে লিখতে পারতেন না। নায়ক সোহরাব-এর দুটি অনুভব মুহূর্ত—

''পাশের মরা বন্ধুর গায়ে ঠেস দিয়ে দিব্যি একটু আরাম করে নেওয়া যাক।''

এই যুদ্ধের খুনোখুনির কি মাদকতা শক্তি! মানুষ মারার কেমন একটা গাঢ় নেশা!... কি ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী।'' যুদ্ধ-মনস্তত্ত্ব মানুষকে অ-মানবিক করে দেয়। এরিশ মারিয়া রেমার্ক-এর ('অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট') মতো করে বিষয়টি তুলে ধরতে নজরুল পারেননি নিশ্চয়ই। সে কথাই ওঠে না। তবু নিজের মতো করে যুদ্ধ-মনস্তত্ত্বটা ধরবার চেষ্টা করেছিলেন নজরুল।

'ব্যথার দান' গল্পে বেদৌরা নামে নায়িকার চিত্ত জয়ে প্রাথমিকভাবে ব্যর্থ হয়ে নায়ক দারা (পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল নূরন্নবী) যুদ্ধে যায়। প্রতিনায়ক সয়ফুল মুল্ক্‌ও যুদ্ধে যায়। এই গল্পে আছে রুশ বিপ্লবী নিয়ে সেনাবাহিনীতে আলোড়নের প্রসঙ্গ। দারা এবং অনুতপ্ত সয়ফুল লাল ফৌজ-এ যোগ দিয়েছে। সেনাবাহিনী থেকে এমনই লিখে পাঠিয়েছিলেন নজরুল। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'-য় মুজফফ্‌র আহমদ তা বদলে দিয়ে করেন 'মুক্তি সেবক ফৌজ'। তখন ব্রিটিশ ভারতে 'লাল ফৌজ'-এর নাম করা ছিল বিপজ্জনক। নজরুল সত্যিই 'লাল ফৌজ' বলতে রুশ সেনাবাহিনী বুঝিয়েছিলেন কি না, সত্যিই কোনো ব্রিটিশ বাহিনীভুক্ত

মুজফ্‌ফর আহমদ-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় নজরুল

ভারতীয় সেনা লাল ফৌজ-এ যোগ দিয়েছিল কি না—তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে মুজফফ্‌র আহমদ খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন—''লাল ফৌজের যে-সব অন্তর্জাতিক ইউনিট দক্ষিণ রাশিয়ায় যুদ্ধ করছিলেন তাঁদের ভিতরে ভারতীয়েরাও ছিলেন।'' ('কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৮১, পৃ. ১০৪) মুজফফ্‌র আহমদ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৫৭ সালে মস্কো-র 'ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস পাবলিশিং হাউস' থেকে প্রকাশিত 'ইন্ কমন্ দে ফট্' নামক পুস্তকে প্রাপ্ত বিবিধ তথ্যের উল্লেখ করেছেন। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৪)। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিকথাতেও লাল ফৌজে ভারতীয় সৈন্যের যোগদানের কথা যথেষ্ট বিস্তৃতভাবেই আছে বলে মুজফফ্‌র আহমদ জানিয়েছেন (ঐ, পৃ. ১০৪-০৫)। এরপর বোধহয় অনেকটাই অসংশয় হওয়া যায় যে, 'ব্যথার দান' গল্পের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলির একটা সম্ভাব্যতা আছেই। তা ছাড়া যুদ্ধের পরিবেশ যেভাবে বিবৃত হয়েছে গল্পটিতে, তার অনেকটাই অভিজ্ঞতাজাত। একেবারে নিজে রণক্ষেত্রে না নামলেও যখন যুদ্ধ চলছে তখন সৈনিকের শ্রুত অভিজ্ঞতারও অনেকটা সত্যতা থাকে। এইভাবেই কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বাঙালির সাহিত্যে এনে দিয়েছেন প্রথম। সৃষ্টিশীল সাহিত্যে সম্ভবত তিনিই একমাত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন যে সৈনিকেরা, যে চিকিৎসকেরা, যে প্রযুক্তিবিদরা এবং যে দপ্তরকর্মীরা তাঁদের কেউ কেউ লিখে গেছেন নিজেদের স্মৃতিকথা। সেগুলির কোনো কোনোটি সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও তা সংখ্যায় খুবই কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যুদ্ধ-প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু বেশ অনেকগুলো। প্রধানত 'মানসী ও মর্মবাণী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী', 'গম্ভীরা' এবং 'সবুজ-পত্র' পত্রিকায় লেখাগুলি পাওয়া গেছে। প্রবন্ধগুলির তালিকা আমরা দিচ্ছি না, কিন্তু আত্মকথা এবং স্মৃতিকথা জাতীয় রচনাগুলি সৃষ্টিশীল সাহিত্যের কাছাকাছি বলে সেগুলির উল্লেখ করা হল।

১. 'কূট-যুদ্ধে তুর্কীহস্তে বন্দী বাঙ্গালীর আত্মকাহিনী', কৃষ্ণবিহারী রায়, *মানসী ও মর্মবাণী*, আশ্বিন, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

২. 'বাঙ্গালী সৈনিকের দৈনন্দিন লিপি', হারাধন বক্সী, *সাহিত্য*, শ্রাবণ-কার্তিক ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

৩. 'ফরাসী রণাঙ্গনের কথা', হারাধন বক্সী, *সাহিত্য*, ভাদ্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ

* আগ্রহী পাঠকেরা পড়ে নিতে পারেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ গ্রন্থ দেবব্রত ঘোষ ও সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত *প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শতবর্ষে ফিরে দেখা*, দীপ প্রকাশন, ২০১৫

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ পানাগড় বাজার, জেলা : বর্ধমান, ডাক সূচক : ৭১৩১৪৮
দূরভাষ : (০৩৪৩) ২৫২৪৩০৭

জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামোন্নয়নে, ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এগিয়ে চলেছে। জনগণের পরামর্শ এবং গঠনমূলক সমালোচনা পঞ্চায়েতের প্রাণশক্তি। পরিচ্ছন্নতা, সুস্বাস্থ্যের প্রাথমিক শর্ত। নিজ গৃহ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিষ্কার রাখুন। নির্মল বাংলা গঠনে সহায়তা করুন।

মহঃ মুরশিদ আলি
উপপ্রধান

কাজল বাউরী
প্রধান

Sl. No. 13

ভিয়েতনাম অজেয়-অলঙ্ঘনীয়-অমর

সুশান্ত ব্যানার্জি

তখন হো চি মিন বিদেশে। ১৯৩০-৩১ সালে ভিয়েতনামে বিপ্লববহ্নিতে উত্তপ্ত, উত্তাল পরিস্থিতিকে বহু দূর থেকে নিবিড়-নিখুঁতভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে তার সাফল্য-ব্যর্থতা, ঘাটতিগুলি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে অবহিত ছিলেন এবং বিপ্লবের শুরু থেকেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অতি-বামপন্থী ঝোঁকের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শ খুব সুস্পষ্টভাবে নেতৃত্বের কাছে প্রথম থেকেই প্রকাশ করে আসছিলেন। সেগুলি সংশোধন এবং প্রতিরোধ করার পরিপূরক হিসেবে অবিলম্বে পার্টির স্বার্থে গণসংগঠনগুলিকে আশেপাশে গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে সময়োপযোগী শ্লোগান তুলে বক্তব্য হাজির করে চারপাশের নানা পেশার মানুষদের নিয়ে গণসমাবেশ-সংযোগ-সম্পর্ক ঘটানোর মধ্য দিয়ে বিপ্লবী শক্তিকে শুধু শত্রুপক্ষের আক্রমণের হাত থেকেই রক্ষা করা নয়, তার সাথে ধাপে ধাপে সংগঠনগুলিকে বিকশিত এবং শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি গভীরভাবে অনুশীলন-চিন্তাভাবনা করে চলেছিলেন।

মতাদর্শগত সংগ্রাম ও পার্টি সংগঠন

ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতিতেই তীব্র সংগ্রামের জোয়ার উঠলে যেসব বিপ্লব-বিরোধী শক্তি, বিপ্লবভীরু শক্তিগুলিই আত্মপ্রকাশ করে এই শিক্ষা তিনি মার্কস-লেনিনের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন। সেজন্য একদিকে পার্টিকে এদের সম্পর্কে সতর্ক করা এবং অন্যদিকে এই সমস্ত মতাদর্শবিরোধী ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় বেশি করে লেখা প্রকাশও শুরু করে দিয়েছিলেন, মূলত এদের মুখোশ উন্মোচন করা এবং মতাদর্শগত সংগ্রামে পার্টিনেতা ও কর্মীদের শিক্ষিত-সচেতন করে তোলার জন্য। পাশাপাশি বিপ্লবের শৈশব অবস্থায় শত্রুর দমনপীড়ন কীভাবে সামাল দিতে হবে, কীভাবে শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে হবে এবং সাংগঠনিক গোপনীয়তা কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে। সংগঠনের সমগ্র বাহিনীকেই বাইরে অপ্রকাশ্য রেখে তাদের জন্য গোপন সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তিনি পার্টি নেতৃত্বের কাছে বারবার নির্দেশ পাঠান।

দ্বিতীয়ত, ১৯৪০-৪৫ সালের মধ্যে হো চি মিন নেতৃত্বাধীন ভিয়েতনাম বিপ্লব, একটা চলমান সৃজনশীল তত্ত্বকে কীভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়, কীভাবে কখন মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে বিপুল তরঙ্গ তুলতে হয়, পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে হয় যাতে করে সমগ্র দেশের সমস্ত মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে গণসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার জন্য অত্যন্ত সুনিপুণভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় যাতে করে শত্রু নিপাত সুনিশ্চিত এবং অবধারিত হয়ে ওঠে, তারও পথ বাতলে যাচ্ছিলেন তিনি।

তৃতীয়ত, হো চি মিন-এর ছিল দুর্দমনীয় সাহস, প্রখর বুদ্ধি, অসাধারণ সৃজনশীলতা এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণের কুশলতা। তিনি বহু সংগ্রামের ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সময়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সাথে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে শত্রুশিবিরকে জোটবদ্ধ হতে দেননি। যেমন, কখনও কুয়োমিন্টাংপন্থী সৈন্যদের খানিকটা সুবিধা-সুযোগ ছেড়ে দিয়ে ফরাসি উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তিকে পুরোপুরি সংহত করেছেন। আবার কখনও ফরাসিদের সঙ্গে সামরিক সমঝোতা করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে চিয়াং কাইং-এর সৈন্যবাহিনী এবং তার গোলামদের এক সাথে দেশ থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াতেও সফল হয়েছেন।

চতুর্থত, শুধু পার্টি গঠনই নয়, ধারাবাহিকভাবে মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং সশস্ত্র সংগ্রাম এবং তাতে দেশের মানুষকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি যাতে পার্টিকে গ্রাস করতে না পারে সেদিকেও 'হো'-র ছিল প্রচণ্ড সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি। পার্টিই ছিল তাঁর দিবা-রাত্রির ধ্যানজ্ঞান, কি বিদেশে, কি দেশে—যেখানেই থাকুন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে দেশের চলমান পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য তিনি পার্টিনেতা, সদস্য এবং কর্মীদের অনবরত আহ্বান জানাতেন, সচেতন রাখতেন। শ্রমিকশ্রেণির সর্বাত্মক বিপ্লবের অভিমুখী অবস্থান, শিল্পায়নের গুণাবলী, মিতব্যয়িতা, সংহতি, গণমুখীনতা এবং আত্মত্যাগের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা এবং যৌথ নেতৃত্ব এবং চেতনা বৃদ্ধির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো, তার সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ঝোঁককে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য 'হো' বারবার আবেদন করতেন। ''পার্টিতে যাতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র পরিপূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে এবং নিয়মিতভাবে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার সুযোগ থাকে সে বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দিতেন। ''জনগণের সঙ্গে পার্টির নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলা, জনগণের কর্তৃত্বকারী ভূমিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং আমলাতান্ত্রিকতার বিপদ ও তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালাবার কথা তিনি বারবার করে পার্টিনেতা, সদস্য এবং কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। কেননা, এটা না হলে একটি ক্ষমতাসীন দল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধঃপতনের পথে নেমে যায় এবং তার চরিত্র পাল্টে যায়।"—ফামভান দঙ

পঞ্চমত, হো চি মিন শুধু পার্টি গঠনের দিকেই নজর দেননি। তিনি তো বুঝেছিলেন কী দুর্ধর্ষ আগ্রাসনে ভিয়েতনামকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেটা হিসাবের মধ্যে রেখেই তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন সকল কর্মধারার মূল প্রাণকেন্দ্র পার্টির উপর। পার্টির অধীনে সতত বিকাশমুখী ও নিখুঁত প্রণালী-প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থা/বিপ্লবকামী সংগঠন, প্রতিষ্ঠানকে সংঘবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ করাটা একান্তভাবে জরুরি। তাই গঠন করেছিলেন ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রন্ট, বিভিন্ন গণসংগঠন, জনগণের সশস্ত্রবাহিনী, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্থা। দেশের এবং বিদেশের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গোপনে নিরন্তর যোগাযোগ রাখতেন নিজে। এর সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলকথাকে অতি সাধারণ-সরলভাবে মনে গেঁথে দেওয়ার মতো এমনই সব কর্মসূচি আপামর জনগণের জন্য নেওয়া হত যার ফলশ্রুতিতে পার্টির গণবিস্তার এবং শক্তি বহুগুণেই বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা যায়—

(১) মাত্র পনের বছর বয়সের একটি তরুণ কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে, আশি বছর ধরে রাঘববোয়াল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফরাসিদের বিতাড়িত করে একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছে ভিয়েতনামের জনগণকে।

(২) দেশের অত্যন্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে দেশের ক্ষমতায় যখন এল 'ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' তখন দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ছাড়াও ফরাসিরা পশ্চাৎপদ দেশটির অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ধসিয়ে দিয়ে গেছে। বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখাটা তখন জীবন-মরণ সমস্যা। রাষ্ট্রক্ষমতাকে রক্ষা করাটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পার্টির সামর্থ্য, বিচক্ষণতা এবং দক্ষতার ওপর। এই অগ্নিপরীক্ষার প্রধান কাণ্ডারী লেনিনবাদে দীক্ষিত হো চি মিন। তাঁর প্রচণ্ড ধৈর্য, সংযম, দূরদৃষ্টি, কূটকৌশলের নমনীয়তা।

নবগঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব ও সাফল্য

নবগঠিত ক্যাবিনেটের প্রথম অধিবেশনেই হো চি মিন প্রস্তাবিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় : (১) দুর্ভিক্ষ, মহামারী; (২) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, (৩) জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে সুরক্ষা ও মর্যাদা দিতে যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠান, (৪) মদ, আফিম, জুয়া—যেগুলি মানুষের সর্বনাশ সাধনকারী, সেইসব ব্যাধিগুলির উচ্ছেদ, (৫) জনগণের সবচেয়ে অপমানজনক করগুলো—মাথাপিছু ট্যাক্স, বাজার ট্যাক্স, নৌকা পারানির ট্যাক্স রহিত করতে হবে, (৬) ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে।

নতুন সরকার ডিক্রি জারি করে একটা স্বাধীনতা তহবিল গঠন করল। এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের প্রত্যেকের কাছ থেকে খাদ্যস্বরূপ চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু করার প্রস্তাব রাখল। প্রেসিডেন্ট হো চি মিন বললেন, তিনি নিজেও থাকবেন চাল সংগ্রহে। তিনি দেশবাসীকে বলবেন, প্রতি দশ দিনে, দিনে একবার আহার বন্ধ করতে হবে (তিনি নিজে সহ)। বাঁচানো চাল পৌঁছে দেওয়া হবে গরিবদের ঘরে ঘরে।

ফলাফল : (১) লক্ষ লক্ষ মানুষ নেমে পড়ল দুর্ভিক্ষবিরোধী অভিযানে। হার মানল অনাহার। (২) জাতির কাছে হো চি মিনের আহ্বান অনুযায়ী সোনা, অর্থ, মূল্যবান জিনিসপত্র মেয়েদের দেওয়া অলংকার, পারিবারিক গহনাপত্র, মন্দির-মঠ প্রভৃতি ধর্মস্থানগুলি থেকে বহু রকম মূল্যবান দ্রব্য জমা পড়ল। সরকার গড়ে তুলল স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ। ফরাসি কলোনিওয়ালা আর তাদের ভিয়েতনামি তাঁবেদারদের জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে বিলি-বন্টন করা হল। আর চাষিদের জমির খাজনা কমানো হল শতকরা ২৫ ভাগ।

আগে থাকতেই বারবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি বলতেন—''মনে রাখবেন, সমস্ত সরকারি শাসন প্রতিষ্ঠান—কেন্দ্র থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত, জনগণের সেবকভৃত্য অর্থাৎ তাঁদের স্বার্থেই কাজ করে যেতে হবে।.. জনজীবনে সুখশান্তি না থাকলে স্বাধীনতাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।... মানুষদের ভালোবাসলে তবেই তো তাঁদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাবেন।" প্রত্যেককেই বলতেন, ''আমলা হবেন না। উঁচুদরের লোক হয়ে দাঁড়াবেন না। তাতে জনগণের সমর্থন হারাবেন। মুখের কথা কাজে করে দেখাবেন। ভালো উদাহরণ স্থাপনই সর্বত্র নেতৃত্ব দেবার সর্বোত্তম উপায়।" (সূত্র : প্রথম পদক্ষেপ)

হো চি মিনের অসাধারণ সাংগঠনিক কৌশল

জেনারেল ভোন্‌গুয়েন গিয়াপ বলেছেন, '' 'চাচা' হো-র একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল শত্রুর মনোভাব ও অনুভূতি ধরতে পারা। এক এক ধাঁচের এক একটি ব্যক্তির সঙ্গে সঠিক বাস্তব আচরণের পদ্ধতি খুঁজে বের করতেন সুনিপুণ কৌশলে। আসলে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিহিত ছিল আমাদের ন্যায্য লক্ষ্যের সমস্ত শক্তি।... শত্রুরা, এমনকি কুখ্যাত কমিউনিস্ট-বিরোধীও তাঁকে সম্মান করতেন। ওঁর সামনে এলেই যেন তাঁরা খানিকটা মারমুখো ভাব খুইয়ে বসতেন... কেউ কেউ বলেন, হো চি মিনের এই ক্ষমতার মূলে ছিল তাঁর ব্যাপক মানসিক উপলব্ধি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি ও তেজস্বিতা। আবার কেউ এই সঙ্গে আরোপ করেন তাঁর মজ্জাগত বিনয় আর সারল্য, আশাবাদ ও আস্থাশীলতা, তাঁর সোজা কথা ও কাজ, খোলা অন্তঃকরণের ওপরে।... প্রেসিডেন্ট হো-র ব্যক্তিত্বে সর্বাধিক গুরুত্বের দিকটা ছিল তাঁর স্বার্থশূন্যতা, তাঁর কামনা যে একটাই এবং সেটাই হল চূড়ান্ত—দেশের ও জনসাধারণের জন্য মহত্তম সুখ। ব্যক্তিগত

স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সামান্যতম আগ্রহের অভাব এমন একটি জীবনকে দিয়েছে অতি পবিত্রতার রূপ...। আমাদের জনগণের রাজনৈতিক শক্তি ও নৈতিক বলের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল পার্টি ও প্রেসিডেন্ট 'হো'-র পদ্ধতি কৌশলের চতুর প্রয়োগ যার ফলে প্রায় ২ লক্ষ সৈন্যবলের অধিকারী চিয়াং জঙ্গিবাজদের আক্রমণাত্মক বাসনা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল।"

একটা কঠিন চক্রব্যূহের ফাঁদে ফেলা হল ভিয়েতনামকে। সেটা একটু উল্লেখ না করলে হো চি মিনের অসাধারণত্ব সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে ফাঁক থেকে যেতে পারে। ১৯৪৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চুং কিং থেকে খবর এল, ৩১ মার্চের মধ্যেই ভিয়েতনাম থেকে চিনা সৈন্যদের ও তাদের বদলে ফরাসি ফৌজকে জায়গা করে দেওয়ার একটা চুক্তি হয়ে গেছে ফরাসি ও চীনাদের মধ্যে। চুক্তির শর্ত বলা হল ভিয়েতনামের পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক। ফ্রান্স পুনরায় ভিয়েতনামকে গ্রাস করে নেবার চেষ্টা করবে। হো চি মিন এবং তাঁর সহযোগীরা এটা তো বুঝলেনই, আর এটাও তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে, 'নামবোয়' (দক্ষিণ ভিয়েতনামে) ফরাসিরা এর মধ্যে যা করেছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। অর্থাৎ ভিয়েতনাম বিপ্লবের যা-কিছু অর্জিত সাফল্য সব তারা ধ্বংস করে ফেলতে ইতস্তত করবে না। অতএব ভিয়েতনামকে এখন দুটোর মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হবে—হয় পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, না হয় একটা রাজনৈতিক আপস-আলোচনার কৌশল গ্রহণ করা।

হো চি মিনের সম্মিলিত সরকারের একটি সভাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হল ফরাসিদের সঙ্গে সমঝোতার নীতি সঠিক হবে কিনা তাই নিয়ে। সভার আবহাওয়া প্রচণ্ড উত্তপ্ত। তারই মধ্যে হো চি মিন ফরাসিদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব তুলতেই পাল্টা প্রস্তাব এল—ভিয়েতনামে ফরাসিদের ফিরে আসার বিরুদ্ধে চীনাদের সামরিক সমর্থন চাওয়াই হোক না কেন?

এই বিতর্কের মধ্যেই হো চি মিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ ভরসায় কৌশলের পথটাই গ্রহণ করলেন। বর্তমানে যেটা সঙ্গতিপূর্ণ সেটাই অর্থাৎ শত্রুর পক্ষে যুক্তিসম্মত ত্যাগ স্বীকার, জনগণের সার্বভৌমত্বের অধিকার বাঁচিয়ে রাখতে একটা সাময়িক বোঝাপড়া, আর এই অবসরেই উপনিবেশবাদীদের ওপর আঘাত হানার জন্য নিজেদের শক্তিকে সুসংহত এবং গুছিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি। এই মওকায় ফ্রান্সের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সভায় স্বাধীন ভিয়েতনামের স্বীকৃতিটাও আদায় করে নিতে হবে। তাদের সঙ্গে সদ্ভাবও বজায় রেখে চলতে হবে। ভিয়েতনামবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যাতে ফ্রান্স মেনে নেয়, সে বিষয়ে লক্ষ করাটাই আসল কথা। তেমনি জরুরি বিষয় হল জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম, জনগণের সংগ্রামী মেজাজকে চাঙ্গা করে রাখতে হবে। প্রতিরোধ যুদ্ধের কাজে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য যেন না থাকে। স্থির হল, ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক যেন কোনোভাবেই জাতির জঙ্গি মেজাজকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে বা নৈতিক বলকে কমজোর না করে।

প্রাথমিক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হল ৬ মার্চ। চুক্তি হল : (১) ফ্রান্স সরকার ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রকে মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিল, যার নিজস্ব বিধানসভা, সেনাবাহিনী এবং অর্থব্যবস্থা বজায় থাকবে। ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রও জানাল—''ইন্দোচীন ফেডারেশনও ফরাসি ইউনিয়নে প্রবেশ করবে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ব্যাপারে ফরাসি সরকার চুক্তিবদ্ধ থাকল 'সাধারণ গণভোটের' সিদ্ধান্তকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়ার জন্য। অতিরিক্ত কূটনৈতিক শর্ত হিসেবে চীনা সেনাবাহিনীর পরিবর্তে ফরাসি ফৌজের প্রবেশের বিষয়টি উল্লিখিত হল। গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম সরকার রাজি হল সাময়িক ভিত্তিতে ফরাসি অধিনায়কত্বে ও ভিয়েতনামী প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় একটি মিশ্র বাহিনী তৈরিতে।

কিছুদিন আগেই টক্‌কিনে ফ্রান্সের কমিশনার হয়ে এসেছিলেন 'জাঁ সাঁতেনি', হো চি মিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও হয়েছে। ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে তিনিই এসেছিলেন হো চি মিন সহ ভিয়েতনাম সরকারের সঙ্গে চুক্তিটি সম্পাদন করতে। জাঁ সাঁতেনি পরে তাঁর 'ব্যর্থ শান্তির কাহিনি' গ্রন্থে লিখেছিলেন, ''হো চি মিনের সঙ্গে কয়েক বারের সাক্ষাতেই বুঝেছিলাম, ঋষিকল্প, জ্ঞানদৃপ্ততা, ক্ষুরবুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল চেহারার এই মানুষটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এশীয় রাজনীতির শীর্ষস্থানে পৌঁছাবেন অচিরকালের মধ্যে।... দেশবাসীর মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা... দুঃখের বিষয় ফ্রান্স তাঁকে সম্যক মর্যাদা দেয়নি, তাঁর এবং তার পশ্চাৎবর্তী শক্তির গুরুত্ব বুঝেই উঠতে পারেনি।"

পক্ষান্তরে হো চি মিন তথা ভিয়েতমিনের মনোভাব জানা যায় তাঁর কয়েকটি কথার মধ্যে—''ফ্রান্স অদ্ভুত দেশ। তারিফ করার মতো বহু চিন্তার ও শিক্ষার জননী সে। কিন্তু ফরাসিরা বিদেশে যাবার সময় এই চিন্তা ও শিক্ষাগুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় না।" অথবা ''ফ্রান্স বা ফরাসি মানুষদের প্রতি আমাদের কোনো ঘৃণাভাব নেই।... আমরা মীমাংসাই চাই। কিন্তু একথাও বলতে চাই যে, যদি আমাদের বাধ্য হয়ে আবার লড়াই করতেই হয় তো শেষ পর্যন্ত আমরা লড়ব।"

ফ্রান্সের সঙ্গে আপসচুক্তিতে ভিয়েতনামে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে জবরদস্তির ব্যাপারটা অনেক পার্টিসভ্যদের পছন্দ হয় নি। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং অতি বামপন্থীরা হো চি মিনকে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে নানা কুৎসা গুজব ছড়াতে লাগল—''হো চি মিন ফরাসি কলোনিওয়ালাদের দালাল। তিনি বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ফরাসিদের পায়েই বিকিয়ে দিলেন,"—ইত্যাদি ইত্যাদি। সরকার কাল বিলম্ব না করে অবস্থাটা খোলাখুলি বুঝিয়ে যেতে লাগল নানা প্রচারধারার মারফত। শেষে হ্যানয়ে থিয়েটার স্কোয়ারে বিশাল এক জনসমাবেশের সামনে চুক্তির প্রকৃত কারণ পারস্পরিক লাভ-ক্ষতির হিসাবটা করেও দেখালেন। লড়াই তুলে নেওয়ার বা হাল্কা বা আলগা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। প্রতিরোধ সংগ্রাম পূর্বের মতোই জারি থাকবে। সংগ্রাম নবপর্যায়ে শুরু, প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম।

শেষে রাষ্ট্রপতি 'হো' স্বয়ং বক্তব্য রাখলেন জনতার সামনে—''১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আমাদের দেশ মুক্ত হয়েছিল। অথচ পৃথিবীর কোনো একটি বড় শক্তিও আমাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেনি।' ফ্রান্সই করেছে। ফলে আজ থেকে পথ খুলে গেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির, দুনিয়ার দরবার গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের অস্তিত্ব এবার সুদৃঢ় হওয়ার পথে। এটা বড় ধরনের আমাদের রাজনৈতিক জয়। আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা স্বাধীন জাতি বলে পরিচিতি লাভ করল। (২) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফরাসি ফৌজকে ক্রমান্বয়ে ভিয়েতনাম থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। আমাদের প্রিয় দেশবাসীকে তাই শান্ত সুশৃঙ্খল থাকতে হবে, ঐক্য ও সংহতিকে আরও জোরদার করতে হবে।"

এরপর সামান্য একটু স্তব্ধ থেকে হো চি মিন পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন—''আমি, হো চি মিন সারাজীবন লড়াই করে আসছি আমার দেশবাসীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে—আমাদের স্বদেশভূমির স্বাধীনতার জন্য। আমি বরং মৃত্যু বরণ করব, তবু আমার আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না।"

এ যেন জাতির সম্মুখে তাঁর দেশভক্তির শপথ গ্রহণ। সমাবেশ নীরব-নিস্তব্ধ, কারো কারো দু-চোখে অশ্রুধারা। তাঁরা মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে তুলে উল্লসিত জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়েন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে মানবেন সরকার ও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ।

দু-দিন পরেই 'হো' হ্যানয়ের নিরাপত্তারক্ষী ইউনিটগুলির অধিনায়কদের ডেকে পাঠিয়ে বলেন—''যুদ্ধবিরতি চুক্তি তো আর যুদ্ধকে শেষ করে দেয়নি! ফরাসি ফৌজের সঙ্গে আমরা সদ্ভাব রাখার নীতি মানব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা দুর্বলতা প্রকাশ করব অথবা চাপের কাছে মাথা নত করব। বরং ঠিক উল্টো। সংঘাত-সংঘর্ষের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের যাতে যে-কোনো নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আগেই সতর্ক থাকা যায়।''

আগস্ট মাসের বিপ্লবের আগে বেসরকারি সমিতিগুলো গড়া হয়েছিল মোটামুটি মুক্ত এলাকার মধ্যেই। এবার তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হল সমগ্র দেশের মধ্যে। ১৯৪৫-এর শেষ নাগাদ সমস্ত গ্রাম-শহর, ফ্যাক্টরি এবং খনিতে আত্মরক্ষী ইউনিট গড়ে উঠল। 'হো' বললেন—''এরাই হল জাতির ইস্পাতের দেওয়াল।'' নিরাপত্তা সমিতিগুলো নিয়মিত সামরিক শিক্ষা, হাতাহাতি যুদ্ধের কৌশল শিখতে লাগল। দেশের প্রত্যন্তে তৈরি হতে লাগল আগ্নেয়াস্ত্র, তরোয়াল, বর্শাফলক।''

১৯৪৬ সালের শুরুতেই একটা প্রকৃতঅর্থে গণফৌজ গড়ে উঠল। হো চি মিন গণফৌজকে শুভেচ্ছাবার্তায় জানালেন, ''মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি, জনগণের প্রতি নিষ্ঠা।'' এদিকে চিয়াংকাইশেখ-এর দু-লক্ষ সৈন্য তো হো চি মিনের বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত করে তার জায়গায় একটা 'পুতুল' শাসক চক্রকেও বসাতে পারল না। তারা এবার ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'' একটা বিপজ্জনক দখলদারি উপস্থিতি থেকে বেঁচে গেল দেশটা। বিরাট একটা আর্থিক বোঝা থেকেও মুক্ত হল ভিয়েতনাম। এই অল্প কটাদিনের মধ্যে ট্রাকবোঝাই, ট্রেন বোঝাই করে লুটপাটের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে তারা চলে গেছে চীনে। ইন্দোচীন ব্যাঙ্ক থেকেও তারা কেড়ে নিয়েছিল চার কোটি পিয়াস্তার। বন্ধু হারিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফরাসিরা আপসচুক্তি ভেঙে শুরু করে দিল সামরিক সজ্জা এবং ঘাঁটি স্থাপন। ভিয়েতনামি আত্মরক্ষী ইউনিটগুলিকে সশস্ত্র সংঘর্ষে প্ররোচিত করার চেষ্টাও শুরু করে দিল।

গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামে প্রাথমিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফরাসিদের কাছে দ্বিতীয় আলোচনা বৈঠকের দাবি জানালেন। ফরাসি হাইকমিশনার দার্জেনল্যু ভাবলেন এই সময় হো চি মিন সরকারকে একটু অপদস্থ করা যাক্। ভিয়েতনামবাসী কিছুটা বাহুবলের নমুনা দেখানো গেলে মন্দ হবে না। মার্চের শেষ দিকে দার্জেনল্যু নিজেই হো চি মিনকে প্রস্তাব দিলেন—আলোচনা হবে এবং তা করা হবে হালং উপসাগরে এক ফরাসি ক্রুজারের ওপর, হ্যানয় থেকে দক্ষিণ পূর্বে দেড়শো কিলোমিটার দূরে।

২৪ মার্চ সকালে একটা উভযান প্লেনে প্রেসিডেন্ট হো চি মিন নামলেন ফরাসি ক্রুজার-এরই পাশে। সিঁড়ি থেকে নামিয়ে হো-কে অভ্যর্থনা জানালেন দার্জেনল্যু আর লেক্লার্ক। তোপধ্বনি হল। প্রাতরাশের পর ক্যাপ্টেনের বুরুজে দাঁড় করিয়ে তাঁকে চলমান ক্রুজার থেকে দেখানো হল যুদ্ধ জাহাজের প্যারেড। মাথায় খড়ের টুপি, হাতে বেতের লাঠি নিয়ে রাষ্ট্রপতি পরিদর্শন করলেন অনাবৃত কামানের সারি দেখিয়ে যুদ্ধজাহাজের গমনাগমন, ডেক থেকে নাবিকদল হর্ষধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানালো হো চি মিনকে। বৈঠক হল। শুধু ফাঁকা বুলি। চিরাচরিত ঔপনিবেশিক স্বভাবেরই পুনরাবৃত্তি। 'হো' সবই দেখলেন। যাই হোক, জেনারেল সাঁলার সমভিব্যাহারে বিমান যোগে হ্যানয়ে ফিরে যাবার সময় খুব শীতল কণ্ঠে হো চি মিন তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন—''যদি অ্যাডমিরাল সাহেবের এরকম ধারণা হয়ে থাকে যে তাঁর বিশাল নৌবাহিনী দেখে আমি ঘাবড়ে গেছি, তাহলে তিনি বিরাট ভুল করেছেন। আপনাদের সানোয়ার জাহাজগুলোর কোনোদিনই হিম্মত হবে না আমাদের নদীপথে ঢোকবার।'' এই হচ্ছেন হো চি মিন।

পালাতের ব্যর্থ বৈঠকের পর হো চি মিন বুঝে গেছেন দার্জেনল্যুর মতো একগুঁয়ে মতান্ধ ব্যক্তিদের প্রভাব থাকলে ইন্দোচীনের অভ্যন্তরে কোনো সমঝোতাই হবে না। আপস আলোচনা যদি করতে হয় পুরোটাই দেশের বাইরে করতে হবে। সুতরাং যথাশীঘ্র বৈঠকের স্থান প্যারীতে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে দাবি জানালেন তিনি। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনাম-সমস্যাটিকে ফ্রান্সের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক জীবনের মাঝখানে দাঁড় করানো। আলোচনা যদি ব্যর্থও হয় তাও হবে ফলদায়ক। কারণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা একটা মহা সুযোগ পাবে ফরাসি জনগণের কাছে গণতন্ত্রী ভিয়েতনামের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার। এইভাবে বহু মিত্রও সংগ্রহ হবে। কী প্রখর কূটনৈতিক কৌশল!

তবে সমস্যা হল দেশের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে একাধিক জননেতাকে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকতে হবে সেটাই বড় প্রশ্ন। তবুও সব দিক বিচার করে ফ্রান্সের রাজধানীতেই আলোচনা বৈঠক করা স্থির হল। প্রথমে ২৬ এপ্রিল সরকারি প্রতিনিধিদল সহ চলে গেলেন ফাম ভান দং। মে মাসের শেষ দিকে ফ্রান্স থেকে আমন্ত্রণ এল হো চি মিনের, ফরাসি গভর্নমেন্টের অতিথি হয়ে যাবেন তিনি। ৩০ মে সকালে হাজার হাজার মানুষ হ্যানয় ও শহরতলি থেকে গিয়ে জমায়েত হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের সামনে। এসেছেন সবাই 'হো'কে বিদায় জানাতে। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে 'হো' তাঁর ভাষণে বললেন—''আমার দেশের সুখশান্তি এবং হিতের জন্য সংগ্রামে আমি আমার সমস্ত জীবন সমর্পণ করেছি।... এখন সেই জনগণের ঐক্যের বলেই আমরা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করেছি, আমার ওপর অর্পিত হয়েছে বর্তমান উচ্চপদের দায়িত্ব। আজ গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনগণের ইচ্ছা বজায় রেখেই আমাকে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ এক পথযাত্রায় যেতে হবে।... আশা করি এবং কথা দিতে পারি জনগণের আস্থার মর্যাদা রাখতে আমরা যথাসাধ্য করব।''

পরদিন খুব ভোরে উঠে হো চি মিন একটা বিশেষ বাণী রচনা করলেন 'নাম-বো'-র সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে—'একটা সরকারি আপস-মীমাংসার জন্য প্রতিনিধি দল নিয়ে আমার ফ্রান্সে যাত্রার সংবাদে খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছেন দেশবাসীরা, বিশেষ করে 'নাম-বো'-র বাসীরা।... 'নাম-বো'র মানুষ আপনারা ভিয়েতনামেরই নাগরিক। 'নদী শুকিয়ে যেতে পারে, পাহাড় ধসে যেতে পারে, কিন্তু এ-সত্যের কখনও কোনো পরিবর্তন হবে না।' আমি আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে উপদেশ দিচ্ছি।... আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীও সকলে এক রকম নয়। কিন্তু তারা একই পূর্বপুরুষ থেকে সম্ভূত।... ব্যাপক ঐক্যই আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এনে দিতে পারে।'' প্যারিতে যে বৈঠক হল সেটাও হল নিষ্ফল। তবে 'হো'র কৌশল হল সফল। প্রথমত আরো একবার যুদ্ধের হাত থেকে ভিয়েতনাম নিস্তার পেল। কিছুদিনের জন্য দম নেবার সুযোগ হল। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সে এই প্রথম তারা দেখল নানা জায়গায় ভিয়েতনামের নতুন জাতীয় পতাকা। ফরাসি সরকার ও সাধারণ মানুষের প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর জনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেছে ভিয়েতনামের ঘটনাবলীর প্রতি। অন্যদিকে দেশের

স্বাধীনতা-ঐক্য এবং মৌলিক সমস্যাগুলোর কোনো সমাধানই হল না। ফ্রান্সের আব্দার হল ভিয়েতনামের বিভাজন, অর্থ, সামরিক সংগঠন ও বৈদেশিক নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব লোপ। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে এক নতুন ধাঁচের উপনিবেশ কায়েম হওয়া।

প্যারির বৈঠক থেকে ফেরার পরই হো চি মিন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভাতেই সবই রিপোর্ট করলেন এবং ওই সভা থেকেই জাতীয় সংসদের আর একটি সভা ডাকা হল। ২৮ নভেম্বর বসল অধিবেশন। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ছয় মাস পরের এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় দেখা গেল ৭০ আসনের অর্ধেকেরও বেশি খালি, সদস্য অনুপস্থিত। কারণ চীনা বাহিনীর লেজ ধরে তারাও বিদেয় হয়েছেন। সরকারিভাবে প্রশ্ন উঠল এই দেশত্যাগী মন্ত্রীদের কী করা হবে?

হঠকারী ও সুবিধাবাদী বিচ্যুতি

হো চি মিন জবাব দিলেন—''এটা সত্যি কথা যে আজ দেশের সংকটকালে এই ভদ্রলোকেরা আমাদের সঙ্গে আর রইলেন না। জনগণ এঁদের বড় বড় পদ দিয়েছিলেন, কিন্তু এরা দায়িত্ব ছেড়ে চলে গেলেন। পরিষ্কার বিবেক নিয়েই ওরা এ-কাজ করেছেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। এই ভদ্রলোকদের কর্তব্যজ্ঞান, দায়িত্বজ্ঞান কোনো কিছুই নেই, হয় এঁরা রাষ্ট্রকর্মের দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চান না, কিংবা এঁরা অকর্মণ্য। আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি যে এই দায়িত্ব আমরা আগের মতোই নিজেরা বহন করে চলব।''

সভায় হর্ষধ্বনি হল। 'হো' হাত তুলে ফের বললেন—''তা সত্ত্বেও, যদি তাঁরা আমাদের ভাই বলে মানেন, যদি বিবেকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যথেষ্ট মনোবল ও সাহস নিয়ে আমাদের দেশবাসীর ডাকে ফিরে আসতে চান, তাহলে আমরা খুশি হয়ে তাঁদের স্বাগত জানাব।''

গত অধিবেশনের মতো এ অধিবেশনেও কিছু সদস্য (ভিয়েতকাখ্ ও ভিয়েতকুওক) বললেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় পতাকাটিকে বদল করা হোক, সেটা নাকি প্রায় কমিন্টার্ন পতাকার মতো, তাই ভিয়েতনামী ভাবধারার পরিপন্থী। জবাবে হো চি মিন বলেন, ''এর আগেও জাতীয় পতাকার বর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে কথা উঠেছিল, সত্যি কথা।... আমাদের স্বর্ণতারকাচিহ্নিত লাল পাতাকা আজ 'নাম-বো' ও 'দক্ষিণ আং বো'-তে সংগ্রামরত হাজার হাজার ভিয়েতনামীর রক্তের প্রতীক। ইউরোপেও এ পতাকা দেখা গেছে, আবার এশিয়াতেও ফিরে এসেছে—সর্বত্রই বিপুল শ্রদ্ধালাভ করেছে ওই পতাকা।'' এবার একটু কঠোর কণ্ঠেই বললেন, ''আর আজ, আড়াই কোটি ভিয়েতনামী ছাড়া কারুরই অধিকার নেই এ-পতাকার বদল করার।''

আবার যুদ্ধ, আবার রণাঙ্গনে

নভেম্বরের ২৩ তারিখে ফরাসিরা সামরিক আক্রমণ শুরু করল—হাইফং-এর ওপর গোলাবর্ষণ করে হাজার হাজার অধিবাসীকে হত্যা করল। খবর পেয়েই 'হো' সামরিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের ডাকলেন। তিনি গিয়াপের কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—''যদি শত্রু উত্তরভাগে লড়াই শুরু করে দেয়, তাহলে তাদের আমরা হ্যানয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারব কতদিন বলে তোমার ধারণা?'' গিয়াপ বললেন, ''এক মাসের বেশি বলে তো মনে হয় না। অন্য শহরগুলো অবশ্য তার চেয়ে একটু বেশি সময় নেবে।'' 'হো' এবার জানতে চাইলেন, গ্রামদেশ সম্পর্কে। সেখানে প্রতিরোধ ক্ষমতা কী রকম? গিয়াপ জবাব দিলেন, ''ওসব অঞ্চল আমাদের দখলেই থেকে যাবে।'' হো চি মিন কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, ''তাহলে আমরা 'তান ত্রাওতেই' ফিরে যাবো।''

হো-র নির্দেশে নুসুয়েন লুয়ংবাং গেলেন ভিয়েতবাকে, গভর্নমেন্ট ও পার্টি নেতৃত্ব জরুরি অবস্থাকালীন সদর ঘাঁটি প্রস্তুত করতে। নতুন উদ্যমে শহর থেকে সরিয়ে এনে কারখানা, গোলাবারুদের ডিপো আর খাদ্যরসদের গুদাম হতে লাগল পাহাড় ও জঙ্গলের গেরিলা ঘাঁটিগুলিতে। আবার ঘোরতর যুদ্ধ ভিয়েতনামের ওপর চাপিয়ে দিল ফ্রান্স। কুছ পরোয়া নেই। হো চি মিন নতুন মেজাজে, একহাতে পরিচালনা করে গেলেন স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে খাদ্য-সামরিক রসদ সংগ্রহ এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কাজ। দেশজুড়ে এই মুক্তি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, দেশ্রেমিকদের সংহত করা, সামরিক বাহিনী পরিচালনা করা (সরকারি ও বেসরকারি) মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা বাহিনীকে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করে রাখা—কত কাজ। শুধু শোনা কথায় তাঁর কাছে আসা রিপোর্টগুলি নিয়ে ৮-১০ জন সশস্ত্র সঙ্গীকে নিয়ে বাঁকে করে ট্যাঙ্ক সহ তল্পিতল্পা কাঁধে করে ৬০ বছর বয়সে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখা—কাজের বিরাম নেই। উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম, তার মাঝে ফ্রান্সর সঙ্গে নিষ্ফলা হলেও সুকৌশলে শান্তিবৈঠক চালিয়ে যাওয়া, অফিসের কাজ সামলানো। যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী। শত্রুকে পরাস্ত করার তাঁর তিনটি মন্ত্র—প্রকরণ, পদ্ধতি, কৌশল—নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি যত সম্ভব কম। ফায়দা তোলা যতটা সম্ভব বেশি। প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দুর্জয় সাহস, অসীম বীরত্ব, ধৈর্য, সংযম, পরাস্ত বন্দিদের প্রতি বন্ধুসুলভ, আচার-ব্যবহার, চূড়ান্ত কষ্টসহিষ্ণুতা, কঠোর নিয়মনীতি, শৃঙ্খলাবোধ।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ফরাসিদের সামরিক শক্তি সংগঠন ছিল উৎকৃষ্টতর, সামরিক অবস্থানও ছিল সুবিধাজনক। শত্রুর ঝটিকা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য হো চি মিন ও তাঁর উপদেষ্টারা মিলে নিজস্ব কৌশল উদ্ভাবন করলেন। কৌশল করা হল 'নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘস্থায়ী দুর্বার গণপ্রতিরোধ'। তার সঙ্গে মিশ্রিত থাকবে 'গেরিলা সংগ্রামের উপাদান'। ক্রমাগত একটানা যুদ্ধে শত্রুকে হয়রান করে, ছদ্রভঙ্গ করে অবশেষে নিকেশ করার অনেক উদাহরণই তিনি দিলেন প্রাচীন ইতিহাস থেকে। সেইসব কৌশলই আজ আবার অবলম্বন করতে হবে। সেনাবাহিনীতে তিন ধরনের ফৌজ ছিল—নিয়মিত ফৌজ, স্থানীয় সেনাদল আর গণ-মিলিশিয়া। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন এবং জরুরি পরিস্থিতিতে তিনটির মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে।

১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি গণপ্রজাতন্ত্রী সামরিক বাহিনীতে সেনা সংখ্যা দাঁড়াল এক লক্ষেরও বেশি। আর সাহায্যকারী ও নিরাপত্তা ইউনিটে আরও বেশ কয়েক লক্ষ জঙ্গি। শত্রুসেনার আক্রমণ, ধ্বংস, নিষ্ঠুরতায় জীবনহানি যত বেশি বাড়ছে প্রতিরোধে শক্তি সঞ্চয় ততগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র জাতির মধ্যে জন জাগরণও বেশি মাত্রায় বিস্তারিত হচ্ছে। সাংগঠনিক শক্তি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৯৪৬ সালে ২০,০০০ জন ছিল। এক বছর পর তা বেড়ে দাঁড়াল ৫০ হাজারে। ক্রমাগত বৃদ্ধির হার বেড়েছে বৈ কমেনি।

'মুক্তি ফৌজ'-সামরিক বাহিনীর যৌথ সাঁড়াশি আক্রমণে ফরাসিরা ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করল। ঝোড়ো আক্রমণ চালিয়ে চীন সীমান্তের কাছে দঃদাং শহরের প্রান্তদেশে শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। এমন একটা যুদ্ধ যা গোটা লড়াইয়ের অসম্ভবকে সম্ভব করে ভাগ্যই ঘুরিয়ে দেবে। কুড়ি দিন চলল এই যুদ্ধ। সাফল্য পেল ভিয়েতনাম ফৌজ। রাত্রে শত্রু-অবস্থানের ওপর ঝড়ের বেগে আক্রমণ চালিয়ে ভোর পাঁচটা নাগাদ জিতে গেল লড়াই। পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম বার হাজার বন্দি হল শত্রুসেনা।

বন্দিদের রাখা হয়েছিল বাঁশের তৈরি ব্যারাক ঘরে। হো চি মিন স্বয়ং গিয়েছিলেন বন্দিদের দেখতে। তবে চাষিদের মতো কালো

কোট গায়ে, দেখলে মনে হয় স্থানীয় বাসিন্দা। বন্দিদের মধ্যে ভাড়া করা ঔপনিবেশিক সেপাই, কেউ আফ্রিকান কলোনি থেকে, কেউ বাওদাইয়ের ফৌজের লোক, হো চি মিনের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল এখানকার একজন 'সাধু' বলে। ফরাসি ফৌজের এক ডাক্তার বন্দির সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন হো। ডাক্তার প্রথমে গ্রাহ্যই করেনি। পরে অবাক হয়ে গেল বুড়ো লোকটার পরিষ্কার ফরাসি ভাষা শুনে। হো তাঁকে বললেন, ভিয়েতনামবাসী যুদ্ধটা চায়নি, তবু আজ চার বছর হয়ে গেল অযথা দু-পক্ষের রক্তপাত ঘটছে। এর জন্য মাত্র কয়েকজন ফরাসি পুঁজিপতিই দায়ী। লক্ষ লক্ষ দীন দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে তারা ফায়দা তুলছে। ডাক্তার কথাগুলি শুনতে শুনতে একটু নরম হয়ে এসেছিল, স্পষ্টতই নাড়া খেয়েছে তার মন। এবার যখন তাঁকে কাঁপতে দেখে হো চি মিন নিজের গায়ের কোটটি তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিলেন, ডাক্তার আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।'' বিরল এই দৃষ্টান্ত। অবিস্মরণীয় এই মুহূর্ত।

মহাচীনে ক্ষমতা দখল

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পিকিং দখল করে চিয়াংকাইশেক চক্রীকে বিতাড়িত করল। আমেরিকার ধারণাতে, ভিয়েতনামের পশ্চাৎভূমিতে একটি প্রবল কমিউনিস্ট প্রতিবেশীর আবির্ভাব অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠল।

১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে হো চি মিন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে চিঠি লিখে জানালেন—''ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রী সরকার সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতা ও পারস্পরিক মান্যতার ভিত্তিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়তে চায়। সঙ্গে সঙ্গেই চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্র ভিয়েতনামের বৈরী সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। ভারতীয় জাতীয় নেতাদের সমর্থন তাঁরা এমনিতেই পাচ্ছিলেন। এতগুলো দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন শুধু নীতিগত এবং রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, বাস্তব কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম সরকারের এতে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় মর্যাদা অনেক গুণে বেড়ে গেল। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনীদের পদলেহনকারী দাইয়ের ঠুনকো রাজত্ব হল একঘরে এবং সঙ্কুচিত। এমনকি থাইল্যান্ডের মতো কমিউনিস্ট বিদ্বেষী রাষ্ট্রও হো চি মিনকে প্রথমে স্বীকার করেনি। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র হতাশ না হয়ে হো চি মিন লেনিনের ঔপনিবেশিক দলিলকেই পাথেয় করে চলছিলেন। সেই মতোই কী ছোটো, কী মাঝারি এবং বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব-সংহতি গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই নীতিতেই অবিচল ছিলেন।

ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রী সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

অতএব হো চি মিন বেশ খুশি মনেই ছিলেন। কারণ পাঁচ বছরের সাম্রাজ্যবাদী চক্রব্যূহে এবার ফাটল ধরেছে। সাম্রাজ্যবাদী অবরোধ ভঙ্গ করে 'গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম' এবার আন্তর্জাতিক-গণতান্ত্রিক সভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন এই যে কূটনৈতিক সম্পর্কের উত্তরণ এবং বিকাশ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই হো চি মিন বলছেন, ''বিগত কয়েকটি বছরের প্রতিরোধ যুদ্ধে ভিয়েতনাম তার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় অর্জন করেছে। পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক দেশ—সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণরাষ্ট্র চীন তার সাথে নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবারের সম-মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে... এই রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যৎ আমাদের সামরিক জয়ের রাস্তাও খুলে দেবে।'' একথা বলতে না বলতেই ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধের নতুন রাস্তাও উন্মোচন হয়ে গেল। যা শেষ হল ১৯৫৪ সালে—দিয়েন ফু-র যুদ্ধ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বহুমুখী রণকৌশল এবং আমেরিকার মদতপুষ্ট—অপরিমিত অর্থযোগান, আধুনিক শক্তিধারী রকেট, বিমান, কামান ইত্যাদি সমরাস্ত্র দিয়ে তারা ফ্রান্সকে শক্তিশালী করে তুলল। কিন্তু প্রধান সেনাপতি হো চি মিন এবং গেরিলা যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ জেনারেল গিয়াপের উন্নত মানের মস্তিষ্ক, অসাধারণ-অকল্পনীয় রণকৌশল, এবং জানকবুল করা সুশিক্ষিত-সুসংহত-দুর্ধর্ষ কর্মবীরে সজ্জিত ভিয়েতনামবাসী মুক্তিবাহিনী গেরিলাবাহিনীর কাছে 'নোরাং যুদ্ধে'র মহা নায়করা নাকখত দিয়ে পালাতে পথ পেল না। ঐতিহাসিক দিয়েন-বিয়েন-ফুল-র অসম যুদ্ধে বিশ্বশ্রেষ্ঠ শক্তিধর আমেরিকার মদতপুষ্ট ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটল—চিরদিনের জন্য পাততাড়ি গুটিয়ে ভিয়েতনাম থেকে পালাতে পথ পেল না।

সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়া উন্নতি-প্রগতি-শান্তিকামী ভিয়েতনাম ফ্রান্সের বিদায়ের পরে পরেই তৈরিই ছিল শেষ বিশ্বমাতব্বর হতে সচেষ্ট সব অশান্তির নাটের গুরু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে তাদের মাটিতেই চূড়ান্ত গ্লানিকর-অবমাননাকর চরম শিক্ষা দিয়ে ওয়াশিংটন পর্যন্ত গলা ধাক্কা দিয়ে ফেরৎ পাঠাতে। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭৫ টানা বিশটা বছর অর্থ, বল, সামরিক বিজ্ঞান, সামরিক শক্তি, অত্যাধুনিক পদ্ধতি প্রকরণ, রসদের বিশাল সম্ভার উজাড় করে দিয়েও তা রুখতে পারেনি আমেরিকা।

এবার আমেরিকা অঘোষিত আগ্রাসনের বদ্ধভূমি

আমেরিকার তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠত্ব' তো বহুমুখী—যৌন, নেশা-মাদক, দেহমনে তীব্র ক্ষুধার্ত লালসা-লোভ, মধ্যযুগীয় বর্বরতা, নৃশংসতা, বীভৎসতা, দানবীয় নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞ। দক্ষিণ-উত্তর ভিয়েতনামে এর বিরুদ্ধে যত গণপ্রতিরোধ, শোচনীয় পরাজয়, বিশ্বজনমতের সক্রিয় বিরোধিতা, ততগুণে বাড়িয়ে চলল দমন পীড়ন। পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের কালঘাম ছোটানো উপায়-পদ্ধতি-পরিকল্পনা একে একে গুঁড়িয়ে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছিল ভিয়েতনামের সুশৃংঙ্খল মুক্তিবাহিনী।

এই সময় 'দিয়েমকে' সরাসরি কমিউনিস্ট নিধনে নামানো হল। কমিউনিস্ট প্রভাবিত সমস্ত গণসংগঠনকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হল। বিশটি কারাগারের জায়গায় একশোর ওপর কারাগার তৈরি করা হল প্রত্যেকটি প্রদেশে। স্কুল, কলেজ, চার্চ, মন্দির, প্যাগোডা—সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহার করা হল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রত্যেকটি প্রদেশ কারাগার আর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে (নিপীড়ন শিবির) ছেয়ে গেল। 'ফুলোই' জেলার একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ছয় হাজার রাজনৈতিক বন্দিকে খাদ্যে বিষপ্রয়োগে শেষ করা হল। কোথাও কোথাও যখন অপরাধী (নিরপরাধ)-দের বিচারের প্রশ্নে সোচ্চার আওয়াজ উঠেছে তখন 'দিয়েমের' গোপন নির্দেশে হাজার হাজার বিচারাধীন বন্দিকে গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

স্ট্যাচু অব লিবার্টি

দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজদরবারের রাজপুরুষদের অর্থ উপার্জনের একটি বীভৎস পন্থার কথা বিদেশি সাংবাদিকরা বিবৃত করেছেন। ১৯৬০ সালে বিপ্লবীরা 'দিয়েম'-এর ছোটো ভাইয়ের দক্ষিণ হস্ত একজন রাজপুরুষকে ধরে এনে শাস্তি দিতে গিয়ে দেখে তার বাড়ির কাঠের আলমারিতে ৩৪২টি মানুষের কান দড়িতে গাঁথা

রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল কমিউনিস্টদের হত্যা করে তার একটি করে কান সরকারের গোপন সংস্থার কাছে জমা দিলে পাঁচ হাজার মুদ্রা পাওয়া যায়। ওই রাজপুরুষটি ৩৪২ জন কমিউনিস্ট হত্যা করে ডান কান জমা দিয়ে মোটা অর্থ আয় করত। দিয়েমের ছয় বছর শাসনকালে ৯০ হাজার মানুষ নিহত, ১ লক্ষ ৯০ হাজার জন আহত এবং ৮ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা-সমর্থক গ্রেপ্তার হয়েছে। বন্দি ৮ লক্ষের মধ্যে ৬ লক্ষ জন সীমাহীন অত্যাচারের ফলে পঙ্গু-বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে।

একজন মার্কিন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথায়—''বিপদ হচ্ছে যে আমরা চাই যুদ্ধে জয়লাভ করতে, আর ভিয়েতনামবাসীরা চায় যুদ্ধকে শেষ করতে।'' বিশিষ্ট জননেতা শ্যামল চক্রবর্তী লিখছেন—১৯৫৪ সালের জুলাই থেকে ১৯৬৩ সালের জুন পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দুরন্ত কীর্তিমহিমা—

- এই সময়ে ৯০০ কারাগার নির্মাণ করেছে
- বন্দি করেছে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যক্তিকে
- হত্যা করেছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার
- বোমা বর্ষণে অথবা অত্যাচারে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার জনকে
- ধর্ষণ করেছে ১৬ হাজার জনকে
- আটক করেছে ৮ হাজার শিশুকে
- কারাগারে বন্দিদের ছাড়াও আরও ৩০ লক্ষ নরনারীকে বন্দি শিবিরে আটক করে রেখেছে। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'।
- বন্দিশিবিরগুলিতে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে হত্যা করেছে বহু যোদ্ধাকে।
- দক্ষিণ ভিয়েতনামে ১৯৫৪ সালে মার্কিন সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ২০০। কিন্তু ১৯৫৯ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩, ৫০০তে। ১৯৬৪-তে এই সংখ্যা হল ৩০ হাজার।
- ১৯৬১ সালে মার্কিনি সৈন্য সমেত যুদ্ধবাজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। ১৯৬৪-তে এসে দাঁড়াল ৬ লক্ষে।

(সূত্র : 'ষাটের দশকে ভিয়েতনামের সংগ্রামের সমর্থনে ছাত্রসমাজ', শ্যামল চক্রবর্তী, *ভিয়েতনাম তোমার জন্যে*, প্রকাশনা : ছাত্র সংগ্রাম, ২০০৭)

এছাড়াও নানা তথ্য থেকে জানা যায়—মহিলাদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ ছাড়াও বহু মহিলার স্তন কেটে নেওয়া হয়েছে। গোপন অঙ্গকে বিক্ষত করে দেওয়া হয়েছে। অনেক পুরুষের লিঙ্গকে কেটে দেওয়া হয়েছে। এই হল 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'র 'স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি'-র মহিমা কীর্তি।

এত কিছু সত্ত্বেও 'জাতীয় নৃশংসতার' সীমাহীন পর্যায়ে গিয়েও 'দিয়েমের' অমানুষিকতা দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের স্বাধীন সত্তা তাদের কালজয়ী সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। সায়গনের বিপ্লবী বীর ন্‌গুয়েনক্রঙ ত্রাক্ ১৯৬৮ সালে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে একটি বীরসুলভ শপথ নেন—''ভিয়েতনামের মাটিতে যতদিন ঘাস জন্মাবে ততদিন বহিঃশত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য ভিয়েতনামের মানুষও প্রস্তুত থাকবে।'' বীর ক্রঙের এই মহান আত্মবলিদানের রক্তাক্ষর প্রতিশ্রুতি শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত ভিয়েতনামের মানুষ রক্ষা করে অমিত পরাক্রমশালী অত্যাচারী বর্বর-নরঘাতক আমেরিকাকে সায়গনের বুকে কবর দেবে। হয়েছে তাই। ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল সকালে সেই বহু প্রতীক্ষিত ক্ষণটি আকাশবাণী সারা বিশ্বের মানুষের কানে পৌঁছে দিল। জানালো ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনী সায়গনে প্রবেশ করেছে। পুতুল সরকার সহ মার্কিন সেনাবাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। ভিয়েতনামের সায়গনের সরকারি দপ্তরের মূল বিল্ডিংয়ে মার্কিনিদের চক্ষুশূল 'স্বর্ণতারকা খচিত লাল পতাকাই' হাওয়ায় খেলিয়ে খেলিয়ে হেলেদুলে উড়তে লাগল। ভিয়েতনামের বুকে প্রথমে 'ফরাসিদের' (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর) শাসকের গদি থেকে নামিয়ে জাপানকে তুলেছিল, তার কিছুদিন পরই আবার জাপানকে গদিচ্যুত করে ফরাসিদের বসাল। এবার আর মার্কিনের এই রাজনৈতিক দাবাখেলায় পাত্তা না দিয়ে ১৯৪৫ সাল থেকে হো চি মিন-এর কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুক্তিকামী স্বাধীনতাকামী ভিয়েতনামের জনগণ আগস্ট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের হটিয়ে হো চি মিনের সভাপতিত্বে প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত করল। আমেরিকার কূটচালে এবং পাঁচমিশালি প্রজাতন্ত্রী সরকারের কিছু দুর্বলতার কারণে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের পুনরায় শাসন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা আংশিক ফলপ্রসূ হলেও 'হো'-র নেতৃত্বে ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। দিয়েন-বিয়েন-ফু'র যুদ্ধে স্থায়ীভাবে গলা ধাক্কা খাওয়ার পর সবকিছু নাটের গুরু আমেরিকা এবার অঘোষিত সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে ভেবেছিল ভিয়েতনামকে কব্জা করে তারাই বসাবে আর একটা পুতুল সরকার। কুড়ি বছর ধরে 'হো'র নেতৃত্বে অসাধারণ বীরত্বব্যঞ্জক দুঃসাহসিক স্বাধীনতার যুদ্ধে দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমেরিকাকে বিতাড়িত করল। দিয়েম আগেই আত্মহত্যা করেছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি আততায়ীদের হাতে খুন হয়েছেন।

বিশ্বাসঘাতকতার নজির

ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন—''Not merely peace for Americans but peace for all men—not merely peace in our time but peace for all time.'' (শুধু আমেরিকানদের জন্যই শান্তি নয়, সকলের জন্যই শান্তি, শুধু আমাদের সমস্ত সময়ের জন্যই শান্তি নয়, শান্তি সর্বক্ষণের জন্যই।) আমেরিকার প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট মিথ্যার ফুলঝুরি ফুটিয়েছেন। প্রত্যেকেই যা-যা চিরকাল আন্তর্জাতিক মহলে বলে এসেছেন সবই হচ্ছে শয়তানি, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতার মুখোশ।

মার্কিন আগ্রাসনের নেপথ্য কাহিনি

ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন সম্পর্কে ফরাসি জেনারেল পিয়ের গ্যালয় ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে যে মন্তব্য করেন তা থেকে মার্কিনিদের 'স্বাধীনতার সীমানা বৃদ্ধি'—'বিশ্বশান্তিপ্রয়াস' ইত্যাদি বোলচালের মুখোশ খুলে গেছে। তিনি মূল চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন—(১) ভিয়েতনাম যুদ্ধ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় কর্তৃত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টারই অংশ; (২) মূল নীতি তাই দক্ষিণ ভিয়েতনামের ওপর আমেরিকার নিজের সামরিক কর্তৃত্ব অটুট রাখা; (৩) ভিয়েতনামের যুদ্ধ এশিয়ায় আমেরিকানদের এক বিপর্যয়ের সূচনা মাত্র; (৪) এশিয়ায় এই ঝুঁকি নেওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপ থেকে সরিয়ে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় নিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ঘটেছেও তাই। মার্কিন সরকারের হিসেব মতোই দেখা যায় এক বছরের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্য কুড়ি হাজার থেকে বেড়ে ২ লক্ষে পৌঁছে যায়। আর ব্যয়ভার দৈনিক ১.৫ থেকে ১৬.৫ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ভিয়েতনামে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী কৌশল নগ্ন হয়ে গেছে।

এর বাইরে মৌলিক যে সত্যটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শঙ্কিত হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে তা হল—(১) ১৯১৭ সালে সফল রুশ

অক্টোবর বিপ্লব। বিশ্বে প্রথম পুঁজিবাদকে অপসারণ করে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা দখল এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, (২) মাত্র ২০ বছরের মধ্যে বিশ্বের একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিস্ময়কর বহুমুখী বিকাশ এবং অগ্রগতি, (৩) ১৯৩০ সালে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মহাসঙ্কট। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতে তার আঁচ পড়েনি। (৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নেতৃতবে পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আক্রমণ—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধে রূপান্তরিত করা। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ফ্যাসিস্ত হিটলার সহ বাকি ফ্যাসিস্ত শাসকদের পতন। (৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র কায়েম, (৬) ১৯৫০ সালে চীনের মহান বিপ্লব কমিউনিস্ট শক্তির দুর্বার বিজয়, (৭) পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই উত্তর কোরিয়া-কিউবার সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তার মধ্যে এশিয়ায় বৃহত্তম দেশ চীন ছাড়া যদি সমগ্র ইন্দোচীনে কমিউনিস্ট পার্টির তথা পুঁজিবাদের পতন সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি (বিশ্বে এক তৃতীয়াংশ ছাড়াও) ঘটে চলে তাহলে পুঁজিবাদ/সাম্রাজ্যবাদের সমূহ সর্বনাশ। এরই মাঝে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে প্রত্যেকটি মহাদেশের অধিকাংশ ঔপনিবেশিক শাসনের পতন। ভারতের মতো দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশেও। সেই জন্য ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল কমিউনিস্ট শক্তির অগ্রগতিকে সর্বশক্তি দিয়ে রোধ করা এবং পাশাপাশি অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের বহুমুখী গভীর চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টা জারি রাখা।

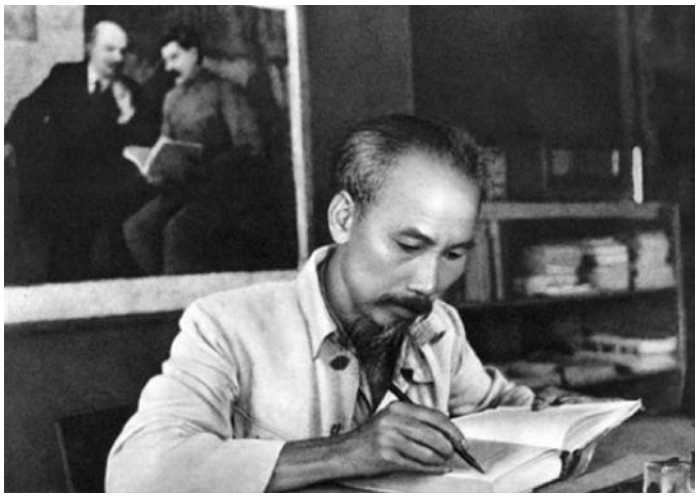

ভিয়েতনাম বিপ্লবের শিক্ষা

(১) ভিয়েতনামের বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসে সমাজতন্ত্রের পথে ছিল নতুন মাইলফলক।

(২) কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিপুল ক্ষমতা।

(৩) জনশক্তির কাছে বিশ্বের কোনো শক্তিই বড় নয়, শক্তিশালী তো নয়ই।

(৪) বলপূর্বক বা পেশিশক্তি, বৈজ্ঞানিক-আধুনিক সামরিক শক্তির দ্বারা ইতিহাসের চাকা বিপরীত দিকে চালনা করা যায় না।

(৫) পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য তার অভ্যন্তরীণ মৌলিক নিয়মেই।

(৬) চেতনাসমৃদ্ধ মানুষ পরাজয় মানে না, পরাজয় জানে না।

(৭) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অজেয়-অলঙ্ঘনীয়—মৃত্যুহীন।

মতাদর্শের মহিমায় বিস্ময়কর বিপ্লবী হো চি মিন

মানবিকতাবাদের সর্বোচ্চ সর্বোত্তম রূপ হচ্ছে মার্কসবাদ, তাই হো চি মিনের আশৈশব অজস্র বহুমুখী সংগ্রাম, সংগ্রামী কৌশল, বিশ্বজুড়ে নিজস্ব অবস্থান সত্য আপন দেশটির গভীর মর্মন্তুদ বিশাল ইতিহাস, বাস্তব অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্থিতি-পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনকল্পে কঠিন রাজনৈতিক কর্মপন্থায় কার্যধারায় তাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই আঁকড়ে ধরে চলতে অফুরন্ত উৎসাহ অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে একটানা দীর্ঘ ৩৫ বছরব্যাপী বিরাম-বিরতিহীন একটা অনন্য সাধারণ ঐতিহাসিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে একটি ক্ষেত্রেও তাঁর সামান্যতম ভুলত্রুটি বিপ্লবের কণামাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারেনি।

সারাজীবন বহু অকল্পনীয় অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে হো চি মিন হয়ে উঠেছিলেন জাতীয়তাবাদী একনিষ্ঠ দেশপ্রেমী, মানবিকতাবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদী সর্বোপরি সাচ্চা কমিউনিস্ট—এই পাঁচটি গুণই তাঁর সমগ্র জীবনের আমৃত্যুকালীন অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় শর্ত তাঁর সুসমৃদ্ধ ভাবধারাতেই পরিপুষ্ট হয়েছে তামাম ভিয়েতনাম।

ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের মহান নেতা হো চি মিন যিনি পান্থপাদক থেকে মহিরূহে পরিণত হয়েছেন। আবার তাঁর নিজের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ক্রমে-ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর, নিরন্তর আত্ম-অনুশীলনের মাধ্যমে ঠিক যেমন মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো উজ্জ্বলতর হয়েছে, একই সাথে অস্তগামী দিনমণির সুনির্মল, স্নিগ্ধ, নিটোল আস্তরণে গড়ে উঠেছে। এ এক অপার বিস্ময়কর তুলনালীন, এও এক বিরল দৃষ্টান্ত, এমনকি মৃত্যুর পরও।

গতিশীল ইতিহাসে ক্রমান্বয় নিত্যনতুন আবিষ্কার তথ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণে তিনি এবং সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ আদর্শবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশ্ববাসীর আসনে নবনব রূপে প্রতিভাত হয়েই চলেছেন। কমিউনিস্ট তথা রাজনৈতিক জগতের এই বিরল ব্যক্তিত্ব সৃজনশীল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নানাবিধ সৃষ্টিশীল প্রয়োগ ও প্রতিক্রিয়াশীল পন্থার একজন নতুন যুগের বিশিষ্ট রূপকার এবং কিংবদন্তি স্বরূপ কৃতবিদ্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ। ঋষিতুল্য বর্ষীয়ান নেতাটি তাই অনেকের কাছেই হেঁয়ালি হয়েই রইলেন।

আজ থেকে মাত্র চল্লিশ বছর আগে ১০০ শতাংশ বৈপ্লবিক মতাদর্শগত প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমিক-শ্রেণির নেতৃত্বে লাওস ও কম্বোডিয়া সহ এক সাথে তিনটি দেশে সফল গৌরবোজ্জ্বল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্যতা যথার্থতাকে বাস্তবে হাতেকলমে প্রমাণ করেছিলেন। তাই কমিউনিস্ট মতাদর্শে আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মহাবীর সেনাপতি হো চি মিন। মহান বিপ্লবী হো চি মিন, বিরল প্রতিভাধর হো চি মিন। মার্কসবাদের নিখুঁত প্রয়োগকারী হো চি মিন।

বিপ্লবীদের গুণাবলী নিয়ে আমরা নিজেরা কি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের একমাত্র মহতি মতাদর্শ এবং তার সংগঠনের জনপ্রিয় এবং গণআকর্ষণ বৃদ্ধির স্বার্থে কিছুটা আন্তরিকতার সাথে নিয়ত আত্মানুশীলন আত্মপরীক্ষণ মহাজীবনগুলি নিয়ে আলোচনা চর্চা করার মধ্য দিয়ে অন্যান্য মহান কমিউনিস্ট কমরেড হো চি মিনের কিয়দংশ গুণও আয়ত্ত করার জন্য চেষ্টা করতে পারি না?

হো চি মিনের কবিতা

১.

চীনের জেলখানা থেকে

মেঘেরা আলিঙ্গন করে পর্বত শিখরকে
শিখরেরা করে মেঘেদের,
নিচে নদী আয়নার মতো উজ্জ্বল,
নিষ্কলুষ পরিষ্কার।
পশ্চিমের পর্বত শিখরের প্রতি আমার হৃদয়
করে স্পন্দন যখন মন ঘুরে বেড়ায়,
দক্ষিণ-দিকের আকাশের দিকে, ও পুরোনো
বন্ধুদের স্বপ্ন দেখে দেখে।

২.

স্ত্রীর পত্র

এই তো, চার বছর পেরিয়ে গেল, আমি সদা মনে করি তোমাকে
যে বিদেশে জীবনযাপন করছে,
আমার চুল কাঁধ অবধি পৌঁছেছে,
তোমার স্মৃতির অশ্রু এখনও শুকোয়নি।
প্রচেষ্টা কর প্রতিশোধ নিতে তোমার দেশ ও পরিবারের হয়ে,
আমি যত্ন নেবো ঘরবাড়ির।
যখন সকল শত্রু হবে উৎপাটিত
আমাদের আনন্দ-জীবন নিজেদের বাড়িতে।

৩.

উত্তর ভিয়েতনাম কর্ভে—ফরাসিদের বলপূর্বক ক্রীতদাস প্রথা

হাজার মাইলেরও অধিক নীল বনানী
ও লাল পর্বতমালা
হাজারো মানুষ শ্রমক্লান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে।
আমি আরও শুনি লাও কাই ইয়েন বাই,
কতো হাজার মানুষ কাটছে পাহাড়-পর্বত,
নদী থেকে তুলে আনছে মাটি।
কী অস্বাস্থ্যকর এসব পর্বত ও বনানীর স্থান
গভীর জলে ফেলে দেয় মৃতদেহ সব
দূরের গুহায় হাড়ের স্তূপ।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শান্তি ব্রিক ফিল্ড

চৌবেড়িয়া, পাঁচড়া, বর্ধমান

Sl. No. 172

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

নির্মল ভারত অভিযান প্রকল্প

সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে

সর্বগৃহে শৌচাগার নির্মাণে

খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েত অঙ্গীকারবদ্ধ।

খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েত

রমানাথ দত্ত
উপপ্রধান

তারাবতী মাঝি
প্রধান

Sl. No. 29

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে

সুধীর রায়

ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সবসময়ই বিপদের মধ্যে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পাকিস্তানে প্রথম কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে ঘোষণা করা হয়। সুন্নি অধ্যুষিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে শিয়ারা অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হয়। এখনো ইরাকে, লিবিয়ায়, পাকিস্তানে সুন্নিরা শিয়াদের ধর্মস্থানগুলিতে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ করছে। এটা ঠিক যে ভারত ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল। কেননা স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী বৎসরে এক বৎসরব্যাপী লাগাতার ধর্মীয় দাঙ্গা ও সন্ত্রাস ভারতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল। প্রথমে ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়ার্দি কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে এক ভয়াবহ মারণযজ্ঞের সূচনা করেন। পরে অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে কিছু ধর্মোন্মাদ মুসলমান এক জমিদারবাড়ি আক্রমণ করে হত্যা ও লুট করে—নোয়াখালির শোধ নেওয়া হয় বিহারে, যেখানে গ্রামের পর গ্রাম জ্বলতে থাকে। হাজার হাজার মুসলিম প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই গড় মুক্তেশ্বর, লাহোর ও কোয়েটায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়। ভারতের শেষ গভর্নরজেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত বিভাগের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে মার্চ মাসে ভারতে আসেন এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট দেশভাগ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পাঞ্জাবের, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানার লোক বিনিময় হয়। কিষেনচন্দের 'খাইবার এক্সপ্রেস' শীর্ষক কাহিনিতে এই নির্মম হত্যা, লুণ্ঠন ও নারীনির্যাতনের এক মর্মন্তুদ বিবরণ আছে। খুসবন্ত শিং-এর 'ট্রেন টু পাকিস্তান' উপন্যাসেও দেশবিভাগ-পরবর্তী দিনগুলির উল্লেখ আছে। কিন্তু ভারতের পূর্বাংশে কোনো লোক বিনিময় হয়নি। ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য বিমলচন্দ্র ঘোষ কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য মোট ১৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু এই অর্থের মধ্যে মাত্র ৩১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ১৫.৭ ভাগ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। নেহরু মন্ত্রিসভার পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন মেহেরচাঁদ খান্না। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বাদশা খানের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তিনি স্পষ্টতই পূর্ববঙ্গের রিফিউজিদের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করেছিলেন। রাজ্যসভার সদস্য ভূপেশ গুপ্ত উত্তেজিতভাবে মেহেরচাঁদ খান্নার এই একদেশদর্শী মনোভাবের নিন্দা করেছিলেন। দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মোট ৪৭ লক্ষ উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে। এদের মধ্যে ২৭ লক্ষ শরণার্থী পাঞ্জাবের হরিয়ানায় এবং হিমাচল প্রদেশে আশ্রয় পায়। ২০ লক্ষ শরণার্থী পাঞ্জাবের বাইরের রাজ্যে পুনর্বাসন পায়। পাঞ্জাবের ৩৫ লক্ষ একর জমি ২৭ লক্ষ লোকের মধ্যে পুনর্বন্টিত হয়। ফলে পাঞ্জাবে উদ্বাস্তুরা অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পায়। তাছাড়া ফরিদাবাদ, গাজিয়াবাদের মতো শিল্পশহর দিল্লির উপকণ্ঠে গড়ে ওঠে। তারা সরকারের কাছ থেকে অনেক ঋণ ও সাহায্য পায়। রণজিৎ রায় তাঁর 'এগনি অব ওয়েস্টবেঙ্গল' গ্রন্থে

অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থীদের মধ্য বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলসমূহ প্রথম থেকেই শরণার্থীদের জন্য সরকারের সক্রিয় ভূমিকা দাবি করেছিল। সি পি আই নেতৃত্ব সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ, কৃষ্ণবিনোদ রায় ও ইলা মিত্রকে পূর্ববঙ্গে পাঠান যাতে তেভাগা আন্দোলন আরও জোরদার হয়। আমার অগ্রজ সহকর্মী অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সরকারকে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়।

কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের শাসকদল মুসলিম লিগ প্রথম থেকেই ইসলামকে দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করেছিল। সরকারি কর্মচারীরা ছিল মোল্লা ও আনসার বাহিনীর অনুগত। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই দাঙ্গা শুরু হয়। খুলনার বাগেরহাটে কৃষকনেতা বিষ্ণু ঠাকুরকে ধরতে গিয়ে পুলিশ বাড়াবাড়ি করে। কয়েকজন নারী নিগৃহীত ও ধর্ষিত হয়। এই খবর কোলকাতায় 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় বয়কট শুরু হয়। ঢাকায় তখন 'আজাদ' পত্রিকা ফজলুল হক সাহেবের এক জামাই-এর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের উত্তেজিত করে এবং ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও দেশত্যাগ শুরু হয়। বরিশালে তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও এস পি দু-জনেই দাঙ্গার পরিকল্পনা করেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন। বাগেরহাট থেকে নমশূদ্ররা প্রথম দেশত্যাগ করে। নমশূদ্ররা প্রধানত চাষবাস করত, মাছ ধরত, আর জনমজুর হিসেবে কাজ করত। এই নমশূদ্ররা প্রথমে দেশের ভিটে ছাড়া হয়। সন্তানসন্ততি নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে তারা দলে দলে ভারতের দিকে চলে এল। ট্রেনে, স্টিমারে, নৌকোয়, হাঁটাপথে লাখ লাখ শরণার্থী হিন্দুস্তানের দিকে আসতে লাগল। সীমান্তে আনসার বাহিনী, কাস্টম্‌স-এর অফিসাররা তাদের যদৃচ্ছভাবে অপমান ও লুঠপাট করল। মহিলাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। তারা অনেকেই লালসার শিকার হয়েছিল। অনেক সময় তারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য, মোল্লাদের হুমকি, সরকারি কর্মচারীদের ঔদাসীন্য অনেক বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। আর এদের উপরে নির্ভরশীল তাঁতি, ধোপা, মালি প্রভৃতি তপশিলি শ্রেণিভুক্ত মানুষরাও দেশত্যাগ করল। ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রামে অসংখ্য লোক হতাহত হল। অনেকের মতে বিহারি মুসলমানরা এই দাঙ্গাগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই দেশত্যাগ এখনও চলছে। কেননা কোনো ইসলামিক রাষ্ট্রে কাফের বা জিম্মিদের আইনের চোখে সমানাধিকার দেওয়া হয় না।

এই সব আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মতে তখন ৮০ লক্ষ ছাড়িয়েছে। দর্শনা, বনগাঁ, শিয়ালদায় আশ্রয়প্রার্থীরা এসে ভিড় করেছে। সেখানেই তাদের বর্ডার স্লিপ, ট্রানজিট অর্ডার দেওয়া হয়েছে। বর্ডারে অবস্থিত সরকারি কর্মচারীরা এইসব আশ্রয়প্রার্থীদের পি.এল. ক্যাম্প, সরকারি আবাসন বা গুদাম ঘরে পাঠিয়েছে। এইসব ক্যাম্পে চিকিৎসার নামমাত্র ব্যবস্থা ছিল না। ক্ষুধা এদের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল। প্রত্যেক পি.এল. ক্যাম্পে প্রতিদিন ২০/২২ জন লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। তাদের মৃতদেহগুলি এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে রাখা হত। সপ্তাহে একদিন বা দু-দিন মেথর এসে সেগুলিকে জ্বালিয়ে দিত। খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার অভাব, নিরাপত্তার অভাব এইসব ক্যাম্পবাসীদের মানুষ-জন্তুতে পরিণত করেছিল। সক্রিয় দালালচক্রের কৌশলে অনেক মহিলা ও তরুণী দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু এই নৈরাজ্য ও অসহায়তা থেকে বাস্তুহারারা ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করল। তারা পশ্চিমবাংলায় বামদলগুলির এক সহায়ক শক্তিতে পরিণত হল। অম্বিকা চক্রবর্তী, প্রশান্ত শূর, বিজয় মজুমদার, ইন্দু গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে এই শরণার্থীরা বামদলগুলির সমর্থনে কলোনি স্থাপন করল, বিদ্যালয় স্থাপন করল, যে-কোনো কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনে তারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে লাগল। নির্বাচনক্ষেত্রে বা অন্যান্য শ্রমজীবীদের সংগ্রামে এই উদ্বাস্তুরা সামনের সারিতে থাকত। সুখের বিষয় পশ্চিম পাকিস্তানের

শরণার্থীদের মতো তারা জনসংঘ বা হিন্দুমহাসভার শক্তিবৃদ্ধি করেনি। তাদের ক্রোধ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল না। কেননা তারা জানত যে কংগ্রেসের ও লিগের অপচেষ্টার জন্যই দেশভাগ রোখা যায়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশলেই দেশভাগ হয়েছিল। তাই তারা শত্রু চিনতে ভুল করেনি। আর পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে খুব বেশি দেশত্যাগ ঘটেনি। তাই কোলকাতায় যখনই কোনো আন্দোলন হয়েছে, ব্যারিকেড করা হয়েছে, উদ্বাস্তুরা তার সামনের সারিতে ছিল। ১৯৫৩ সালে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষক আন্দোলনে, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য আন্দোলনের সময় উদ্বাস্তুরা এইসব বামদলগুলির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদের নেতারা ১৯৪৬ সালের দামের ভিত্তিতে তাদের দখল করা কলোনিগুলি বৈধ ও আইনানুগ করার জন্য সরকারকে বায়নামানা দেওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু রাজ্য সরকার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে রাজ্য বিধানসভায় এক উচ্ছেদবিরোধী আইন পাশ করল। কেন্দ্রের সরকার ও রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে পশ্চিমবঙ্গের মতো জনাকীর্ণ রাজ্যে আর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব নয়। তাই রাজ্য সরকার শরণার্থীদের বিহার, আসাম, ওড়িশা, ত্রিপুরা, দণ্ডকারণ্য, আন্দামান প্রভৃতি স্থানে প্রায় জোর করে পাঠাতে লাগল। রাজ্য সরকারের অনিচ্ছায় হেরোডাঙ্গা প্রকল্প সফল হল না। সুন্দরবনে প্রস্তাবিত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থাও সফল হল না।

একথা ঠিক যে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তুদের জন্য প্রথম থেকেই কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ উদ্বাস্তু যুবকদের জন্য তিনি স্টেট বাস চালু করলেন, কলেজে পড়া ছাত্রীদের জন্য তিনি দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রে সকালবেলা চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন। সরকারি চাকরির একটা বড় অংশ পূর্ববাংলাগত উদ্বাস্তুদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল। বিহারের বেতিয়ায় পি.এল. ক্যাম্পে ৭০ হাজার উদ্বাস্তুকে পাঠানো হয়েছিল। বেতিয়া পি.এল. ক্যাম্পে উদ্বাস্তুরা খাদ্যের অভাবে, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে, হঠাৎ হঠাৎ মরে যেতে লাগল। যখন তারা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এল তখন প্রথমে ক্রুদ্ধ সরকার তাদের ডোল দেওয়া বন্ধ করলেন। পরে বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসুর পরামর্শে বিধানচন্দ্র রায় তাদের আবার ডোল ইত্যাদি দিলেন। মানুষ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর অন্যান্য মন্ত্রীদের তুলনায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও হৃদয়বত্তায় অনেক বড় ছিলেন। তিনি কল্যাণী ও দুর্গাপুর শহর স্থাপন করে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্পে এই সময় ৭০ হাজারের ওপর শরণার্থী রাখা হয়েছিল। এইসব পি.এল. ক্যাম্প কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন ছিল। তাদের আমলাতান্ত্রিক আচরণ, পানীয় জলের অভাব, খাদ্যের অভাব, প্রাইভেসির অভাব অনেক সময় শরণার্থীদের শিবির ত্যাগে বাধ্য করত। বিধানচন্দ্র রায় শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বসুর পরামর্শে বাস্তুহারা পরিষদের দাবিগুলি অনেকটা মেনে নেন।

উদ্বাস্তুরা প্রথমে আন্দোলনে যেতে চায়নি। তারা চেয়েছিল পশ্চিমবাংলার অভ্যন্তরেই তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদ আন্দোলনে যাওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক শরণার্থী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গেল। ভালো বৃষ্টি ও উর্বর জমি পাওয়ায় উদ্বাস্তুরা সেখানে বিভিন্ন দ্বীপে জঙ্গল সাফ করে সরকার প্রদত্ত জমির উন্নতিসাধন করে, কৃষির অগ্রগতি হয়। আমি ১৯৯৪ সালে আন্দামানে যাই। সেখানে পোর্টব্লেয়ারে একজন পি.ডব্লিউ.ডি-র অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন তাঁর বাবা ফরিদপুর জেলা থেকে এসেছিলেন। তিনি প্রায় ১৫ বিঘা জমি জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। এখনও তাঁর বড় ভাই চাষবাস করে। আর তিনি নিজে কলকাতায় পলিটেকনিক পড়াশোনা করে অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন। পোর্ট ব্লেয়ারের অ্যাবার্ডিন বাজারে আর একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর কথায় তাঁরা ঢাকা জেলা থেকে প্রায় ২০ বছর এখানে এসেছেন। বাবা এখন প্রয়াত, দাদা চাষাবাদ করেন। তিনি অন্ধ্রে পলিটেকনিক পড়ে এখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মতে, পরে কেন্দ্রীয় সরকার আর আন্দামানে উদ্বাস্তু পাঠাতে রাজি হয়নি। জগদ্দলপুরে, ওড়িশায়, আসামে, ত্রিপুরায় বাঙালি শরণার্থীরা যেখানে গেছে শ্রম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে তারা ভালোভাবেই আছে। রাজধানী দিল্লিতে চিত্তরঞ্জন পার্কে বাঙালিদের সচ্ছল অবস্থা ঈর্ষণীয়। কিন্তু পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে উদ্বাস্তুরা সি.পি.আই., সি.পি.আই(এম), আর.এস.পি. ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের সঙ্গেই ছিল। বাংলার মার্কসবাদী দলগুলি সবসময় তাদের সাহস যুগিয়েছে। অসংখ্যবার তারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করেছে, গ্রেপ্তার বরণ করেছে।

১৯৬৭ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তারা সাংসদ নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই নির্মল চ্যাটার্জি কমিশন ৭৫০ কোটি টাকার সুপারিশ করে যাতে উদ্বাস্তু সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হয়। কিন্তু প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মতে, ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের আবার দণ্ডকারণ্যেই ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। ১৯৭৮ সালের বর্ষাকালে দণ্ডকারণ্যের লক্ষাধিক উদ্বাস্তু সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসে। তারা মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেয়। সাংসদ দিলীপ চক্রবর্তী অভিযোগ করেন যে পঁচিশজন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পুলিশের গুলিচালনার ফলে নিহত হয়েছে। কিন্তু পঁচিশজনের মৃত্যু এখনও অসমর্থিত রয়ে গেছে। দণ্ডকারণ্য থেকে টাউটদের উস্কানিতে যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসতে চেয়েছিল, সরকার তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। মহবুব জাহেদি, যিনি পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলার সভাপতি হয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং মৃত্যুকালে সাংসদ হয়েছিলেন, সেই মহবুব জাহেদি প্রথমে বর্ধমানের রামচন্দ্র ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের নেতৃত্ব দিতেন। পরে মহবুব জাহেদি ও অন্যান্যদের পরামর্শে উদ্বাস্তুরা ফিরে যায়।

এইসব উদ্বাস্তুরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভেসে বেড়ায়, তারা এখনও পূর্ববঙ্গের স্বপ্ন দেখে, যেখানে তারা আর কোনোদিন ফিরবে না। স্বপ্নের মধ্যে তাদের ঘুম ভেঙে যায়, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়ালখাঁর কথা চিন্তা করে। জ্যোৎস্না রাত্রে পেচার ডাকে সুপারি গাছ থেকে টুপটাপ করে সুপারি পড়ে। হিজল গাছগুলি ডোবার সবুজ জলে নুয়ে পড়ে। কেন্দ্রের সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তারা এখন একটা যাযাবর গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এইসব উদ্বাস্তুদের পরবর্তী প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষ এখন রিক্সা চালিয়ে, হকারি করে, জনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বস্তিতে, ঝুপড়িতে তারা থাকে। কিন্তু বিশ্বায়ন, উদারীকরণের যুগে সেই আশ্রয়ও নষ্ট হতে বসেছে।

তথ্যসূত্র

১. তপন রায়চৌধুরী, *বাঙালনামা*
২. মিহিরকুমার সেনগুপ্ত, *বিষাদবৃক্ষ*
৩. প্রফুল্ল চক্রবর্তী, *দ্য মার্জিনাল মেন*
৪. জ্যোতি বসু, *যতদূর মনে পড়ে*
৫. বিধানসভার কার্যবিবরণী

With Best Compliments of

KHANDRA COLLIERY EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Reg. No. 477 Dt. 10-04-79

Vill. & P.O. Khandra
P.S. Andal, Dist. Burdwan

Sl. No. 26

অবিনাশী বর্ণমালা

অশোক দাস

বাংলায় পাল রাজাদের রাজত্বকালে মাগ্‌ধি প্রাকৃতের খোলস ছেড়ে বাংলাভাষা সবেমাত্র হাঁটতে শুরু করলো। তখন থেকেই বাংলা ভাষা রাজরানি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ চর্য আর অচর্য বোঝাতে সংস্কৃত ছেড়ে মানুষের মুখে ভাষা ব্যবহার করলেন তাঁদের চর্যাপদগুলিতে। অনুপ্রাস রূপক উৎপ্রেক্ষা সমাসোক্তি স্বভাবোক্তি যমক শ্লেষাদি অলঙ্কারে শোভিত হয়ে বাংলাভাষা সেদিন থেকেই গর্বভরে পদচারণা শুরু করেছে। ধর্মীয় আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পদকর্তাগণ তাঁদের কাব্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি নিসর্গ বর্ণনায়, সমাজ চিত্র পরিস্ফুটনে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাভাষা তাই জনগণের মনবনপথচারিণী হতে পেরেছে।

পাল রাজত্বের অবসান ঘটলে, সেন রাজত্বের সূচনা হয়। সেনরাজারা ছিলেন কর্ণাটি দেশীয় ব্রাহ্মণ, বৃত্তিতে ক্ষত্রিয়। সেই আমলে মাগ্‌ধি অপভ্রংশজাত বাংলা আরো সমৃদ্ধ আর কাব্যগুণ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকশ্রেণি তাদের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী এদেশের সাহিত্যের ভাষা এবং রাজসভার ভাষা হিসেবে বাংলার পরিবর্তে স্থান দিলেন সংস্কৃতকে। যে ভাষায় মানুষ ব্যক্তিগত হৃদয়ের আত্মবেদনা সর্বজনের চিত্তে সঞ্চারিত করতে পারে, সেই মাতৃভাষা স্থান পেল না রাজসভায়। রাজরানি হয়েও তার স্থান হল দাসদাসীদের মহলে। অথচ, সংস্কৃত তখনো কয়েকজন পণ্ডিতদের কুক্ষিগত, সাধারণের চণ্ডীপাঠ বা বেদপাঠ নিষিদ্ধ। সেন রাজাদের সভাকবি জয়দেব এদেশে প্রচলিত কৃষ্ণ ধামাইল বা তারও আগে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অবলম্বনে রাজসভার জন্য সাহিত্য রচনা করলেন, নাম দিলেন 'গীতগোবিন্দম্'। পণ্ডিত প্রবরেরা শ্রেণিস্বার্থেই বিধান দিলেন যে দেবভাষায় রচিত কাব্য শাস্ত্রপুরাণাদি যদি কেউ 'ভাষায়াং' অর্থাৎ মাতৃভাষায় অনুবাদ করে, তাহলে তাকে 'রৌরব' নামক নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এমনকি মাতৃভাষায় রচিত রামায়ণ মহাভারতও গৃহস্থের বাড়িতে রাখা নিষিদ্ধ হলো। এইভাবেই বাংলা ভাষা জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলো। কালক্রমে বাংলায় পালদের মতো সেন রাজত্বেরও অবসান ঘটলো, শুরু হলো তুর্কী-শাসন ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই। প্রথম এক-দুশো বছর কিন্তু তুর্কীরা এদেশে কোনো সুলতান বংশের শাসন স্থায়ীভাবে কায়েম করতে পারেনি। মসনদ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি হয়েছে, কত আমির ওমরাহদের মুণ্ড রাজপথে গড়াগড়ি গেছে, তার হিসাব পাওয়া যায়নি। এর ফলে মানুষের ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, শিশু-নারী-বৃদ্ধদের নিরাপত্তা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাই এ সময় লোককবিরা হয়তো গান বেঁধেছেন, পালা বেঁধেছেন, কিন্তু তারও কোনো কালানুক্রমিক সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে শান্তি এসেছে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের শাসনকালে, ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান রুকবুদ্দিন বরবক্ শাহ সর্বপ্রথম ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং বর্ধমানের মালাধর বসুকে দিয়ে শ্রীমদ্ভাভগবতের বাংলা অনুবাদ করালেন। মালাধর বসু লিখলেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', খেলাত ও খেতাব পেলেন, তাঁর উপাধি হলো গুণরাজ খান।

মুসলমান শাসকদের আমলে স্বাভাবিকভাবেই রাজসভার ভাষা ছিল ফারসি। সে যুগে যাঁরা চাকরিবাকরি করতে চাইতেন, বিশেষ করে কায়স্থরা, তাঁরা সংস্কৃতর পাশাপাশি ফারসিও শিখতেন। মধ্যযুগের শেষভাগের কবি ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত ও আরবি উভয় ভাষাতেই অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু মুসলমান শাসকরা বাংলাভাষাকে আনাদর করলেন না, বরং বাংলা শেখা ও জানাতে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ জন্মাল। আমাদের দেশের পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রটি তাঁদের কাছে এতই আকর্ষণীয় ছিল যে রুকবুদ্দিন বরবক শাহ যেমন ভাগবতের অনুবাদ করিয়েছিলেন, পরাগ খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, মধ্যযুগেই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, সেই সময়ই অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং সর্বোপরি পদাবলী সাহিত্যের শতাধিক কবি বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনে ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং রাজসভাতে ফারসি ভাষা ঠাঁই পেলেও, লোকসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হয়ে উঠলো পোশাকি ভাষা। সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালিরাও এমন কি মৈথিল কবি বিদ্যাপতিও বাংলা-হিন্দি-মৈথিলি মিশিয়ে ব্রজবুলি সৃষ্টি করে পদরচনা করলেন, যদিও তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল সংস্কৃত। অর্থাৎ সেনযুগে সংস্কৃতর দাপটে বাংলা হয়তো কিছুটা পিছু হটেছিল, কিন্তু তুর্কী শাসনকালে বা নবাবী আমলে বাংলা এই ভূখণ্ডে তার ঠাঁই করে নিল। সপ্তদশ শতকের কবি আব্দুল হাকিম লিখলেন,

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সেব কাহার জন্ম নির্ণয় না মানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

এই মুসলমান কবি হয়ত আরবিতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন, ফারসিতে করতেন রাজকার্য, কিন্তু তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি প্রেম কতখানি প্রগাঢ় ছিল তা এই কবিতাটির এই অংশটুকু পড়ে বুঝতে পারা যায়। সুদূর চট্টগ্রাম রোসাঙের সীমান্তেও যে দু'জন কবি মগ রাজাদের রাজসভাতে বসে ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রেমের কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁরাও ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমান। আরাকানরাজ সভার এই রাজারা জাতিতে মগ, ধর্মে বৌদ্ধ এবং

সিংহাসনে বসে মুসলমান নাম গ্রহণ করতেন, ঠেট গোহারি ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু এঁদের সাহিত্যের ভাষা ছিল বাংলা। এখানে বসেই দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল লিখেছিলেন 'লোর চন্দ্রানী বা সতী ময়না' এবং 'পদ্মাবতী' কাব্য দু'খানি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তুর্কী সুলতান ও নবাবী আমলে বাংলা ভাষা শৈশব থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছিল, ফুলেফলে পল্লবিত সুশোভন বৃক্ষ হয়ে আকাশ স্পর্শ করতে চাইছিল।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পলাশীর প্রান্তরে নবাবী আমলের অবসান সূচিত হলো সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এবং বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে পাকাপাকিভাবে বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে নিল। এর আগে এসেছিল পর্তুগীজরা, তারপর একে একে ডাচ, ফরাসি, আর্মেনিয়ান, ড্যানিশ ইউরোপের প্রায় সব দেশের লুঠেরারাই এসে জুটেছিল এ ভারতের অমৃতভাণ্ডের সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে। ভারতবাসীর চোখে এরা সবাই ছিল সাহেব। কারণ, এদের চামড়া ছিল সাদা। বাণিজ্যের সুবাদে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করাটাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এরা বুঝেছিল যে দেশি ভাষা ছাড়া এদেশে ধর্মপ্রচার সম্ভব নয়। তাই হ্যালহেড সাহেব সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ লিখলেন, ছাপা হলো রোমান হরফে, কেননা, তখনো বাংলা হরফের সৃষ্টি হয়নি। ডোম আন্তোনিও এবং মানুএল দ্য আস্‌সুম্পসাম যে বইগুলি লিখলেন সেগুলি পুরোপুরি বাংলা ভাষায় লেখা হলো, কিন্তু এগুলিও রোমান হরফে ছাপা হলো বিদেশেই। অর্থাৎ ইউরোপীয়রাও বুঝেছিল যে এদেশে বাণিজ্য করতে হলে বা শাসন করতে গেলে ইংরেজি বা সংস্কৃত নয়, বাংলারই সাহায্য নিতে হবে।

মধ্যযুগে বাংলা পদ্যের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ব্যাপ্তি ঘটলেও বাংলা গদ্যের স্থান ছিল কেবলমাত্র চিঠিপত্রে, দলিল দস্তাবেজে ও রাজানুশাসনে। গদ্যের বাংলা ছিল আরবি-ফরাসি মেশানো, ছিল না কোনো শিল্পের কারুকার্য। কোনো কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এমন গদ্য লিখতেন, যা ছিল তৎসম শব্দের দ্বারা আকীর্ণ। মৌখিক গদ্যের সাথে লেখ্য গদ্যের ব্যবধান ছিল দুস্তর। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে শ্রীরামপুরে এসেছিলেন ডেনিশ মিশনারিরা। উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান এবং টমাসকে বলা হতো শ্রীরামপুর-ট্রায়ো। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীই সর্বপ্রথম চিন্তা করলেন বাংলা হরফে বাংলা গদ্যগ্রন্থ ছাপিয়ে তবেই মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে। এই ইউরোপীয় ভদ্রমহোদয় দস্তুরমত পরিশ্রম করে বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দি শিখেছিলেন। মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি বাংলা হিন্দি, ইংরেজি ও সংস্কৃতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। তিনি তাঁর মুন্সি রামরাম বসু এবং পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে দিয়ে বাংলা বই লেখালেন, কিন্তু রামরাম বসুর গদ্যে অতিরিক্ত ফারসি শব্দ এবং মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যে অতিরিক্ত তৎসম শব্দ থাকায় সেই গদ্য মানুষের বোধগম্য না হওয়ায় কেরি সাহেব নিজে বাংলা শিখে গদ্য লিখলেন। প্রকৃতপক্ষে উইলিয়াম কেরিই বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ। শুধু তাই নয়, এই গদ্য ছাপাবার জন্য তিনি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন, পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে বাংলা হরফ তৈরি করালেন। এই ইতিহাস এবং এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। এরপর কীভাবে রাজা রামমোহন, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ-র হাত ধরে বাংলা গদ্য তার আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করলো, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তা বিকশিত হলে, সে ইতিহাস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি কথা জানা দরকার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রাণপুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য বাংলা ভাষার অশ্লীলতাদোষ মুক্ত করার জন্য এতই সচেষ্ট ছিলেন যে তাঁর সন্তানদের জন্য নিযুক্ত বাংলা শিক্ষকদের শুদ্ধ বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি শিখে আসার জন্য নিজ অর্থ ব্যয়ে বারাণসীর পণ্ডিতদের কাছে প্রেরণ করতেন। তাঁরই উত্তরাধিকারসূত্রে ঠাকুরবাড়ির একমাত্র রবীন্দ্রনাথই নন, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রত্যেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন সাধনা করে গেছেন। এমনকি প্রমথ চৌধুরী যখন চলিত গদ্যে 'সবুজপত্র' প্রকাশ করলেন তখন চলিত গদ্যেরও সৌকুমার্য রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই তাঁকে উপদেশ দিয়ে গেছেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ইংরেজি যে রাজসভার ভাষা হবে, এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই, যেমন তুর্কী শাসনকালে ফারসি ছিল রাজকার্যের ভাষা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইংরেজি শেখার জন্য মেদিনীপুরের বীরসিংহ থেকে পদব্রজে কলকাতা আসতে হয়েছিল এবং কঠোর কৃচ্ছ্রতাসাধন করে ঠাকুরদাস তাঁর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তার জন্য মাতৃভাষা বাংলাকে তাঁরা কোনোদিন উপেক্ষা করেননি। অমন ডাকসাইটে সাহেব মাইকেল মধুসূদন তো শেষ জীবনে বঙ্গভাণ্ডারেই বিবিধ রত্নের সন্ধান খুঁজে পেলেন। শুধু কাব্যে নয়, গদ্যে, নাটকে, প্রহসনেও তিনি দেখিয়ে দিলেন যে বাংলা ভাষাতেও কত সুললিত সাহিত্য রচনা করা যায়। মাতৃভাষার খনি কত মণিজালে পরিপূর্ণ।

১৮৬১ সালে যখন 'মেঘনাদ বধ' লেখা হচ্ছে, ১৮৬৫-তে বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণের পথে অশ্বারোহণে যাত্রাকালে শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহ তিলোত্তমার সাক্ষাতের দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশমন্দিনী' লিখে বাংলা উপন্যাসের রাজপথটিকে মসৃণ ও প্রশস্ত করে তুলছেন, সেই সময়েরই কিছু আগে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। কিন্তু রাজরানি বাংলাভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার কায়েম হলো দীর্ঘকাল পরে।

একথা ঠিক যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন বাংলা গদ্য এতটা সমৃদ্ধ ছিলনা। তবুও ইংরেজ শাসকবর্গ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং ১৮৫৮ সালে গৃহীত প্রথম বি.এ পরীক্ষায় প্রাচীন সাহিত্য ও ব্যাকরণ নির্ভর ১০০ নম্বরের একটিমাত্র পেপারের বাংলা আবশ্যিক পরীক্ষণীয় বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ১৮৬২ সালে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় (পরবর্তীকালে যাকে আই.এ এবং বর্তমানে বারো ক্লাসের উচ্চমাধ্যমিক বলা হয়) বাংলাকে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলার প্রথম প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা খাতার পরীক্ষক ছিলেন নাকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কিন্তু অচিরেই বাংলা, শুধু বাংলা কেন, সমস্ত মাতৃভাষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে বিতাড়িত হয়, ১৮৬৩ সালে সেনেট সভায় অনুমোদিত এক আদেশক্রমে। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন মাননীয় ক্লডিয়াস জেমস এরস্কাইন। তিনি ১৮৬৩ সালের ১৬ মার্চ সেনেটের সমাবর্তন ভাষণে বললেন,

''It is thought by many that students, who in the lower courses have processed one of the vernacular languages of India as their second language, should not, on coming forward for the degree of Bachelor of Arts, be examined in that language, but in the elements of the Indian classical language with which it has affinity."

ভাইস চ্যান্সেলার-এর ইচ্ছাতে আইনগত চেহারা দিতে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রমানাথ টেগোর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মৌলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর এবং কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণকে নিয়ে এক সাব কমিটি গঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় সাতদিন পর সভা হয়। ফ্যাকাল্টি অব আর্টস-এর মাত্র একজন ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ। সংশোধিত সিদ্ধান্ত সিণ্ডিকেটে প্রেরিত হয়। তড়িঘড়ি করে একদিন পরেই সভা আহ্বান করে সিন্ডিকেটে ফ্যাকাল্টির সংশোধিত সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। সেই সভায় কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায় প্রস্তাবটি বিনা প্রতিবাদে পাশ হয়ে যায়। প্রস্তাব নেওয়া হয়—"Under the revised Regulations the examination in the Vernacular languages of India at the first Examination in Arts and the B.A Examination has been discontinued and all candidates will be required to take up one of the following classical languages : Latin, Greek, Sanskrit, Hebrew and Arabian."

মাতৃভাষা বলতে এখানে ভারতের যে কোনো রাজ্যের ভাষাকে বোঝায়। বিদেশি শাসক শ্রেণিস্বার্থেই যে ভাষা মানুষের কোনো কাজে লাগেনা সেই ভাষা চাপিয়ে দিল শিক্ষার্থীদের উপর। স্বাভাবিকভাবেই, বাধ্য হয়ে হিন্দুরা সংস্কৃত নিল, আর মুসলমান ছাত্ররা নিল আরবি। বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া ইতাদি দেশীয় ভাষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে নির্বাসিত হলো।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে ১৮৯০ সালের ১ মার্চ যোগ দেন। আর ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ২৬ বৎসর মাত্র এবং তিনি তখনো 'স্যার' উপাধি পাননি। স্যার গুরুদাস ১৮৯১ সালের মার্চ মাসে সমাবর্তন ভাষণে শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ''...I also deem it not merely desirable but necessary, that we should encurage the study of those Indian Vernaculars that have a literature by making them compulsory subjeets of our examinations in conjunction with their kindred classical language. The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study, ... The darkness of middle ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of the numerous modern languages. So, in India ... the dark depths of ignorance all round will never be illuminated untill the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own Vernacular (Applause)."

সমাবর্তন ভাষণটি করতালিধ্বনি সহযোগে অভিনন্দিত হয়েছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষে এত বড় যুক্তি উপস্থাপিত করার জন্যই। যে সব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন ড. মহেন্দ্রলাল সরকার, গৌরদাস বসাক, উমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। যেন চাঁদের হাট বসেছিল সেদিন। আর একটি তরুণ হৃদয় সেদিন উদ্বেলিত হয়েছিল স্যার গুরুদাসের বক্তৃতা শুনে, তিনি হলেন বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সেদিন থেকেই তাঁর মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বীজ উপ্ত হয়েছিল যে মাতৃভাষাকে তিনি বিশ্ববিদ্যাশিক্ষাপ্রাঙ্গণে রাজরানির আসনে বসাবেনই।

স্যার গুরুদাসের সমাবর্তন ভাষণের পাঁচ সপ্তাহ যেতে না যেতেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শুধু এফ.এ এবং বি.এ পরীক্ষায় নয়, অনার্স এবং এম.এ পরীক্ষাতেও মাতৃভাষা প্রবর্তনের জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সহ সংশ্লিষ্ট আইন সংশোনের জন্য অনুরোধ করেন। সিন্ডিকেট সভার কার্যাবিবরণী থেকে জানা যায় যে ১৮৯০-৯১-এর সিন্ডিকেট সভায় উপস্থিত ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট, আনন্দমোহন বসু, বাবু দীনবন্ধু দত্ত, স্যার জন এডগার, বাবু শ্রীনাথ দাস এবং বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। চিঠিটি পঠিত হয়েছিল এবং ফ্যাকাল্টি অব আর্টস-এর ১৮৯১ সালের ১১ জুলাই তারিখের সভায় বিবেচনার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং পেশ করা হয়। দুঃখের বিষয়, সভায় ভারতীয়দের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও আশুতোষের প্রস্তাব ভোটে নাকচ হয়ে যায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৫ জন। যাঁরা পক্ষে ছিলেন তাঁরা হলেন বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, মৌলভী সিরাজ উল ইসলাম, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, রেভারেন্ড ডা: ম্যাকডোনাল্ড, আনন্দমোহন বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বাবু প্যারীমোহন মুখার্জী সংশোধনী আনেন এবং কর্নেল এইচ এস জারেট, নবাব আবদুল লতিফ, বাবু রজনীনাথ রায়, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবটি ভোটের জন্য উত্থাপিত হয়। কিন্তু ১১-১৭ ভোটে নাকচ হয়ে যায়, ৭ জন ভোটদানে বিরত থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অভ্যন্তরের এই দ্বন্দ্ব বাইরে প্রকাশিত হলো। মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানালেন। আশুতোষের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। কিন্তু, বাঘকে যেমন খাঁচায় বন্দি করে রাখলে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়না, তেমনি আশুতোষ থেমে থাকলেন না। ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হলো। পরিষৎ-এর চতুর্থ অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রজনীকান্ত গুপ্ত দু-খানি চিঠি লেখেন। তাঁরা সেই চিঠিতে মাতৃভাষা পঠন-পাঠনের উল্লেখ করা ছাড়াও সমস্ত বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। এ বিষয়ে যে কমিটি গঠিত হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রস্তাবটি ফ্যাকাল্টি অব আর্টস-এ পাঠানো হয়েছিল। কমিটির সুপারিশ ফ্যাকাল্টিতে গৃহীত হওয়ার পর সেনেটে ও সিন্ডিকেটে নীতি হিসাবে অনুমোদিত হলো, আইন হিসাবে নয়। আশুতোষ তখনো পরাজয়ের গ্লানি ভোলেননি।

এরপর স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হলেন, কিন্তু তখন সেনেট ও ফ্যাকাল্টিতে তাঁর বিরোধীরাই শক্তিশালী, মাতৃভাষা অন্তর্ভুক্তির তাঁরা ঘোরতর বিরোধী। তাই, তিনি তড়িঘড়ি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে ধীরে ধীরে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার পথ বেছে নিলেন। এর মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কঠোর পরিশ্রম করে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি.এ. স্তর পর্যন্ত বাংলার পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। আশুতোষ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে স্পেশাল রিডার নিযুক্ত করলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তৃতামালা ইংরেজিতে প্রকাশিত হলে বিদেশিদের কাছে বাংলাভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। ১৯১৩ সালে দীনেশচন্দ্র রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত হলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর গবেষণা পুস্তকগুলি একে একে প্রকাশিত হতে থাকলো। সেই বছরই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন এবং স্যার আশুতোষের উদ্যোগে তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধি দেওয়া হলো।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেপালের রাজদরবার থেকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কার এবং ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য থেকে তা প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাংলাভাষার প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হলো। এ ইতিহাসও সকলেরই জানা। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে স্যাডলার কমিশন গঠিত হওয়ার পর ১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টের প্রকাশের আগেই বাংলা, হিন্দি, অসমিয়া, ওড়িয়া, উর্দু, মৈথিলি, গুজরাটি, তামিল তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম ও সিংহলী এই ১৩টি ভাষায় এম.এ ক্লাসে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হলো। এইভাবে স্যার আশুতোষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বাংলা ও অন্যান্য মাতৃভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হলো, জাতি ও দেশ জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভাবজনিত দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেল। ব্রিটিশ শাসক বিরোধিতা করতে সাহস পেল না।

এর মধ্যে ধূর্ত ব্রিটিশ শাসক এই উপমহাদেশটির ধর্ম ও ভাষা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা শুরু করলো। ১৮৫৭ সালে তারা দেখলো এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি যদি সংগঠিত হয়, তাহলে এদেশ শাসন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। একেই তো ব্রিটিশদের যতগুলি উপনিবেশ ছিল তার মধ্যে ভারতকে নিয়ে তাদের সেই ফকির বিদ্রোহ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে হিমসিম খেতে হয়েছে, ব্রিটিশ সিংহের একদিনও নিশ্চিন্তে নিদ্রা হয়নি। তার উপর ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের ফলে তাদের বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। এজন্যই তারা ধর্ম ও ভাষার নামে শুরু করলো মানুষে মানুষে বিভেদ। ব্রিটিশ আমলে ভারত কয়েকটি প্রেসিডেন্সিতে বিভক্ত ছিল। বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যা নিয়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, মারাঠী, গুজরাটি, সিন্ধী ভাষা-ভাষিদের রাজ্যগুলিকে নিয়ে বোম্বে প্রেসিডেন্সি এবং তামিল, তেলেন্ড, কানাড়ী ও মালয়ালম্ ভাষা-ভাষিদের রাজ্যগুলিকে নিয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়েছিল। এক প্রেসিডেন্সির মানুষের অধিবাসীদের মধ্যে যেমন সৌভ্রাতৃত্ব ছিল, তেমনি অপর প্রেসিডেন্সির মানুষদের প্রতি তাদের কোনো বিদ্বেষভাব ছিলো না। ব্রিটিশ সর্বপ্রথম বিভাজন নিয়ে এলো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে। বাংলাকে ভেঙে দু-টুকরো করে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গকে আসামের সাথে জুড়ে দিয়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম নামে একটি প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গকে বিহার ও ওড়িশার সাথে জুড়ে দিয়ে বেঙ্গল নামে আরেকটি প্রদেশ সৃষ্টি করলো। এক্ষেত্রে তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করলো। ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং আসামে ছিল মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য এবং বেঙ্গলে ছিল হিন্দিভাষীদের সংখ্যাধিক্য। লর্ড কার্জনের এই পরিকল্পনা যদি সেদিন কার্যকর হতো তাহলে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তারই সেদিন বিলুপ্তি ঘটতো। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হলো, এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ পথে নামলেন, পরবর্তীকালে এই আন্দোলন স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে পরিণত হলো, অবশেষে বঙ্গভঙ্গ রদ হলো। কিন্তু বাংলাভাষী মানুষদের জেলা শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া যুক্ত হলো আসামের সাথে এবং মানভূম (ধানবাদ-পুরুলিয়া-বোকারো- চাস-চাণ্ডিল-চন্দনকিয়ারী-টাটা), বলভূম (রাঁচি-রামগড় সংলগ্ন জেলাগুলি), সাঁওতাল পরগনা (জামতাহা-দুমকা-দেওঘর- সাহেবগঞ্জ-গোড্ডা-পাকুড়), পুর্ণিয়া ইত্যাদি একদা বাংলার অন্তর্ভুক্ত এবং বাংলাভাষী অধ্যুষিত জেলাগুলি যুক্ত হলো বিহারের সাথে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও জেলাগুলি আর বাংলায় এলো না। ব্রিটিশ সেইদিনই পাকিস্তান সৃষ্টির বীজ বপন করলো, সাথে সাথে বরাক উপত্যকায়, ঢাকায় এবং পুরুলিয়ায় মাতৃভাষার জন্য সংগ্রামেরও বীজ উপ্ত হলো। ভাঙাগড়ার ফলে আসাম নামে একটি প্রদেশ গঠিত হলো। ১৯১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আসামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৮,৩৯, ০০০ এর মধ্যে অসমিয়া ছিল ৮,৩৫,০০০, বাঙালি ছিল ১৭,৫৮, ০০০, অন্যান্য ভাষাভাষী ১০,২১,০০০, হিন্দি ভাষী ২,৩৫,০০০। শ্রীহট্ট জেলার মুসলমানদের মধ্যে এবং কাছাড় ও গোয়ালপাড়ার অসমিয়াদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বীজ বপন। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে যখন দেশটাকে দু-টুকরো করে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এক টুকরো মহম্মদ আলি জিন্নাহকে এবং আর এক টুকরো জওহরলাল নেহরুকে দিয়ে গেলেন। শ্রীহট্ট জেলার মানুষেরা যদিও বাংলাভাষী, তবুও যেহেতু তারা মুসলমান, তাই তারা পাকিস্তানে যেতে চাইল। মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলইকে ক্রীড়নকে পরিণত করে ব্রিটিশ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলো। কিন্তু, ভাষা সমস্যা মিটলো না; আগুন জ্বলে উঠলো ১৯৬১ সালের মে মাসে। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

ব্রিটিশ শাসকদের ভাষা ও ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সর্বনাশা নীতির ফলে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও শান্তি ছিল না। পাকিস্তানে সিন্ধি, উর্দু, পোস্ত ও বালুচিতে শুরু হয়ে গিয়েছিল হানাহানি। সেই অশান্তির আগুন এখনো তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে। ইসলামি ধর্মের বাঁধন তাকে ধরে রাখতে পারছে না। পূর্বপ্রান্তে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনও ধর্মের বেড়াজাল ছিন্ন করে দিয়ে জীবন দিয়ে ভাষা শহিদেরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে ধর্ম নয়, ভাষাই মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধতে পারে। ওদিকে দক্ষিণ ভারতেও অন্ধ্রপ্রদেশের দাবিতে পাট্টি রামালু জীবন দিলেন। পাশাপাশি মারাঠীদের জন্য স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র গঠন এবং পাঞ্জাবী সুবার জন্য আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলো। পশ্চিম পাঞ্জাব দেশভাগের সময়েই পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, পূর্ব পাঞ্জাবও তিন টুকরো হয়ে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ নামে তিনটি রাজ্য গঠিত হলো, আর ওপারে বসে ব্রিটিশ মুচকি হাসলো। এখানেই অশান্তি থেমে গেল না, খালিস্তানের জন্য আবার আগুন জ্বললো। শাসকশ্রেণি এমনকি স্বাধীন ভারত এবং পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি এর ফয়দা লুটলো।

বঙ্গভঙ্গের জেরে যখন রাজমহল থেকে কেওনঝড় পর্যন্ত শৈলশ্রেণি বেষ্টিত বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী মানুষের আবাসস্থল জেলাগুলি বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল তখনই জঙ্গলমহলের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। তৎকালের কংগ্রেস নেতারা তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে স্বাধীনতার পর ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন করা হবে এবং বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পশ্চিমপ্রান্তের জেলাগুলি বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ১৯৩৮ সালে মানভূমের সদর শহর মানবাজার থেকে পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিহারেই থেকে যায়। এখানকার অধিবাসীদের ভাষা বাংলা, সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতিদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা। ঝাড়খণ্ডি উপভাষাকে এবং কুরমি মাহাতোদের মধ্যে প্রচলিত উপভাষাকে জনগণনাকারীরা বাংলা হিসাবে চিহ্নিত না করে তাকে হিন্দির অপভ্রংশ বলে চালিয়ে দিলেন। এবং এই অঞ্চলে হিন্দিভাষীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে চালানোর জন্য কারচুপির আশ্রয় নিলেন। গান্ধীজির আহ্বানে পুরুলিয়া জেলা স্কুলের হেডমাস্টার নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও পুরুলিয়া জজকোর্টের আইনজীবী অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে মানভূম জেলায় কংগ্রেসের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিচ্যুতি দেখে ১৯৪৮ সালে অতুলচন্দ্র ঘোষ ও

লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি বড়ো অংশ বেরিয়ে এসে লোকসেবক সংঘ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিনোদানন্দ ঝা। প্রথমেই তিনি এই অঞ্চলে পাঁচশো হিন্দি মাধ্যমের স্কুল চালু করলেন, ৮৭ শতাংশ বাংলা ভাষীদের জন্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করলেন না। ডি.আই. অফিস থেকে সার্কুলার জারি হলো প্রতিটি স্কুলে ভার্নাকুলার হিসাবে হিন্দি পড়াতে হবে। অফিসে, কাছারিতে, দোকানের সাইনবোর্ডে সর্বত্রই উগ্রভাবে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হলো। এদিকে দেশভাগের পর বাংলা উর্দুর কাটাকাটির ফলে মাত্র এক ভোটে জয়ী হয়ে হিন্দি রাজ্যসভায় স্থান পেল। সেই গর্বে অন্ধ হয়ে বিহার সরকার বাংলা ভাষীদের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করলো। অথচ, হিন্দিকে দক্ষিণ ভারত মেনে নিল না। এছাড়া সে সময় হিন্দি ইংরেজি কেন, ভারতে প্রচলিত অন্যান্য ভাষার মতো তখনো সমৃদ্ধিশালী হতে পারেনি। তখন মানুষ সংঘবদ্ধ আন্দোলনে নেমে পড়লো এবং মানভূমকে বিহার থেকে ছিনিয়ে এনে বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার লাড়াই-এ সামিল হলো। অরুণচন্দ্র ঘোষ পুরুলিয়ার প্রচলিত টুসুগানের আদলে গান বাঁধলেন!

আমার মনের মাধুরী,
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি!
আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে মেঠো সুরের কোন ঢুয়া!
বাংলা গানে ছড়া কেটে আষাঢ় মাসে ধান রুয়া।।
মনসাগীতি বাংলা গানে শ্রাবণে জাত মঙ্গলে
চাঁদ বেহুলার কাহিনী গাই চোখের জলে গান বলে।।
বাংলা গানে করি লো সই ভাদুপরব ভাদরে
গরবিণীর দোলা সাজাই ফুলে পাতায় চাদরে।।
বাংলা গানে টুসু আবার মকর দিনের সাঁকরাইতে
টুসু ভাসান পরব টাঁড়ে টুসুর গানে মন মাতে।।

কমিউনিস্ট পার্টির সাংসদ রেণু চক্রবর্তী লোকসভায় এই গানটির ইংরেজি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন সংসদ অধিবেশনে। টুসু গানের প্রতি ভীত হয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার একটি টুসু গানের দলের উপর পুলিশি অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল, ১২ বছরের অন্ধকিশোর বাবুলাল মাহাতো পর্যন্ত পুলিশি অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পায়নি। শতাধিক সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। সাংসদ ভজহরি মাহাতোকে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সর্বজনশ্রদ্ধেয় কাকাবাবু, গান্ধীজির শিষ্য অতুলচন্দ্র ঘোষকে অসুস্থ অবস্থায় খোলা গাড়িতে চড়িয়ে ১৩৫ মাইল দূরবর্তী হাজারিবাগ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেদিনও এই ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামীদের পাশে ছিলেন কমিউনিস্টরাই যদিও লোকসেবক সংঘের সাথে কমিউনিস্টদের মত ও পথের বিরাট পার্থক্য ছিল। সেযুগের বিখ্যাত সাংসদ এন.সি. চ্যাটার্জি (প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জির পিতা) সংসদে এর প্রতিবাদে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমরা তখন ক্লাস টেন-এর ছাত্র। আসানসোলের স্টুডেন্টস ফেডারেশনের নেতা হরিদাস চক্রবর্তী, বিষ্ণু মালখণ্ডি, মানিকলাল, নিমাই রাউত-রা যখন আমাদের স্কুলে এলেন, স্কুলের সমস্ত ছাত্র আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লোকসেবক সংঘের সাংসদ চৈতন্য মাঝি সংসদে বক্তৃতা দিয়ে বিহার সরকারের কদর্য চোহারাটি উন্মুক্ত করে দিলেন।

এর মধ্যে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি নাকি পশ্চিমবঙ্গের রূপকার, সেই বিধানচন্দ্র রায় আন্দোলনকারীদের পক্ষ তো নিলেনই না, উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সাথে হাত মিলিয়ে বঙ্গ বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব আনলেন, যেটা বাস্তবায়িত হলে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্বটাই বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাই বক্তৃতায় নিমাই রাউত বলেছিলেন, বিধান রায়ের 'বি' আর শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-র 'শ্রী' এই বিশ্রী প্রস্তাব আমরা মানিনা। শুরু হলো পুরুলিয়া থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত একহাজার সত্যাগ্রহীর পদযাত্রা ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ও গ্রেপ্তার বরণ। সেদিন বাংলা ভাষাপ্রেমিকদের জেলে পুরলো বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার, পশ্চিমবঙ্গের রূপকারের সরকার।

অবশেষে আন্দোলনকারীদের কাছে বিহার সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাথা নত করলো। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিনে মানভূমের সম্পূর্ণ অংশ না হলেও পুরুলিয়া মহকুমার একাংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীর সভাপতিত্বে। বাংলা ভাষার আংশিক জয় হলো। কিন্তু খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ধানবাদ থেকে গেল বিহারে। টাটা কোম্পানির জল সরবরাহের অজুহাতে চাণ্ডিল, পটমদা, ইটাগড় এই তিনটি থানা পুরুলিয়া থেকে বাদ পড়লো। বাংলার মেয়েরা মনের দুঃখে টুসু গাইলেন—

হায় ভালোবাসা,
আমার চলে গেল চাইবাসা।

পূর্ববাংলায় ১৯১১ থেকে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। এর জন্য জীবন দিয়েছিলেন আব্দুল জব্বার, বরকত, রফিক আর সালাম, ১৩ বছরের প্রতিবন্ধী শামসুদ্দীন নিখোঁজ হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে, যে দিনটি রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দিয়েছেন। শুধুমাত্র ভাষার জন্য যে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষের যুদ্ধ তা প্রমাণ করে। সে ইতিহাস সবার জানা, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, ১৯৬১-র ১৯ মে আসামের শিলচরে বরাক উপত্যাকায় বাংলাভাষার স্বীকৃতি দাবি করতে গিয়ে শহিদ হয়েছিলেন সত্যাগ্রহী কমলা ভট্টাচার্য, শচীন্দ্র পাল, হিতেশ বিশ্বাস, সুকোমল পুরকায়স্থ, সত্যেন্দ্র দেব, কানাইলাল নিয়োগী, বীরেন্দ্র সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, সুনীল সরকার, কুমুদ দাস। এ ইতিহাসও বহু আলোচিত। বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের সাথে বরাক উপত্যকার শহিদদেরও স্মরণ করা হয় সশ্রদ্ধ চিত্তে।

বর্তমান প্রবন্ধে দুটি স্বল্প-আলোচিত ঘটনা উপস্থাপিত করা হলো এই কারণে যে বর্তমানে যাঁরা বাংলাভাষি পিতামাতার সন্তান হয়েও পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে, কলেজ-ক্যান্টিনে, দূরালাপে, এফ.এম. রেডিও বা বেসরকারি চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সঞ্চালনার সময় জেনে শুনে বাংলা না জানার ভান করে কিছুটা বাংলা শব্দ রেখে বেশির ভাগ হিন্দি এবং ইংরেজি জুড়ে দিয়ে একটি বকচ্ছপ ভাষার সৃষ্টি করছেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে যে, ভাষা মহান মানুষদের অবদানে শহিদদের রক্তে রাঙা হয়ে সারা বিশ্বে রাজরানির স্থান গ্রহণ করেছে, সে ভাষা অবিনশ্বর, তাকে যেন ধ্বংস করার চেষ্টা না করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. সিংহ, দীনেশচন্দ্র, *ভাষা আন্দোলনের শতবর্ষান্তে*, আমাদের যেটুকু আকাশ, প্রান্তর, বেনাচিতি
২. পালচৌধুরী, পরিতোষ, *কাছাড়ে বাংলাভাষা সংগ্রামের আদিপর্ব*, আমাদের যেটুকু আকাশ, প্রান্তর, বেনাচিতি
৩. সেনগুপ্ত, দেবাশিষ, *মানভূমে বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন*, আমাদের যেটুকু আকাশ, প্রান্তর, বেনাচিতি

বর্ধমান জিলা পরিষদ-এর লক্ষ্য

বাংলা জুড়ে আজ
উন্নয়নের জোয়ার।
সেই প্রবাহের ঢেউয়ে
পানসি ভাসিয়েছে
বর্ধমান জিলা পরিষদ।
সমাজের সর্বক্ষেত্রে
সাধারণ মানুষের
জীবনযাত্রার মান
উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্ধমান
জেলা পরিষদের অবিরাম
প্রয়াস আজ সাফল্যের
চূড়ার দিকে ধাবমান।
আর সেই উন্নয়নের
আলোকপথে সকলের
সহযোগিতা পাব—
এই আশা রাখি।

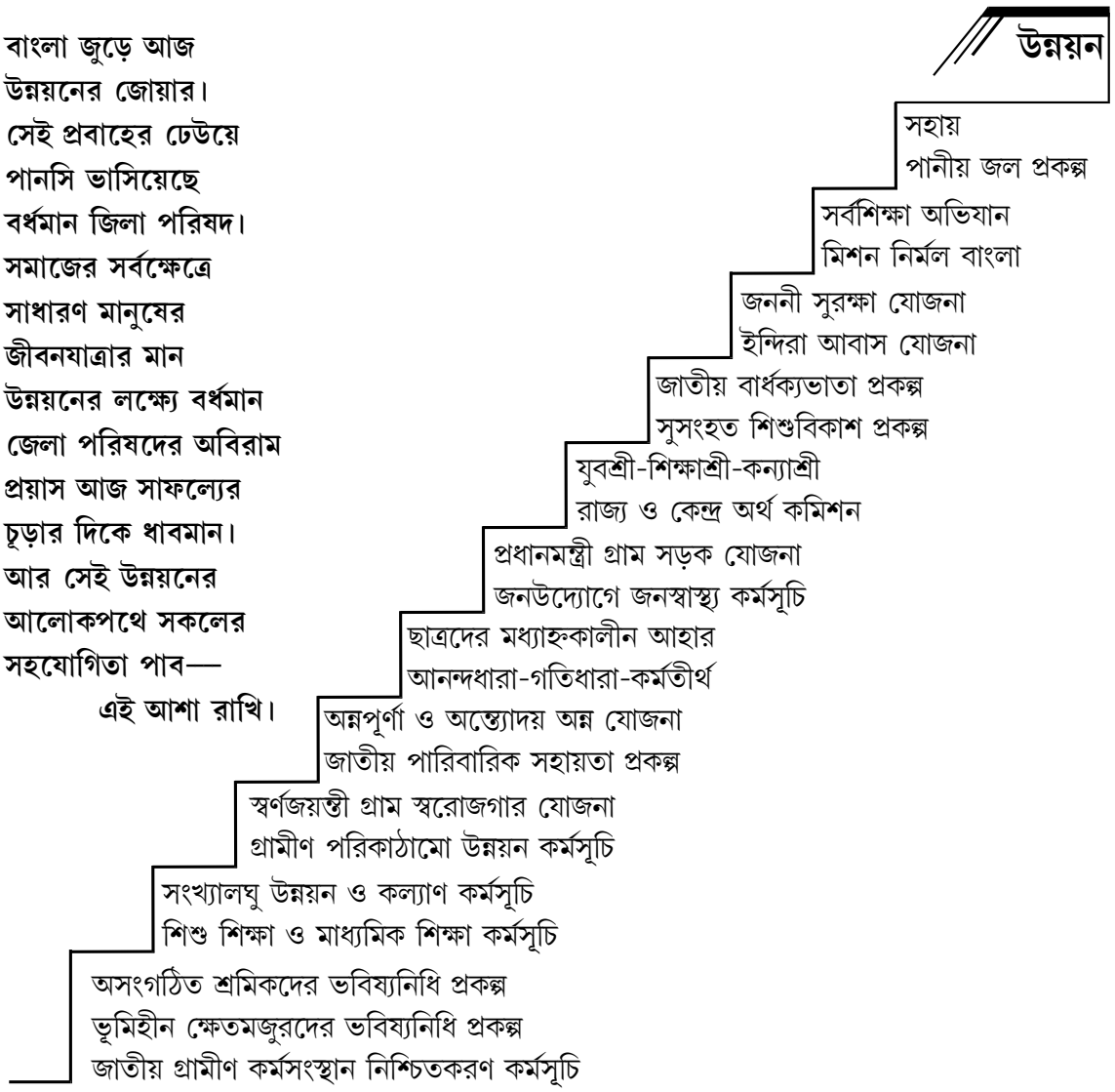

ড. সৌমিত্র মোহন, আই.এ.এস.
নির্বাহী আধিকারিক
বর্ধমান জিলা পরিষদ

দেবু টুডু
সভাধিপতি
বর্ধমান জিলা পরিষদ

Sl. No. 71

কমফর্টেবলিটির ওই শিল্পবন্ধু রূপ, দেখেছো তোমার বাপের নাম খগেন করে দিচ্ছে

তাপস রায়

ঢং ঢং করে এস এম এস ঢুকছে
স্কুলের ছুটির ঘণ্টার দিকে যেভাবে ঝুঁকে থাকা ছিল
দিওয়ানা করে দেবার হক্
ওই ধ্বনির ভেতর ঢুকে আছে, আর
মনে রেখো টরেটক্কার মতো এই টেক্সট সম্প্রসারণ
তোমার প্লেটে বিষাদও সাজিয়ে দিতে জানে

চটকল মরে যাবার ফলে গঙ্গার দুপারে সৌন্দর্যায়ন
সাংসদ তহবিল দিয়ে টেনে আনা তেমন
কষ্টকর নয়, ফলে চোখে পড়বে
অনেক ক্লাবঘরই দোতলা, তিন-তলা
গলির মোড়ে মোড়ে ফুচকার শিল্প সুঘ্রাণে
আমাদের দৈনন্দিন রসনাও এমন চার্জড্, শুধু দুবেণী নয়
যে-কোনো মাথার ভেতরেই অম্ল-জলের টানাপোড়েন
বিকেল বিকেল
এক একদিন হোয়াট্স অ্যাপ থেকে নেমে
কাজরীও জ্বরে ঢুকে যেতে পারে

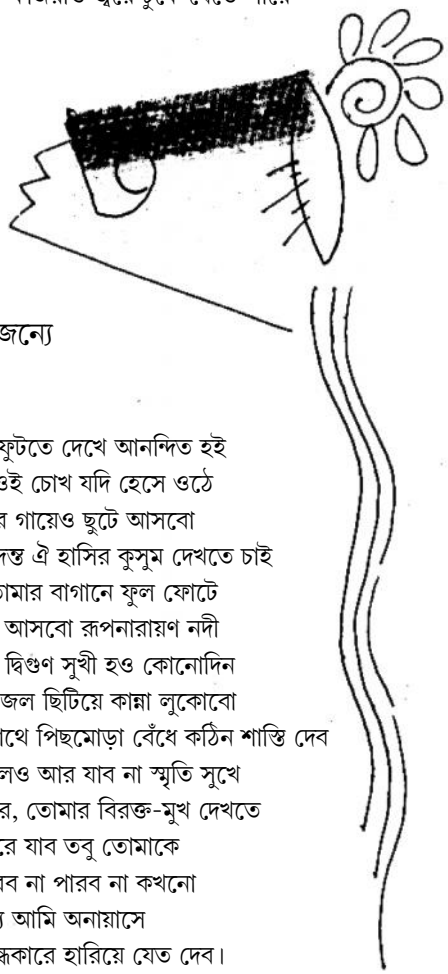

তোমার খুশির জন্যে

অরূপ আচার্য

তোমার মুখে ফুল ফুটতে দেখে আনন্দিত হই
আমি কাছে এলে ওই চোখ যদি হেসে ওঠে
তবে তো আমি জ্বর গায়েও ছুটে আসবো
আমি তোমার গজদন্ত ঐ হাসির কুসুম দেখতে চাই
আমি এলে যদি তোমার বাগানে ফুল ফোটে
তবে আমি সাঁতরে আসবো রূপনারায়ণ নদী
যদি আমি না এলে দ্বিগুণ সুখী হও কোনোদিন
আমি তখন চোখে জল ছিটিয়ে কান্না লুকোবো
নিজেকে গাছের সাথে পিছমোড়া বেঁধে কঠিন শাস্তি দেব
তবু বুক পুড়ে গেলেও আর যাব না স্মৃতি সুখে
তোমার অফিস ঘরে, তোমার বিরক্ত-মুখ দেখতে
একা একা পুড়ে মরে যাব তবু তোমাকে
অখুশি দেখতে পারব না পারব না কখনো
তোমার খুশির জন্য আমি অনায়াসে
নিজেকে অনন্ত অন্ধকারে হারিয়ে যেত দেব।

অন্তরপ্রহরী

নিলয় মিত্র

সময়ের সংকেত ছুঁতে গিয়ে অধুনা
বাসাভাঙা প্রতারিত চোখে
দেখি ধ্বনিহীন, কলরবহীন আনন্দ সংহার।
মনের তারে মিলছে না কোনো সুর
নিঃশ্বাস ভেঙে পড়ছে বিষাদে
গ্রহণলাগা সূর্যের নিচে এখানে চলছে অসুন্দরের ধ্বজা পূজা।
রক্তমাখা ধানে শিষে, শ্রমমন্ত্রে
মাথা ঠুকে মরছে প্রাণ অপ্রেমের দাহতে।

বস্তুর বিপুল ভার বয়ে নিয়ে চলেছে হতমান দিন
নষ্ট সময়ে নষ্টমানুষের স্তুতির চোরা স্রোতে,
প্রাণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে চলেছে প্রাণহরণের নিত্যনতুন খেলা।
খিদে চাবুক মারছে পেটে, তৃষ্ণা চেপে ধরছে কণ্ঠ
গোঁসাইরা, নেশা ধরিয়েছে উৎসবের,
উৎসবের চাঁদোয়ার তলে চলছে মুদ্রাপাগল দাসেদের
জমাটি আড্ডা
পরিয়ে দেওয়া বস্ত্রে কেউ মন্ত্রী, শান্ত্রী, শিখণ্ডী।

রোদ্দুরের ছুটি এখানে
বঙ্গপুরীর বিধানঘরের জঠরে তলিয়ে গেছে সূর্য
প্রতিদিন পিঠে দেগে দেওয়া হচ্ছে দাসেদের সংখ্যা
গোঁসাইয়ের ভাষায় এরা সবাই তৃণঅবতার।

নাড়িতে নাড়িতে জ্বলে ওঠে আগুন
আঁচ লাগে সমাজ ছন্দে
অন্তরপ্রহরী কণ্ঠ ছাড়ে জোরে, ভয় পেয়ো না,
বিপদের তলায় তলিয়ে যাবার আগেই পেয়ে যাবে
অসংখ্য বুকের শ্বাসপ্রবাহ, সম্পর্কের ধ্বনি, স্পর্ধার সুর
অন্তরঐশ্বর্য ঘুচিয়ে দেবে সব ভয়
পেয়ে যাবে পরিচিত মানুষের হৃদয়শস্য,
শ্রেণি মানুষের মুখ

গান

নাসের হোসেন

জানালার ওপাশে কতরকম মেঘ জমেছে
দিগন্তের ওপারে দিগন্ত ছেয়ে আছে মেঘে
তোমার জেগে থাকা তবু এই ঘরের ভিতর
তোমার ঘুমে থাকা তবু এই ঘরের ভিতর

জানালা খোলাই থাকে, কখনো বন্ধ হয় না
জানালা দিয়ে কতরকম হাওয়া ঢোকে
কত বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, এমনকি
অচেনা ভাষায় অচেনা গানও শোনা যায়

ভয়ের সমাধি

অনাথ মুখোপাধ্যায়

নক্ষত্রমণ্ডলের ছাউনির নীচে
উদার অন্ধাকর, কোথায় লুকোবে মুখ
চেনামুখ ঠেকে না অচেনা
কোঁচকানো যে মুখের রেখায়
প্রশ্রয়ের প্রার্থনায়
অসুখের সুখ
বলে ফেলে দয়াল দুর্মুখ
নিজেকে বাঁচায়

ভুলি না যে, তাই ফিরে আসি বারবার
যেখানেই থাকি পরস্পর তোমাতেই মিলি
ভুলে থাকা ভুলে ভালোলাগার কোনো
ব্যাখ্যা তিথি-নক্ষত্র খুঁজে বেছে সময় অপব্যয়

দিনগুলো কবুতরের সুখ ও অসুখ
ঘরের কার্নিসে, ফাঁকফোকরে বকবকুম
রকমসকম। যে যেমন করে পারে
হাত করে লুটে শুষে নেয় অধর্মের ব্রতকথা
ভদ্রতার ভণ্ডামি অশান্ত মরশুমের মাশরুম

অন্তরায় সন্ধানী অন্ত ও আদি
হৃদয়ের অগোচরে অনুভব ওথলায়
অক্ষরে তামাদি
ভয়ের সমাধি।

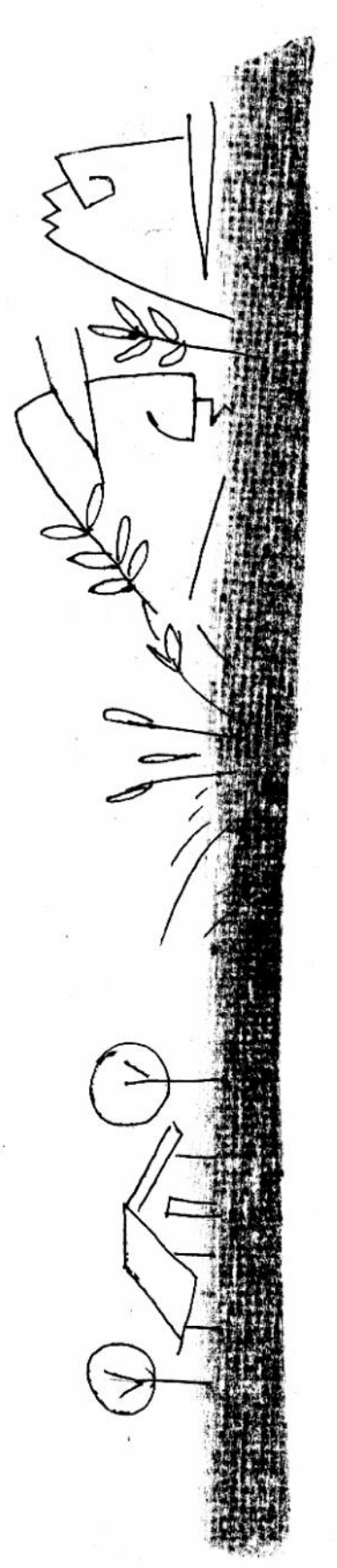

অবগাহনে

বিতস্তা ঘোষাল

তুমি লুকিয়ে কোন অন্ধকারে
এই বৃষ্টিতে?
অযত্নে রক্ষিত বুভুক্ষু মানবীর মত
তোমার গা থেকে ঝরে যাওয়া জলে
নুয়ে পড়া ফসলের ঘ্রাণে...
তোল, মুখ তোল, এই শ্রাবণে—

দূরে—আরো দূরে
আছে সে, কর্মব্যস্ত হাসিমুখে,
তবু কেটে যায় রাত নগ্ন, মন খারাপের ঘরে।
উত্তাপহীন, নিঃসঙ্গতায়।
কে বেশি ভালো আছি?
এই মেঘলা অবগাহনে

নামভূমিকায়

পার্থ চৌধুরী

তুমিই আঁকছ; তুমিই লিখছো
তুমিই গাইছো গান
তোমারই সাধের তানপুরাতে
তুমিই ধরেছ তান।

তুমিই বলছো, আমিই সেরা
তোমারই উঠছে ছবি।
তোমার মহিমা গেয়ে যান
কিছু পোড়খাওয়া সভাকবি।

তোমারই ভাষণ প্রথম কাগজে
তুমিই দিচ্ছো বাইট,
ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধটা সেরে
বলছো, কী দিনু ফাইট!

মন্দিরে গড়া তোমারই প্রতিমা
ভুবনে তোমারই ছায়া
সামনে তোমার স্পটলাইট
পিছনে কাদের কায়া।

কানে কানে কিছু গুপ্তচরেরা
দিয়ে যায় ভালো খোঁজ।
আসলে মানুষ ভাবছে টা কী
তার কি রেখেছো খোঁজ?

ঘাড়ের রগ

সঞ্জয় সোম

১.
তোমাকে মাটির প্রতীকে লিখি
অ্যাতো অত্যাচার লাঞ্ছনা নিগ্রহ
সহ্য করো বলেই তোমাকে মাটি ভাবি

২.
উল্টোটা কিন্তু হয় না,
নিজেকে মাটি ভাবতে পারি না
বরং কেউ মাটির উপমা দিলে
ঘাড়ের রগ ফোলে

৩.
মন ছেয়ে আছে হিংসায়
প্রতি রোমকূপে রতি, চোখে লালসা
অন্তর জুড়ে শতাংশের উপর অহঙ্কার।
মা, আমি কবে নরম হবো মা।

হে পিতা

সৌম্য দত্ত

সেই কবে এক হাঁটু কাদা ভেঙে আমাদের পিতা
অন্ধকার ফুঁড়ে, এনেছিল সূর্যের সাহস...

আমাদের গ্রাম ছিল সোনালী ধানের শীষে
একবিন্দু শিশিরের মতো...
বাঁশির সুরের মতো ভোর এসে পায়ে পায়ে
ঘুরে বেড়াত নিকোনো উঠোন—খড়ের পালুই
তুলসীতলা...
ভাপানো ধানের থই থই ঘ্রাণের ভিতর
মায়ের কপাল জোড়া টিপে
জেগে থাকত গোধূলির রং...
সন্ধ্যা নামত যেন সরীসৃপ নদীটির মতো
উলু শঙ্খ আর আজানের যুগলবন্দিতে
চোখ মেলতো বর্ণপরিচয়...

তারপর, কারা যেন ময়াল অন্ধকারে
মাথা তুলে... চুপিসারে
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ঢেলে দিল বিষ
কালো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী তর্জনী তুলে
ভয় দেখায়—শাসায় অহর্নিশ...

সেই কবে, অন্ধকার ফুঁড়ে—এক হাঁটু কাদা ভেঙে
আমাদের পিতা, এনেছিল সূর্যের সাহস...

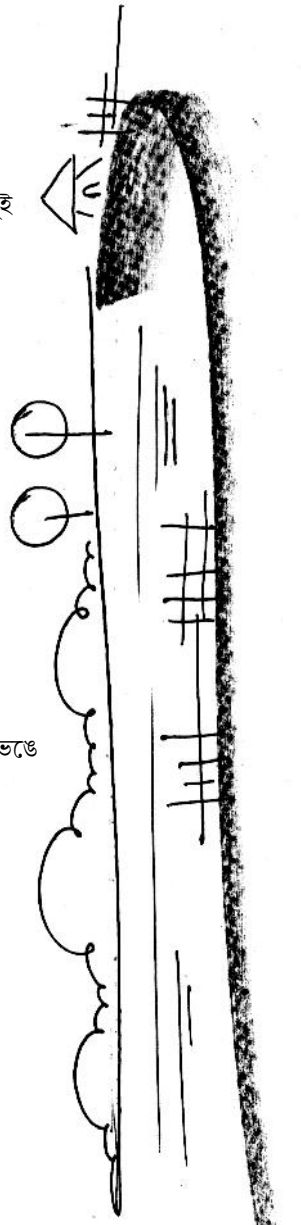

আর্তনাদ

ঋর্না মুখোপাধ্যায়

যন্ত্রণার আর্তনাদ থেকে উঠে আসা শব্দ
রোদমাখা পালক
দুঃখের চাবুক দাগ
শহিদ যুবক হতে চায়
নোনাজলও সেই সাথে বুক পাতে।

সন্ত্রাস মানচিত্রে বিশ্ব হেঁটে যায়
উপস্থাপনার দক্ষতায়
প্রিয় ভায়েরা আমার
গরম রক্তে সারে স্নান।

ছিন্ন ডানায় ওড়াউড়ি কম
নিরপরাধ পৃথিবীর
দু-এক টুকরো কথা
লাইনে চেঁচায়
হাতের পতাকা হাঁটছে এখনো।

সেই সব গ্রাম

মানস মণ্ডল

আর নেই।

দু-হাত অন্তর
জলা জমি, পুঁতে রাখা নাম

তোমার আমার গ্রাম...

ছোট্ট ঘটনায় ঢাকা
রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

মুছে দিয়ে উঠে এলো

এই আমাদের অনন্ত কলম

পুবের আলোটি হয়ে ফুটে ওঠা
অক্ষর নিঙড়ে তুলে আনা
অনন্ত বিশ্বাস

হাতের মুঠোয় নিয়ে
সময়ের সীমা পার হয়ে
তুলে নেব, বসবাস
তৃতীয় প্রকোষ্ঠ থেকে খুঁজে নেব
হাতে রাখা
সাহসের হাত।

ফ্যাকাশে হলুদ পাতা

অপূর্ব দত্ত

চওড়া দেয়াল, উঁচু-উঁচু ছাদ, কাঠের বরগা-কড়ি
জানালায় মোটা লোহার গরাদ, পাল্লাতে খড়খড়ি।
স্কাইলাইটের ফাঁকগুলো জুড়ে পাতা-খড়কুটো ঠাসা,
সারাদিন শুধু বকম-বকম—গোলা পায়রার বাসা।

উঁচু-নিচু দুটো বেঞ্চ জোড়া দেওয়া, পাথরের মতো ভারি
ঘেঁষাঘেঁষি করে পাঁচ জন, প্রায়ই সিট নিয়ে কাড়াকাড়ি।
দারোয়ান রামস্বরূপের হাতে ঘণ্টা বাজত যেই
হুড়মুড় করে ক্লাসে ঢুকতাম, খেলার সময় নেই।

গেটের মুখেই মস্ত একটা ইউক্যালিপটাস গাছে
সুখ-স্মৃতিগুলো আটকে রয়েছে, ছুটে যাই তার কাছে।
মাটিতে ছড়ানো ধুলোমাখা যত ফ্যাকাশে হলুদ পাতা
তিল তিল করে ভরেছে আমার পদ্যলেখার খাতা।

এই মৃত্যু এই অবহেলা মানব না

কঙ্কণ সরকার

একটা অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে
তুমি আমাকে ফেলে রেখে চলে গেলে
চারিদিকে অগ্নিপ্রজ্বলন সাদা আর নীলে
দাউ দাউ দেদীপ্যমান জ্বলন্ত অঙ্গার
আর কি কোনো উপায় আছে এড়িয়ে যাবার?

সামনে সেপাই ওদিকে মন্ত্রী ষড়যন্ত্রী সুপারিকিলার
কামাল ছেলের দল, সামাল! সামাল!
ইতিউতি করে খুঁটে নিচ্ছে লুটের সম্ভার
ও লুট, লুটের কী উলঙ্গ পণ্যমতি বিস্তার!
ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে দ্রুত যত পঙ্গপাল

ফসলের ভরা মাঠে ভরাডুবি, স্বপ্নে অনাহার
চাষিরা কি আত্মহত্যাপ্রবণ? যুবকেরা কোথায় যাবে
কোনখানে গেলে কাজ পাবে?
রসদ তামাদি হলে সবই অসার
অতিভক্তি শ্রমশক্তি মিলায় ফুৎকারে সুতীব্র যন্ত্রণায়

দেওয়ালে ঠেকেছে পিঠ আগুনে পুড়ছে কড়াই
টগবগ টগবগ, এভাবে কি আর বাঁচা যায়?
মজুরির মুদ্রা খায় রাক্ষসি পরজীবী!
জীবনের বিনিমিয়ে মৃত্যু, মৃত্যুর বিনিময়ে
তাই নতুন কী আর দিবি?

এই অদৃশ্য অবহেলা মৃত্যু মৃত্যু খেলা মানব না!

এসময়

পান্নালাল মল্লিক

সময় পাল্টে গেছে ঘড়ির কাঁটাকে সাক্ষী রেখে—
তোমাদের ভোল বদল আমাকে বিস্মিত করেনি কখনও।
রক্ত মেখে প্রতিদিন ভোর হয়
চোখের জলে পাল তোলা নৌকা ভেসে যায়
মেঘের আঁচল কেটে সূর্য উঁকি দেয়
কখনও আকাশ নীলে রোদের বর্ণমালা দেখি—
মনে হয় হাঁক পাড়লেই
স্বপ্ন বপন করে চলে যাব, অন্য কোথাও!

ফোটা ফুলে হাত রেখে গান গায় দুরন্ত যুবক,
স্বপ্ন দোল খায়, নিয়ম ভাঙার ঘণ্টা বাজে—
বৃত্তের ভিতর বৃত্ত গড়ে হাঁটে কঠিন সময়।
বিসর্জনের বাজনা শুনতে শুনতে আজও
মুঠোয় ধরে আছি হাতের নিশান,
যেমন করে সন্ত্রাসের বধ্যভূমিতে
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে শুদ্ধ বিবেক।

দিকে দিকে জেগে উঠছে নতুন ভূখণ্ড

সুধাংশুরঞ্জন সাহা

প্রথম পুরুষ। আমিই সেই ছেলে
ক্লাস ফাঁকি দিয়ে খেলার মাঠের
এপ্রান্ত ওপ্রান্ত ছুটেছি, ফড়িং ধরেছি
ফড়িং উড়িয়েছি, সে এক মজার সময়।

দিনকাল বদলে গ্যাছে। মাঠ জুড়ে
এখন অজস্র বহুতলের উন্নত শির...
গলিতে গলিতে সিন্ডিকেটের বাঘের গর্জন
বাঘের ভয়ে সবাই ত্রস্ত হরিণী
তবু, বাঘে গরুতে এক পুকুরে নামে।

নদীগামী ধুলোপথ নিরুপায়।

রসাতলের রসদ সংগ্রহে নেমেছে সময়!
তিন তাসের জাদু ফুঁসছে মেধায়...
স্কুলেই বহিরাগতের হাতে জনপ্রিয় শিক্ষক
বেধড়ক মার খাচ্ছে
মাস্তানরা থার্ডডিগ্রি প্রয়োগ করছে
প্রতিবাদী ডাক্তারের ওপর, প্রকাশ্য দিবালোকে।
মা-বাবার সামনেই মেয়ের ওপর বলাৎকার
উসকে দিচ্ছে এক ভয়াবহ পরিণতির ইতিহাস
এরা ভুলেও ভাবছে না একবার
পৃথিবীতে এটাই শেষ রাত নয়
আরও রাত আসবে, আসবে ভোরও।
সেই ভোরের অপেক্ষাতেই জ্বলে উঠছে
লক্ষ লক্ষ মোম। সেই আলোতে
দিকে দিকে জেগে উঠছে নতুন ভূখণ্ড,
কান্নামোছা স্বপ্নিল চোখে চোখে
প্রতিবোধক।

ডানা পোশাক

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

সাদা পাতা থেকে
তুলে আনি ফড়িঙের খিদে ঘুম
বিশেষ সংবাদ
লাভের উত্তর লেখা কাদাগোলা জলে ক্ষমতার সদম্ভ ঘোষণা
পরজীবীদের যাওয়া আসা
উত্তাপ হারিয়ে মৃত রক্তজ্যোৎস্না
তিন পা ঠিক আরও তিন পা দূরে
শূন্য ছায়াপথ

বৃষ্টি এলে নেচে ওঠে ফুর্তিবাজ ফড়িঙের ডানার পোশাক।

আশ্চর্য অরূপ

যযাতি দেবল

কিছু তো করার নেই—এই ভেবে কতদিন চুপ
থেকে কাটাবে সময়
কতদিন বুক জুড়ে পুষে রাখবে ভয়;
এখনও ঘরের কোণে এখনও সংশয়...
সমীগাছে অস্ত্র বেঁধে মেনে নেবে ঘৃণ্য পরাজয়?

এটা নয় বেঁচে থাকা, এটা নয় মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

মেনে নেবে আলফাল কথাঞ্জলি কথার বিকৃতি
মায়ের উঠান জুড়ে কালান্তক বেহায়া উচ্ছ্বাস
মদগর্বে মত্ততায় দুর্জন দুষ্কৃতী
রাজ্যজুড়ে স্পষ্ট আজ তারই প্রতিভাস
এবং সেটাই দেখি পেয়ে যাচ্ছে সুন্দর মান্যতা
শাসকের আস্তাবলে সরকারি সন্ত্রাস
থানার আড়ালে বসে নোংরা চোখে নির্মম বন্যতা
গ্রাম যেন মৃত্যুপুরী হানাহানি প্রেতের আবাস
লজ্জারুণ সংবিধান দিকে দিকে তাণ্ডব উল্লাস!

তবুও মানুষ জানে শেষ হবে হিংসা পরাক্রম
শীতল সন্ত্রাস শেষে মুক্তি পাবে মানুষের বুকচাপা শ্বাস
আলোর বিভায় ভেসে কাটবে বিভ্রম
পাখির কাকলি আর ভোরের আজানে
ভেষজ প্রলেপ পাবে সব ক্ষতস্থানে
আবার গড়বে দেশ—স্বপ্নের স্বদেশ
শান্ত হবে গ্রাম ঘর—চেনা প্রতিবেশ
শিশুর দেয়ালা দেখে মা-র মুখে হাসি অপরূপ

দোলায় দোদুল দোল ঘরে ঘরে আশ্চর্য অরূপ।

বাঁশি

নরেশ মণ্ডল

রাখালিয়া বাঁশি শুনি না এখন
শুনি বিষের বাঁশি
রাধাও নাচে না তাই
কেউ কেউ নাচে অঙ্ক কষে।

মজুর কপালে জমে বিন্দু বিন্দু ঘাম
পথ অবরোধে নেমেছে ওরা
অনেক ধাঁধা জমে আছে বুকে
হিসেব মেলাতে গিয়ে—মেলে না হিসেব
চেনা পথেই নেমেছে তাই।

বিষের বাঁশি বাজাও তুমি
বাজাও বাজাও বাজাও বাঁশি
তোমার বিষেই হবে বিষক্ষয়!

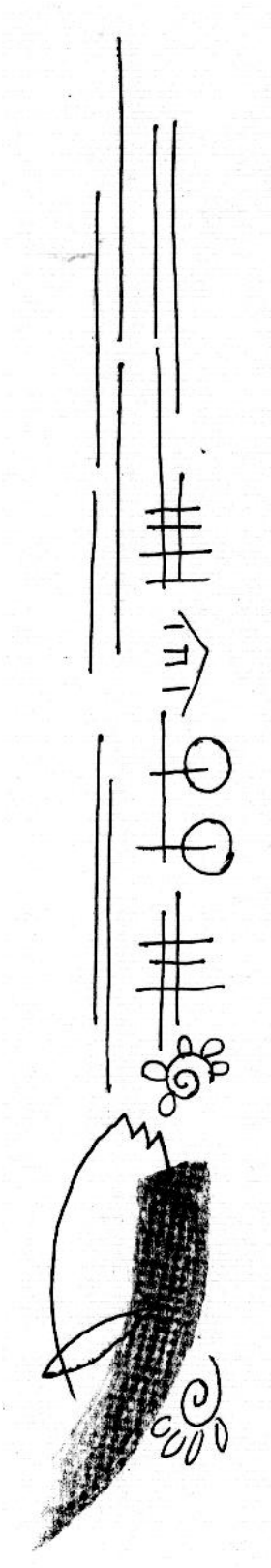

শোধ

মাধুরী অধিকারী

এমন নিশ্চিন্তে বসে পান চিবোনো ছাড়্
ছাড়্ তুই আধশোয়া আলসেমি
আমি তোকে যতদূর জানি
যতদূর বুঝি তোর এপাশ ওপাশ
অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের দুপুরে অবিশ্রাম দৌড়...
আচমকাই উচ্চস্বরে সুপুরির বদলে
ভেঙে পড়ে দাঁত—রক্তে ছয়লাপ,
ঠোঁটও
তুই কী বোঝাতে চাস
এই সেই পরম্পরায় তাম্বুল সোহাগ...!

সময় ভাবনা

পরেশনাথ কর্মকার

এখন সময় বড় অসময়
চারপাশে বোমা বারুদের গন্ধ
অসহ জীবনযন্ত্রণা
দুঃশাসনদের দাপাদাপি
এর পরেও লুকিয়ে রাখবে নিজেকে?

শরীরের গ্রন্থিগুলো সজাগ কর
পথেই মিলবে পথ, যদি—
চেতনার রঙ হয় রঙিন।

তুমি জান—
রণক্ষেত্রেই লুকিয়ে থাকে
জীবনের নতুন ঠিকানা...।

ধ্বনি

প্রকাশ দাস

ঘর খালি করে চলে গেছ তুমি।
সারা উঠান ভরে গেছে সবুজ মুথাঘাসে।
শূন্য দাওয়ায় পড়ে আছে তোমার চন্দ্রহার।
পিঠে চাবুকের দাগ নিয়ে
সারাবেলা ঘুরি পথে-পথে
ধূলায়, পথে-পথে চেয়ে দেখি
কোথায় লুকিয়ে রয়েছে আমার জন্মদাগ।
কলঙ্কের দাগভাগ নিয়ে
পায়ের নিচে শুয়ে থাকা
হে আমার অন্নদাতা ভূমি
দিনাবসানে পাত পেড়ে
যদি বসে পড়ি তোমার কোলে
যেন শুনি
অন্নের থেকে উঠে আসা
ওঙ্কার ধ্বনি।

সাগরের ডাক

পরেশ ঘোষ

তারপর হাঁটতে হাঁটতে
নোনা জল ছুঁয়েছি কত
বালিয়াড়ি ভেঙে এগিয়েছি যত।

ঝাউবন ভেসে গেছে
ভেঙে গেছে বালুকাবেলা
নোনাজল নোনা বালি শাওন-একলা।

অতলান্ত সাগরের দিকে
ফিরে চাওয়া অনিবার্য দুর্নিবার
ঢেউয়ের অমোঘ টান এসেছি আবার।

পড়ন্ত জীবনের বাকি আর দিন
হিসাবের ধারাপাত খোলা পড়ে থাকে
সাগর ডেকেছে আবার ডাকে আমাকে।

ভালোবাসা মিশে আছে
নোনা জল বেলাভূমি সফেন হাওয়া
জীবনের ওঠাপড়া নৈঃশব্দে আসা-যাওয়া।

বন্য আসে আসুক

পুষ্পজিৎ রায়

বন্যা আসে আসুক, আসুক
দেশ ভেসে যায় ভাসুক, ভাসুক
ত্রাণ দেবে না তোমরা
রাজ্য চালাই বিপদ, বালাই
দেখব আমি সত্যি বা lie
যা দেব তা, আমরা!

আমার দল আমি গব্‌মেন্‌
তোমরা তো নও কোনো কম্মেন
করবে তো কাজ ক্যাডার

ঘর গেলে সব থাকবে হাটে
বাজার গেলে থাকবে মাঠে
আর কী কথা, ব্রাদার!

বন্যা আসে, আসুক আসুক
দেশ ভেসে যায় একটু ভাসুক
কীসের আবার মিটিং
সব দলে খর্ব বল
বাড়বে শুধু কথার জল
'ম্যানমেড' না 'চিটিং'!!

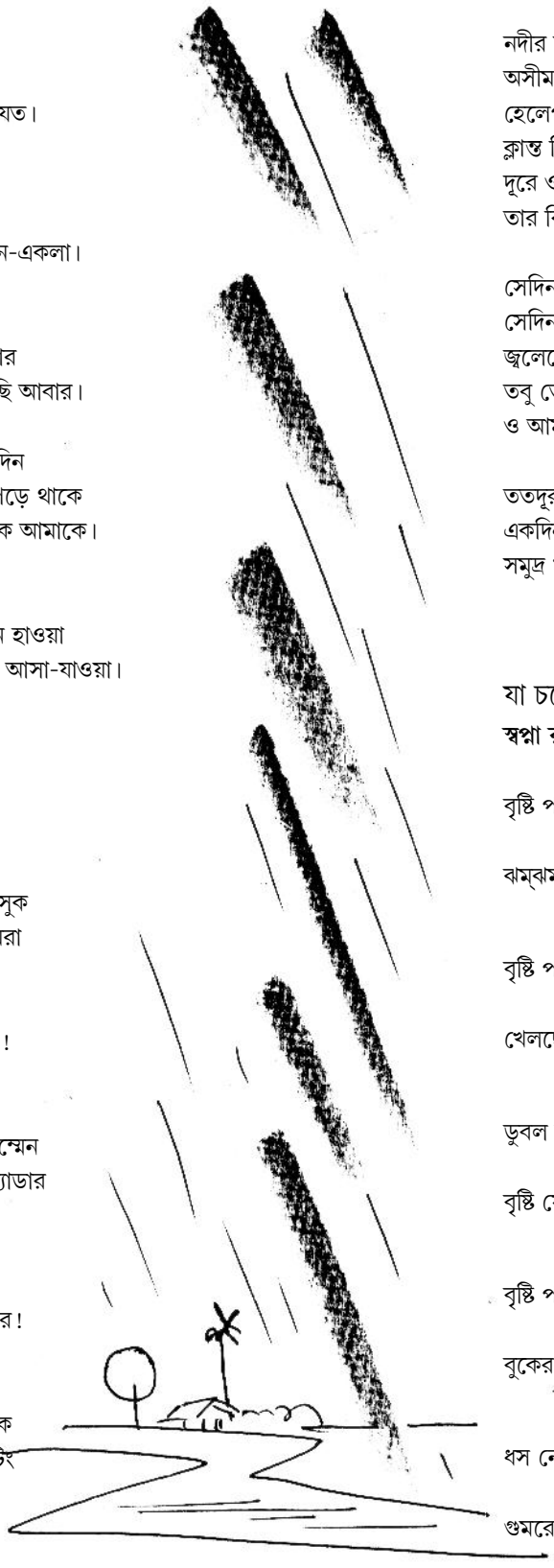

মাঝির জন্য

রসুল করিম

নদীর চড়ায় ঘুমিয়ে আছে কুমারী রোদ
অসীম সংযমে দ্যাখে—
হেলেপড়া সংসার
ক্লান্ত বিকেল চেটে নেয় একবুক নদী
দূরে ওই দূরে শীর্ণ পাতায় বাঁধা
তার বিশাল পৃথিবী

সেদিনও পেশিবলে ছুটিয়েছিল জলযান
সেদিনও হাওয়ার পালে নাচিয়েছিল ঘনবসতি
জ্বলেছে আর নিভেছে মোমবাতি হাওয়া
তবু তোমাকে দিতে পারিনি কিছুই
ও আমার দুখিনী শ্রাবণ

ততদূর নয়
একদিন মুখে মুখে কথা হবে
সমুদ্র খনন।

যা চলে যা

স্বপ্না রায়

বৃষ্টি পড়ে গ্রাম শহরে
বৃষ্টি বাজার হাটে
ঝম্‌ঝমাঝম্‌ উথাল পাথাল
খাল বিল মাঠঘাটে।

বৃষ্টি পড়ে রাত্রে দিনে
নেইকো চোখে ঘুম—
খেলছে নদী পাড় ভেঙে ওই
খেলার সে কী ধুম!

ডুবল ফসল গোরু বাছুর
লক্ষ গৃহহীন
বৃষ্টি যেন রাক্ষুসী এক
নিষ্ঠুর দায়হীন!

বৃষ্টি পড়ে পাহাড় জুড়ে
কোথায় যে ধস নামে
বুকের ভেতর গাবগুবাগুব
যেন বা না থামে!

ধস নেমেছে টিংলিং-এ তার
আকুল প্রাণের কান্না
গুমরে বলে সর্বনাশী
যাক চলে যাক আর না।।

চে-কে মনে রেখে

অমল কর

খুনি-সভ্যতায় এখন বাতাস ফাটে ঠাসঠাস
অযোগ্য শাসনযন্ত্রের মারণ শোষণে
মানুষ দগ্ধে পোড়ে সময়ের জতুঘরে
আক্রমণ এখন অবদমিত বাসুকির ফণা
স্তব্ধ স্রোতমুখে আহত হৃদয় ভাসে বারুদ বাতাসে
প্রতিদিন আমাদের স্বরলিপি-কবিতালিপি
বেদনার অসহ বেদবাক্য লিখে রাখে

দুর্নিবার এসময়ের বিপন্নতায় আমরা দিশাহারা
ভেতরের হৃৎপিণ্ড-পোড়া আগুন আমাদের গ্রস্ত করে

দরিদ্র এ-বিশ্বে খিদে বড়ো কাতর
ফুল ফোটার আশায় প্রবল ভোরের প্রতীক্ষায়
নিশিজাগরণ। অন্যায় শোষণ সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে
বিরতিহীন তুমি পরাক্রম আর্নেস্তো চে গেভারা
তোমার ছিল সারাজীবন আপসহীন রণ
উচ্ছল রক্তে তুমি এক জেহাদের ফুটন্ত আগুন
তোমার প্রতিটি পদপাতে বিশ্ব হাঁটে সাথে
প্রতিটি নক্ষত্রে জমা রয়েছে মৃত্যুকে অস্বীকারের তীব্র মন্ত্র
সাবেকি জীর্ণ ক্লিন্ন ঢং ভেঙে প্রদীপ হয়ে জ্বলো
আর শ্রমজীবী মানুষের জন্য ঢালো অনির্বাণ আলো
বিপুল বাজাও স্পন্দনের মৃত্যুঞ্জয়ী বাঁশি
মিয়ানো জীবনে কুলোর ঝাঁকির মতো
মানুষ ফের ঝিকিয়ে উঠুক তোমার প্রবল উত্তাপে

কালিমপঙে চোদ্দ লাইন

প্রভাত ঘোষ

কখনো ডাইনে যায় কখনো বাঁয়েতে থাকে লুকোচুরি খেলা শেষে
ভরা যৌবনা পাহাড়ী কন্যা পথ ছেড়ে দেয় তিস্তা বাজারে এসে।
পাকদণ্ডী পথ ধরি, দু-পাশে অরণ্য রাজি, প্রশান্ত নির্জন—
ওক শাল সেগুনে, দেওদার পাইনে ভরে আছে বন।
হঠাৎ বর্ষা নামে, মুষল ধারেতে বৃষ্টি পাহাড়ে পাহাড়ে—
বন্ধুরা বলেছিল, 'পাগল নাহলে কেউ যায় নাকি এ ঘোর আষাঢ়ে।'

আমি তো দু-চোখে দেখি চারিদিকে ঘন নীল সবুজের সারি
'পাহাড়ের রানি' নয়, তবু আমি রূপ দেখে প্রেমে পড়ি তারি—
পুরোনো সাহেবি বাংলো বারান্দায় বসে আছি বেতের চেয়ারে
নীল পাহাড়ের বুকে সাদা তুলো মেঘরাশি ঘোরে আর ফেরে।
ভোর থেকে বসে আছি, কত পাখি ডেকে যায় নাম আমি
জানি না তো তারি—
থাকলে সেলিম আলি হয়তো বা বলে দিত
তাতে কিবা যায় আসে ভারি!
আমি শুধু প্রাণ ভরে শব্দ শুনি, চোখ ভরে শুষে নিই রঙ
সবুজ চাদরে মুড়ে বৃষ্টি শেষে রৌদ্রে ভাসে একা কালিমপঙ।

তিনি মানে শুধুই তিনি

সনৎ মণ্ডল

কাজের নামে কাজ ফাঁকিতে দক্ষ যারা
দুধ মেশানো জলের অনুপাতে;
তিস্তা নদীর জল কতটা
রঙ কতটা—
কে জানে সে কোথায় মিশে আছে!

ম্যামটি মানুষ ইচ্ছামতী
আবার অমোদিও;
সরস্বতীর বিড়ম্বনায় লক্ষ্মী যখন
উপত্যকায় দিচ্ছে গোলাপ ছুঁড়ে...
সেই গোলাপের পাপড়িগুলো
ঝড়ভাসিতে
রক্ত ভিজে পড়ছিল সব ঝরে!

ম্যামটি মানুষ ইচ্ছামতী
বলছি যা তো শোনো;
আমি মানে শুধুই আমি
শয়তান-ভগবানও!

আগমনীর সুরে

গৌতম সাহা

কাশবনে আজ বাজছে বাঁশি
আগমনীর সুরে,
বাজছে কোথাও কাছে-পিঠে
খুব বেশি নয় দূরে—
আগমনীর সুরে।

হৃদয়-বীণার তারে বাজে মালকোশের-ই ধুন,
মনের মাঝে সদাই গাহে গুন-গুন-গুন-গুন।
রোদকে ডেকে শরৎ বলে,
'থেকো আকাশ জুড়ে'—
আগমনীর সুরে।

ঢাকের মুখে বোল ফুটেছে
'তাক-কুর-কুর-কুর'
ও কালো মেঘ আর ডেকো না
'গুর-গুর-গুর-গুর'।
শারদীয়ার স্বর্ণশোভা দেখো দু-চোখ ভরে।

বাউল কবি একতারাতে ভৈরবী গায় ভোরে,
জাগছে আলো কালোর কোলে সুরের হাতটি ধরে।
মন পড়ে রয় ঠাকুরতলায়,
যায় না কোথাও উড়ে—
আগমনীর সুরে।

কাটাকুটি

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

অসমাপ্ত কবিতারা বুঝি প্রেত পিছু পিছু ঘোরে...
রূপক ও প্রতীক যত তীক্ষ্ণ মুখ তীরের মতন—
ধেয়ে আসে : এলোমেলো বর্ণমালা যেন ঝাঁক বেঁধে ওড়ে...
যেমন বন্দি জেলে মেনে নেয় পশু-নির্যাতন

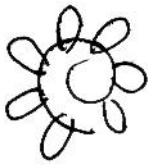

তাড়া করে তাড়া করে—দিস্তেদিস্তে পাতা ছেঁড়াখোঁড়া...
গর্ভে থেকে-যাওয়া-লেখা জন্মমাত্র পঙ্গু জরদ্‌গব...
পালানো যায় না; ভনভন করছে মাছিধরা বাক্যরা...
বিবর্ণ অতীত ভেঙে জাগছে ঐ ছন্দোবদ্ধ শব—

মওকা পেলেই কাঁধে চেপে বসবে শব্দের কাঠামো
যেন বা বেতাল পার করিয়ে নিল আলেয়ার জলা...
কোনও উপশম নেই, এ-লিখন দুরারোগ্য ব্যামো
কোষে-কোষে বিঁধে রয়েছে কতশত রফলা-জফলা...

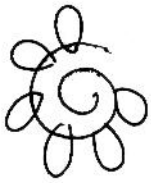

অসমপ্ত-প্রেম-এক পিশাচিনী কণ্ঠা চেপে ধরে...
না-লেখা কবিতারাশি মরে যায়, বেঁচে ওঠে, ভিতরে ভিতরে

ক্যাম্পাসে রোদ্দুরে

দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়

স্টেজে উঠেছিল এক মুঠো আলো, তাকিয়ে দেখুক লোকে
শাসক তাকাক শাসকসুলভ হাড়হিম করা চোখে
তুমিও তাকাও, তোমার দুচোখে পৌষ নবমীর চাঁদ
এক মুঠো ক্ষিতি অপ তেজ ব্যোম, এক মুঠো প্রতিবাদ

আহা কি স্পর্ধা, এত হিম্মৎ কোত্থেকে আসে তোর?
ওই বিনম্র নমস্কারেও এক কোটি থাপ্পড়
স্লোগানের চেয়েও জোরে বেজে ওঠে, এমন অগ্নি জ্বালালে
শাসক আঙুল তুলবেই, তা দেখে নাচুক চামচা দালালে

দেখুক, পৃথিবী তাকিয়ে দেখুক শাসকের চোখে ভয়
শাসক জানে না এখানে অকালে কালবৈশাখী বয়
শাসক জানে না কবে কার ওপর ইতিহাস ভর করে
পুলিশের কাঠি তোমার দুহাতে রোদ্দুর হয়ে ঝরে

আহা, রোদ্দুর ক্যাম্পাসে আজও রক্তকরবী ফোটে
আমার প্রতিটি লড়াই যেভাবে গীতশ্রী হয়ে ওঠে।

লাইনে আছি

কুশল দে

ঝড়ঝঞ্ঝা
ভূমিকম্প
শিলাবৃষ্টি
ফুরফুরে শীতল আমেজ।
এই সময়, অনেকেই শরীর গরম করে নেয়।

বুক পকেটে বেজে ওঠে মোবাইল।
ঢুকিয়েছিস?
না, ঢোকাইনি
এবার ঢোকাবো।
লাইনে আছি।

সকাল থেকেই গেট জ্যাম
টিউব ফেটে হাওয়া বেরিয়ে গেছে।
গুদামের মুখে উল্টে পড়ে আছে যান,
এক গর্ভবতী চক্রনাভি।

তুই কখন ফিরবি সোনা?
লাইনে আছি মা।

হুলো

আমির উল হক

চুনো পুঁটি মাছ ধরে
পেকেছিল চুল,
মিথ্যার বেসাতিতে
ছিল নাকো ভুল।
ক্ষুরধার চলাফেরা
নাটকীয় বেশ,
এতদিনে হুলোটার
কাল হল শেষ।
দিন যায় রাত যায়
দিন শেষে রাত,
শাক দিয়ে মাছ কেনে
মাছ দিয়ে ভাত।
পাকাচুল খাড়া করে
সজারু হুলোটা,
ঝুলি ভরে নিয়ে গেল
আলুটা-মুলোটা।
সবশেষে একদিন
দিনক্ষণ গুনে,
পাকা চুল ছাঁটা হল
কুঠারি সেলুনে।।

মজ্জাক্ষরণে

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! কে ছড়ায় ভাত! কাক
কই নেমে আসে! শাক
দিয়ে কই আর মাছ ঢাকা যায়! থাকা না-থাকার দিন
ঘরে কালঘুমে অচেতন। ওরে, মূর্খ-অর্বাচীন,
কই এলো আর রজতশুভ্র জীবন-যাপিত বোধ!

শুধু চারিদিকে হায়েনার হাসি, অপদার্থের ক্রোধ
সব গ্রাস করে, বাস করে ঘরে শেয়ানা শেয়াল। বাঘ
সেই কবে যেন হয়ে গেছে ভীরু ছাগ!
তার ছানারাই তিড়িং-বিড়িং নেচে-কুঁদে পথময়
বাগানের ফুল সব ঝরে যায়, সিংহ খাচ্ছে ঘাস।
পাখির কূজনে পূজনের নামে সংঘাত বারো মাস
চলছে। বলছে স্বরাজ এসেছে, পুরবাসী, ঘর-দোর
বন্ধ কোরো না; এক্ষুনি হবে ভোর।

হবে। হবে। ভোর হলে ওগো তুমি অদূরদর্শী নারী,
(বলিহারি, বলিহারি)
কেমন সূর্য দেখাবে, শেখাবে বাতাসের দোলাচলে
কেমনে হাতের তালুতে গজায় দুব্ ঘাস, কথা বলে
ভেতর-ঘরের আত্মা-শাবক! পাবক জ্বলেছে বুকে।
এই মাটি আজ হিংসার কৌতুকে
তোমাকে দেখায় কাঁচকলা; আহা, কানমলা খাও, রানি,
অন্য আকাশে রামধনু ওঠে; ঘুমন্ত রাজধানী
জাগবে কখন? যখন সবার ম্যমির ওপরে চিল
কাঁদবে ফাঁদবে জলদস্যুরা চক্র; দুয়ারে খিল্
তখনো দেবে না ভূমিপুত্রের পিতামহ-পিতামহী!

কেউ ভালো নেই। মজ্জাক্ষরণে সকলেই বিদ্রোহী।

ভেজা ছবি

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

এই মধ্য বিয়াল্লিশের বিকেলে দাঁড়িয়ে খুঁজি
বিগত জন্মের ডাক নাম

পান্না হয়ে যাওয়া দুঃখ-কথা থেকে উড়ে গেছে
একদল পরিযায়ী পাখি
কবে কোথায় অভিজাত হাত তুলে ডেকেছিলাম
প্রিয় ঝোরা নদীটির পাশে
ভুলে গেছি—অগ্নিগর্ভ দুপুরে সেই হাততালির শব্দ

কেবল ভেঙে পড়া মাস্তুল হাতে দাঁড়িয়ে
সমুদ্রপাড়ে খুঁজি—আমাদের চণ্ডকাল

অনুভূতি

গণেশ ভট্টাচার্য

ছিঁড়ে দিতে নেই অনুভূতির জামা
ছিঁড়ে দিতে নেই উদাসী মানুষের অহঙ্কার
ছিঁড়ে দিতে নেই বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্ক...

ভালোবাসা তখনই যন্ত্রণা
যখন অপমান তাকে
আহত পাখির মতো
আছড়ে ফেলে
ভেঙে দেয় ডানা...

ছিঁড়ে দিও না মানুষের
স্বাধীনতা
একাকী বিষণ্ণ হেঁটে যাওয়া
নিভৃত নরম বুক
হৃদয়ে স্বপ্ন খুঁজে পাওয়া।

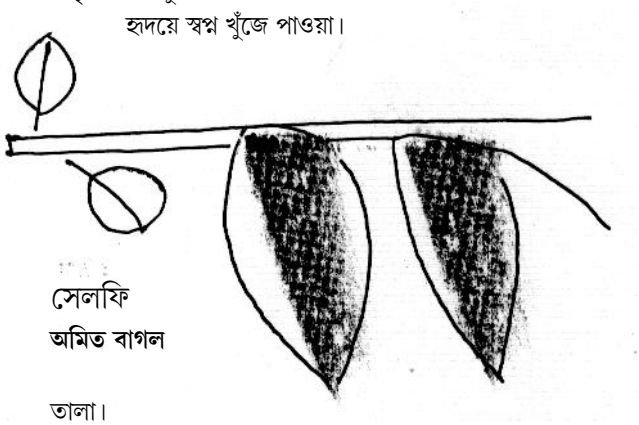

সেলফি

অমিত বাগল

তালা।
পালাই নি। কিছুদিন সরে গেছি। সয়ে গেছি তুমুল হিংসা-দ্বেষ
তালা। নির্দেশ নিয়ে গেছি। মা আমার বরাভয়া। বরাভয়ের দেশ

তালার খোঁপে বোলতা-ঘর
ভেজা ভেজায় ফাঁক-ফোঁকরে রোদ-ছায়া-গাছ-গাছালির
মাটিকে শোকায়, শুকবে না জীবনের আভা কোনোদিনও!

আমার আভা বলতে ভারতবর্ষ আমার দেশ
তোর ফোন বেজে বেজে নো-অ্যানসার, সারাবেলা অভ্রান্ত বিইজি...
কি চতুর কল-ড্রপ! পদ্মের ফুটে ওঠা আভায়-প্রভায় দ্যাখো...

কার দোষ কার গুণ, সরে যে ছিলাম
এসে দেখি, দরজার ফাঁক দিয়ে কালো-পিঁপড়ের দল
কোথা যায়, ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আরেক আশ্বিনে যায় বুঝি

জীবন আর কিছু নয়, যত সব-ই আমাদের আভা—

থাক। চাবিটি ছোঁয়াবো না
এত ছাড়াছাড়ি! তার উপর আমি এসে ভেঙে দেব কাঁচা ঘরবাড়ি

চলমান

বিষ্ণু সামন্ত

আমরা ট্রেনের মধ্যে। ট্রেন চলছে প্রচণ্ড গতিতে।
বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে
জানলার শার্সিগুলো সব বন্ধ, একটা শুধু
ভাঙা জানলায় আমার চোখ—বাইরে
আকাশ তোলপাড় করা ঝড়
ঘনঘন বাজের তীব্র আলো আর অসহ্য আওয়াজ
সে কী তাণ্ডব!
আমরা ট্রেনের মধ্যে, ট্রেন চলছে নির্বিকার।

দেখা

দিশা চট্টোপাধ্যায়

চোখ বন্ধ করলে
দেখতে পাই—
তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমার সামনে।

আমি পা উঁচু করে দেখতে চাই
দেখতে পাই...
কেবল তোমার দাঁড়িয়ে থাকা।

তোমার ওধারে কোন পৃথিবী
তুমি কেবল মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে থেকো
তোমার এধারে এই পৃথিবী।

পাওয়া এবং হারিয়ে পাওয়া
চাওয়া শুধু দেখতে পাওয়া
কেবল তোমার ওই দাঁড়িয়ে থাকা।

ঈশ্বরীয় আলো

শান্তা চক্রবর্তী

কে বলেছে নারীই সৃষ্টির আধার, বিজ্ঞান?
কে বলেছে পুরুষ ও নারীই সৃষ্টির মূলে, কবি?
আজ সেই নারীর অরির উল্লাসে কেঁপে উঠছে ভূমি
আমি ও তুমির ভালোবাসার মাঝে ঢুকেছে শয়তান
ফিরে আসছে কাঁচামাংসের আদিম সভ্যতা, মানুষের
ভব্যতা অন্তরীণ, বৃথা হৃদয়ের বীণ বেজে যায়
প্রেম তো পরবাসে, ভালোবাসার অসুখ এখন
জঙ্গলে পড়ে থাকা গর্ভবতীর লাশ পাহারা দেয় চাঁদ

মান ও হুঁশ মরে গিয়ে মানুষের মুখোশে ঢুকে পড়েছে পশু
তারই মাঝে এই অসূয়া আঁধারে, গ্রাম ও শহর, মৃত সভ্যতায়
মাটির প্রদীপের মতো টিমটিম করে
পথ দেখায় এক দুটি ঈশ্বরীয় আলো

অব্যক্ত

সুস্মেলী দত্ত

উত্তাপে গলে গেল মোম
সেই তোমাকে
মুখস্থ করে চলেছি সারারাত
সম্ভ্রান্ত বিকেল পার করে ধূ ধূ উষ্ণতা বহুদূর
সৌজন্যসম্মত ঢেউ, পাহাড়ের পাকদণ্ডী স্পষ্ট হল
বৃষ্টির 'ব' এখন সর্বাঙ্গে
সেই তোমাকে মুখস্থ...
মোম মোম আকাশ,
তোমাকে স্পর্শ করলে
নিজেকে সম্পূর্ণ বলে মনে হবে—
সেই তোমাকে...
এই বলে আগুন মাথা তুলে দাঁড়াল
চোখ বন্ধ করল গোধূলি
প্রচ্ছন্ন আবেগ না কি প্রেম!
সে জানে না
শুধু পুড়তে জানে
আগুন পোড়াতে
অথচ
দহনের পর কেউ কাউকে বলল না,
ভালোবাসি।

নাগরিক আশ্রয়

দেবাশিস প্রধান

কে কাকে প্রণাম করে
কে কাকে ছোঁয়ায় হাত
এ চোখে নম্রতা ঝরে
স্নানান্তে নোয়ায় মাথা...

পায়ে ও পয়ারে ধুলোবালি জমে
এও এক আবিশ্ব ভ্রমণ
বন্ধনের আকণ্ঠ টানে, গানে গানে
আবিশ্ব সুরের তৃতীয় নয়ন...

নিশি অবসান প্রায়, পুরাতন বছর হল গত
আমি এই ধুলো গ্রামে, এ জীবন ক্লান্ত সম্মত
তবে তুমি কেন এত কুঁজো হয়ে বসে আছো ঘরে
সুখ-দুঃখ অব্যর্থ নিদান জেনে তৈরি থেকো
মোচ্ছবে নয়, মানবিকতার ঠোঁটে ঠোঁট বুলিয়ে
নতমুখ মুদ্রায় বসো, বলো—প্রভু, এই বেশ আছি
আমাদের ভাঙাচোরা কথার নগরে...

সন্তানহন্তারক বিজ্ঞানী

শ্যামল চক্রবর্তী

'হন্তারক' শব্দ আমাদের শুনতে ইচ্ছে করে না। তার ওপর 'সন্তানহন্তারক' শুনলে সারা শরীর আমাদের কেমন কেঁপে ওঠে। 'সন্তানহন্তারক বিজ্ঞানী' তবে কে? কতজন সন্তানহন্তারক বিজ্ঞানীর কথা আমরা জানি?

একজন বিজ্ঞানীর নাম পল এহ্‌রেনফেস্ট। ১৮৮০ সালে অস্ট্রিয়ায় জন্ম। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় তিনি বড় হয়েছেন। বাবা-মা দু-জনেই একটা মুদির দোকান চালাতেন। গণিত তাঁর সবচেয়ে ভালোবাসার বিষয় ছিল। তবে রসায়ন নিয়ে পাশ করেছেন। তাঁর একজন মাস্টারমশাই ছিলেন লাডভিগ বোলৎজম্যান। বিজ্ঞানে বোলৎজম্যানের কাজের কোনো তুলনা হয় না। অথচ যখন তিনি তাঁর কাজ নিয়ে বললেন, অনেক বিজ্ঞানী মানতে চাইলেন না। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হল বেশ। নিশ্চয়ই নরম মনের মানুষ ছিলেন খুব। একদিন দেখা গেল তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

মাস্টারমশাই বোলৎজম্যানকে ছাত্র এহ্‌রেনফেস্ট কখনও ভুলতে পারেন নি। তাঁর কাছেই তো ডক্টরেট থিসিস করেছেন এহ্‌রেনফেস্ট। প্রতি পদে তাঁকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন। তাই বলেই কি মাস্টারমশাইয়ের মতো নিজেকেও পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিতে হল? চলে গেলেন। যাওয়ার আগে নিজের এক সন্তানকেও তিনি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন। লেখাপড়া ও গবেষণা জীবনে অভাবনীয় খ্যাতি পেয়েছিলেন এহ্‌রেনফেস্ট। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর দেখা সেরা মাস্টারমশাই হিসেবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা বলতেন, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলতেন এহ্‌রেনফেস্টের কথা। শিক্ষকতায় শীর্ষ সফলতা, গবেষণায় শীর্ষ সফলতা, তবু তিনি নিজেকে কেন পৃথিবীর পক্ষে 'অযোগ্য' মনে করেছিলেন?

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়া হল তাঁর। এরপর চলে গেলেন গটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। গটিনগেন তখন গণিতবিদ্যা আর তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার স্বর্গরাজ্য। ওখানে এক সোভিয়েত কন্যার সঙ্গে দেখা হয়। নাম তাতিয়ানা। কিয়েভে জন্ম। সেন্ট পিটার্সবার্গে পড়েছেন। গণিতের সেরা গবেষিকা ছিলেন তাতিয়ানা। ১৯০৪ সালে এহ্‌রেনফেস্ট নিজের ডক্টরেট থিসিস জমা দেন। ডিসেম্বরে তাতিয়ানাকে বিয়ে করেন। দুই ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে দু-জনের সংসার ছিল। এক মেয়ে গণিত নিয়ে পড়াশোনা করে নাম করেছেন। আর এক মেয়ে লিখতেন ও ছোটোদের বইয়ে ছবি আঁকতেন। বড়ো ছেলে পদার্থবিদ্যার জগতে ছিলেন। সবার ছোটো ছেলের নাম ওয়াসিক। ১৯১৮ সালে তার জন্ম। পনেরো বছর বয়সে বাবার পিস্তলের বুলেটে প্রাণ গিয়েছিল।

১৯০৬ সালে বোলৎজম্যান আত্মহত্যা করলেন। আত্মহন্তারক বিজ্ঞানী। এহ্‌রেনফেস্টের উপর ভার পড়ল মাস্টারমশাইকে নিয়ে লিখবার। খুব বড় আকারে তিনি শ্রদ্ধা নিবন্ধ লিখলেন। ফেলিক্স ক্লেইনের মতো বিশ্বসেবা এক গণিতজ্ঞ এহ্‌রেনফেস্ট দম্পতিকে বললেন, বোলৎজম্যানের বৈজ্ঞানিক অবদান নিয়ে বড় লেখা লিখতে। কয়েক বছর ধরে দু-জনে খুব খাটলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল চলে গেল। বিজ্ঞানী দম্পতির লেখা তারপর বেরোল। বিজ্ঞানে সত্যিকারের কী অবদান রেখে গিয়েছেন বোলৎজম্যান, অসাধারণ বিশ্লেষণে লিখলেন দুজনে। এমন লেখা সচরাচর দেখা যায় না।

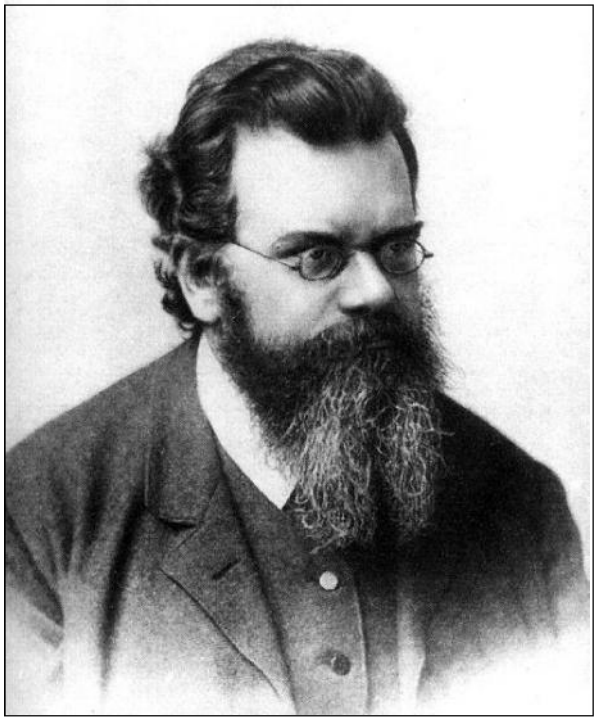

লাডভিগ বোলৎজম্যান

১৯০৭ সালে এহ্‌রেনফেস্ট সোভিয়েত কন্যার দেশে গেলেন। বন্ধু পেয়েছিলেন কয়েকজন। তবে অস্ট্রিয় নাগরিক তিনি। পরিচয়ে ইহুদি। ওখানে পাকাপাকি থাকার কথা ভাবাই যায় না। তবু সেন্ট পিটার্সবার্গে পাঁচ বছর রইলেন। তখন তাঁদের সংসারে দুই কন্যার জন্ম হয়েছে। ১৯১২ সালে যখন জার্মানিতে ফিরে এলেন, প্রথম কন্যার বয়স সাত বছর। দ্বিতীয় কন্যার বয়স দুই বছর। জার্মানিতে এসে তিনি একটা পাকা চাকুরি খুঁজছিলেন। এক ডাকে যে তত্ত্বীয় পদার্থবিদদের পৃথিবীর সকলে চেনেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব

ছিল। বার্লিনে গিয়ে ম্যাক্স প্লাঙ্কের সঙ্গে দেখা হল। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আর্নোল্ড সোমারফেল্ডের সঙ্গে দেখা হল। প্রাগে গিয়ে তখন তিনি আলবার্ট আইনস্টাইনকে দেখতে পেলেন। তারপর তো দু-জনের সখ্য দিন দিন বেড়েছে বই কমেনি। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনস্টাইন সে-সময় চলে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর জায়গায় এহ্‌রেনফেস্টের নাম সুপারিশ করেছিলেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো অভাব ছিল না তাঁর। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই ছিল বলা চলে। তবু চাকুরি হল না কেন? নিজেকে তিনি 'নাস্তিক' ঘোষণা করেছিলেন। আইনস্টাইন তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, চাকুরিটা হয়ে যাক একবার। তারপর নিজেকে 'নাস্তিক' ঘোষণা করলে চাকুরি যাবে না। এমন বোঝাপড়ায় যেতে রাজি ছিলেন না এহ্‌রেনফেস্ট। বন্ধু সোমারফেল্ড তাঁকে মিউনিখে নিয়ে যেতে চাইলেন। একই সময়ে লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সেখানে যোগদান করেন। তাঁর বিদ্যাবত্তার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর নানা দেশের সেরা পদার্থবিদেরা তাঁর আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন ও তাঁদের কাজের বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সামনে বলতেন। অধ্যাপনায় এক বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল এহ্‌রেনফেস্টের। সেরা ছাত্ররা সব তাঁর ক্লাসের লোভে ছুটে আসত। বেশ কজন তাঁর কাছে গবেষণা করে পরে পৃথিবীজোড়া নাম কিনেছেন। ক্লাসে তিনি বেশি ছাত্র নিতেন না। খবর রাখতেন কারা লাইব্রেরিতে নিয়মিত যায়, পড়াশুনো করে। তাদের থেকে বেছে নিতেন। আগেই বলেছি, আইনস্টাইন বলেছিলেন, ''আমার জীবনে অমন ভালো শিক্ষক আমি দেখিনি।'' এককথায় বলা যায়, তাঁর ছাত্রদল যে-কোনো গবেষকের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। ছাত্রদের কয়েকজনের পরিচয় পরে দেব। যে বিজ্ঞানীরা বাইরের দেশ থেকে এসে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন সেই তালিকাও আমাদের বিস্মিত করে। এনরিকো ফার্মি, রবার্ট ওপেনহাইমার, ভার্নার হাইজেনবার্গ, পল ডিরাক। এমন কত নাম বলব?

১৯২৮ সাল। সামারের ছুটিতে রবার্ট ওপেনহাইমার কাজ করবেন ভেবে এহ্‌রেনফেস্টের কাছে চিঠি দিলেন। পরমাণু বোমা যখন তৈরি করছিল আমেরিকা, লস আলামস গবেষণাগারের প্রধান ছিলেন ওপেনহাইমার। বোমার বীভৎসতা দেখে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যেন এই বোমা কিছুতেই মানুষের বসতিতে নিক্ষিপ্ত না হয়। পরে কমিউনিস্ট সন্দেহে তাঁকে নানাভাবে হেয় করা হয়েছে। ওপেনহাইমারের চিঠি পেয়ে এহ্‌রেনফেস্ট লিখেছিলেন এক অসম্ভব মজাদার চিঠি :

''ইউরোপে এসে আগামী বছর তুমি যদি গণিতবিদ্যার ভারি গোলাগুলি বর্ষণ করতে চাও তবে লেইডেনে এসো না। এমনকি হল্যান্ডে আসতেও বারণ করব। আমি তোমাকে সত্যিই পছন্দ করি বলে এমন করে লিখছি। কিন্তু প্রথম কয়েকমাস ধৈর্য ধরে তুমি যদি আমাদের এখানে কাটাও, হইহুল্লোড় করে কিছু বিষয় আলোচনা করব। কিছু মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আমি ও সকল তরুণ বন্ধুরা তোমার সঙ্গে হালকা মেজাজে তর্ক করব। পেপার ছাপাবার বাড়াবাড়ি চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললে আমি তোমায় দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করব।''

বিজ্ঞানে কেমন কাজ করে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন সে আলোচনায় যাব না। একটা কথা বলব শুধু। পদার্থবিদ্যার বইয়ের পৃষ্ঠায় 'এহ্‌রেনফেস্ট থিওরেম', 'এহ্‌রেনফেস্ট মডেল', 'এহ্‌রেনফেস্ট প্যারাডক্স' এসব শিরোনাম জায়গা পেয়েছে। ছোটোখাটো কাজের বেলায় বিজ্ঞানীদের নাম দিয়ে কোনো 'তত্ত্ব', 'মডেল' বা 'কুটাভাস' বিজ্ঞানের বইতে তো জায়গা পায় না।

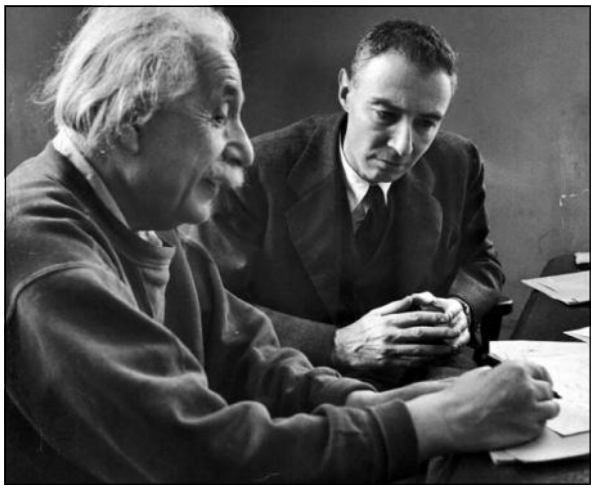

রবার্ট ওপেনহাইমার ও আলবার্ট আইনস্টাইন

'অর্থনীতি' বিষয় হিসেবে তাঁর খুব পছন্দের ছিল। পদার্থবিদ্যার সূত্র দিয়ে তিনি অর্থনীতির চলাফেরা বুঝতে চাইতেন। এক গবেষক ছাত্রকে তিনি এই নিয়ে ডক্টরেট থিসিস করতে বললেন। ছাত্রের নাম জ্যান টিনবার্জেন। এই ছাত্র তাঁর কাজে এমন নাম করেছেন যে ১৯৬৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার চালু হলে টিনবার্জেনই প্রথম এই পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর ছোটোভাই নিকোলাস টিনবার্জেন ১৯৭৩ সালে শারীরতত্ত্ববিদ্যায় নোবেল পেলেন। সবচেয়ে ছোটো ভাই লুক টিনবার্জেনের নাম পৃথিবীর পক্ষীতত্ত্ববিদেরা সকলেই জানেন।

স্কুলে বিজ্ঞান পড়তে গেলে আমাদের সকলেরই নীলস বোরের নাম জানতে হয়। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী নীলস বোর। পরমাণুর গঠন নিয়ে যখন তাঁর কাজ বেরোল, এক জটিল বিতর্কে মেতেছিলেন এহ্‌রেনফেস্ট। বিজ্ঞানে বিতর্ক তুললে কেউ 'শত্রু' বলে বিবেচিত হয় না। আজকাল দেখা যায়, একটা পুরো বাক্যেরও প্রয়োজন হয় না। সামান্য একটা 'শব্দ' উচ্চারণেই 'শত্রুপক্ষ', 'মিত্রপক্ষ' ঠিক হয়ে যায়। যাক্ সে কথা। আইনস্টাইন যেমন এহ্‌রেনফেস্টের বন্ধু ছিলেন খুব, নীলস বোরও তাই। তিন বন্ধুতে মিলে লেইডেনের বাড়িতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন। হ্যান্স ক্র্যামার্স (১৮৯৪-১৯৫২) নামে একজন পদার্থবিদ ছিলেন যিনি এহ্‌রেনফেস্টের ছাত্র ছিলেন ও তাঁর অধীনে ডক্টরেট থিসিস করেছিলেন। মাত্র আটান্ন বছর বয়সে ক্র্যামার্স পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় তিনি একের পর এক মৌলিক অবদান রেখেছেন। তাঁর নামে পদার্থবিদ্যার বহু কাজ চিহ্নিত রয়েছে।

১৯১৯ সাল। নীলস বোর লেইডেনে এসেছেন। ক্র্যামার্স তাঁর থিসিসের কাজ নিয়ে বলবেন। বোর শুনবেন। তখন এহ্‌রেনফেস্ট ও বোর নানা আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন। ফিরে গিয়ে নীলস বোর যে চিঠি লিখেছিলেন তা পড়লে বোঝা যায়—বিশ্বসেরা এই বিজ্ঞানী এহ্‌রেনফেস্টকে কেমন চোখে দেখতেন।

''এত নানা রকমের বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমি বসে সেসব নিয়ে ভাবছি। আমি বুঝতে পারছি যে আপনার কাছ থেকে কত নতুন জিনিস আমি শিখেছি। আমার এই শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার আনন্দময় মুহূর্তগুলিও আমার মনে পড়ছে। আমার প্রতি আপনি যে আস্থা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন আমি প্রত্যুত্তরে তার উপযুক্ত কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না।''

হল্যান্ডের সবচেয়ে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়। হল্যান্ডের নাম এখন নেদারল্যান্ড। ১৫৭৫ সালের বিশ্ববিদ্যালয়। সাড়ে চারশো বছর প্রায় হয়ে গিয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের, তার মেধাবী ছাত্র-শিক্ষকের নাম লিখতে গেলে মহাভারত লিখতে হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা অধ্যাপক ছিলেন এমন ষোলো জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে, একসময় রেনে দেকার্ত, রেমব্রান্ড্‌ট, বারুচ স্পিনোজা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছেন।

এহ্‌রেনফেস্টের সুখের সংসারে একটাই বিষণ্ণতা ছিল। সবার ছোটো ছেলেটি যেমন করে বড় হবার কথা তা হচ্ছিল না। লেইডেনে যোগ দেওয়ার পর এহ্‌রেনফেস্ট ও তাতিয়ানার সংসারে দুই ছেলের জন্ম হয়। ১৯১৫ সালে বড় ছেলে পল এহ্‌রেনফেস্ট জুনিয়রের জন্ম। ডাক নাম পাভলিক। বাবার মতোই তিনি পদার্থবিদ্যার জগতে গিয়েছেন। মা তাতিয়ানার জন্ম ১৮৭৬ সালে। ১৯১৫ সালে মায়ের বয়স চল্লিশ বছর। আগেই বলেছি আমরা, মা তাতিয়ানা ছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের কন্যা। ছোটোবেলায় তিনি বাবাকে হারান। এক কাকার সংসারে ছোটোবেলায় বড় হয়েছেন। সে-সময় পৃথিবীর অনেক জায়গার মতোই রাশিয়াতেও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি ছিল না। মেয়েদের স্কুলে তাতিয়ানা পড়া শেষ করলেন। তারপর শিক্ষিকা হবার ট্রেনিং নিলেন। মেয়েদের বিজ্ঞান পড়াতেন তিনি। কয়েক বছর পর মনে হল, আরও পড়বেন। কিন্তু কোথায় পড়বেন? ঠিক করলেন জার্মানিতে গিয়ে গর্টিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন। একসময় এহ্‌রেনফেস্ট ও তাতিয়ানার পরিচয় হয়। গণিতবিদ্যায় তাতিয়ানার প্রতিভা ছিল সত্যিই বলবার মতো। তখন একটা 'গণিত ক্লাব' ছিল যেখানে অনেকে মিলে মাঝে মাঝে বসতেন ও গণিতের নানা বিষয় সেখানে আলোচনা হত। কয়েকটা দিন যাওয়ার পর দেখা গেল, তাতিয়ানা এই ক্লাবে আসছেন না। কেন আসছেন না? খোঁজ নিতে গিয়ে এহ্‌রেনফেস্ট জানতে পারলেন, মেয়েদের এই ক্লাবে যাওয়ার অনুমতি নেই। এহ্‌রেনফেস্ট তার প্রতিবাদ করেন। একসময় নিয়ম বদল হয়।

মেয়েদের আলোর বাইরে সরিয়ে রাখার সামাজিক নানা 'নিয়ম' তো দেশে দেশেই ছিল। বিয়ে থা হয়ে গেল দুজনের। ১৯০৭ সালে তাতিয়ানা ও এহ্‌রেনফেস্ট যখন সেন্ট পিটার্সবার্গে যাবেন ভাবলেন, তখন একটা নিয়মের বাধা ছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজনের আলাদা ধর্ম হলে সে দেশে ঠাঁই হবে না। এহ্‌রেনফেস্ট ইহুদি। তাতিয়ানা ছিলেন রুশ অর্থোডক্স ধর্মের মেয়ে। এসব পরিচয় দু-জনের কারও কাছেই খুব জরুরি ছিল না। মানুষের কাছে জরুরি না হলে কী হবে, রাষ্ট্রের কাছে অনেক সময় 'ধর্ম' খুব জরুরি হয়ে ওঠে। আজও সে জিনিস দেখা যায়। একটা উপায় আছে। দু-জনকেই বলতে হবে, ওঁরা 'নাস্তিক'। কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না। সেটা তবু একটা ভালো দিক বলতে হবে। এমন প্রশ্ন তো তোলাই যেত, আজও যায়। 'ধর্ম' বাদ দিয়ে আবার মানুষ হয় না কি? দুজনে এসব ভাবেন না। নিজেদের 'নাস্তিক' বলে জানিয়ে দিলেন। বছর পাঁচ ছিলেন ওঁরা সেন্ট পিটার্সবার্গে। তখন তাতিয়ানা জ্যামিতি ও গণিতবিদ্যার নানা বিষয় পড়ানোর বেশ কিছু নতুন উপায় বের করেছিলেন। অনেক পরে, সোভিয়েত দেশ নতুন করে তৈরি হওয়ার পর, ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তাতিয়ানা সে-দেশের গণিত পাঠক্রমের এক বড় রকমের বদল ঘটিয়েছিলেন। পড়ানো যাতে ছাত্রদের ভালো লাগে, তার অনেক উপায় তিনি বের করেছিলেন।

তাতিয়ানা

বোলৎজম্যান-কে নিয়ে যে অসাধারণ লেখা লিখেছিলেন দুজনে, সত্যি বলতে গেলে যা বোলৎজম্যানের গুরুত্বকে বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার রচনাকার হিসেবে এহ্‌রেনফেস্টের পাশাপাশি তাতিয়ানার নামও রয়েছে। এহ্‌রেনফেস্টের গবেষণার নিত্যসঙ্গিনী ছিলেন তাতিয়ানা। দুজনে মিলে রুশ, ডাচ ও জার্মান ভাষায় প্রচুর লেখা লিখেছেন। তাঁর 'অঙ্ক শেখানোর উপায়' শুরুতে সমর্থন পাচ্ছিল না। নতুনকে গ্রহণ করার একটা অনীহা অনেকের ভেতরেই থাকে। বলতে বাধা নেই, ১৯৭০-এর পর তাতিয়ানার কাজ সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

এহ্‌রেনফেস্ট ও তাতিয়ানার সবচেয়ে ছোটো ছেলে ওয়াসিকের ১৯১৮ সালে জন্ম হয়। মা তাতিয়ানার বয়স তখন তেতাল্লিশ। বাবা এহ্‌রেনফেস্টের চেয়ে মা চার বছরের বড় ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞানগম্যি থেকে মনে হয়, এই কারণে হয়তো ওয়াসিক স্বাভাবিক শিশু হিসেবে পৃথিবীর আলো দেখেনি। খুব নিশ্চিত হয়ে এই কথা কেউ আমরা বলতে পারছি না। মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে বড় হচ্ছিল ওয়াসিক। হাসপাতালে বহু রকমের চিকিৎসা হয়েছে তার। প্রতিবন্ধী শিশুদের আবাসে রেখে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার সবরকম চেষ্টা হয়েছে। জার্মানির জেনা শহরে একটা খুব ভালো আবাস ছিল। খরচ অনেকটা বেশি। বাবা মা খরচের কথা একবারও না ভেবে ওয়াসিককে জেনার আবাসে অনেক দিন রেখেছিলেন। মাস্টারমশাইরা যাঁরা ওই আবাসে প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াতেন তাঁদের কথা পোস্টকার্ডে লিখে বাবা মায়ের কাছে পাঠাত ওয়াসিক। ১৯৩৩ সালে নাৎসি হিটলার যখন ক্ষমতায় এল তখন তাকে হল্যান্ডের ওয়াটারইঙ্ক ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসতে হয়। বাবা তাকে নিয়মিত দেখতে যেতেন। ১৯৩৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক ভয়ঙ্কর

ঘটনা ঘটে যায়। বাবা গিয়ে ইনস্টিটিউটের অপেক্ষা করবার ঘরে বসে আছেন। ওয়াসিককে খানিকটা পরে বাবার কাছে নিয়ে আসা হয়। বাবা এহ্‌রেনফেস্ট একটা পিস্তল বের করে ওয়াসিককে গুলি করেন তারপর নিজের বুকে গুলি চালিয়ে দেন। বাবা সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারান। ওয়াসিক কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিল। তারপর মারা যায়। পিতা শুধু সন্তানহন্তারক হয়ে বেঁচে রইলেন না ইতিহাসে, আত্মহন্তারকের গ্লানিও তাঁর পরিচয়ে গেঁথে রইল।

এহ্‌রেনফেস্টের কথা লিখেছেন একজন যিনি স্টলি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ ম্যাক্স ড্রেসডেনের ছাত্র ছিলেন। ড্রেসডেন এক অদ্ভুত মানুষ। কখন কী বলবেন বুঝতে পারা যেত না। একদিন ক্লাসে এলেন ড্রেসডেন। ছাত্রদের বললেন, অসম্ভব বিপদে পড়েছেন। খানিকক্ষণ থেমে তারপর বললেন, ''লাডভিগ বোলৎজমান আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর ছাত্র পল এহ্‌রেনফেস্ট আত্মহত্যা করেছেন। এহ্‌রেনফেস্টের ছাত্র জর্জ উহ্‌লেনবেক আমার মাস্টারমশাই। যদি তিনি আত্মহত্যা করেন, তারপর আমার পালা আসবে।'' ১৯৯৭ সালে ড্রেসডেন আশি বছর বয়সে ক্যান্সারে মারা যান। মোট ৬৩ জন ছাত্র তাঁর কাছে ডক্টরেট ডিগ্রি করেছেন।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ মার্টিন ক্লেইন। তিনি এহ্‌রেনফেস্ট-কে নিয়ে বই লিখেছেন। লিখলেন 'প্রথম ভাগ'। 'দ্বিতীয় ভাগ' আর কখনও লিখলেন না। জানতে চাইলে বলতেন, অমন শোকাবহ ঘটনার বিবরণ তিনি লিখতে পারবেন না।

এহ্‌রেনফেস্ট, নীলস বোরের সঙ্গে পল জুনিয়র

গণিতের দুই কিংবদন্তী অধ্যাপক ফেলিক্স ক্লেইন আর ডেভিড হিলবার্টের ছাত্র ছিলেন এহ্‌রেনফেস্ট। অনেক বন্ধু পেয়েছেন জীবনে। আইনস্টাইন ও বোর তাঁর সহোদরের মতো ছিলেন। হেনড্রিক লরেঞ্জ অবসর নেওয়ার পর লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন এহ্‌রেনফেস্ট। তাঁর ছাত্রদল ঈর্ষণীয়। তবু মানুষটি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাননি। মাঝে মাঝে চরম হতাশায় ভুগতেন। তাতিয়ানা জানতেন নিশ্চয়ই। বন্ধুরা কি জানতেন না? বন্ধুদের বিজ্ঞান বিতর্কে তাঁকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থতা করতে হত। তা করতেনও তিনি চমৎকার। ১৯২৭ সালে সলভে সম্মেলন বসেছে। পৃথিবীর সেরা পদার্থবিদেরা আমন্ত্রিত। বোর এসেছেন। আইনস্টাইন এসেছেন। আরও সকলে এসেছেন। এহ্‌রেনফেস্ট-ও এসেছেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে আইনস্টাইন আর বোর একমত হচ্ছেন না। সকলে দেখেছেন, কী অসামান্য দক্ষতায় তা সামাল দিলেন এহ্‌রেনফেস্ট। দুই বন্ধুতে মিলে কেন এমন ঝগড়া হচ্ছে? দুঃখ পেয়েছিলেন এহ্‌রেনফেস্ট। বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ সলভে সম্মেলনে হাজির ছিলেন। তিনিও তো কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লিখছেন—

''কদিন ধরে বিতর্ক চলল।.. এহ্‌রেনফেস্ট বললেন, তখন 'আইনস্টাইন, আমি তোমার জন্য লজ্জাবোধ করছি। নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে তুমি ঝগড়া করছ, যেমন তোমার বিরোধীরা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে ঝগড়া করে।'' 'আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' আইনস্টাইনের দান, একথা আমরা সকলেই জানি।

এহ্‌রেনফেস্ট দিন দিন তাঁর গবেষণার সহজাত প্রতিভা হারাচ্ছিলেন। আইনস্টাইন যেমন এক সময় বলেছিলেন, বিজ্ঞানের গবেষণার কাল তাঁর ফুরিয়ে এসেছে, নতুনেরা এখন কাজ করবে, এহ্‌রেনফেস্ট সে কথা বললেন খানিকটা ঘুরিয়ে। দু-খানা জার্নালের নতুন সংখ্যা হাতে এলে তাঁর দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। বলতে ইচ্ছে করে, ''My Boy, I know absolutely nothing.'' হতাশা তখন তাঁকে চারিদিক থেকে গ্রাস করতে চাইছে। ভাই হিউগো তখন সেন্ট লুইয়ে ডাক্তারি করছেন। কোনো কারণ ছাড়াই এহ্‌রেনফেস্টের মনে হতে লাগল, তিনি আর লেইডেনে থাকতে পারবেন না। ভাইকে একটা চাকরি খুঁজে দিতে চিঠি লিখলেন। ভাই ডাক্তার। বুঝতে পারলেন না দাদাকে। রেগে গিয়ে বললেন, ''অহেতুক তুমি হীনমন্যতায় ভুগছ।'' তখনই চলে গিয়েছিলেন সোভিয়েত দেশে। থেকে এসেছেন পাঁচ বছর। ১৯৩৩ সালে সন্তানের জীবন কেড়ে নিয়ে নিজের জীবননাশের ইঙ্গিত তিনি একটি চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেন। সেই চিঠি তিনি বোর, আইনস্টাইন ও পরিচিত বেশ কয়েকজনের কাছে লেখেন। তবে কাউকে পাঠাননি। পরে তাঁর ঘর থেকে সেই চিঠি খুঁজে পাওয়া যায়। সেই চিঠিতে তাঁর আশ্চর্য এক অভিমান। পদার্থবিদ্যার নিত্যনতুন আবিষ্কারের ছিটেফোঁটাও তিনি বুঝতে পারছেন না। তাই তাঁর আত্মহত্যা ছাড়া কোনো পথ নেই। সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু তাঁর দিন গুজরান। ভয়ঙ্কর মানসিক এক অসুখে ভুগছিলেন তিনি। কোনো মনোবিদের চিকিৎসা যদি পেতেন এহ্‌রেনফেস্ট, পৃথিবীতে হয়তো এই করুণ ইতিহাস রচিত হত না। নিরপরাধ দুই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল।

সবশেষে তাঁর গবেষক ছাত্রদের বিখ্যাত কয়েকজনের পরিচয় দিয়ে এই রচনার ইতি টানব।

জোহানেস মার্টিনাস বার্জার্স (১৮৯৫-১৯৮১)। নেদারল্যান্ডে জন্ম। ১৯১৮ সালে এহ্‌রেনফেস্টের কাছে ডক্টরেট ডিগ্রি করেন। 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব থিওরেটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ওয়াশিংটন শহরে মৃত্যু হয়।

আইনস্টাইনের সঙ্গে এহ্‌রেনফেস্ট ও পল জুনিয়র)

হেনড্রিক কাসিমির (১৯০৯-২০০০)। নেদারল্যান্ডে জন্ম। ১৯৩১ সালে এহ্রেনফেস্টের অধীনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। কিছুদিন কোপেনহেগেনে গিয়ে বিজ্ঞানী নীলস বোরের কাছে কাজ করেছেন। উলফ্যাং পাউলির গবেষণা সহযোগী ছিলেন। লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগ দেন। শেষ জীবনে ফিলিপ্স-এ চাকুরি করেন ও ১৯৭২ সালে অবসর নেন। 'ইউরোপিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি' তৈরিতে তাঁর অবদান স্মরণীয়। বিদেশের নানা জায়গা থেকে কাসিমির ছয়টি সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন।

ডার্ক কোস্টার (১৮৯৯-১৯৫০)। তিনিও নেদারল্যান্ডের সন্তান। একান্নবর্তী শ্রমিক পরিবারে জন্ম। দশ ভাইবোন। সকলেই লেখাপড়া করেন। এমএসসি পাশ করার পর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলেন। ১৯২২ সালে এহ্রেনফেস্টের কাছে থিসিস করেন। নীলস বোরের সঙ্গে কোপেনহেগেনে কাজ করেন। হেনড্রিক লরেঞ্জের গবেষণা সহযোগী ছিলেন। পরে গ্রনিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। হাফনিয়াম মৌলের সহ-আবিষ্কর্তা হিসেবে তাঁর নাম রসায়ন মহলে সুপরিচিত। তীব্র নাৎসিবিরোধী ছিলেন। লিজে মিটনার ও আরও অনেক ইহুদি বিজ্ঞানীকে গোপনে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেন। তাঁর নামে একটি গ্রহাণু রয়েছে।

স্যামুয়েল গাউডস্মিট (১৯০২-১৯৭৮)। নেদারল্যান্ডে জন্ম। ১৯৪৩ সালে তাঁর বাবা-মাকে হিটালারের বন্দিশিবিরে খুন করা হয়। ১৯২৭ সালে লেইডেনে এহ্রেনফেস্টের অধীনে ডক্টরেট ডিগ্রি করেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। দুবার নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লাইনাস পাওলিং-এর 'দ্য স্ট্রাকচার অব লাইন স্পেকট্রা' বইয়ের সহ-লেখক। লস আলামস পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন। বিখ্যাত জার্নাল 'ফিজিক্যাল রিভিউ'-এর মুখ্য সম্পাদক হয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় আগ্রহ ছিল। ইজিপ্ট সভ্যতা নিয়ে কাজ করেন। জর্জ ইউজিন উহ্লেনবেকের সঙ্গে ১৯২৫ সালে ইলেকট্রনের 'ঘূর্ণন' বিষয়ে স্মরণীয় গবেষণা করেছেন।

জ্যান টিনবার্জেনের কথা আগে বলেছি। এছাড়া জর্জ উহ্লেনবেক খুবই খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯০০ সালে জাকার্তায় জন্ম। ১৯৮৮ সালে আমেরিকায় প্রয়াত হন। ১৯২৩ সালে উহ্লেনবেক লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাশ করেন। এহ্রেনফেস্টের গবেষণা সহযোগী পদে যোগ দেন। তখন গবেষক ছাত্র ছিলেন স্যামুয়েল গাউডস্মিথ। ১৯২৫ সালে উহ্লেনবেক আর গাউডস্মিথ করলেন এক স্মরণীয় কাজ—ইলেকট্রনের 'ঘূর্ণন' আবিষ্কার। ১৯২৭ সালে উহ্লেনবেক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। নাৎসিরা যখন নেদারল্যান্ড দখল করে তিনি স্বদেশ ছেড়ে আমেরিকায় পাকাপাকি চলে যান। যুদ্ধের সময় রাডার নিয়ে গবেষণা করেন। কলম্বিয়া, মিচিগান, রকেফেলার ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। প্রচুর পদক ও স্বীকৃতি পেয়েছেন।

বিজ্ঞানের আজকাল অনেক উন্নতি হয়েছে। সুযোগ সুবিধে বেড়েছে। মনোবিদ্যার চর্চায় নতুন নতুন বিষয় যোগ হয়েছে। 'মন' নিয়ে ভেবেছেন অনেকেই। থালেস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হিপ্পোক্রেটস 'মন' নিয়ে কথা বলেছেন। ধীরে ধীরে 'দর্শন' থেকে 'বিজ্ঞান' মহলে প্রবেশ করেছে এই বিষয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, একুশ শতকে মনোবিদ্যা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, আজ এহ্রেনফেস্ট থাকলে তাঁকে আমরা হয়তো আত্মহননের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। 'আত্মহন্তারক' ও 'হত্যাকারী' হিসেবে বিজ্ঞানীকে এই অপবাদ চিরকাল বইতে হত না।

With Best Compliments of

M/s. BENGAL CONSTRUCTION & CO.

T.C. Road (Chaul Patty)
P.O. Tarakeswar, Dist. Hooghly, PIN : 712410

Sl. No. 110

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

ড্রিম ডেস্টিনি

অ নু ষ্ঠা ন হ ল

পূর্বস্থলী দক্ষিণ রেল গেট

বিবাহ অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য
বিশ্বস্ত ও অভিজাত প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ নারায়ণচন্দ্র দত্ত

Sl. No. 106

রবীন্দ্রনাথের চোখে পুলিস

শুভংকর চক্রবর্তী

তখন দেশে ব্রিটিশ সরকারের পুলিস। ব্রিটিশরাজের আর এক নাম পুলিসরাজ। বালক, যুবক, বৃদ্ধের চোখে পুলিস বাঘের চেয়েও ভীষণ। 'পুলিসে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।' বালক রবীন্দ্রনাথের চোখেও সেদিন ব্রিটিশ পুলিস ছিল এমনই বিভীষিকা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মনে আছে, ছেলেবেলায় পুলিসকে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা-বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে করতুম। যেমন স্বাভাবিক মানবজীবনের সঙ্গে দৈত্যদানব-ভূতপ্রেতের সহজ সামঞ্জস্য নেই, এ যেন সেই রকম।' রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার এই পুলিস-বিভীষিকা বয়স বাড়ার সঙ্গে বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ঘটনা, কাগজপত্রে প্রকাশিত নানা সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় পুলিস-বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল। পুলিস রিপোর্ট থেকেও জানা যায় এই বিদ্বেষ থেকে রবীন্দ্রনাথ পুলিস দেখলে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। ব্রিটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যে হিংস্র দমননীতি প্রকট ছিল তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন নিন্দায় ও প্রতিবাদে নির্ভীক ও সরব ছিলেন। পুলিস ছিল রবীন্দ্রনাথের চোখে ব্রিটিশ সরকারের এই দমন নীতিরই একটা যন্ত্র। তথ্য প্রমাণ থেকে তিনি দেখেছেন পুলিসকে সরকার দস্যুবৃত্তির কাজে লাগাত। পুলিস দেশবাসীর কাছে সরকারি অপরাধকারী ও সরকারি হত্যাকারী হয়ে উঠেছিল। ছোটো বড়ো সাহেবপুলিস তো বটেই, পুলিসের এক একটি দেশি পেয়াদা, দেশি কনস্টেবলও ছিল এক-একটি প্রচণ্ড উৎপীড়ক শক্তি। তারা চাকরির স্বার্থে, পদোন্নতির লোভে, উপরি রোজগারের সুবিধার জন্য, ওপরওয়ালার মন পেতে ব্যাকুল হয়ে, বিবেক বিক্রি করে মনুষ্যত্ব খুইয়ে স্বদেশবাসীর ওপর সীমাহীন অত্যাচার ও পীড়ন চালাতে দ্বিধা করত না। গ্রামে, শহরে, এলাকায়, পাড়ায় পুলিস লাগলে রক্ষে নেই। পুলিসের গ্রাসে পড়ার ভয়ে মানুষ মরে। সাহেব পুলিস হোক আর দেশি পুলিস হোক, পুলিস রাগ করলে তার হাত থেকে মান সম্মান আর স্ত্রী ছেলেমেয়ে রক্ষা করা ছিল কঠিন। পুলিস রক্ষক-ভক্ষক বিভীষিকা।

ব্রিটিশের এই সরকারি পীড়নকারী পুলিসযন্ত্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খড়্গহস্ত। কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, ভাষণে তিনি রক্ষক-ভক্ষক পুলিস সম্পর্কে তাঁর এই ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।

ইংরেজ কিন্তু নিজের দেশে পুলিসকে এই রক্ষক-ভক্ষক বিভীষিকা রূপে দেখতে চায়নি। পুলিসের গ্রহণযাগ্য একটা ভাবমূর্তি স্বদেশে তারা তৈরি করেছিল। লন্ডনে উনিশ শতকের প্রথমভাগে হোম সেক্রেটারি, Sir Robert Peel, যাকে আধুনিক পুলিস ব্যবস্থার জনক বলা হয়, পুলিসবাহিনীকে এমন একটা অসামরিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন যারা রাজনীতিগতভাবে ছিল নিরপেক্ষ (politically neutral)। পরিষ্কার নির্দেশ ছিল পুলিস কখনো রাজনৈতিক দল দেখে কাজ করবে না (job was apolitical)। পুলিসের কাজ হবে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। লোকে যাতে আইন মান্য করে চলে, তা দেখা। সমাজবিরোধীদের হাত থেকে লোকের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিসের ওপর। পুলিস হবে শান্তিরক্ষক। নাগরিকদের কাছে পুলিসকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। পুলিস থাকবে পাবলিকের পাশে, পাবলিক থাকবে পুলিসের পাশে—'the police are the public and the public are the police'। এই ছিল Peelian Principles।

কিন্তু ইংরেজ তার উপনিবেশ ভারতে এসে Robert Peel-এর এই পুলিসনীতি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে উপনিবেশ কড়া হাতে শাসন করার উপযুক্ত একটা পুলিসনীতি তৈরি করল। সে ব্যবস্থায় আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রাগ-দ্বেষ, মান-অপমানের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর ছিল না। নেটিভ-বিদ্বেষী কিছু নীচ সাহেব এবং এদেশের এক দল হীন, 'চাবুক খাবার যোগ্যতাসম্পন্ন' দাসসুলভ মনোভাবের লোককে ইংরেজ তার পুলিস বাহিনীতে নিল। রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভে বেদনায় স্তম্ভিত হয়ে দেখেছেন—পুলিস লাথি মেরে সাধারণ মানুষের প্লীহা ফাটিয়ে দেয়। প্রকৃত আসামীকে ধরতে না পেরে হাতের কাছে চারজন নিরপরাধ পেয়ে তাদের আসামী বলে হাজির করে। একজন আসামীকে দড়ি দিয়ে জন্তুর মতো করে বেঁধে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। সাহেব-পুলিসের নির্দেশে দেশি বান্দা মহাবিক্রমে এক নায়েবের কান ধরে তাঁবুর চারদিকে লোকারণ্যের মধ্যে ঘোড়দৌড় করায়। ইংল্যান্ডে এমন দৃশ্য ভাবা যেত না। কিন্তু এদেশে ব্রিটিশ সরকার তার পুলিস নামক পীড়ন-যন্ত্রকে এহেন কাজ করার ছাড়পত্র দেয়। এর প্রতিবাদ করলে এবং আদালতে গিয়ে সুবিচার চাইলে কী করুণ পরিণতি হয় রবীন্দ্রনাথ 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে সে কাহিনিই লিখেছেন।

এর ওপর আছে ইংরেজের পিটুনি পুলিস (punitive police)। পিটুনি পুলিস সাধারণ মানুষের ওপর জোর জুলুম চালিয়ে মহা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। পিটুনি পুলিস রবীন্দ্রনাথের চোখে ছিল—রাজদূতের বিভীষিকা।

জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের এই অতিবিশ্বস্ত সরকারি দমনকারী পুলিসযন্ত্রের নিষ্ঠুরতা ও দানবভাব ভীষণ হয়ে উঠত। অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষ মাত্র নয়, সে একটা প্রচণ্ড শক্তি' ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ)। যে সব লোক সরকারের এতটুকু নতিস্তুতি না করবে, যারা ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদ চাইবে, লাঠিচার্জ করে তাদের পা ভাঙবে, মাথা ভাঙবে, হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। রক্ত ঝরাবে। মিথ্যে মামলা সাজিয়ে জেলের ঘানি টানাবে। ধরসনার লবণ গোলা

অভিযানে পুলিস নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের যেভাবে লাথি মেরে, লাঠি চার্জ করে ক্ষতবিক্ষত করেছিল তা নিয়ে ইঙ্গ মার্কিন সাংবাদিকদের মর্মস্পর্শী বিবরণ লেখা আছে। পুলিসের এই অত্যাচার, আন্দোলনের এই কণ্ঠরোধ রবীন্দ্রনাথকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। হিজলি জেলে রাজবন্দিদের ওপর পুলিসের বর্বর অত্যাচার ছিল রবীন্দ্রনাথের চোখে—খুনি কারা-পুলিসের নরঘাতক অভিযান। মর্মাহত কবি তীব্র ধিক্কার জানিয়ে লিখলেন—'হিজলি কারার রক্ষীরা সেখানকার দু'জন রাজবন্দীকে খুন করেছে... রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে...।' ('কালান্তর') 'The Statesman' পত্রিকা সেদিন যখন এই সরকারি হত্যাকারী কারাপুলিসদের প্রতি দরদ দেখিয়ে মানবপ্রেমের পরিচয় দিতে আবেদন করল, রবীন্দ্রনাথের চোখে তা ছিল ব্রিটিশ শাসন-সেবক পত্রিকার অসহ্য ভণ্ডামি। ভণ্ডামিকে নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ খোলা চিঠি পত্রপত্রিকায় পাঠালেন। The Statesman রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ-চিঠি ছাপল না। 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার', 'প্রবাসী' কবির বিবৃতি প্রকাশ করল।

পুলিসের রাজবন্দি খুনের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানাতে অসুস্থ শরীর নিয়ে মনুমেন্টের উত্তর দিকের বিশাল জমায়েতে উপস্থিত হয়ে (কবির জন্য একটি ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি তাতে না বসে) সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণ পাঠ করলেন—'...ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।' ('কালান্তর')

রবীন্দ্রনাথের চোখে ব্রিটিশের রাজনীতির দলনবাহিনী ছিল পুলিস। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি শচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা তুলে ধরেছেন। রংপুরের উকিল যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র শচীন্দ্র পুলিসের পৈশাচিক পীড়নে আত্মঘাতী হলেন। শচীন্দ্র পিতাকে যে অন্তিম চিঠি লেখেন সে চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ পুলিসের গুপ্ত দলনে তাঁর প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় প্রকাশ করেন—'দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্ত দলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি?' ('ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধ)

পুলিস যে কীভাবে তার ইচ্ছেমতো আইনের ধারা তুলে গল্প বানিয়ে কেস সাজায় তার দৃষ্টান্ত শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুলিসের ওপর তাঁর রাগ ও ক্ষোভ আরেকবার প্রকাশ করলেন অনাথবন্ধু চৌধুরীর কাহিনি বলে—ষোলো বছরের অনাথবন্ধু চৌধুরী বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে ক্ষোভে আশ্রম থেকে পালিয়ে যায়। পরের দিন পুলিস তাকে ভাগলপুরে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাকে আশ্রমে ফিরিয়ে না দিয়ে ভারতরক্ষা আইনের বিধানে তাকে কারাগারে আটক রাখে। পুলিসের এ হেন কাজ দেখে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম করেন। রবীন্দ্রনাথ পুলিসের আচরণে ক্ষোভ জানিয়ে বিবৃতি দেন—'...এই ব্যাপার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয়—পুলিস অনাথের আটক সম্বন্ধে কোনো সংবাদ আশ্রমে আমাদিগকে দেয় নাই। ষোড়শ বর্ষ মাত্র বয়স্ক একটি বালককে দণ্ড দিতে বিলম্ব করা যায় না, অথচ দণ্ডদানের কারণ গোপন রাখা হইয়াছে। আমরা উৎকণ্ঠচিত্তে একটা গল্প প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু গল্প রচিত হইতে এবং বালকটির মুক্তিলাভ করিতে যে বিলম্ব হয়, তাহা নিষ্ঠুর।'

পুলিসের ওপর রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি ও ক্ষোভের আর এক কারণ সৃষ্টি করেছিল শান্তিনিকেতনে নানাভাবে পুলিসের হস্তক্ষেপ এবং রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনে পুলিশের উৎপাত। শান্তিনিকেতনে যে কর্মধারা চলত পুলিসের চোখে তা ছিল ব্রিটিশবিরোধী, রাজদ্রোহী (anti-British and disloyal)। পুলিসি হস্তক্ষেপ এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল যে, শান্তিনিকেতনের গঠনকাজে যে সব বিদ্যোৎসাহী অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাইতেন, তাঁদের নিষেধ করা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার গোপন সার্কুলার জারি করে সরকারি কর্মচারীদের রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদের না পড়াতে নির্দেশ দিয়েছিল। 'হুংকার' কাব্যগ্রন্থের লেখক হীরালাল সেনকে শান্তিনিকেতনে চাকরি দেবার ফলে রবীন্দ্রনাথকে পুলিসের নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। পুলিসের সন্দেহের তালিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির নাম ছিল পুলিসের গোপন খাতায়। রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির ওপর, চিঠিপত্রের ওপর নজর রাখত পুলিস। তাঁর লেখার ওপরও পুলিস হস্তক্ষেপ করত। 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' গানটি শুনে পুলিসের মন্তব্য—এটি রাজদ্রোহীর গান। এটি বাদ দিতে হবে। পুলিস এমন রিপোর্টও দিয়েছিল—ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে অস্ত্রশস্ত্রের চোরাই চালানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত।

ব্রিটিশ পুলিসের ওপর বিরক্তি ও ক্ষোভ-বিদ্বেষ থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা সময় বিভিন্ন লেখায় পুলিস সম্পর্কে যা সব লিখেছেন, তার একটি বিবরণ তৈরি করলে রবীন্দ্রনাথের চোখে সামগ্রিকভাবে পুলিসের একটি চালচিত্র তৈরি হবে—

- 'একথা শুনিয়া... পুলিস-সর্প ফণা তুলিতে পারে।' ('রাজভক্তি' প্রবন্ধ)
- 'পুলিসের লালায় বিষ আছে।' ('ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধ)
- 'পুলিসের বুদ্ধির ফাঁকের মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো ফুটোই থাকবে।' ('বদনাম' গল্প)
- 'পুলিসের ঠাট্টাতেও যে গায়ে দাঁত বসে।' ('বদনাম' গল্প)
- 'পুলিসের নিঃশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে।' ('কালান্তর')
- 'স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। একটার বেশি প্রাণ কাহার শরীরে আছে।' ('মেঘ ও রৌদ্র' গল্প)
- 'আর একটা সর্বনাশ এই যে, পুলিস একবার যে-চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে-চারায় কোনো কালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না।' ('কালান্তর')
- 'আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণবয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাইতেছে।' ('কালান্তর')
- 'পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক।' ('ছোটো এবং বড়ো' প্রবন্ধ)
- 'পুলিসের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল।' ('কালান্তর')
- 'সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না।' ('কালান্তর)
- 'ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজব শুনি নাকি/কুলিশপানি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।' ('চিঠি' কবিতা, পুরবী)
- 'ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে/উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে/আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে.../ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।' ('গান্ধী মহারাজ' কবিতা)

সেদিন একটা জিজ্ঞাসা দেশবাসীর মনে ঘুরত—রক্ষক-ভক্ষক ইংরেজ সরকারের পুলিস মানুষ ছিল কি? আর দেশি পুলিস, যারা সাহেব পুলিসের চাবুক খেয়েও তা পরিপাক করে সরকারের নতিস্তুতি করত, তারা মানুষ ছিল কি?

২

দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীন দেশের পুলিস ও পুলিসনীতি কি ব্রিটিশ-পুলিসের চরিত্রকলঙ্ক নিয়েই চলছে? ব্রিটিশ-পুলিস তার সরকারের প্রতি দাসমনোভাব, নীচতা, বর্বরতা, জনবিচ্ছিন্নতাকে তার পুলিসধর্ম করে নিয়েছিল। স্বাধীন দেশের পুলিসও কি ব্রিটিশ-পুলিসের পুলিসধর্মকে আজ তার স্বধর্ম করে নিয়েছে? ব্রিটিশ সরকারের পুলিসের আচরণের ধারাবাহিকতাকে তারা কি বয়ে নিতে চাইছে? পুলিস কি রক্ষক-ভক্ষক বিভীষিকাই রয়ে গেল? পুলিস কি মানুষ হলো না?

এসব প্রশ্ন মনে জাগছে, বিশেষ করে এরাজ্যে বর্তমান সরকারের জমানায় পুলিসের ভূমিকা দেখে। পুলিস রাজ্যের বৃহদংশ মানুষের জীবনের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক ছিন্ন করে চলেছে। সরকারি অত্যাচারী যন্ত্রের আচরণ ও সরকারের আজ্ঞাবহ বিবেকহীন দাসের রূপ পুলিসের মধ্যে বড়ো বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। তার অতি নগ্ন দৃষ্টান্ত দেখলাম সদ্য সমাপ্ত ৯২টি পুরসভা নির্বাচনে সরকারপক্ষকে জেতাতে এবং ৩০ এপ্রিলের সরকারবিরোধী এককাট্টা ধর্মঘট রুখতে ও ভাঙতে পুলিসের মাঠে নেমে সরকারপক্ষে সক্রিয় হবার ভূমিকায়। প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিসমন্ত্রী উদাত্ত ও উদ্ধত কণ্ঠে পুলিসকে শংসাপত্র দিলেন। আর শাসকদলের নেতা জয়ের আনন্দে পুলিসের ও.সি.-কে আলিঙ্গন করলেন। দোর্দণ্ড সমাজবিরোধী ভোজসভায় নেতামন্ত্রীদের সঙ্গে পুলিসকে ডাকল। সরকারের প্রতি, শাসকদলের নেতানেত্রীদের প্রতি পুলিসের আনুগত্য স্বাধীনতার পর এ রাজ্যে সব আমলেই ছিল। কিন্তু পুলিসের এহেন বিবেকহীন আনুগত্যের বাড়াবাড়ি, বিশেষ করে, সমাজবিরোধীদের প্রতি চক্ষুলজ্জাশূন্য এহেন আনুগত্য পূর্বের কোনো সরকারের জমানায় আমরা দেখিনি।

সরকার-শাসকদল-সমাজবিরোধী আর পুলিসের মধ্যে একটা চতুর্ভুজ অশুভ জোট এ-রাজ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল শাসন চালাচ্ছে। যেমন হয়েছিল ইতালি, জার্মানিতে ফ্যাসিস্ত শাসনে।

পুলিসের হৃদয়, পুলিসের বিবেক, পুলিসের মনুষ্যত্ব নিয়ে এ রাজ্যে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন। চোখের সামনে সহকর্মীকে গুলি করে হত্যা করছে সমাজবিরোধী। গুলি করে ভয়ংকর জখম করছে সহকর্মীকে। বেধড়ক মেরে মাথা ফাটাচ্ছে সহকর্মীর। সরকারের এক নেত্রী পুলিসকে অকথ্য গালিগালাজ দিলেন, চড় মারলেন। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিসকে চাবুক মারা উচিত বললেন। কিন্তু সহকর্মীর জন্য পুলিসের মন কাঁদে না। চড় ও চাবুকে তার হৃদয় লজ্জা বোধ করে না। চাকরি রাখতে পানিশমেন্ট পোস্টিং এড়াতে, পদোন্নতির পথ সুগম করতে, ভালো থানায় পোস্টিং পেতে, ওপরওয়ালার মন পেতে এ রাজ্যে পুলিশ কি ব্রিটিশ-পুলিশের মতো বিবেক বিক্রি করছে না? আত্মবিক্রয় করছে না? পুলিস কি সরকারি অপরাধী ও সরকারি হত্যাকারী হয়ে রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধ বাড়িয়ে তুলছে না? ব্রিটিশ পুলিসের মতো রাজ্যের পুলিস কি মনুষ্যত্বের ধিক্কার শোনার শ্রবণশক্তি হারিয়েছে?

পুলিস তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সম্ভ্রম যত হারাচ্ছে ততই সে তার নিজের বিপদ ডেকে আনছে। আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ে হয়েও তারা আমাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠছে। বহু পরিবারে পুলিস আপন সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'বদনাম' গল্পে ঘরের ভেতর থেকে নিন্দা ও প্রতিবাদ দেখে সদু'র স্বামী পুলিস ইনস্‌পেক্টর বিজয়বাবুকে কৃতকর্মের সম্পর্কে ভাবতে হয়েছিল। এ রাজ্যে পুলিস?

পুলিস ইতিহাসের শিক্ষা শোনে না। সরকারের নির্দেশে, শাসকদলের প্রশ্রয়ে, পুলিস ও সমাজবিরোধী-সাপ এই যে ফণা তুলেছে তার মোকাবিলা করতে রাজ্যের নানা স্তরের ক্ষুব্ধ-বিরক্ত সাধারণ মানুষ যখন এককাট্টা হবে, থর্‌থর্ করে কাঁপিয়ে তুলবে ভিত।

রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'প্রজার মর্মের ক্ষুধিত সত্য'। একে বলপ্রয়োগ করে দমন করা সাধ্য নয়। রাজ্যের বৃহদংশ মানুষের মর্মের মধ্যে এই ক্ষুধিত সত্য আজ হাহাকার করছে। হাহাকারের মধ্য বার্তা জাগছে—এই সরকার আর তার পুলিশ-সমাজবিরোধী-সাপের উদ্যত ফণার মোকাবিলা করতে হবে ভীরুতা ও কাপুরুষতা ছেড়ে এককাট্টা হয়ে। এর এতটুকুও কম নয়।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

ওলি

দত্ত সেন্টার, বি.সি. রোড, বর্ধমান

হোসিয়ারি ও রেডিমেড, ব্লাউজ ও সায়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 44

সুশোভিত রাজপথ

মহানগরীর সৌন্দর্যায়নে

এক সফল প্রয়াস

কলকাতা পৌরসংস্থা

Sl. No. 59

সোশ্যালাইট

পঙ্কজ রায় সরকার

নীরা রাদিয়ার কথা মনে আছে? দেশের মন্ত্রী বাছাই-এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট জগৎ এবং কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া-র পছন্দকে কীভাবে নীরা রাদিয়া লবিইং করেছেন তা সিবিআই-এর তদন্তে ৫৮৫১টি ফোন রেকর্ডিং সামনে না এলে বোঝা যেত না। এই ৫৮৫১টা ফোন রেকর্ডিং-এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফোন কলার বা রিসিভারদের নামের তালিকা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। সেই তালিকায় রয়েছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ. রাজা, রয়েছেন রাজ্যসভার সদস্য কানিমোঝি কে, নামজাদা শিল্পপতি রতন টাটা, মুকেশ আম্বানী, মিডিয়া ব্যারন সান গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর কলানীতি মারান; সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন এন.ডি.টি.ভি. গ্রুপ এডিটর বরখা দত্ত, 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক প্রভু চাওলা, ওই পত্রিকারই তৎকালীন আর এক নামজাদা সাংবাদিক শঙ্কর আইয়ার, 'হেডলাইন্স টুডে'-র অ্যাডভাইসরি এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর বীর সাংভি। ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর পালিতা কন্যার স্বামী তথা আমলা রঞ্জন ভট্টাচার্য।

এই টেপ-কাণ্ড নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। সমগ্র দুনিয়া উত্তাল। কিন্তু ভারতের বহু মেইনস্ট্রিম মিডিয়া কত সেকেন্ড সময় সম্প্রচার করেছিল এই রোমহর্ষক ঘটনার অনুসন্ধানে বা কত সেন্টিমিটার কালি খরচ করেছিল, সেই তথ্য আরও বিস্ময়কর। এ হেন পাওয়ার ব্রোকার লবিইস্ট, শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী এবং কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার এহেন গলা জড়াজড়ির দৃশ্য দেখেছে দেশবাসী। বহু মেইনস্ট্রিম মিডিয়া এই খবরটাকে কার্যত ব্ল্যাক-আউট করেছিল তাঁদের নিজেদের সম্মান বাঁচানোর তাগিদে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে বিশেষত ট্যুইটার এবং ফেসবুক-এ (Barkhagate page-এ) লাগাতার চাপ তৈরি না হলে এই কর্পোরেট হাঙরেরা এই ইস্যুটাকে গিলে খেয়েই নিয়েছিল। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' ২৩ নভেম্বর ২০১০-এর সংখ্যায় লিখেছিল—''Social media has played an important role in launching what has become an international conversation on the issue, with the Indian diaspora weighing in."

২.

'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম' এই শ্লোগান 'হিডেন এজেন্ডা' বা লুক্কায়িত ঘোষণাপত্রে আর নেই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের। মিডিয়া-নির্ভর রাজনীতির কারবারি, কর্পোরেট দুনিয়া এবং মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার গোপন অভিসার এখন লন্ডন বা সিঙ্গাপুরের রাস্তায় প্রকাশ্যে চুম্বনের দৃশ্যে অবতীর্ণ। তবে এটা ঠিক যে এই মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার মধ্যে আবার Non-antagonistic ভাগাভাগি আছে। সুনীল গাভাস্কারের বদলে সনীল গাওস্কর লেখার মধ্যে বাঙালি কুলীনতা বজায় রাখার চেষ্টা যেমন কেউ কেউ করে, আবার কেউ কেউ চটুল ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যান্য অংশের গ্রাহকের কাছে জনপ্রিয়তা ধরে রাখার চেষ্টা করে। তবে সবাই কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল। নিখুঁত চিত্রনাট্য তৈরি করে কমিউনিস্টদের দুর্বল করার লক্ষ্য। তবে ভাবার কোনো কারণ নেই যে একটা রাজ্যে বা দিল্লিতে সরকারে বামপন্থীদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগকে খাটো করতেই গণমাধ্যমগুলি তাঁদের এই লক্ষ্য স্থির করেছে। Casino Capitalism (জুয়াড়ি ধনতন্ত্র)-র পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই কমিউনিস্ট বা বামপন্থীদের দুর্বল করার চিত্রনাট্য তৈরি হচ্ছে বিশ্বপল্লিতে।

৩.

নীরা রাদিয়ার টেপকাণ্ড শুধু নয়। অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট থেকে শাহবাগ-এর আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। সম্প্রতি রাজ্যে 'হোক কলরব' আন্দোলনের উত্তাপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ফেসবুক ও ট্যুইটার-এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাইক্রোসফ্‌ট-এর 'Windows' এখন সমগ্র

বিশ্বে মোট জানালার থেকে কয়েকগুণ বেশি খোলা হাওয়া আমদানি করছে। অদ্ভুত বৈপরীত্য। মাদারির খেলা না দেখালে ফুটফুটে রাজস্থানী শিশুকন্যার খাওয়ার না জোটার দেশ ইন্টারনেট-ব্যবহারকারীদের সংখ্যার নিরিখে সমগ্র বিশ্বে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর তৃতীয় স্থানে। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় প্রকাশ ২০১৩ সালে ১৮.৯৬ কোটি ভারতবাসী ইন্টারনেট ব্যবহার করতেন। ২০১৫ সালে জুন মাসে সেটা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ কোটিতে। এর মধ্য ৫০ শতাংশের বেশি সক্রিয় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ফোনেই ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করেন। আলুচাষি, তুলাচাষি, খেতমজুরদের ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করা এই রাজ্য-সহ দেশে যখন দস্তুর তখন ৯৩.২ কোটি দেশবাসী ফোন ব্যবহার করে। তার মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বেশ যে উল্লেখযোগ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। SMS/MMS থেকে প্রিয়জনের জন্য উপহার কেনা সবই এই স্মার্টফোনের মাধ্যমে সম্ভব। স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের ধরন সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা চিত্র-১-এ দেওয়া হল :

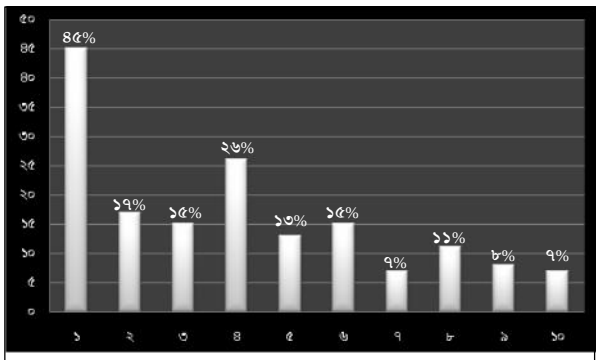

১.	এস.এম.এস	৬.	ব্রাওজিং
২.	ই-মেল	৭.	শপিং
৩.	ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং	৮.	স্ট্রিমিং অনলাইন মিউজিক
৪.	সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং	৯.	ভিডিও/মোবাইল টিভি
৫.	অ্যাপস	১০.	মোবাইল ব্যাঙ্কিং

তথ্যসূত্র : নিয়েলসন মোবাইল কনজুমার রিপোর্ট, অ্যা গ্লোবাল স্ন্যাপসট, ২০১৩

৪.

১০০ দিনের কাজ পাক বা না পাক, মোবাইল পরিষেবা এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বাড়বেই আমাদের দেশে। গ্রামাঞ্চল বা কৃষি অঞ্চলেও বাড়বে। ২০১৪-১৫ সালে আমাদের দেশের বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছিল National Rural Internet and Technology Mission-এ। আরো ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছিল e-Governance ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য। MGNREGA প্রকল্পকে এই সরকার ৬৫৭৬টি ব্লক থেকে কমিয়ে ২৫০০ ব্লকে সঙ্কুচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই এক বাজেটে। ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষে ICDS কর্মসূচিতে ২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে। মহিলা ও শিশুদের কল্যাণমূলক কাজে এই প্রভাব বিপজ্জনক। আমাদের দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ১ শতাংশ জনস্বাস্থ্যে ব্যয় করা হয়, যা গোটা বিশ্বের মধ্য একেবারে নিচের সারিতে। তারপরেও আবার বরাদ্দ ছাঁটাই। তাছাড়াও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্প, মিড-ডে-মিল প্রকল্প-সহ সমস্ত গরিবদের সাহায্যকারী প্রকল্পে ছাঁটাই হচ্ছে। আসলে মধ্যবিত্তদের প্রদর্শনীমূলক আভিজাত্যই আজ লোভনীয় বাজারে পরিণত হয়েছে। বাজার অর্থনীতির বিষমন্থনে নীলকণ্ঠ হয়েছেন মধ্যবিত্তরা। যে Window দিয়ে বস্তির তাপ্পি-মারা জীবন দেখা যায়, যে Window দিয়ে পাশের বাজারের সবজিওয়ালা ও ফেরিওয়ালার চিৎকার কানে আসে ''আজ পেঁয়াজের দাম কম—৮০ টাকা কিলো—কাল থেকে আর পারবো না'', সেই Window বন্ধ করে দিয়ে Microsoft-এর Window-এর মাধ্যমে ফ্যান্টাসির রঙিন দুনিয়ার জালে আটকে রাখার চেষ্টা।

নগরজীবনের প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে সবাই চাই খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে বেশি তথ্য নিজের হেফাজতে রাখতে। তাই চলতে-ফিরতে ক্লাসরুমে-ওয়ার্কিং ক্যাবিনেটে দিনরাত চোখ থাকে ফেসবুক-ট্যুইটার বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকগুলি বাণিজ্যিক সংস্থা এই সোশ্যাল মিডিয়া মুনাফার স্বার্থেই চালান—Facebook, Twitter, Google+, Google Hangouts, Linkedin প্রভৃতি। সর্বাধিক প্রচলিত সোশ্যাল মিডিয়া হল Facebook এবং Twitter তারপরেই (এক আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষা অনুসারে)। হোয়াটসঅ্যাপ দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। কোথায় কী ঘটছে তাঁর ছবি আপলোড হচ্ছে দ্রুত, মতামত সংগঠিত হচ্ছে নিমেষে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে। প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করা অস্থিরতা থেকে বৃষ্টিতে দিদিমণির সাধের লন্ডনে জল জমা—সবই জানা যায় কয়েক সেকেন্ডে। প্রেমে দাগাখাওয়া অস্থির মনের বহিঃপ্রকাশ সোশ্যাল মিডিয়াতে কবিতা আকারে প্রকাশ পায়। কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া কবিতা সংকলন প্রকাশের কথা ভবিষ্যতে ভাবতেই পারেন স্বচ্ছন্দে। তার গুণগত মান খারাপও হবে না।

কেবল কি কর্মরত মহিলারাই ফেসবুকে থাকেন? না। গৃহবধূদেরও নিয়মিত আসা-যাওয়া এই সোশ্যাল সাইটে। সামাজিক বৈষম্য-রাজনীতির অস্থিরতার প্রতিফলনও পড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে। কেবল কি তাই? অনেক পুরনো বন্ধুর সাথে পুনঃযোগাযোগ স্থাপন হচ্ছে এইখানে। এই দুনিয়ায় জন্ম নেওয়া কোনো কোনো সম্পর্ক বৈবাহিক সম্পর্কে পরিণতি পাচ্ছে। অনেক ওষুধের গায়ে লেখা থাকে 'No side effect.'। সোশ্যাল মিডিয়ার গায়ে বোধহয় এই ধরনের তকমা লাগানো যাবে না। সোশ্যাল মিডিয়ার মেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার মধ্য দিয়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে। কিছু নতুন গড়ে ওঠা সম্পর্কের পরিণতি ভালো হচ্ছে না। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ল্যারি রসন একটি গবেষণাধর্মী লেখাতে লিখেছেন—''...teenagers who are on FB more show narcissistic tendencies. They are also more prone to depression, psychological disorder and future health problem if they are in FB too much.'' ব্রিটেনে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে অনেক সওদাগরি কোম্পানি, যারা মূলত সার্ভিস সেক্টর বা I.T. সেক্টরের সাথে যুক্ত, তাদের কয়েক বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে প্রতিবছর কেবলমাত্র কর্মচারীদের কাজের সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বুঁদ হয়ে থাকার জন্য। তাই অনেক কোম্পানি তাঁদের অফিসে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটকে ব্লক করে রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভারতে এ.সি. নিয়েলসন-এর একটি সমীক্ষায় প্রকাশ আমাদের দেশে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০১২-তে ৬.১৩ কোটি, ২০১৩-তে ৮.৬৭ কোটি, ২০১৪-তে ১২.০৫ কোটি, ২০১৫-তে ১৪.৫৬ কোটি এবং ২০১৮-তে এই সংখ্যা ২২.৪২ কোটিতে পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের বিন্যাস নিম্নরূপ :

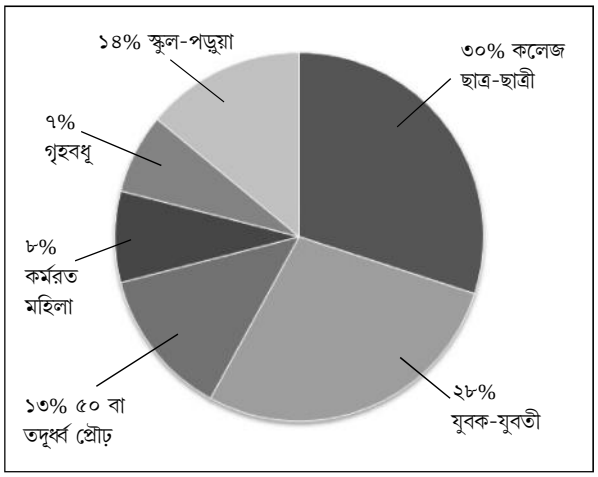

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র একটি ব্যঙ্গচিত্র শেয়ার করেছিলেন ফেসবুকে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অম্বিকেশবাবু এক প্রতিবাদী মুখ হয়ে উঠছেন সেই কারণে এক রাত্রি হাজতবাসের জন্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে, সামাজিক ইস্যুতে জনমত গড়ে উঠছে এই সোশ্যাল মিডিয়ায়। যন্ত্র এবং প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে অপবাদ থাকা বামপন্থীরাও প্রবলভাবে উপস্থিত সোশ্যাল মিডিয়াতে। সর্বত্র থাকতে হবে আমাদের। প্রত্যেক না-ছোঁয়া ক্ষেত্রকে স্পর্শ করতে হবে আমাদের মেধার তীক্ষ্ণতায় এবং হৃদয়ের উষ্ণতায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন কবি লিখেছেন—''ফুলকি ছেড়ে ফুল ধরেছি/মিছিল ছেড়ে মেলা...''

আমাদের কর্মী-নেতৃত্ব যারা ফেসবুক করেন, তাঁদের জন্য কোনো কবিকে কলম ধরে না লিখতে হয়—''সংগ্রামের পথ ভুলে,/ ফেসবুকে আছি ঝাণ্ডা তুলে...'' (লেখকের কলমে)

মানুষের সাথে জীবন্ত যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই। লড়াই-এর ময়দানে অনুপস্থিত থেকে কর্মী-সংগঠকদের সোশ্যাল মিডিয়াতে কেবলমাত্র সমালোচনা করাও অনভিপ্রেত। তবে, প্রযুক্তির এই ব্যবস্থাতে আমাদের অনেককেই রপ্ত হতে হবে। পরিমাণগত অবস্থানই গুণগত অবস্থান রূপান্তরে সাহায্য করে। অনেক সমালোচনা হয়। ন্যায্য-অন্যায্য অনেক কিছু। কেউ আমাদের সহমর্মী হয়ে সমালোচনা করেন, আবার কেউ বামপন্থী আন্দোলনকে খাটো করার জন্য 'কমেন্ট' করেন। কিন্তু মাথায় রাখা প্রয়োজন ধৈর্যচ্যুতি যেন কখনোই না ঘটে আমাদের 'রিপ্লাই' দেওয়ার প্রশ্নে। পার্টিতে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব তুলে আনার প্রশ্নে, পার্টির কর্মসূচির ফর্ম নিয়ে, রণকৌশলগত লাইনের প্রশ্নে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে অনেক প্রস্থচ্ছেদ হয় এই সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে। আবার এও দেখা গেছে ৩১ অগস্ট খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবসের ছবি পোস্ট করার পর কমেন্ট এসেছে ''কেসটা কী?'' রিপ্লাই দেওয়ার প্রশ্নে আমাদের অসহিষ্ণু না হয়ে এইরকম সুযোগ ব্যবহার করে ৩১ আগস্ট-এর লড়াইয়ের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা উচিত।

বামপন্থী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে এবং দীর্ঘদিনের একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী হিসেবে আমি কতকগুলো ব্যক্তিগত ধারণায় উপস্থিত হয়েছি—

ক. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী বামপন্থী কর্মীদের 'ফটো আপলোড' বা 'স্টেটাস পোস্ট' করার প্রশ্নে দক্ষতার ছাপ রাখতে হবে। ছবি তোলার 'Conception' থেকে যে-কোনো পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ (দ্বান্দ্বিকতার ভিত্তিতে) থাকা জরুরি।

খ. পরিচিত বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীদের ব্যক্তিগত ছবি বা 'স্টেটাস' দেওয়ার প্রশ্নেও সতর্কতা জরুরি। কারণ ফেসবুকের একটা Timeline বা Wall যেমন পার্টির একজন নেতা বা কর্মীর Image তৈরিতে সাহায্য করে, তেমনিভাবে সামগ্রিকভাবে পার্টির Image-এর প্রশ্নেও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গ. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী বামপন্থী কর্মীদের বিভিন্ন Post বা Comment করার সময়ে অনেক গণতান্ত্রিক এবং উদার মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা মাঝে-মধ্যেই দেখি কোনো Event create করার আগে প্রকাশ্য মতামত নেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট Group-এর সাথে সম্পর্কিত সকলের; কোন সময়ে Event-টি হবে, বা কোথায় হবে ইত্যাদি বিষয়ে। তার মানে অবশ্য কখনোই এটা নয় যে আমি বলছি সংগঠনের কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রেও Event create-এর মতো পরিমণ্ডল তৈরি করতে। বোঝা প্রয়োজন যে কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণের প্রশ্নে যুক্তির জাল গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলেই সোশ্যাল মিডিয়াতে বিস্তার করতে হবে অন্যের হৃদয় জয় করার জন্য।

ঘ. বিরোধী দলের নেতা বা নেত্রী অথবা প্রশাসনের কর্তা/ আমলাদের সম্পর্কে অযথা কটুক্তি বা আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার আমাদের না করাই উচিত।

ঙ. আমাদের রাজ্যে যদিও টুইটার-এর ব্যবহার অনেক কম তা সত্ত্বেও টুইটার হ্যান্ডেল খোলার মাধ্যমে অনেককে স্পর্শ করা যায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা টুইট বা রিটুইট করাও যেতে পারে। হোয়াটস অ্যাপেও গ্রুপ তৈরি করা যেতে পারে।

চ. কেবলমাত্র ছবি বা লেখা না দিয়ে বিভিন্ন কার্টুন, ইনফোগ্রাফিক্স, স্বল্প সময়ের ভিডিও পোস্ট করে বিষয় বস্তুকে আরও আকর্ষণীয় করা যেতে পারে।

৭.

উইক এন্ডে স্কার্ট পরা তরুণী তার প্রিয়জনের সাথে মন্দারমণি বিচে হাঁটতে হাঁটতে মধ্যমগ্রামের ধর্ষিতা কিশোরীর বাবার আর্তনাদ শুনতে পান এই সোশ্যাল মিডিয়াতে। কারোর কারোর সোনালী বালুবেলা তখন ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর তপ্ত ধাতবপাত হয়ে যায় ঘৃণায়-ক্রোধে। আবার কেউ কেউ কমেন্ট বক্সে লেখেন 'Disgusting', 'Nasty Politics'। এইরকম শিকড়হীন 'বং' কালচারে বেড়ে ওঠা অনেকেই থাকেন এই সোশ্যাল মিডিয়াতে। নাইট ক্লাবে দ্রাক্ষারস নিয়ে মায়াবি আলোয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট দেখতে দেখতে মনে হতে পারে আমিও একদিন সেজেগুজে গঞ্জের মোড়ে একটি ছবি তুলে পোস্ট করতে পারি। পোস্ট হয়ও এরকম আকছার। সম্বিৎ ফেরে যখন সপাৎ করে বাস্তবের চাবুকের ঝাপটা এসে পড়ে পিঠে। মোমবাতির নরম আলোর আলোকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের উপস্থিতির পরিবর্তে শ্রেণিচেতনার আগুনের আলোতে আলোকিত হয়ে আমাদের উপস্থিতি প্রয়োজন সোশ্যাল মিডিয়াতে। অনেক Community, Group, Page আছে বা তৈরি হবে—ছবি বা পোস্ট আপলোড হবে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষের গণতন্ত্র ও মূল্যবোধকে খাটো করতে। ওরা ভয় পায়। আমাকে? আপনাকে? না! সেই ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কয়েক পাতার চটি বই-এর শুরুতেই মার্কস ও এঙ্গেলস যা লিখে গিয়েছিলেন—''A spectre is haunting Europe—the spectre of communism.''—''ইউরোপকে ভূত তাড়া করছে—কমিউনিজমের ভূত।'' ইউরোপের ভূত এখন সমগ্র বিশ্বপল্লিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই সোশ্যাল মিডিয়াতেও অনেকের অরাজনীতির রাজনীতিকে পরাস্ত করে জীবনের জয়গান গাইতেই হবে।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

ড্রিমল্যান্ড নার্সিং হোম

ইন্দ্রপ্রস্থ, বাবুরবাগ, বর্ধমান

দূরভাষ : (০৩৪২) ২৬৫৬৩৬৬, চলভাষ : ৯৭৭৫১৬৯১১১

Sl. No. 119

আমার স্মৃতিতে পিতা বিনয় কোঙার

সুকান্ত কোঙার

প্রায় এক বছরের বেশি হল বিনয় কোঙার প্রয়াত হয়েছেন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তিনি প্রয়াত হন। জন্ম ২৪ এপ্রিল ১৯৩০। বেঁচেছিলেন ৮৪ বছরের বেশি। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। ৬৬ বছরের বেশি রাজনৈতিক জীবনের অবসান হল। সর্বশেষ নিউরোজনিত সমস্যায় বারে বারে পড়ে যাচ্ছিলেন। কতবার যে পড়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। একবার হার্টের বাইপাশ সার্জারি, দু-বার কোমরের অপারেশন, একবার পেশমেকার বসাতে হয়েছে। কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। হাসপাতাল থেকে বের হয়েই কয়েকদিনের মধ্যে পার্টির কাজে লেগে যেতেন। বলতেন, অবসরের প্রশ্ন নেই, কাজ করতে করতে মরতে চাই। বাস্তবে তাই ঘটল। গত ১৪ আগস্ট, ২০১৪ রাজ্য কৃষকসভার উদ্যোগে হাওড়ার শরৎ সদনে হরেকৃষ্ণ কোঙারের শতবর্ষের একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। তার কয়েকদিন পর (২০ আগস্ট) বাড়িতে পড়ে গিয়ে কোমরের হিপজয়েন্ট ভাঙে, অপারেশন হয়। কিন্তু এবার আর তাঁকে ফেরানো যায়নি। পার্টি থেকে বারে বারে সঙ্গে একজন কর্মী রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু তা উনি নেননি।

বিনয় কোঙারের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা আমার নেই। কিছু টুকরো স্মৃতি তুলে ধরার জন্য এই লেখা। আমাদের ছোটোবেলায় দেখেছি বাবা অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে জেলে রয়েছেন বা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন। শুনেছি আত্মগোপনে থাকার সময় সাইকেল চালিয়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে পার্টির কাজ করেছেন। এমনকি যখন স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকত তখনও বাড়ি আসতেন কয়েকদিন বাদে বাদে। আমরা ভাইবোনেরা তখন ছোটো। গোয়েন্দারা আমাদের কাছে জানতে চাইত বাবা বাড়িতে এসেছেন কিনা? বাড়ি থেকে শেখানো ছিল যে বলতে হবে—"বাবা আসেনি।" আমরা তাই বলতাম। বুঝেছিলাম যে কংগ্রেসি পুলিশ বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে। বাবা নিয়মিত বাড়ি আসতে না পারলেও যথাসম্ভব পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করতেন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সবে রাজ কলেজে ভর্তি হয়েছি ১৯৬৭। কলেজের বি.পি.এস.এফ-এর নেতারা (তখনও এস.এফ.আই হয়নি) জানতে পারল যে বিনয় কোঙারের ছেলে এই কলেজে ভর্তি হয়েছে। নেতারা আমার সঙ্গে দেখা করল। আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হল এবং আমাকে প্রস্তাব দিল যে কলেজ নির্বাচনে বি.পি.এস.এফ-এর হয়ে দাঁড়াতে হবে। তখনও পর্যন্ত আমি ওই সংগঠন সম্পর্কে তেমন কিছু বুঝতাম না। আমার রাজনৈতিক জ্ঞানও ছিল অতি সাধারণ। শুধু এটুকু বুঝেছিলাম যে কংগ্রেস ধনীদের দল আর কমিউনিস্ট পার্টি গরিবের পার্টি। এই ধারণা থেকেই ভোটের সময় কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করতাম। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলাম। বাবাকে সবটা বললাম। বাবা এক কথায় উত্তর দিলেন না। দীর্ঘ আলোচনা করলেন। সমাজ কী, শোষণ কী, সমাজ

পরিবর্তনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি লড়াই করে কেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর বলতে ভুললেন না যে কমিউনিস্ট পার্টির পথটা খুব কঠিন। সেই সঙ্গে বললেন যে তুমি যদি সব কিছু বুঝে সুঝে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দাও আমি খুশি হব। আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে বাবা কী চাইছেন। ভোটে দাঁড়াতে রাজি হলাম। তারপর থেকে বারে বারে দেখেছি বাবা হিসেবে বা নেতা হিসেবে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতেন না। নিজের অভিমত জানাতেন, কিন্তু সহকর্মীদের সিদ্ধান্ত নিতে দিতেন। এ এক অসাধারণ গুণ।

মার্কস বলেছেন, ''ব্যাপকহারে এই কমিউনিস্ট চেতনা তৈরির জন্যও বটে, আবার আদর্শের সাফল্যসাধনের জন্যও বটে, ব্যাপকহারে মানুষের পরিবর্তন প্রয়োজন, যে পরিবর্তন ঘটতে পারে কেবলমাত্র বাস্তব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে; অতএব এই বিপ্লবের প্রয়োজন শুধুমাত্র এই জন্য নয়, যে অন্য কোনো উপায়ে শাসকশ্রেণিকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন এই জন্যও বটে যে, যে শ্রেণি তাকে উচ্ছেদ করবে একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সেই শ্রেণির পক্ষে সম্ভব যুগযুগান্তের সমস্ত পচা কাদা নিজের গা থেকে ধুয়ে ফেলে নিজেকে নতুনভাবে সমাজ গঠনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা।'' অর্থাৎ মার্কসবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাও এই পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেই বড় হয়। তাই এই বুর্জোয়া সমাজের পচা কাদা তাদের গায়ে লাগে। এই পচা কাদা নিজেদের গা থেকে ধুয়ে ফেলে কমিউনিস্টদের নতুনভাবে সমাজ গঠনের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে হয়। কমিউনিস্টদের প্রতিনিয়ত আদর্শগত লড়াই করেই কমিউনিস্ট হতে হয়। বিনয় কোঙার নিজেকে আদর্শ কমিউনিস্ট হিসেব গড়ে তোলার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং এ কাজে তিনি সফল। তাঁর অগ্রজ প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মশতবর্ষে 'জন্মশতবর্ষের শপথ' শিরোনামে একটি স্মৃতিচারণায় বিনয় কোঙার লেখেন, ''ক্রমেই বিত্তশালী হয়ে ওঠা পিতার কল্যাণে পুঁজিবাদী সমাজে নিজেকে সৌভাগ্যের সোপানে উচ্চস্তরে নিয়ে যাবার হাতছানির প্রলোভনকে পরাস্ত করে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কেষ্টদা নবম শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থাতেই পিতার সতর্ক প্রহরাকে এড়িয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়ে রাজনৈতিক জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।'' বিনয় কোঙার যখন বড় হচ্ছেন তখন তাঁর পিতা শরৎ কোঙার ছিলেন মেমারির মধ্যে একজন অন্যতম ধনী। ফলে বিনয় কোঙারেরও ব্যক্তিজীবনে বিত্তশালী হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল। কিন্তু সেই হাতছানিকে পরিত্যাগ করে শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির জন্য, পুঁজিবাদী-জমিদারি শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য কঠিন কঠোর জীবনকে হাসিমুখে বরণ করলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি করার অপরাধে জেল খাটলেন, আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হলেন, অনেক অত্যাচার সহ্য করলেন। আচার আচরণেও তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট। অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি চাইতেন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও নেতারা সহজ সরল জীবন যাপন করুক। নিজের পরিবার বা ঘনিষ্ঠদের মধ্যে তার ব্যতিক্রম ঘটলে তিনি সমালোচনা করতেন। নিজের কাজ নিজে করতেন, কাউকে ব্যাগ বইতে দিতেন না। শরীর অনুমতি দিচ্ছে না, অথচ নিজেই নিজের জামাকাপড় কাচতেন, থালা বাসন ধুতেন।

পুঁজিবাদী-জমিদারি শোষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ছিল তীব্র ঘৃণা। অধিকাংশ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য এবং অভাবের কারণ যে এই শোষণের সমাজব্যবস্থা এবং এই সমাজ ব্যবস্থার কারণেই যে দরিদ্র মানুষেরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয় তা প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এমন কোনো কমিটি সভা, কর্মীসভা বা জনসভা ছিল না যেখানে তিনি এগুলি সম্পর্কে সহজ ভাষায় বলতেন না। বলতেন, শোষণের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র প্রচার গড়ে তোলা দরকার।

বিনয় কোঙার কর্মী গড়ে তোলার ওপর জোর দিতেন, বিশেষ করে গরিবদের মধ্য থেকে কর্মী গড়ে তোলার ওপর। বলতেন, শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, সুতরাং সেই ঘর থেকে সচেতন কর্মী গড়ে তুলতে না পারলে পার্টির অগ্রগতি সম্ভব নয়। অনেক গরিব ঘর থেকে আসা কর্মীরা তাঁর হাত ধরে নেতৃত্বে এসেছেন। বিনয় কোঙারের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশ কিছু কর্মী চাকরি ছেড়ে সিপিআই(এম)-এর সর্বক্ষণের কর্মী হয়েছেন, দলের সম্পদ হয়েছেন। দলীয় সভাগুলিতে রাজনৈতিক আলোচনার ওপর জোর দিতেন। যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার হতো সেই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কী তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতেন। ফলে উপস্থিত কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেত। কোনো কর্মীর কোনো বিভ্রান্তি থাকলে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করে তাঁদের বিভ্রান্তি কাটাতেন। এইভাবে দলীয় কর্মীদের গড়ে তুলতে সাহায্য করতেন। পরিবারে নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন।

পার্টির ভিতরে সুস্থ বিতর্ককে উৎসাহিত করতেন। বলতেন 'কী', 'কেন' জানতে না চাইলে সে আবার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী কেন? অন্ধ আনুগত্যকে পছন্দ করতেন না। কোনো কর্মী ভুলভাবে সমালোচনা করলেও রাগ করতেন না, সেই কর্মীর ভুলটা ধরিয়ে দিতেন। সঠিক সমালোচনা করলে স্বীকার করে নিতেন ও কর্মীদের উৎসাহিত করতেন। পার্টির ভেতরে সুস্থ বিতর্ক করার পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর জোর দিতেন। বলতেন এই পরিবেশ কোথাও বিঘ্নিত হলে সেটা নেতৃত্বের ত্রুটি। বিনয় কোঙারের সমালোচনার পদ্ধতি ছিল ভারি সুন্দর। সমালোচনা করতেন কঠোরভাবে, কিন্তু সমালোচনার সময় দলীয় কর্মীদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ থাকত না, থাকত সহানুভূতি। দলীয় কর্মীর সমালোচনা করতেন না, করতেন তার রোগটার। ফলে সমালোচিত কর্মীর কোনো রাগ হত না।

তিনি শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণি আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দিতেন। বলতেন, শ্রেণি আন্দোলন শুধু গরিব মানুষের মজুরি বাড়ায় না, গরিব মানুষকে শত্রুমিত্র চিনতে সাহায্য করে। শ্রেণি আন্দোলনের পরেই শ্রমজীবী মানুষকে বোঝাতেন যে কিছু মজুরি বৃদ্ধিতে তার দুঃখের অবসান ঘটাবে না। এই শোষণের ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া যে তাদের মুক্তি নেই তা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন। বামফ্রন্ট সরকার যে বুর্জোয়া-জমিদারি ব্যবস্থার মধ্যে একটি সরকার, এই সরকারের ক্ষমতা যে অত্যন্ত সীমিত এবং এই ধরনের সরকারের পক্ষে যে মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব নয়, সেকথা বার বার মনে করিয়ে দিতেন। স্মরণ করিয়ে দিতেন একটি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির উচিত শোষণের সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার গড়ে তোলা। তিনি বারবার মনে করিয়ে দিতেন যে সিপিআই(এম) ভোটের পার্টি নয়, শোষণ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের পার্টি। বলতেন, শ্রমিক শ্রেণিকে শুধু নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হলে চলবে না, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সহ অন্যান্য অংশের মানুষকেও তার পক্ষে আনার চেষ্টা করতে হবে। জাত, ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ঐক্যের কথা বলে যারা শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যকে ভাঙতে চায় তারা যে গরিবের শত্রু তা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং শ্রেণি ঐক্যের ওপর জোর দিতেন। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি যে একে অপরের পরিপূরক সেকথা বারবার মনে করিয়ে দিতেন।

শ্রমকে মর্যাদা দিতেন ও শ্রমজীবী মানুষকে শ্রদ্ধা করতেন। আইনস্টাইনের একটি বক্তব্য খুব পছন্দের ছিল। এটি ল্যামিনেট

করিয়ে বহুজনকে দিয়েছেন। বক্তব্যটা নিচে দেওয়া হল—

''আমি প্রতিদিন শতবার স্মরণ করি যে, আমার মানসিক ও শারীরিক জীবন নির্ভর করছে জীবিত বা মৃত ব্যক্তিদের পরিশ্রমের উপর। আমি যে খাদ্য খেয়ে বেঁচে আছি, সে খাদ্য ফলাচ্ছে অন্য লোক। আমি যে পোশাক পরছি, সে পোশাক তৈরি করছে অন্য লোক। আমি যে গৃহে বাস করছি, সে গৃহ তৈরি করেছে অন্য লোক। শৈশবকাল থেকে আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা পেয়েছি অন্য লোকের কাছ থেকে। তাই, যতটা পরিমাণে দান আমি পেয়েছি এবং এখন পাচ্ছি—ততটা দান করবার চেষ্টা আমাকে করতে হবে।''

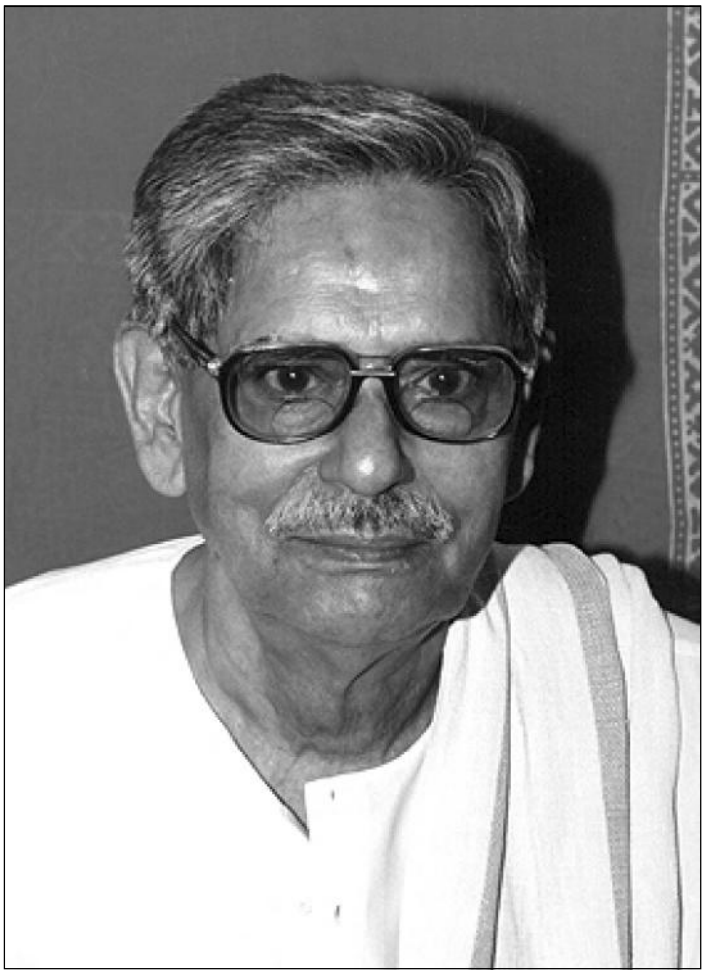

মার্কসবাদকে বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ হিসেবে দেখতেন। তাঁর মধ্যে কোনো রকম সংস্কার ছিল না। এক্ষেত্রে কারও বিচ্যুতি দেখলে দৃঢ়ভাবে সমালোচনা করতেন। বলতেন ডাক্তার দেখাতে হবে না—ওই সবই করো। এ বিষয়ে দলীয় কর্মীদের তিনি গাইড করতেন। আমার বিয়ের ঠিক করলেন বিয়ের তারিখ নেই এবং যে মাসে বিয়ে হয় না এমন একটা দিনে বিয়ে হবে এবং হল। আমার শ্বশুর মহাশয় আপত্তি করেননি। অনেকে বলেন যে সমাজের চাপে, আত্মীয় পরিজনের চাপে অনেক সংস্কারমূলক কাজ করতে হয়। ওনার মৃত্যুর পরে আমরা কোনো সংস্কারমূলক রীতি পালন করিনি। (হরেকৃষ্ণ কোঙার ও বিভা কোঙারের মৃত্যুর পরেও করা হয়নি।) কোনো চাপ আসেনি। এর কৃতিত্ব হরেকৃষ্ণ কোঙার ও বিনয় কোঙারের। তাঁরা আত্মীয়দের মানসিকতা তৈরি করতে পেরেছিলেন। তাঁর পরিচিত একজন দলীয় কর্মীর পিতৃবিয়োগের পরে তিনি জেলখানা থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার একটি অংশ এখানে তুলে ধরছি—''সামাজিক অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে সংযম রক্ষা করো। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ, আর তার নাম করে ধনগৌরবের আভিজাত্য প্রকাশ—দুটো এক নয়। সামন্ত ও বুর্জোয়া সমাজের স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা—সবেরই বাটখারা পরশ্রমার্জিত মুদ্রা, আর মেহনতি মানুষেরাও সেই ধারণার শিকার হয়। তোমরা তার ঊর্ধ্বে থাকবে বলেই আমরা জানি।''

দলীয় তহবিল সংগ্রহের ওপর জোর দিতেন। ভালো সংগ্রহ হলেই যে খুশি হতেন তা নয়। জিজ্ঞাসা করতেন গরিবদের কাছ থেকে কত সংগ্রহ হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ কম হলে সমালোচনা করতেন। বলতেন যাদের পার্টি তাদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহে জোর দিতে হবে। নিজের পরিবার বা ঘনিষ্ঠ কেউ চাকরি পেলে তাকে ডেকে পাঠাতেন ও মাসে মাসে পার্টির জন্য কত টাকা দেবেন, তা আলোচনা করে ঠিক করে দিতেন। কোনো কারণে পরিবারের কোনো সম্পত্তি বিক্রি হলে পার্টিকে কত টাকা দিতে হবে তা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে দিতেন।

তিনি প্রয়াত নেতার স্মৃতিচারণা করতেন অসাধারণভাবে। কোনো নেতা প্রয়াত হলে আমার মতো অনেকে উন্মুখ হয়ে পরের দিনের 'গণশক্তি' পত্রিকার দিকে তাকিয়ে থাকতো বিনয় কোঙার কী লিখেছেন তা পড়বার জন্য। বর্তমান পরিস্থিতির পটভূমিতে সেই নেতার রাজনৈতিক জীবনের একটি সুন্দর ছবি তুলে ধরতেন। সেই নেতা সম্পর্কে পূর্ব থেকে তেমন কোনো ধারণা না থাকলেও লেখাটি পড়ে একটি ধারণা গড়ে উঠত। এক কথায় অসাধারণ। আজ বোধহয় সেই অভাব থেকে গেল।

আমাদের রাজ্যে, দেশে ও সমগ্র বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি বর্তমানে ব্যাহত হয়েছে। রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি আক্রান্ত ও সাময়িকভাবে হলেও জনসমর্থন বেশ কিছুটা কমেছে। বিনয় কোঙার বলতেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর শাসকশ্রেণির আক্রমণ এটা তাদের দুর্বলতার পরিচয়। বলতেন, জয়লাভে যারা আত্মহারা হন আর পরাজয়ে হতাশ হন তারা কমিউনিস্ট নন। তিনি বলতেন, এই বিপর্যয় কাটবে এবং মার্কসবাদের জয় হবেই। বর্তমানে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ৪ বছরের রাজত্বে মানুষের অভিজ্ঞতা তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে মানুষের মোহমুক্তি ঘটাচ্ছে, প্রতিরোধ বাড়ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে যে একা বাঁচা যায় না, সমষ্টিগতভাবেই বাঁচা সম্ভব।

নূতন পত্রিকা ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

বিনয় কোঙারের চিঠি

বর্ধমান জেল
২৪-০৮-১৯৭০

From Binoy Konar
To Com. Debabrata Dutta

প্রিয় কমরেড,

অনেকদিন তোমার দেখা পাইনি। জেলখানায় বেকার বসে থাকতে থাকতে বোধ হয় কিছুটা স্বার্থপরতা জন্মায়। মন বলে, তোমরা কেউ দেখা করতে আসছ না কেন? তোমাদের কঠিন দায়িত্বের কথা বোধ হয় আমরা ভুলে যাই।

পাশব আক্রমণে সংগ্রামী দুর্গাপুরকে পিছু হঠতে হয়েছে। বাইরের বিস্তারিত খবর কাছে নাই, তবে পত্রিকা পড়ে মনে হয়েছে এই সংগ্রামে দুর্গাপুরে শ্রমিকদের যথেষ্ট গর্ব করার আছে। পুরান চেনা কথাটাই মনে পড়ছে—শ্রমিকশ্রেণী বারে বারেই হারবে, আখেরে একবারই জিতবে। এই পরাজয় সাময়িক। অনুভব করতে পারছি—সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, আমলার ষড়যন্ত্র, সি.আর.পি, মজুত ফৌজ, ১৪৪ ধারা, সভার নিধেষাজ্ঞা, কার্ফু অর্থাৎ সাময়িক আক্রমণে শ্রমিকদের যদি পিছু হটতে হয় তাতে অবাক হবার কি আছে? অবাক হচ্ছি শ্রমিকদের পক্ষকালের প্রতিরোধ দেখে। আরও একটা কথা—দুর্গাপুরের শ্রমিক সর্বহারা শ্রমিক নয়, অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী, শিক্ষার সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চ বা মধ্য ঘর থেকে আসা সন্তান যারা স্বাভাবিক কারণেই সংগ্রামে-ভীরু, দোদুল্যমান ও পশ্চাদপদ হয়। তাতে কি অপূর্ব প্রতিরোধ নির্যাতন ও আঘাত সহ্য করার দৃষ্টান্ত দেখাল। ইতিহাসের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শাসকশ্রেণী সশস্ত্র আক্রমণে নিরস্ত্র শ্রমিককে পরাজিত করে উল্লাসে মগ্ন হতে পারে কিন্তু আহম্মকেরা জানে না যে আঘাতের ভিতর দিয়ে নিজের কবর রচনার ঐতিহাসিক শর্তগুলিকে পূরণ করে চলেছে। নানা ঘাটের জল খেয়ে ক্যারামের ঘুটির মত নানা ঠোক্কর খেয়ে অত্যন্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই পুঁজিপতির পোষা মজুর সর্দ্দারদের সমস্ত রঙে সুবিধাবাদী পথ সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়েই শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লবী সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। কমরেড লেনিনের ভাষায়—''দুঃসময়েই বন্ধু চেনা যায়, পরাজিত সৈন্যবাহিনীই শেখে বেশী।'' এই সংগ্রাম শুধু দুর্গাপুরের শ্রমিককেই অমূল্য শিক্ষা দেয়নি, সারা দেশের শ্রমিকদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার অমূল্য উপাদান সৃষ্টি করেছে। দুর্গাপুর শ্রমিকরা কোন দাবীতে লড়ছিল? ৩/৮ তারিখে শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ হল, যার প্রত্যাহারের সর্বসম্মত গণতান্ত্রিক দাবী। এই দাবীতে শ্রমিকরা ৪/৮ তারিখে ধর্মঘট করল। পরবর্ত্তী আন্দোলনে প্রস্তুতি পর্বে জনপ্রিয় শ্রমিক নেতাদের খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হোল। পুঁজিবাদী সমাজে খুন, জখম, রাহাজানি, ছিনতাই, গুণ্ডামী, নারী ধর্ষণের ঘটনা নিয়ত ঘটবেই। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য তাকে নেতৃত্বহীন করার উদ্দেশ্য নেতাদের সেই রকম কোন না কোন মামলায় জড়ানর অতি প্রাচীন

কায়দাকে পরাস্ত করেই বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগুতে হয়েছে। এই চক্রান্ত বন্ধের দাবী আমাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্বীকৃত অত্যন্ত মামুলী দাবী, কোন বিপ্লবী দাবী নয়। যে কোনও ব্যক্তি বা দল, যারা মজুরের স্বার্থরক্ষা করার ও পুজিবাদী হামলার বিরোধিতা করার ভড়ংও দেখায় তাদেরও এই দাবীর পিছনে দাঁড়ানোর কথা ছিল। দালালি করতে হলেও ব্যাভিচারের কারবারকে গোপন রাখতে হয়। কিন্তু দুর্গাপুরে আমরা অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। ঐ দাবীতে শ্রমিকরা যখন জীবনপণ লড়াই করছে তখন (নেতৃত্ব সম্পর্কে যে মতই থাক না কেন) তাকে মদত দেওয়ার বদলে তাকে খতম করার জন্য কমিউনিস্ট নামধারী, আগমার্কা বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্রীরা পর্য্যন্ত মরিয়া হয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় নামল। দুর্গাপুরের শ্রমিকদের কৃতিত্ব এইখানে যে তারা পুঁজিবাদী সামন্তবাদী কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার, রাজ্যপাল, নানা রঙের কংগ্রেস, ঘৃণ্য আমলা বর্গ আর বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্রের সশস্ত্র ঠেঙ্গারে বাহিনী পুলিশ, সি.আর.পি. শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী আর ফৌজের সাথে তথাকথিত শ্রমিক দরদীদের একই বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সশস্ত্র আক্রমণে নিরস্ত্র সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণী পশ্চাদপসরণ করার পর সারা দেশের শ্রমিকশ্রেণী অপার বিস্ময়ে দেখল যে তথাকথিত শ্রমিক নেতা রমেন সেন, নীহার মুখার্জিদের পৈশাচিক উল্লাসে দু'কষ বেয়ে লালা ঝড়ে পড়ছে। বুর্জোয়াজীর প্রেমের বাঁশি যখন বাজে দয়িতার কি তখন সময় অসময় থাকে? বলত—শ্রমিকশ্রেণিকে শিক্ষিত করার জন্য এই দৃশ্য অপরিহার্য্য ছিল না?

দুর্গাপুরে আমরা আর এক নূতন দৃশ্য দেখলাম। একদিন আনন্দবাজারে সংবাদ দেখলাম, ''দুর্গাপুরে আন্দোলন কার্য্যতঃ নারীদের নেতৃত্বে''। অপূর্ব্ব! সামন্ত পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীরা ভোগবিলাসের সামগ্রী বলেই পরিচিত ছিল। সামন্ত সংস্কৃতির প্রভাবে আমরাও অনেক সময় স্ত্রীদের সংগ্রামের সাথী হিসাবে গড়ে তোলার কাজে জড়তা দেখাই। দুর্গাপুরে সাময়িক পরাজয়ে শ্রমিকদের পশ্চাদপদ অংশ হয়ত কিছুটা সাময়িক ভীত হতে পারে, তবে বাস্তব অবস্থার চাপে সচেতন প্রচেষ্টায় অতি দ্রুত তা কেটে যাবেই। কিন্তু সংগ্রামের তিক্ততার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অগ্রগামী বাহিনীর তুণে যে নূতন কর্মীর সঞ্চয় গড়ে উঠল, যে মা বোনেরা সামন্ত সম্পর্কে বন্ধন ছিন্ন করে সংগ্রামের সাথী হিসাবে গড়ে উঠল—তা কি কম মূল্যবান? আহাম্মকরা ভাবে এক, হয় আর এক। স্বীয় চরিত্র গুণে সতত ভীত শাসকশ্রেণী জনমতে ভীত করার জন্য আঘাত হানতে গিয়ে ক্রমাগত বেশী বেশী মানুষকে ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে ছিটকে ফেলে সমষ্টির সংগ্রামের সদর রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। বলত—এটা কি আখের লড়াইয়ের পুঁজিকে বাড়িয়ে তুলল না? পত্র দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে সামনে তোমাদের ঝোড়ো দিন। পিছনের শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে নির্ভীক দৃঢ়তায় তোমাদের হাল ধরে এগুতে হচ্ছে—তোমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই। শেষ করার আগে তোমার মারফত দুর্গাপুরের বীর শ্রমিক বন্ধুদের আর সংগ্রামী মা বোনদের আমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

শরীর মোটামুটি ভাল, তবে ডান হাতের স্নায়ুর যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি কিছুটা। পারত, উত্তর দিও।

ইতি, তোমাদের
বিনয় কোঙার

প্রতিস্বাক্ষর—এইচ, ব্যানার্জি
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বর্ধমান জেল

With best compliments of

A

Well Wisher

Sl. No. 80

মধুসূদনের নারী প্রতিমা নির্মাণ

কল্যাণী ভট্টাচার্য

ইংরেজ কবি এলিয়ট বলেছিলেন, কবির বাক্‌প্রতিমার উৎস তার নিজের জীবন, নিজের অনুভূতি। একইভাবে কোনো কবি যখন তাঁর 'নারী প্রতিমা' নির্মাণ করেন তখন তাঁর সৃষ্টির উৎসে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রত্যক্ষ ভূমিকা অবশ্যই থাকে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই সমকালীন সামাজিক বিচার-আচার, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মদর্শন-এর পরোক্ষ কিন্তু গভীর প্রভাব থেকেই যায়। স্মরণ করা যেতে পারে ফরাসি ভাবুক সিমন দ্য বোভায়ার সেই অমোঘ উচ্চারণ—'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, তাকে নারী করে তোলা হয়।' নারী প্রতিমা নির্মাণ তাই এক সামাজিক নির্মাণ কিন্তু এ নির্মাণ অটল অনড় চিরস্থায়ী কিছু নয়। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণাও বদলে যায়, নারী প্রতিমারও রূপান্তর ঘটে। আমাদের দেশের উনিশ শতকের 'নারী প্রতিমা' একুশ শতকে এসে অনেক পাল্টে গেছে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম শুধু সেকালে নয়, একালেও বহু শ্রুত, বহুচর্চিত। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের মতো প্রতিভা বিরল। বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতোই তাঁর জীবন—যে জীবন উল্কার মতো জ্বলে উঠে শেষ হয়ে গিয়েছে। 'চতুর্দ্দশপদী' 'হেকটরবধ' ও 'মায়াকানন'-কে বাদ দিয়ে তাঁর তাঁর সাহিত্য জীবনের সময় মাত্র তিন বছর। ১৮৫৯-এর জানুয়ারি থেকে ১৮৬২-র ফেব্রুয়ারি। এর মধ্যেই রচিত হয়েছে 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলেই সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী', 'তিলোত্তমা সম্ভাব' 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা' 'কৃষ্ণকুমারি' ও 'বীরাঙ্গনাকাব্য'।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল মধুসূদনের 'নারী প্রতিমা নির্মাণ'। অর্থাৎ মধুসূদনের মনের অভ্যন্তরে যে নারী রূপ, তাঁর রচিত কাব্য নাটকে সেই রূপ কতটা অবয়ব ধারণ করেছে তারই অনুসন্ধান।

'নারী প্রতিমা নির্মাণ'-এর মতো বিষয় হঠাৎ একদিনে বা একটিমাত্র কারণে সৃষ্টি হয় না। জীবনের পথ চলতে চলতে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই নারী প্রতিমা নির্মিত হয়। মধুসূদনও তার ব্যতিক্রম নন।

মধুসূদন যখন জন্মেছেন, ও বড় হয়েছেন তখন সারা দেশ জুড়ে যে সমস্ত সংস্কার আন্দোলন চলেছে তার সিংহভাগই হল নারীকেন্দ্রিক। বছরের পর বছর ধরে মেয়েরা ছিল অন্তঃপুরে অন্তরীণ, শিক্ষার অভাবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষেরা তাদের জীবনসঙ্গিনী নারীকে নাবালিকা, পুতুলের মতো দেখতে চান নি। তাঁরা মেয়েদের জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে তাদের বিপন্ন জীবন থেকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলেই সতীদাহ প্রথা বন্ধ হল। বিধবা বিয়ের আইন হল, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা শুরু হল। মেয়েদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হল। মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল খ্রিস্টান পাদরিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিন্তু যখন বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত তখন থেকেই মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বন্ধ দরজা খুলে গেল। দেশ জুড়ে এই যে সমস্ত আন্দোলন, মধুসূদন কিন্তু কোনোদিনই তার অংশ হন নি। ১৮৬৫ সালে যখন বিধবা-বিয়ের আইন পাস হল, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিয়ে নিয়ে সারা দেশে ঝড় উঠল, মধুসূদন কিন্তু একেবারেই নীরব। বিধবা বিয়ের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সেকালের বুদ্ধিজীবীরা সকলই অংশ গ্রহণ করেছিলেন, একমাত্র ব্যতিক্রম মধুসূদন। কেবলমাত্র তাঁর লিখিত একটি চিঠিতে বিধবা বিয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তা হলেও সেকালে যে নারী মুক্তি আন্দোলন ইয়ং বেঙ্গলরা, বা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা অথবা প্রগতিশীল হিন্দু সমাজ গড়ে তুলেছিল, মধুসূদনের তার সঙ্গে যোগ ছিল। ১৮৪২ সালে মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটি রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে মধুসূদন প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ছাত্র বয়সেই লিখেছিলেন, 'In India, women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men.' (ভারতে মনে করা হয় যে মেয়েদের সৃষ্টি হয়ে থাকে শুধু পুরুষের কামনা চরিতার্থতার জন্য)। এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয় সে সময়ে মেয়েদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে অথবা জড় পদার্থ হিসেবে দেখা হত। মধুসূদনের দৃষ্টি তখনি ছিল ভিন্ন।

প্রশ্ন হল, কেন মধুসূদন সম্পর্কে কৌতূহল আর কেনই বা মধুসূদনের নারী প্রতিমা নির্মাণকে ফিরে দেখা। আসলে মধুসূদনের মতো এত বৈপরীত্য খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। এত বিদ্রোহই বা আর কে করেছেন? ধনীর সন্তান হয়েও কেবলমাত্র নাবালিকাকে বিয়ে করবার আপত্তির জন্যেই বিদ্রোহ, ধর্মকে ভালো না বেসেও ধর্মান্তরিত হওয়া, নিশ্চিত জীবন থেকে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। বিপুল বৈভবের মধ্যে বড় হয়ে উঠেও কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ—সব মিলিয়ে এ এক আশ্চর্য মানুষ। সেকালে যখন দস্তুর ছিল বাল্যবিবাহ—মধুসূদনের বন্ধুরা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক সকলেই বিয়ে করেছেন বালিকাকে—মধুসূদন কিন্তু বালিকা বিয়েতে রাজি হলেন না। মধুসূদনের বিদ্রোহ এই বিয়েতে—মধুসূদনের এই প্রতিক্রিয়া সে যুগের বিচারে অভিনব।

আসলে মধুসূদন ছিলেন অত্যন্ত রোমান্টিক। গৌরদাস বসাককে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, '...of course I am still Romantic, for that, you know, is my nature.'

তরুণ বয়সে কবি হয়ে যশোলাভ করবার এমনকি নীলনয়নার প্রেম লাভ করবার স্বপ্ন তিনি দেখতেন। বন্ধু গৌরদাস বসাককে অজস্র চিঠিতে তিনি তাঁর মনের কথা লিখেছেন, কিন্তু কোনো চিঠিতেই মেয়েদের সম্পর্কে তার মনোভাব প্রকাশ করেন নি। মধুসূদনের জীবনীকার গোলাম মুর্শেদ দেখিয়েছেন তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা কবিতায়। 'নারীদের সম্পর্কে তিনি যে রোমান্টিক ধারণা পোষণ করতেন তা তিনি স্বদেশের মাটিতে পান নি, পেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের যে সাহিত্য তিনি পাঠ করেছিলেন সেখান থেকে।' সে কারণেই বাবা মায়ের নির্বাচিত বালিকা কন্যাকে তিনি নিজের পত্নী বলে ভাবতে পারেন না। বন্ধু গৌরদাস বসাককে চিঠিতে লিখেছেন 'এখন থেকে তিন মাস পরে আমায় বিয়ে করতে হবে—কী ভয়ানক ব্যাপার এটা ভাবতেও আমার রক্ত শুকিয়ে যায়।' তবে তার 'মানসী' সম্পর্কে তার ধারণা কীরকম ও ব্যাপারে মধুসূদন নির্বাক। কোনো চিঠিতেই তিনি তা উল্লেখ করেন নি।

মধুসূদনের ছেলেবেলা কেটেছে যশোরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে, জননী জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে মধুসূদনের বন্ধন ছিল নিবিড়। জাহ্নবী দেবী ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ। শুধু নিজের সন্তানকে নয়, অন্যের সন্তানকেও নিজের করে নেওয়ার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল তাঁর। প্রতিবেশী সূত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মা বলে ডাকতেন এমনই স্নেহময়ী ছিলেন তিনি। যে যুগের বিশ্বাস ছিল মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয়, সেই কালে জন্মেও জাহ্নবী দেবী লেখাপড়া জানতেন। মধুসূদনকে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, কবি কঙ্কন চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল পড়ে শোনাতেন। ছেলেবেলা থেকেই মা ছিলেন মধুসূদনের খুব কাছের মানুষ। কিন্তু নাবালিকার সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে বাঁধা না পড়ার জন্য, বিলেত যাওয়ার স্বপ্নকে সফল করবার জন্য ধর্মান্তরিত হয়ে কাছের মানুষ মাকেও দূরে সরিয়ে দিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মধুসূদন তাঁর কোনো রচনায় সরাসরি মায়ের কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁর শতাধিক সনেটের কোনো একটিতেও মাতৃবন্দনার কোনো ছবি নেই। কোনো রচনায় মায়ের কথা উল্লেখ না থাকলেও তাঁর মনে যে মায়ের অস্তিত্ব কত গভীরভাবে ছিল তা মেঘনাদবধ কাব্যের মন্দোদরী অথবা চিত্রাঙ্গদার চরিত্র চিত্রণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুত্র বীরবাহুকে হারিয়ে চিত্রাঙ্গদার হাহাকার পড়বার সময় বারবার মনে হয় কোথা থেকে মধুসূদন মাতৃহৃদয়ের এই হাহাকারের ছবি এঁকেছেন। চিত্রাঙ্গদার 'একটি রতন' বীরবাহুর মতো মধুসূদনও কি তাঁর মায়ের একটি রতন নয়? চিত্রাঙ্গদার হাহাকার ও জাহ্নবী দেবীর হাহাকার মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যে বারবার এসেছে জননী ও শিশুর কথা। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ স্বপ্নে জননীকে দেখলেন,

হে জননী, কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখাপুনঃ পূজি পা দুখানি
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি;
মা আমার, যবে আমি বিদায় হইনু
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়;

চিতা আরোহণে মৃত্যুর আগে প্রমীলা জননীর কথা স্মরণ করেছেন—নয়নের জলে ভেসে হাহাকারের মধ্যে প্রমীলার শেষ উক্তি :

কহিও পিতার পদে; এসব বারতা
বাসন্তি! মায়েরে মোর—হায়রে, বহিল
সহসা নয়নজল!

মধুসূদনের মনে তার মাতৃমূর্তি অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল বলেই তাঁর মনের অভ্যন্তরে নারী প্রতিমার একটি রূপ জননী মূর্তি হয়ে দেখা দেয়। শিশিরকুমার দাস সীতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'যে মা চোখের সামনে নেই, যাঁর অধিষ্ঠান নয়নের মাঝখানে, চিত্তের গভীরমূলে, দুঃখের তীব্রতায়, আশ্রয়হীনতার ভয়াবহ অনুভূতির মূহূর্তে, চিত্তের সেই গভীর মূল থেকে স্মৃতির অন্ধকার থেকে যিনি উঠে আসেন, আশ্রয়ের প্রতীকরূপে, দুঃখ অবসানের আশারূপে, সেই মাকে স্মরণ করেছেন সীতা।' সীতার মাকে স্মরণের মধ্যে মধুসূদনের মা এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে যান।

যে নারীমূর্তি আশৈশব মধুসূদনের মনের অভ্যন্তরে সে হল সিন্দুর বিন্দু শোভিত কল্যাণময়ী নারী মূর্তি। মেঘনাদবধ কাব্যে সরমা সীতাকে সিঁদুর পরায় :

কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিল ফোঁটা
সীমান্ত, সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে।

আবার প্রমীলা সহমরণে চলেছেন, সেখানেও তার রূপ বর্ণনা করেছেন কবি :

ললাটে সিন্দুরবিন্দু, গলে ফুলমালা।'

সীতা চরিত্রকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, সর্বংসহা নারীমূর্তিরূপে। মধুসূদনের মনের কোণায় শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় বাঙালি নারীর এই চিরন্তন রূপটি ছিল। নারীর এই রূপটিই তার রচনায় বারংবার এসেছে।

আগেই বলেছি যৌবন উন্মেষের পর্বে তিনি নীলনয়না নারীর স্বপ্ন দেখতেন। শৌর্যে, বীর্যে, সাহসী পদক্ষেপে মেয়েদের জীবনের পথ চলতে হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। মধুসূদনের রচনায় এই সব নারীদেরও দেখা যায়। বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন যে সমস্ত নারী চরিত্র এঁকেছেন তারা তাদের স্বামী অথবা প্রেমিকের কাছে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এমনকি সেখানে অবৈধ প্রেমের কথাও আছে। 'সোমের প্রতি তারা' রচনায় তারার জবানীতে বলা হয়েছে :

গুরুপত্নী আমি তোমার, পুরুষরত্ন
কিন্তু ভাগ্যদোষে, ইচ্ছা করে দাসী
হয়ে সেবি পা দুখানি।

মধুসূদনের মনে নারীর দুটি রূপ। সাহসী বীর্যবতী রূপ এবং শান্ত কল্যাণী রূপ। বীরাঙ্গনা কাব্যে যে সমস্ত চরিত্র রয়েছে তারা সকলেই ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাই অথবা রানি দুর্গাবতীর মতো নয়। দ্রৌপদী অথবা জনার চরিত্র তেজস্বিনী হলেও অধিকাংশ চরিত্রেই নারীর শান্তরূপ প্রকাশিত।

আসলে মধুসূদনের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ছিল স্ববিরোধ। রেবেকাকে তিনি ভালোবেসে বিয়ে করে চারটি সন্তানের জন্ম দিলেন আবার একদিন অনায়াসে তাদের ফেলে চলে এলেন। এরপর তাঁর জীবনসঙ্গী হলেন হেনরিয়েটা। যদিও মধুসূদনের জীবনীকারেরা দেখিয়েছেন, রেবেকার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ না হওয়ার জন্য তিনি হেনরিয়েটাকে বিয়ে করতে পারেন নি। হেনরিয়েটা ছিলেন আমৃত্যু তাঁর জীবনসঙ্গী। মধুসূদনের জীবনীকার সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন, নারীর কাছে মধুসূদন যা চেয়েছিলেন, তার অনেকখানিই হল শুশ্রূষা ও আনুগত্য। হেনরিয়েটার মধ্যে জননী সত্তা প্রকট। মধুসূদন মাতৃস্নেহের চিরকাঙাল হেনরিয়েটার মধ্যে তিনি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন, গৌরদাস বসাক হেনরিয়েটাকে সাবিত্রী সদৃশ মনে করতেন। হেনরিয়েটার পাতিব্রত্যই তাকে সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনীয় করেছে।

আগেই বলেছি প্রথম জীবনে অত্যধিক আদরে প্রতিপালিত বাস্তবজ্ঞানহীন মধুসূদন রোমান্টিক দৃষ্টিতে নারীর রূপ কল্পনা করেছেন। ধর্মান্তরিত হয়ে বিশপ কলেজে পড়ার সময় তিনি বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ধনীর সন্তান মধুসূদন অর্থাভাব কাকে বলে তা জানতেন না। বাব রাজনারায়ণ যখন তার অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন তার শোচনীয় অবস্থার কথা। রাজনারায়ণ যখন বংশরক্ষার জন্য বারবার বিয়ে করলেন মধুসূদন কি তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের বেদনাকে অনুভব করেন নি? 'একেই কি বলে সভ্যতায়' হরকামিনীর দীর্ঘশ্বাস : 'হায় এই কলকেতার যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই?' এই দীর্ঘশ্বাস সেকালের বহু মেয়ের দীর্ঘশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'একেই কি বলে সভাত্য' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—দু-খানি প্রহসনে তিনি সমকালীন সমাজের বিকৃতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। সমকালে মধুসূদন অনেক বদনামের ভাগী হয়েছেন কিন্তু চরিত্রহীনতা বা লাম্পট্য দোষে কেউ তাকে দোষী করতে পারে নি। মধুসূদন নিজেও চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও লাম্পট্যকে পাপ বলে মনে করতেন। বন্ধু গৌরদাসের বাড়িতে গিয়ে গৌরদাসের দেখা না পেয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমার আশংকা হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষিত ছেলেরা যে পাপের পথে ভেসে যায়, তুমিও সে পথে পা দিয়েছ।'

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধা বিরহিবধূয়া মধুসূদনের রোমান্টিক মনের সৃষ্টি। ব্রজাঙ্গনায় রাধা কৃষ্ণ বিরহে উন্মাদিনী। কিন্তু এই রাধাও ভারতীয় নারীর মধুরতা দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে ভগ্নস্বাস্থ্য কবি তাঁর বালিকা কন্যার বিয়ে ঠিক করলেন। যিনি না কি বিশ্বাস করতেন বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকেরা নয়, পাত্র-পাত্রী নিজেরাই বিয়ে ঠিক করবে—কন্যার বিয়ের ব্যাপারে তাঁর সে মত বজায় রাখতে পারলেন না। সহায় সম্বলহীন কবি তাঁর আদরের কন্যা শর্মিষ্ঠার বিয়ে দিলেন, মেয়ের থেকে দ্বিগুণ বয়সী এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবকের সঙ্গে। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তার এতদিনের লালিত বিশ্বাসের সঙ্গে ভগ্নস্বাস্থ্য কবি আপস করলেন।

মধুসূদনের নারী প্রতিমা নির্মাণ মূলত তার রোমান্টিক মনের সৃষ্টি। সে তিনি জননী বা জায়া যে মূর্তিতেই নারীকে দেখুন না কেন। মৃত্যুপথযাত্রী নিরুপায় মধুসূদনের মধ্যেও সেই রোমান্টিক মনেরই প্রকাশ। হাসপাতালে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত কবি শুনলেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হেনরিয়েটার মৃত্যুসংবাদ। পত্নী বিয়োগে তাঁর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেও সেই রোমান্টিক মন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ম্যাকবেথ থেকে আবৃত্তি করলেন :

'...Life's but a walking shadow;
a poor player
That struts and frets his hour upon
the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and
fury,
Signifying nothing.'

এই হলেন কবি শ্রীমধুসূদন। মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেও তাঁর রোমান্টিকতার মৃত্যু হয় না। পত্নী বিয়োগে তাঁর অনুভূতি ও ম্যাকবেথের অনুভূতি মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বসু, যোগীন্দ্রনাথ, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪
২. মুরশিদ, গোলাম, *আশার ছলনে ভুলি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩. *মধুসূদন রচনাবলী*, কামিনী প্রকাশনালয়, ১৯৯৯
৪. *কোরক* সহিত্য পত্রিকা, মধুসূদন সংখ্যা, ১৪০৬
৫. *চতুষ্কোণ*, মধুসূদন জন্ম সার্ধশত ও মৃত্যু শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৮০

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বনফুল

রেডিমেড পোশাক বিক্রেতা

দত্ত সেন্টার (এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সামনে), বি.সি. রোড, বর্ধমান

Sl. No. 46

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

প্রতি ঘরে শৌচাগার আমাদের অঙ্গীকার—এই লক্ষ্য নিয়ে
গরিব মানুষের সুখ-দুঃখের চির সাথী

কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত

দেবাশিস গাঙ্গুলী
উপপ্রধান

নির্মল কাউর ভামরা
প্রধান

Sl. No. 34

সুনীতিকুমার : এক ব্যতিক্রমী কর্মযোগী

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার কোষে কোষে আন্তর্জাতিকতার সবিস্তার প্রমাণসিদ্ধতা করার কাজে নিজেকে মজুরখাটানিতে খাটিয়েছিলেন সুনীতিকুমার। এ-ভাষার প্রাণরস যে ভাষাবিবর্তনের ঐতিহাসিক বিজ্ঞানধারার প্রতিনিধিত্ব করে চলছে, তার সুস্পষ্ট চিন্তাগুলো অনাদরে ও অসতর্কতায় ধুলোর বেশবাসে আটকা ছিল। সেই দীর্ঘসঞ্চিত ধুলো সরিয়ে এ-ভাষার গরিমা তিনি উদ্ধার করেন। বিদ্যাসাগরের তিনি সুযোগ্য সন্তান। নিজের মর্মশাঁস ঠিক রেখেই ওই ভাষা যে যুগভিন্ন চাহিদামাফিক নিজেকে যুক্তিসিদ্ধ বদলের সামর্থ ও সম্ভানা ধরে আছে, তা তিনি আমাদের মননে ও প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে-সব বাংলাভাষী মানুষজন বাংলা ভাষার আগামী-আয়ু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তারা হয় সুনীতিকুমারকে পড়েন নি অথবা পড়েও তাঁর প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। তাঁদের যে পুরোটাই খাটো চোখের ভাবনা—তা বলা যায় না। সুনীতিকুমারের বৈচারিক চর্চা আমরা তো চাহিদামাফিক করি নি। তাঁর গহন-ব্যাকরণচর্চার ভেতরে খুব অল্প মানুষই পথ কাটার যোগ্যতা ধরে, এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও মিথ্যা নয় যে, আমাদের মতো অল্পক্ষমতার মানুষদের জন্য তাঁকে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রারম্ভিকে ও ব্যবহারিক ভাষা-ব্যবহারের প্রয়োগ ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োগ করা দরকার ছিল সেভাবে আমরা তাঁকে চর্চা করিনি। ধরা যাক তাঁর লেখা 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' বইটি। ভাষাবিদ সুভাষ ভট্টাচার্যের মতে বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে এটি একটা খুব উন্নত গুণমানের ছাত্রপাঠ্য বই। এছাড়া তাঁর 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বইটি ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের রীতিতে লেখা একটি সেরা বাংলা ব্যাকরণ বই। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম যুগান্তকারী বই 'Course in General Linguistics'-এর লেখক ফ্যর্দিনা দ্য সস্যুর। বইটিতে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রামাণিকতাকে না মেনে বলা হয়েছে ভাষা তার নির্দিষ্ট সময়কালের অবস্থার যে বিচার করে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, এক কালিক ভাষাবিজ্ঞানেরই নামান্তর তার তত্ত্ব। ভাষার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারত্বকে তিনি গুরুত্ব দিলেন না। এক কালিক ব্যবহারবিধিই ভাষার চরিত্রনির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়। নোওম চমস্কির 'Syntactic Structures' এবং 'Theory of Syntax' বইদুটি ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে এনে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। দেখা গেল ভাষাবিজ্ঞানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ধারাচল, এককালিক অবস্থাভাষ্য ও মনোবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ—এই তিনটি পদ্ধতিতে উঠে আসে। সুনীতিকুমার তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বকেই আরও যুগোপযোগী চলিষ্ণুতায় সমৃদ্ধ করেছেন। ভাষাকে সমাজ সংস্কৃতির প্রতিফলনবিচ্ছিন্নে তিনি দেখেন নি। তবে তাঁর চর্চা ও চর্যায় চমস্কির তত্ত্বের সারাৎসার অনেকটা স্বীকৃতি পেয়েছে। মনে রাখা দরকার চমস্কির 'Transformational Generative' যা বাংলা পরিভাষায় 'সংবর্তনী-সঞ্জননী' তত্ত্ব হিসেবে উঠে এসেছে, তা বর্তমানে ভাষা বিজ্ঞানী লেনার্ড পামার বা র‍্যাফায়েল সালকি প্রমুখের দ্বারা কমবেশি সমালোচিত হচ্ছে।

সুনীতিকুমারের 'The Origin and Development of the Bengali Language' যা ODBL নামে পরিচিত সেটি মূলত ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে বিভক্ত। বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আর বিশ্লেষণ এবং বাংলা ভাষার শব্দগঠন, শব্দের উৎস, শব্দের রূপ পরিবর্তন নিয়ে তার প্রামাণিক আলোচনা বইটির বিষয়বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সঙ্গে অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দি, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার শব্দের ইতিহাসকে যেভাবে মিলিয়ে দেখেছেন তিনি তাতে বাংলা ভাষার সঙ্গে ভারতের নানা আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণগত ও ভাবগত যোগাযোগের বহমানতা আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলা ভাষা কেমন করে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে লিখতে হবে তা তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর 'রাজস্থানী ভাষা', 'ভারতের ভাষা ও

ভাষাসমস্যা' ইত্যাদি অনেক ভাষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা আমাদের মতো বহু ভাষাভাষী দেশের নানাবিধ আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষাকে পরস্পরের যোগাযোগে ও লেনদেনে কেমন করে সমৃদ্ধ করা যায়, সে সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাচর্চাকে ও আন্তর্ব্যবহার প্রয়োগচেষ্টাকে সমৃদ্ধ ও প্রাণিত করার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে ও এখনও লাগাচ্ছে। আজকের যুগে শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নানা ভাষাবিশেষের অন্যান্য সব ভাষার ওপর আগ্রাসনধর্মিতা বাড়ছে ও আধিপত্যবাদের সংক্রমণ গুরুতর হচ্ছে। পরস্পরকে গুরুত্ব ও মর্যাদা দেবার বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উপযোগিতাকে পর্যুদস্ত করা হচ্ছে। ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষাগুলি এমনকি অনেক সক্ষম ভাষাও কমবেশি আক্রান্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে অনেক ভাষা ও উপকথা মুমূর্ষু ও অনেকে বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির মুখে চলে যাচ্ছে। কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের তত্ত্বে এই নীতির কোনো প্রশ্রয় নেই। আগ্রাসনের এই নীতি আসলে এক ধরনের ভাষানাৎসীবাদ শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার যা একটি সংস্কৃতিগত হাতিয়ার। সুনীতিকুমারের তত্ত্ব ভাষাসমন্বয়ের, সহাবস্থানের তত্ত্ব।

২.

সুনীতিকুমারের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি 'হিন্দু-ইসলামীয় সংস্কৃতি'। একদিকে প্রাক্-আর্য ও অন-আর্য—এই উভয় সংস্কৃতি ও আরবীয় সংস্কৃতির মিশেলে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে সুনীতিকুমার মনে করেন। তাঁর মতে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও সহিষ্ণুতা। নানা ধর্মমত একই সত্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পদ্ধতি বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়াও তিনি মনে করেন, নাস্তিকের সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দেবার অধিকার নেই আমাদের, তাকে জোর করে আস্তিক্যে আনবার চেষ্টাও অবৈধ। ছেচল্লিশের নোয়াখালির দাঙ্গায় অনেক হিন্দু মেয়ে ধর্ষিতা হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের কলকাতায় নিয়ে আসেন ও তাঁদের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু পুরোহিত পাওয়া সমস্যাসঙ্কুল বলে সুনীতিকুমারই পৌরোহিত্য করেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের লেখা অসমাপ্ত জীবনকথায় তিনি লিখছেন, "জন্মগত অধিকারের দাবিতে, ধর্ম বিষয়ে ভুঁইফোঁড় হয়ে, নিজেকে আর নিজের ধর্মগোষ্ঠীর সমাজের প্রচারক বা গুরুদের সব-জানতা ঠাউরে, একটু আত্মপ্রসাদ, কোথাও বা একটা জাতিধর্মগত অহংকার নিয়ে, ধর্মঈশ্বর মানব-জীবনে জীবনোত্তর অস্তিত্ব প্রভৃতি ধরে পাকা-পোক্ত একটা বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতে পারলেই যেন সকলে সুখী। পাঁচ রকম অস্বস্তিকর ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার একটা আরাম এতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ জগতের সমস্ত কিছুর মতো স্থিতিশীল নয়, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তার দেহের মধ্যে যেমন মনের মধ্যেও তেমনি ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। নিজেকে যে জানতে চায় সে এই দৈহিক আর মানসিক পরিবর্তন বিচার করে দেখে, এতে আত্মসমীক্ষার একটা আনন্দ পায়। বিশেষ করে মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারে। আবার এই আনন্দের মধ্যে একটু ভাবনায় বা সন্দেহেও পড়ে যায়। সেই চিন্তা, ভাবনা বা সন্দেহকে সুবিচারের দৃষ্টিতে দেখে, ইংরেজিতে divine discontent-ও বলা হয়েছে—'একদিব্য সংশয়-বোধ।... পা না ফেললে চলা হয় না, ধাপ বা সিঁড়ি বেয়ে না উঠলে উঁচুতে ওঠা যায় না।' '...নানাপ্রকারের ধর্ম-বিশ্বাস অন্ধ-বিশ্বাসের ফাঁদ পাতা হয়েছে সরল মানুষকে যেন ভোলাবার জন্যই—কিন্তু মানুষের মহত্ব সেখানেই যেখানে সে এই-সব ধর্ম আর অন্ধ বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে—নিজের সহজ আন্তর জ্যোতিতে যার চিন্তা-বিচার উদ্ভাসিত—'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/সে পায় তোমার হাতে/শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

সুনীতিকুমার যে 'আন্তর জ্যোতি'র কথা বলেছেন তার ব্যবহারিক চেহারা বোধকরি স্বাস্থ্যকর অনুসন্ধিৎসা ও সেই শারীরবৃত্তিক প্রবণতাকে টানা খাটিয়ে চলা। টানা কারণ সে খাটুনির কোনো পার্বিক উত্তর-উপার্জন মূলত অনুসন্ধিৎসার গতিমুখকে আত্ম-উপলব্ধ সংশ্লিষ্ট আরও দুর্গম কোনো প্রশ্নমুখে ঠেলে দেওয়া। প্রশ্ন কেন? একদিকে কাজের পাওনা হিসেবে আত্মসামর্থের বাড়তি যোগ্যতার আত্মস্বীকৃতি অন্যদিকে তেমনি আত্মসংশয়ের নতুন ধারা আবিষ্কার করা। এই যুগ্মচাপের ফলশ্রুতিতে প্রশ্নের উদ্ভব। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দকে তাঁর আজীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। 'যে দুজনের লেখার সঙ্গে সংস্পর্শ উত্তরকালে আমার আভ্যন্তর জীবন, চিন্তা, রভসানন্দ প্রভৃতির বিকাশে স্পর্শমণির কাজ করেছে—সেই দুজন হচ্ছেন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।... তবে এক কথায়, জীবনে শ্রেয় আর পেয় যা কিছু লাভ করেছি সবই এদের কাছ থেকে।' জীবনের শেষ পর্বে এসে সুনীতিকুমার এঁদের তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা বলেছেন কেন? মূল কথায় গতির আবিষ্কারধর্মী রোমাঞ্চ ও স্থিতির শক্তিরক্ষক ও শক্তিবর্ধক মাধুর্যের মিশ্রণে জীবনের ব্যবহারিক বনেদ তৈরি করার মূলত ভাবগত মননে ও কর্মচলে এরা আজীবনের যোদ্ধা ছিলেন। এদের বর্ধমান আত্মবিরোধ সমাধানের নতুন নতুন দিকমুখ আবিষ্কার করেছে ও উপস্থিত গতি ও পথগুলির সাথে তাদের বিরোধ ও সমঝোতার বহু ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। সমন্বয়বাদী বললে এদের ঠিক মূল্যায়ন হয় না। অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণালব্ধ পরিশ্রুতিপ্রবণ সমন্বয়বাদী বলাই বোধহয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, সুনীতিকুমার ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে একই কাজ করে গেছেন।

৩.

সুনীতিকুমার যে ভ্রমণখোর ছিলেন তা আমরা সকলেই কমবেশি জানি। কিন্তু আরাম উপভোগের ও দেখন-খুশির হুজুগিরির অভ্যেস তাঁর ছিল না। বরং ঘিলুখাটুনির মজুরিগিরির পোক্ত অভ্যেসকে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কাজে লাগিয়ে দিতেন। বিচিত্র সব চালচলনের, লোকলৌকিকতার ভেতর খুঁড়ে তিন বের করতেন তাদের অন্তর্নিহিত প্রাণরসের বিধিব্যাকরণকে। খুঁজে পেতেন আন্তর্দেশীয় মানবপ্রজাতির মিলনধারা ও পার্থক্যকে। অতীত আর বর্তমানের যোগসূত্রগুলি ও বিয়োগচিহ্নগুলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি মানবসংস্কৃতির বিশ্বমাতৃক ভূমিকাকে প্রামাণিক করার সক্রিয়ে তিনি নিজের গোটা জীবনকে ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর লেখা 'ভারত সংস্কৃতি' 'সাংস্কৃতিকী', 'বৈদেশিকী' প্রভৃতি বই ও 'পরিচ্ছদের ইতিহাস আলোচনা', 'পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতি', 'সমন্বয়মূর্তি', 'পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প', 'ধর্মশিক্ষা', 'আধুনিক ইউরোপ সংস্কৃতি ও শিল্প' প্রভৃতি অসংখ্য প্রবন্ধ নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু ভারতের নানা জায়গার জীবনচল ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের ভেতরেই তিনি তাঁর দৃষ্টিফাল ঢোকাননি, সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার মানুষদের, চীনাদের, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী ছাড়াও নানা দেশের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি ভাষাতাত্ত্বিক ও শৈল্পিক দিক থেকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর 'চীনাদের কাহিনী', 'শিল্পকলা', 'দ্রাবিড়', 'তাও', 'বড়ো জাতি', 'মণিপুরপুরাণ', 'কৃষ্ণ আফ্রিকার কৃতি' প্রভৃতি লেখায় নৃবিদ্যা, নৃকুলবিদ্যা, জাতিতত্ত্ব ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গভীর পরিশ্রমউদ্ভূত জ্ঞানচর্চায় আমরা যদি সমৃদ্ধ হতে পারতাম ও ব্যবহারিক দিক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে সংস্কৃতিগত ও প্রশাসনিক দিক থেকে খাটাতে

পারতাম তবে জাতি ও উপজাতিগত দগ্‌দগে সমস্যাগুলি যা অবিরাম ভারতের প্রাণরস শোষণ করছে, সেগুলির সমাধানে কতকগুলি বাস্তব ও ভাবগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কিছু অমূল্য শর্ত সৃষ্টি করতে পারতাম। এমনকি প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার ও নানা পরামর্শ তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতাম। সংকটটা অন্যত্র। বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন পৃথিবীতে কেউ চলতি বস্তুগত জীবনকেই তার ভাবগত চেহারায় গড়ে পিটে নেয়, কেউ তার ভাবগত জীবনকেই বস্তুগত কাঠামোচলে ব্যবহারিক করতে চায়। তাঁর অতি সংক্ষিপ্ততম কথামর্মকে বাড়তি কিছুটা শরীরে তুলে ধরা হল। মুসকিলটা এটাই যে দুয়ের ভেতর সমাধানলিপ্সু করিৎকর্মা লেনদেন হয় না। সেক্ষেত্রে মূলত সাংস্কৃতিক মিস্ত্রিমজুরের দল উদ্যোগী হলেও পার্থিব জীবনবদ্ধ মানুষেরা মোটের ওপর নিরুদ্যোগীই থাকেন। তারা ভাবেন সেসব ওপরতলার লোকেদের কাছে তাদের মনমর্জিমত পথ পাওয়া যাবে না। তারা বাণীযোগ্য অথবা পাঠযোগ্য অথবা উপভোগযোগ্য মানুষজন। সুনীতিকুমাররা সেসব মানুষদের সঙ্গে মিশে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে তাদের জীবনচর্যা পাঠ করেন কিন্তু তারা সুনীতিকুমারদের মননচর্চাকে কি উৎসাহে ও উদ্যোগে গ্রহণ করেন? যাঁরা সমাজের নিচের তলায় আছেন তাঁদের কঠিন জীবন ও শিক্ষাযোগ্যতার ঘাটতির জন্য সুনীতিকুমারের কাছে পৌঁছতে পারেন না। কিছু শিক্ষা ও অবস্থানে যারা কমবেশি সুবিধাপ্রাপ্ত তাঁরাও কতজন শ্রদ্ধার ও পরিশ্রমের সঙ্গে সুনীতিকুমারের চর্চা করেন? নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে সুনীতিকুমারের জন্ম ১৮৯০ সালে। অভাব, অনটন ও নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন। নিজের শৈশব ও শিক্ষাজীবনের পরিপার্শ্ব নিয়ে তার গভীর অনুধাবনযোগ্য আত্মচরিত তিনি শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৭ সালের ২৯ মে আচমকাই তিনি চির-অবসর পেলেন।

৩.

'ইতিমধ্যে কোনওক্রমে গৃহারম্ভটি সারিয়া ফেলিলাম, পাঁজি-নির্দিষ্ট ভালো দিন দেখিয়া জমিতে পূজা-হোম করা হইল, মঙ্গলেষ্টক স্থাপন হইল, পঞ্চরত্ন পঞ্চশস্য পোতা হইল। এখন নুন-টুন সব হইল, চারিটী পান্তা হইলেই হয়; গৃহারম্ভ হইল, টাকা হইলে এখন বাড়ি তৈয়ারী আরম্ভ করা যায়। ইচ্ছা হয় গরম দুধ জামবাটী করিয়া ফুঁ দিয়া দিয়া খাই—ইচ্ছা আছে, ফুঁও আছে, কেবল দুধ আর বাটী নাই। আমার অবস্থা তাই। বাড়ির plan, fresco কোথায় হইবে, কোথায় গ্যাসের স্টোভ থাকিবে, এই সব লইয়া জল্পনা কল্পনা বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। কিন্তু টাকা নাই—ধার করিয়া না পাইলে বাড়ীর ভিত্-ই শুরু করা যাইতেছে না।" ১৯৩২ সালে অর্থাৎ ১৩৩৯-এ গোপাল হালদারকে লেখা এই দীর্ঘ চিঠিতে সুনীতিকুমারের দুটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে। প্রথমটি হল, ''অস্পৃশ্যতা আন্দোলন কংগ্রেস বাবুরা যেভাবে করিতেছেন তাহাতে দেশের culture-টা নষ্ট হইবে আশঙ্কা করি—পরের চিঠিতে এ বিষয়ে আপনাকে লিখিব।" দ্বিতীয়টি—''কলিকাতায় খুব জোরে 'চিত্রা' সিনেমায় 'চণ্ডীদাস' (সবাক ফিল্ম) চরিতেছে। 'দ্বাদশ গৌরবময় সপ্তাহ'। অতি বাজে wretched film. অথচ যেভাবে গড্ডলিকা-প্রবাহ চলিতেছে তাহাতে দেশের culture-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত হতাশ হইতে হয়।" সুনীতিকুমার রবীন্দ্রচিন্তন ঘরানার। ভাবচড়া উন্মাদনায় সরল জনসমবায়কে সাময়িক মাতানো যায়, তাদের বর্তমান অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অনেক পুঁজিপাটা এমনকি নিজেদের জীবনও তারা আবেগতাড়সে দিয়ে দেয় বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। প্রায় একশ বছর হতে চলল। অস্পৃশ্যতা বা সংস্কৃতির দশা এখনও কি রাহুগ্রস্ত নয়? মুসকিল তখনও সুনীতিকুমাররা সঙ্গচ্যুত ছিলেন, এখনকাররাও তেমনি সঙ্গচ্যুত। যারা তাদের পরামর্শে সেদিনও কান দেননি, আজও দেননা তারা সেদিনের মতো আজও দূষিত সঙ্গের শিকার। সুনীতিকুমাররা আজও নিঃসঙ্গ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। আমরা দূষিত সঙ্গে আজও চুলোয় যাচ্ছি। ''একটা চিন্তা আমার মাথায় কয়মাস হইতে ঘুরিতেছে। Polyglottism in Ancient India. ফারসি ভাষা এদেশে আসায় আমরা বলি হাট-বাজার, লোক-লস্কর, রাজা-বাদশা, ধন-দৌলত ইত্যাদি। ইংরেজির আগমনে 'বাক্স-পেঁটরা'। সমার্থক দুইটা শব্দ দুই বিভিন্ন ভাষা হইতে মিলাইয়া একটি শব্দ। প্রাচীন ভারতেও ছিল। যথা—কার্ষা-পণ (কার্ষা—প্রাচীন পারসিক 'কর্ষ' + ভারতীয় austric-মূল পর্ণ, দুইয়ের অর্থ কোনও রকম reconing of value) 'গচ্ছপিণ্ড' (<গাছ + হিন্দি পেঁড়-tree) ইত্যাদি। কতকগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ পাইতেছি যাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন ভারতে একাধিক ভাষা জনসমাজে প্রচলিত ছিল—আমাদের উত্তর ভারতে; এবং অনার্য (কোল, দ্রাবিড়) + আর্য্য, আর্য্য + অনার্য্য, ভারতীয় + বিদেশীয় প্রভৃতি নানাভাবে শব্দ মিলাইয়া সৃষ্ট সমস্তপদ আজকালকার মতই ব্যবহৃত হইত। এখন যে সব শব্দ বহুশঃ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বরা প্রমাণ হয় যে যীশু খ্রীস্টের যুগের এদিক পর্য্যন্তও উত্তর ভারতে অনার্য্য ভাষারও বহুল প্রচার ছিল।" সুনীতিকুমারের একটি চিঠির টুকরো অংশ। এই অংশটিতে ১৯৩৩ সালে নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ সম্মেলনে তিনি যে নিবন্ধটি পাঠ করেন তার কিছু চিহ্ন এই উদ্ধৃতাংশে আছে। তাঁর চিঠি থেকেই জানা যায় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বাংলা ছন্দ সম্পর্কে নিবন্ধটি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত আলোচনা বলে মনে করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অমূল্যধনের বাংলা ছন্দ সম্পর্কে বইটি পরে প্রকাশ করে। আজ পর্যন্ত বইটির বহু সংস্করণ হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। ''সর্বত্র এক ভাব—কি করিয়া অপরকে দাবাইয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইব। ভবিষ্যৎ culture of humanity সম্বন্ধে আমার বড় আশা নাই। একধর্মরাজ্যপাশে (ধর্ম অর্থে culture) সমগ্র মানবজাতিকে গাঁথিবার স্বপ্ন যাহারা দেখেন, তাঁহাদের কল্পনাশক্তি অসাধারণ। তবে আমার মনে বয়সের দোষে বোধ হয়—বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে নিহিত সৎ চিৎ ও আনন্দময় সত্তার উপর বিশ্বাস আসিতেছে, তাই মানবজাতির বিশেষতঃ ভারতীয় মানবের, হিন্দু মানবের বাঙালী হিন্দু সমাজের এই বিশেষ আপৎকালেও একটা stoicism born of faith আসিতেছে, ... কিন্তু pessimism আসিলেও হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে চাহি না। যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া যাইতে চাই। এই কাজের মধ্যই অনন্দ, ইহার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা, এই কাজের দ্বারাই আমরা in tune with infinity থাকিতে পারিব।"

সুনীতিকুমারের কয়েকটি চিঠির টুকরো টুকরো অংশগুলিকে তুলে ধরার ভেতর দিয়ে শুধু ভাষা সংস্কৃতি নয়, সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজচল, বহুবন্দিত তথাকথিত বিনোদন সংস্কৃতি ও শিক্ষিত জনসমষ্টির গড় মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর বাস্তবমুখী মতামতের কিছু কিছু চিহ্ন আমরা পেলাম। আরও অনেক উদাহরণ দিতে পারা যায়। কিন্তু তাতে প্রবন্ধের শরীর বাড়বে। তাঁর মতামতগুলি কত তাৎপর্যবাহী তা আমরা মর্মে মর্মে আজ বুঝতে পারছি। কিন্তু বাঁচার মন্ত্র তিনি যা আমাদের দিয়েছেন তা নিজের জীবনেও পালন করেছেন। তা হল কাজ আর কাজ।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েত

দেবীপুর, জেলা : বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২২৬৩১১৭, ২২৬৩৯১৭
E-mail: baradhamasgp@mail.com

একনজরে বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েত

আয়তন : ২০.৭২ বর্গ কিমি, মোট জনসংখ্যা ১৬,১৩৩ জন, তপঃ জাতি ৫১৯৭, তপঃ উপঃ ৩৯৯০, মোট সংসদ ১২টি, গ্রামের সংখ্যা ১৬টি, মৌজা ১৩টি, মোট ভোটার ১১,৭২৪ জন, মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১টি, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ১১টি, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ১টি, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ৩টি, পোস্ট অফিস ২টি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ১টি (স্টেট ব্যাঙ্ক), সমবায় সমিতি ১টি, সরকারি পাঠাগার ১টি, হাট ২টি, নলকূপ ১৮১টি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ২৮টি, পঞ্চায়েত দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ১টি, প্রাণীচিকিৎসা কেন্দ্র ১টি, পাকা রাস্তা ৩৯ কিমি., কাঁচা রাস্তা ১৪ কিমি

আমাদের শপথ

১. গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল বাড়িতে শৌচাগার, ২. সকলের জন্য কাজ, ৩. সকলের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, ৪. গৃহে নয়, নবজাতকের জন্ম হোক সরকারি হাসপাতালে, ৫. গোপনীয়তা নয়—উন্মুক্তভাবে কাজ করা।

মিতালি মুখার্জী
উপপ্রধান

মালতি মাণ্ডি
প্রধান

Sl. No. 132

সাহিত্যিক সুশীল জানা : শতবর্ষের আলোকে

(১৯১৬-২০০৮)

রঙ্গনকান্তি জানা

কবে থেকে সময় মাপা শুরু হয়েছে সঠিক করে বলা কঠিন। তবে ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় মানুষ সময়কে মাপার ব্যবস্থা করেছিল। দিন ও রাত্রির আপেক্ষিক মাপ বা পল-অনুপল-প্রহর-ঘন্টা-দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর-দশক-অর্ধশতক-শতক এই সিঁড়িভাঙা হিসাবের মাপ প্রত্যেকটি পার্থিব ও অপার্থিব বস্তুর হয়, অন্তত আমরা নিজেদের মতো করে তাকে বানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু মনে কৌতূহল জাগে গাছ,পশু-পাখি সম্বলিত পৃথিবী সৃষ্টির পর অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চারের পর থেকে দিনরাত্রি মাপা শুরু হবার আগে পর্যন্ত কত সময় অনর্থক নষ্ট হয়েছে বা পচে গেছে হিসেব নেই। তার খোঁজ করাটাও বৃথা। আজ একবিংশ শতকে বসে ঘড়ির দিকে সচেতন বা অবচেতন ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটুকু বোঝা যায় সময়কে মানব সভ্যতা লাগাম পরাতে সক্ষম হয়েছে। এখন বলা সহজ সময় নষ্ট করা ভালো নয়। সময় এখন হাতের মুঠোয় ইত্যাদি। প্রত্যেকটা মানুষের জন্মের আগে মাতৃজঠরে ভ্রূণ সঞ্চারের দিন থেকে তার একটা বয়স সময়ের হাত ধরে গোনা শুরু হয়ে যায়। যদিও মাতৃ জঠর থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত বয়স গোনা শুরু হয় না। প্রত্যেকটি মানুষের এইভাবেই বয়সের গুনতি করা হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। জন্ম থেকে মৃত্যু সামাজিক প্রয়োজনে মানুষ সমাজে থাকাকালীন বহু কাজ করে। প্রত্যেকটি মানুষ কেউ শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কেউবা কৃষি-বিজ্ঞানের প্রযুক্তি-প্রকৌশলে, কেউবা ধর্মীয় আন্দোলনে কিছু না কিছু কাজ করে যায়, যা মানব-সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে। যাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃতবিদ্য হিসাবে স্মরণীয় হন, কেউবা কালের অন্তরালে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। যে মানুষটি এই নাতিদীর্ঘ উপস্থানের পর সরাসরি আলোচনায় জায়গা করে নেবেন তিনি আগামী ৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ শতবর্ষে পদার্পণ করছেন। অর্থাৎ মনুষ্য জন্মের পর থেকে একশটি বছর অর্থাৎ ছত্রিশ হাজার পাঁচশ দিন এই সামাজিকভাবে পরিচিত মানুষটি অতিক্রান্ত। খুব কম মানুষই একশ বছর জীবিত থাকেন এই ব্যক্তিমানুষটিও পারেন নি। আলোচ্য মানুষটি ধরাধামে বেঁচে ছিলেন বিরানব্বই বছর অর্থাৎ তেত্রিশ হাজার পাঁচশ দিনের কিছু বেশি। এই দীর্ঘ জীবন ব্যাপী সময়ে তিনি যে সব কাজ করে গিয়েছেন মানব সমাজের প্রয়োজনে তারই একটা আলোচনা এই প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য।

মানুষটি হলেন কথা সাহিত্যিক সুশীল জানা (সুশীল রঞ্জন জানা, বা সুজা বা তমোনাশ সামন্ত)। এই মানুষটির জন্ম ইংরাজি ৬ ডিসেম্বর, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর শহরে। মফস্বল শহর মেদিনীপুর-এ জন্মগ্রহণ করলেও এই পরিবারটি ঐ জেলায় (বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর) কাঁথি মহকুমার খেজুরি থানার লাক্ষী গ্রামের এক সভ্রান্ত শিক্ষিত কৃষক পরিবার। শিশু অবস্থায় মায়ের মৃত্যুর পর (বাসন্তী) শিশু-বাল্য ও কৈশোরের কিছুটা সময় বাড়িতে জেঠতুতো দাদা সুধীর রঞ্জন ও গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার প্রাথমিক পর্বের পর, বাবা ভোলানাথ জানার হাত ধরে চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন প্রথাগত স্কুল শিক্ষার জন্য ভবানীপুর পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনে (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ)। স্কুলের পর (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) কলেজ শিক্ষা হাজরা পার্ক সংলগ্ন আশুতোষ কলেজে। কলেজ পাশ করে (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ নেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের বঙ্গভাষা সাহিত্য শাখায় এবং সম্মানে উত্তীর্ণ হন, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ। সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ কৈশোরকাল থেকেই। স্কুল ছাত্রাবস্থায় বঙ্গভাষার শিক্ষক ঐ কালের প্রখ্যাত কবি হেম বাগচীর যিনি বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িক, স্নেহছায়ায় সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। স্কুল পাশ করার অব্যবহিত পরে সেই সময়কার দুটি নামী সাহিত্যপত্র 'উত্তরা' ও 'প্রবাসী'-তে দুটি ছোটোগল্পের প্রকাশ দিয়ে বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ। কলেজ ও স্নাতকোত্তর পাঠকালে যাঁদের সান্নিধ্যে তাঁর সাহিত্য মনের বিকাশ তাঁরা হলেন অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ), সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ), খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮০-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ), তমোনাশ দাশগুপ্ত প্রমুখ। সমসময়ে সাম্যবাদী ও মার্কসীয় দর্শনে পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ), নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬-১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ), হিরণ কুমার সান্যাল (১৮৯৯-১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ), সুশোভন সরকার (১৯০৬-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ), গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রমুখের সাহচর্যে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা শেষে সুশীল জানা ১৯৪৩-এ গ্রামে ফিরে যান। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রবলতর অবস্থায় ছিল। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান-জাপানি জোটের কাছে ব্রিটিশ ও অন্যান্য শক্তির জোট পর্যুদস্ত অবস্থায়। কলকাতায় জাপানি বোমা পড়েছে। কলকাতা থেকে গ্রাম মফস্বলের অগণিত মানুষ পুনরায় গ্রামমুখী; এই সময়ে আবার দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় সমগ্র মেদিনীপুর জেলা ও অবিভক্ত বাংলাদেশ বিধ্বস্ত প্রায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর মিছিলে হাঁটছে। সেই সময় তিনি সরকারি খাদ্যবন্টন বিভাগে একজন অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করতেন। পাশাপাশি চালাতেন একটি অনাথ শিশুদের ত্রাণ শিবির। সেই সময়কার মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। 'গণশক্তি' পত্রিকায় এক সাক্ষাতকারে কথাকার বলেছেন—''আমার সাহিত্যিক জীবনে গদ্য চর্চাটাই বেশি করেছি।... প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত পর্যন্ত তথাকথিত সাহিত্য স্রষ্টাদের যে নগরায়ণের প্রতি ঝোঁক, আমাকে খুব আকর্ষণ

করেনি। এর মধ্যেই এলেন বিভূতিভূষণ। তিনি মন অধিকার করে বসলেন। আগে থেকে দীপ্যমান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। আমার লেখক সত্তাকে গ্রামই টেনেছে। সেখানকার সরল দরিদ্র সাধারণ মানব-মানবীরাই তাদের জীবনের রসদ জুগিয়েছে আমার লেখায়। কিন্তু ১৯৪২-এর পরে আমার দেখা সেই গ্রামবাংলার মায়াময় স্নিগ্ধ পরিবেশ এবং জীবনগুলি বদলে গেল। ১৯৪২-এর জঙ্গি আন্দোলন, মেদিনীপুরে বহুৎসবের আকার নিয়েছিল। এর পরে-পরেই ঘটল সমুদ্রোচ্ছ্বাস। ধেনো দেশের একটা বৃহৎ অঞ্চল তার সম্পদ সম্পত্তি নিয়ে নিঃসম্বল হয়ে গেল। নারী-শিশুদের নিয়ে লোকশক্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন। প্রচণ্ড ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সমগ্র জেলাই। এ খবর সরকার থেকে প্রায় সাতদিন চেপে রেখেছিল। তারা তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রতিরোধ শিবির গড়ছে জেলার সমুদ্র অঞ্চল বরাবর। জাপানিদের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ ধুরন্ধররা পালিয়ে এল যুদ্ধশাস্ত্রের ভাষায় পশ্চাদপসারণ করলো। এই দুঃসময়ে মেদিনীপুরের ভাগে জুটলো ওদের কঠিন denial policy কোনো খয়রাৎ, কোনো সাহায্য নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর ধান, চাল যা গোলাজাত ছিল তা 'সিজ' করা হল। সব নৌকা ডুবিয়ে বা ভেঙে নষ্ট করে দেবার হুকুম জারি হলো। মেদিনীপুরের এই দম চাপ অবস্থার মধ্যে সেদিন যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সচেতন বিপ্লবী অংশের মানুষেরা যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।... এরপরেই ঘটলো আমার লেখার পরিবর্তন। একটি ১৯৪২-এর আগে অন্যটি ৪২-এর পরে তথা জলোচ্ছ্বাস, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ পরবর্তী অধ্যায়।... নতুন পটভূমি, অচেনা-অজানা আঞ্চলিক মানুষের জীবনসমস্যা রচনায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।" (গণশক্তি, রবিবার, ৬ জুন, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ)। এইসময় ছোটোগল্প লিখেছেন সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়—প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গশ্রী, ভারতবর্ষ, অলকা, প্রবর্ত্তক, প্রভাতী, চিত্রালী, পরিচয়, শারদীয়া যুগান্তর, আনন্দবাজার, অগ্রণী, নতুন সাহিত্য, দেশ ইত্যাদিতে।

গ্রামে থাকাকালীন সুশীল জানা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অজয় মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বাহিনীর সদস্য ছিলেন। যৌবনের প্রথম দিকে গান্ধীজির মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও, ধীরে ধীরে মানসিক পরিবর্তন আসতে থাকে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এসে 'অরণি' পত্রিকা পরে স্বাধীনতা পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কর্তব্যরত ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুজফ্ফর আহমদ্-এর আহ্বানে ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে যোগদান করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক সুনীতিকুমার ও অধ্যাপক সুকুমার সেন-এর সুযোগ্য ছাত্র সুশীল জানা, মুরলীধর গার্লস কলেজে প্রভাষক হিসাবে বাংলা ভাষা সাহিত্য বিভাগে যোগদান করেন। ওই কলেজে থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে অবসর নেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে, এই কলেজের উন্নয়নে সম্পূর্ণ কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে উপন্যাসের সংখ্যা সাতটি। তার মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছয়টি। মহানগরী (১৯৫১), সূর্যগ্রাস (১৯৫১, অনুপমা নামে চলচিত্রায়িত হয়), বেলাভূমির গান (১৯৬০), সাগর সঙ্গমে (১৯৭০), শতদ্রুর সন্ধ্যা (১৯৮১), প্রস্থানপর্ব (১৯৮৫, উপন্যাসসম বড় গল্প)। ছোটোগল্প সমগ্র—পদচিহ্ন (১৯৪৪), শেওলা (১৯৪৬), গ্রামনগর (১৯৪৯), ঘরের ঠিকানা (১৯৫৩), দ্বিতীয় জীবন (১৯৫৭), চিরদিনের কাহিনী (১৯৫৭) শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৭৭), নগরে প্রান্তরে (১৯৮৩)। বেশ কিছু ছোটোগল্প ভারতের অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় এবং বিদেশি ভাষায়—(রুশ, ইংরেজি, পোলিশ, স্লোভাক, চীনা) অনূদিত হয়। ওনার সাহিত্যচর্চায় কিশোরদের জন্য একটি উপন্যাস 'শৃঙ্খল ঝনকার' (১৯৮৯) ও বেশ কিছু ছোটোগল্প রচনা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য কিশোর মনের উপযোগী করে উপস্থাপন করেন দুই খণ্ডে—'গল্পময় ভারত'। কবিতা চর্চায় ছিল তাঁর সমান দখল। 'বঙ্গশ্রী', 'প্রবর্ত্তক', 'ভারতবর্ষ', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় বহু কবিতা ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লেখা সাহিত্যে 'নরনারী'-র প্রেমকে উপপাদ্য করে বাংলাভাষায় রচনা করেন 'সহস্রবর্ষের প্রেম'। অনুবাদকর্মে সমান দক্ষতা দেখান ম্যাক্সিম গোর্কি-র 'আমার ডায়েরী থেকে' বঙ্গভাষায় অনুবাদ করে (১৯৮০)। দীর্ঘ সাহিত্য চর্চায় প্রবন্ধ সাহিত্যেরও চর্চা করেন যার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে 'পরিচয়', 'সোভিয়েত দেশ', 'কালান্তর', 'স্বাধীনতা', 'একক', 'যুবমানস', 'চতুরঙ্গ', 'কিশোর ভারতী', 'মূল্যায়ন', 'দর্শক' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়।

তাঁর দীর্ঘ জীবনের (১৯১৬-২০০৮) সত্তরটি বছর সাহিত্যচর্চায় অতিবাহিত হয়েছিল। 'শতদ্রুর সন্ধ্যা' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার'-এ ভূষিত করে। তাঁর অনন্য সাহিত্যকৃতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি রৌপ্য পদক'-এ ভূষিত করে। তাঁর 'আম্মা' গল্পটির অবলম্বনে পরিচালক গৌতম ঘোষের পরিচালনায় 'দখল' চলচিত্রটি শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র হিসাবে 'স্বর্ণ-কমল' পুরস্কারে ভূষিত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ঐ একই বছর বাংলা চলচিত্র পুরস্কার সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন পৃথক পৃথকভাবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কাহিনিকারের পুরস্কারে ও 'দিশারী' পুরস্কারে ভূষিত করে।

প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন—'তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভূমিহারা কৃষক, নারী, খেতমজুর, নৌকার দাঁড়ি মাছি, গৃহহারা যাযাবর, কুলি ধাওড়া ও কসবী গাঙের নারীগুলিকে দেখেছেন, তাদের পার্শ্বচর হবার বিরল এক সুযোগ পেয়েছেন। দেখেছেন এরাই দুর্ভিক্ষে মরে প্রাণের চেয়ে বেশি যে মান তা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়, আর বলি হয় পুলিশি নৃশংসতার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন ও মন্বন্তরের মানবিক পটভূমির অধ্যয়ন তাঁর লেখনীতে সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে। অথচ এই প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে মিশেছে তাঁর অপার সহানুভূতি। যা কথাকারের দুর্লভ সম্পদ। দেশের অবস্থা যতদিন এরকম অমানবিক থাকবে, অন্তত ততদিন শিল্পী সুশীল জানা লাঞ্ছিত জীবনের অন্যতম দক্ষ রূপকার হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। (ভূমিকা, সুশীল জানা-র শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৯৭৭, কলকাতা)।

আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুশীল জানা-র নাম কতটা স্মরণীয় এটা একটা বড় প্রশ্ন। আদ্যন্ত প্রচার বিমুখ ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম নিঃসঙ্গ সৈনিক বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনে তাঁর সঠিক স্থান পাননি। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারায় যে কয়েকজন মানুষ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মান্য করে চলেছিলেন সুশীল জানা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

কারান্তরালে উৎপল দত্ত

সলিল ভট্টাচার্য

বিগত শতকের ষাটের দশক। এক জটিল কিন্তু উত্তাল পরিস্থিতি। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের কিছু আগে এবং পরে ভারতের শাসকশ্রেণি একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতি, সামন্তবাদের প্রভুদের এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে শোষিত জনগণের ওপর লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষত, শ্রমজীবী মানুষের নানা সংগঠন : কমিউনিস্ট পার্টি ও অপরাপর বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির প্রশাসনের সাহায্যে ধ্বংস করার, পঙ্গু করে দেওয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত। অন্যদিকে, গণআন্দোলনের দুর্বার গতিধারা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতেই পশ্চিমবাংলার বুকে হুগলি জেলার হিন্দমোটর কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেনে অগণিত সশস্ত্র গুণ্ডাদের আমদানি করা হল। এইসব গুণ্ডারা শাসকশ্রেণি, কারখানার মালিকগোষ্ঠী এবং পুলিশের মদতপুষ্ট হয়ে ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু রক্তাক্ত, লাঞ্ছিত মানুষগুলি আত্মসমর্পণ করেনি। ধর্মঘট চলতেই থাকে—অকুতোভয় শ্রমিকরা তাদের পাশে অনেক অনেক প্রতিবাদী মানুষের সমর্থনে প্রতিরোধের এক বীরত্বগাথা রচনা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নট-নাট্যকার উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' নামে একটি অসাধারণ পথনাটক রচনা ও প্রযোজনা করলেন।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে হুগলি মহসীন কলেজের একজন ছাত্র ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে চুঁচুড়া ময়দানে এই 'স্পেশাল ট্রেন' দেখে মনে হয়েছিল যে এই পথনাটকটি শ্রেণিসংগ্রামের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সময়ের দাবিকে পূরণ করেছে। সেই প্রথম উৎপল দত্তকে সামনা সামনি দেখা। তাছাড়া মিনার্ভার এল.টি.জি. (লিটল থিয়েটার গ্রুপ)-এর প্রধান ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের নাটক 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ' দেখার সুযোগও এই সময়কালেই ঘটেছিল। তাঁর অভিনীত নাটক, চমৎকার অভিনয় দেখে বারবার মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় বা সান্নিধ্যলাভের সুযোগ তখনও পাইনি। সেই সুযোগ এনেছিল ১৯৬৫ সালের কারাবাসের দিনগুলি।

ইংরেজি ১৯৬৫ সাল। বামপন্থী শক্তির অগ্রগতির দীপশিখা জ্বালানোর জন্য সলতে পাকানোর এ সময়। ১৯৬২ সালে উগ্র এবং জঙ্গি জাতীয়তাবাদের প্রকোপে কমিউনিস্ট পার্টি, তার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবাহিনীর ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে এসেছিল। এই সময়ে কেবল কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির প্রশাসনই নয়, আক্রমণের চরিত্র ছিল বহুমাত্রিক। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শগত বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে। এই পার্টি-নেতৃত্বের একাংশ চীনকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করে শাসকশ্রেণির কুৎসা ও অপপ্রচারে গা ভাসান। অসংখ্য নেতা ও কর্মী বিনা বিচারে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবাস ও অন্যান্য লাঞ্ছনা ভোগ করতে বাধ্য হন। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত বিতর্ক কেবল নয়, বিশ্ব-পরিস্থিতি এবং আমাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণ, বিপ্লবের স্তর, রণনীতি এবং রণকৌশল নিয়ে অনেকদিন ধরেই পার্টির অভ্যন্তরে বিতর্ক চলছিল। ১২ পার্টির দলিল, ৮১ পার্টির দলিল এবং অন্যান্য বিভিন্ন মতাদর্শগত দলিল থেকে অনেক ঝড়ঝাপটার পর অবশেষে তেনালী কনভেনশন থেকে নতুন পার্টি গঠনের জন্য সপ্তম কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়। যাঁরা সেদিন কংগ্রেস দলের ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিজেদের প্রকৃত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' নামে ঘোষণা করলেন, তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে ১৯৬৪ সালে সপ্তম কংগ্রেসে নেতৃত্ব নতুনভাবে পার্টি গঠন করলেন, তারও নাম হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। পরে এই পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এই নামে পরিচিত এবং স্বীকৃত হয়। সাধারণের কাছে পুরনো পার্টিকে

'রুশপন্থী' আর নতুন পার্টিকে 'চীনপন্থী' বলে প্রচার করা হয় বৃহৎ-পুঁজির প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে। আবার পুরোনো পার্টিকে 'সংশোধনবাদী', 'দক্ষিণপন্থী' এবং নতুন পার্টিকে সংকীর্ণতাবাদী এবং দলছুট বামপন্থী নামেও চিহ্নিত করা হয়েছিল। উৎপল দত্ত কোনো দিনই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না থাকলেও এই বিভাজনের পরে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং এই সময়ে তাঁর সৃষ্টিশীল নানা কাজে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। যদিও একথা বলা প্রয়োজন যে উৎপল দত্ত একটা সময়ে নকশালপন্থা ও চীন-প্রীতির পরিচয়ে তাঁর সৃষ্টির অবদানকে আর একটি পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেন। আবার পরবর্তীকালে কিছুটা মোহমুক্ত অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কাছাকাছি এসেছেন এবং আমৃত্যু তাঁর সৃষ্টিকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বামপন্থায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। এক আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক শিল্পী ও স্রষ্টা হিসেবে উৎপল দত্তের বহুমাত্রিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে সেই আলোচনা অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করি।

১৯৬৫ সালের অস্থির সময়ে এই প্রতিবেদক যখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের (বি.পি.এস.এফ.) সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, তখন মিনার্ভায় 'কল্লোল' চলছে। ১৯৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করে উৎপল দত্ত রচনা করেছেন এই ঐতিহাসিক অনবদ্য নাটক। শাসকের রক্তচক্ষু আর মহান জাতীয়তাবাদী দৈনিকগুলির বিজ্ঞাপন বন্ধ ও কুৎসাকে উপেক্ষা করেই তখন একটাই শ্লোগান—'কল্লোল চলছে—চলবে।' বর্ধমানের কমরেডরা বললেন, ''তুমি যখন কোলকাতায় যাচ্ছো, তখন বিডন স্ট্রিটের মিনার্ভা থিয়েটার থেকে কল্লোলের কয়েকটা টিকিট কিনে এনো।'' এই অনুরোধ উপেক্ষা করা গেল না। কিন্তু মিনার্ভায় পৌঁছে হতাশ হতে হল, সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টিকিট পাওয়ার এবং 'কল্লোল' দেখার কোনও সুযোগ নেই। হঠাৎ দেখা হল স্বয়ং উৎপল দত্তের সঙ্গে। অনেক আবদার করা হল। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন—''ঠিক আছে, সামনের সপ্তাহেই আমি বর্ধমানের কমরেডদের কল্লোল দেখার ব্যবস্থা করছি।'' বর্ধমানে যুব-উৎসবে একটি নাটক তিনি দেখেছিলেন। সে-কথা মনে রেখেছেন। বললেন—''তোমাকে তো চিনি।'' নামটাও বলে দিলেন। কিন্তু সেদিন আর বর্ধমানে ফেরা হয়নি। সিঁথি মোড় থেকে বিশ্বনাথ কলোনির একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গমনোদ্যত অবস্থায় কলকাতার গোয়েন্দা বাহিনী (এস.বি. পুলিশ) একটা বড় ডজ গাড়ি নিয়ে ঘিরে ফেলল। সেখান থেকে কাশীপুর থানা, তারপর লালবাজার লকআপে ছ-সাত দিন কাটাবার পর শিয়ালদহের কোর্টে চালান। বিচারক ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ভারত-রক্ষা আইন ছাড়ল না। মাননীয়া রাজ্যপাল (পদ্মজা নাইডু) হিসেবে এই প্রতিবেদক সহ অপরাপর ছাত্রনেতা-নেত্রীদের আইন-শৃঙ্খলা ও ভারতের প্রতিরক্ষার কারণে ভারতরক্ষা আইন-৩০ ধারায় কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মোতাবেক কিছুক্ষণের জন্য গোয়েন্দা হেড-কোয়ার্টার লর্ড সিনহা রোডে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ, শেষে প্রেসিডেন্সি জেলে বসবাসের ব্যবস্থা করা হল।

সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, সুবিনয় ঘোষ, বিমল করগুপ্ত, অশোক মাইতি, শিপ্রা ভৌমিক (পরবর্তীকালে শ্যামল চক্রবর্তীর স্ত্রী), এই প্রতিবেদক সহ আরও কিছু ছাত্র-নেতৃত্ব (বিভিন্ন বামপন্থী দলের) প্রেসিডেন্সির কারান্তরালে ওয়ার্ড নং ৭ (জেলের ভাষায় ৭ কিতা বা খাতা)-এর দোতলায় পাঠানো হল। শিপ্রা অবশ্য জেনানা ওয়ার্ডে রাজবন্দী হিসেবে থাকলেন।

এই সময় চারিদিকে ব্যাপক ধর-পাকড় চলছে। কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরাও নানা জেল থেকে গ্রেপ্তার হয়ে এখানে এসেছেন। আর পশ্চিবাংলার জননেতা জ্যোতি বসু, সমর মুখার্জি, আবদুল হালিম, সতীশ পাকড়াশি, প্রশান্ত শূর, শচীন সেন প্রমুখ সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ যেমন ছিলেন, তেমনি আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই, সিপিআই(এম), ওয়ার্কার্স পার্টি, বলশেভিক পার্টি, এসইউসি, সোস্যালিস্ট পার্টি ইত্যাদি বামদলগুলির সামনের সারির নেতা ও কর্মীরা এই জেলের বাসিন্দা হিসেবে অনেকদিন কাটিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, একসঙ্গে বামপন্থী অনেক নেতার সান্নিধ্যে কারাবাস বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে রইল।

রাজবন্দী হিসেবে জেল কোডের নিয়মমাফিক সুযোগ-সুবিধা থাকলেও তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকা ছাড়া কমিউনিস্ট এবং অপরাপর বামপন্থী দলগুলির পত্রপত্রিকা বা লিটারেচার ইত্যাদি পাওয়ার সুযোগ ছিল না। অবশ্য তথাকথিত নিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা, বইপত্র এমনকি পার্টি-সার্কুলার কোনো-না-কোনোভাবে জেলের ভেতর আসত। সন্ধের পর গিন্‌তি হবার পর, সেগুলির যৌথ-পাঠের ব্যবস্থা হয়েছিল। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ক্লাসেরও ব্যবস্থা ছিল। সমরদা (সমর মুখার্জি) পার্টি-কর্মসূচির ওপর দিনের পর দিন ক্লাস নিয়েছেন। আর নরেশদা (নরেশ দাশগুপ্ত) মার্কসীয় অর্থনীতির ওপর দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস নিয়েছেন। এছাড়া সংগঠন, গঠনতন্ত্র, ইতিহাস, দর্শনের ওপর ও রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হত। এ সবের মধ্য দিয়ে মনোযোগী শ্রোতা ও ছাত্র হিসেবে চিন্তাচেতনায় অনেক তত্ত্বগত ভাবনায় ঋদ্ধ হতে পেরে বেশ আনন্দেই সময় কেটে যেত।

এর পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা ছিল। কর্পোরেশনের নেতা সত্যানন্দ ভট্টাচার্য, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী অনেক ধরনের মজাদার গান ও কৌতুককর বক্তৃতা, গল্পসল্প করে আসর মাতাতেন। এই আসরে ছাত্রনেতা রাজবন্দীরাও নানা গণসঙ্গীত গেয়ে, নাটকের সংলাপ বলে একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তবে, কেবল বিনোদন নয়, সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও একটা পরম্পরার মধ্য দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, এমনকি ক্রান্ত শিল্পী সংঘ-র বেশ কিছু গান সংগৃহীত এবং চর্চিত হতে থাকে। তবে, এর যোলো কলা পূর্ণ হল উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদারকে কাছে পেয়ে। এর মধ্যে সাংবাদিক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রেসিডেন্সি জেলে এসে গিয়েছেন। ১৯৬৫ সালে কোলকাতায় ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য প্রফুল্ল সেন মহাশয় যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার ফলে অসংখ্য বামনেতা ও কর্মী যেমন গ্রেপ্তার হয়ে এসেছিলেন, তেমনি নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অনেকেই কারাবরণ করেছিলেন। এর পাশাপাশি পাক-ভারত যুদ্ধের সময় অনেক মুসলিম যুবা-বৃদ্ধকে ছত্রী সেনা বলে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় আনা হয়েছিল। সাধারণ কয়েদিদের মতো তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত হীন আচরণ করা হত।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যখন চলছে, তখন উৎপল দত্ত শারদীয় 'দেশহিতৈষী' পত্রিকার 'সংগ্রামের আরেক দিক' নামে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধটিতে তিনি নানা রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের বেইমানির বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত ভাষায় যেন চাবুক মেরেছিলেন। শাসকশ্রেণি তা সহ্য করতে পারেনি। প্রবন্ধটিকে দেশ ও রাষ্ট্রের বিরোধী এই বিবেচনায় নিষিদ্ধ করা হয়।

এমনকি শারদীয় দেশহিতৈষীর সমস্ত সংখ্যাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবু এই প্রবন্ধটি এবং দেশহিতৈশীর শারদ সংখ্যাটি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর লেখা 'সমাজতান্ত্রিক চাল'ও নিষিদ্ধ হয়। যুদ্ধ থেমে গেল। কিন্তু ২৩ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিনে উৎপল দত্তকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হল। তাঁর আগমনটাও বেশ চিত্তাকর্ষক। দুপুরবেলায় খাওয়াদাওয়ার পর আড্ডা চলছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকে তাকিয়ে আছে কেউ কেউ। এমন সময় কাঠের সিঁড়িতে ধপ্ ধপ্ আওয়াজ আর ভরাট গলায় ঘোষণা—''আমি এসে গেছি। এসে গেছি। ওরা থাকতে দিল না বাইরে। এবারে ভেতরেই দিব্যি কাটবে।" কথাটায় বেশ মজা আছে আবার চরম সত্যও রয়েছে। মনে পড়ল—'Man is born free, but everywhere he is in chains.' কিন্তু শেকল পরাবে কে? উৎপল দত্তের মতো সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে শেকল দিয়ে আটকানো যায় না। কারান্তরালে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সাত মাস কাটাবার সময়কালে এই সত্যকে বারবার উপলব্ধি করা গেছে।

প্রেসিডেন্সি জেলের ভেতরে রাজবন্দীদের ওয়ার্ড ৭ ও একটা সময়ে 'সিপাইজি বাতি বুতা দিজিয়ে' এই বলে জানানো হলে বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ হয়ে যেত। তখন কয়েকটি হ্যারিকেনই সম্বল। এগুলির দখল নিতে কাড়াকাড়ি হত। কেউ কেউ তাস খেলতে চাইতেন। আর ছাত্ররা পড়াশুনোর জন্য হ্যারিকেন ব্যবহার করত। উৎপল দত্ত তখন একটি হ্যারিকেন নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা, লেখালেখি করতেন—অনেক রাত অবধি তাঁকে জেগে থাকতে হয়েছে এই কাজে। সন্ধেবেলায় সাংস্কৃতিক আসরে তিনি স্মৃতি থেকেই অনর্গল আবৃত্তি করে শোনাতেন। হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিং লীয়র, রিচার্ড দ্য থার্ড—শেক্সপীয়রের এইসব কালজয়ী নাটক থেকে আবৃত্তি, অভিনয় করে মাতিয়ে দিতেন। শেক্সপীয়র চর্চার এমন জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া সকলকে কেবল অভিভূত নয়, কাউকে কাউকে এ বিষয়ে প্রেরণাও জোগাতেন। আবার দেশজ মজাদার নাট্যাভিনয়ের কারুকর্মও মাঝে মাঝে তুলে ধরতেন। এই বহুভাষাভাষী বিদগ্ধ প্রতিভাধর মানুষটি কারান্তরালে একটি উজ্জীবিত সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মননধর্মের একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ আবশ্যক। ভারতীয় সঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ওপর তাঁর যেন একটা অনায়াস সঞ্চরণ ছিল। তিনি এই প্রতিবেদক সহ বেশ কয়েকজন রাজবন্দীকে বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গীত (বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই) একজন কৃতবিদ্য শিক্ষকের মতোই শিখিয়েছিলেন। সেই সকল গানের কথা আজও স্মৃতির গভীরে জাগরুক রয়েছে। এইসব গানগুলির উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইভাবে রাখা যেতে পারে।

(১) 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'—উর্দু কবি ইকবাল রচিত এবং পণ্ডিত রবিশঙ্কর সুরারোপিত এই গানটির মধ্যে কাওয়ালি, গজল, মুশায়েরা জাতীয় পরিবেশনায় ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের রাগ ও রূপ যেমন করে মিশে আছে, উৎপল দত্ত গোটা কবিতাটি লিখে দিয়ে, গেয়ে শুনিয়ে শিখিয়েছিলেন। দুঃখের কথা, ইদানীংকালে সেইভাবে আর গাওয়া হয় না। এর মধ্য দিয়ে তখন যে প্রাপ্তি, তাকে বোধ করি এখন আর কেউ গুরুত্ব দেবেন না।

(২) 'কেয়া খাক্ হ্যায় তেরে জিন্দেগানি'—ইন্টারন্যাশনাল গানের অনুবাদ। এই গানটিও তিনি শিখিয়েছিলেন।

(৩) 'সোভিয়েত ল্যান্ড সো ডিয়ার টু এভরি টয়লার'—ইংরেজিতেই তিনি উচ্চারণ ও সুরধ্বনি অক্ষুণ্ণ রেখে শিখিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত একথা বলা দরকার যে সলিল চৌধুরী এই গানটির ভাবানুষঙ্গে 'শ্যামলবরণী ওগো কন্যা' গানটি লিখেছিলেন এবং দ্বিজেন মুখার্জির গলায় এই গানটি (মূল গানটির সুর অবিকৃত রেখে) জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

(৪) 'কমরেডস্, দ্য বিউগলস্ আর সাউন্ডিং'—এই গানটির ধ্বনিঝংকার ও ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রেখে 'কমরেড শোন্, বিউগল ঐ হাঁকছে রে' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

(৫) ফরাসি জাতীয় সঙ্গীত—'লা মার্সাই'। 'আঁলস আঁফা দে লা পাত্রিয়ে'—প্রতিটি ফরাসি শব্দের ইংরেজি বর্ণীকরণের সাহায্যে অর্থ-সহ বুঝিয়ে দেওয়া আর সুরের কারুকৃতিকে বার বার তুলে ধরেছিলেন। এই গানটির অনুসরণে 'অব কোমর বান্ধ তৈয়ার হো—লাখ কোটি ভাইয়ো' নামক জনপ্রিয় গণসঙ্গীতের জন্ম।

(৬) ইতালির পার্টিজান সঙ্—'আভান্তে পোপোলো-আলারিস্ কস্সা'—এই গানটির অংশ বিশেষ 'নওজোয়ান নওজোয়ান' বিশ্বে জেগেছে নওজোয়ান—গানটির অন্তরাতে প্রযুক্ত হয়েছিল।

(৭) পল রোবসনের একটি জনপ্রিয় গান—'ওয়ে ডাউন আপন দ্য সোয়ানি রিভার' এই গানটি শেখাতে গিয়ে উৎপল দত্ত বলেছিলেন যে প্রথম পর্যায়ে বিষাদ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বৈপ্লবিক বিদ্রোহাত্মক উত্তরণ যেভাবে ঘটেছে, তা যেন সুকান্তের 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি' এই গানটিতেও প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁর মতে, সঙ্গীতের কোনো ভাষাগত ব্যরিকেড থাকতে পারে না। সব দেশে সব কালেই এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় সঙ্গীতের সুরও মর্মবস্তুর আত্মীকরণ ঘটেছে।

(৮) 'থ্রু দা ওইন্টার্স কোল্ড অ্যান্ড ফেমিন'—লেনিনকে উৎসর্গ করা এই গানটির মধ্যে সম্পূর্ণ কবিতাটি শেখানো হয়েছিল। 'ভেদী অনশন মৃত্যু তুষার তুফান'—হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনুবাদে মুক্তিসেনাদের মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযানের বার্তা গানটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এই গানটির দ্বিভাষিক রূপটি বেশ আকর্ষণীয়।

(৯) ব্রিটিশ লেবার পার্টির সদস্যরা মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বস্ত না হলেও হাউস অব কমন্সের (পার্লামেন্ট) সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণকালে একটি অসাধারণ গানে লাল-পতাকাকে অভিনন্দন জানাতেন, এসব তথ্য সহকারে উৎপল দত্ত মূল গানটি তুলে দিয়েছিলেন মনোযোগী ছাত্রদের কাছে। গানটি হল—'দ্য ওয়ার্কার্স ফ্ল্যাগ ইজ ডিপেস্ট রেড'। এই গানটির মধ্যেই আছে—'দো কাওয়ার্ডস ফ্লি অ্যান্ড ট্রেটরস্ স্লিয়ার/কাপুরুষেরা পালিয়ে যেতে পারে, বেইমানেরা নাক উঁচু করে ব্যঙ্গ করতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে লাল পতাকা ওড়াবোই।

মনে হয়, এই সময়কালেই কথিত গানটির চমৎকার প্রাসঙ্গিকতা আছে। লাল পাতাকার মর্যাদা রক্ষার লড়াই এখনও চলছে।

উৎপল দত্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি প্রায়ই ফরমাস করে বলতেন—রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাও। বিশেষ করে—'ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও' গানটিকে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর জেলখানার ভেতরে প্রতিধ্বনিত তরঙ্গে অনুরণিত হয়ে উঠত।

কারান্তরালে উৎপল দত্তের দুটি মৌলিক নাটক রচনা তাঁর প্রতিভার হার-না-মানা দিকটি তুলে ধরেছিল। তিনি লিখেছিলেন দুটি নাটক। একটি—'কংগোর কারাগারে' ও অপরটি 'লৌহমানব'। নভেম্বর বিপ্লব উদ্‌যাপন এবং স্তালিন সম্পর্কে একটি সভায় নাটক দুটি তাঁর নির্দেশিত ধারায় চমৎকার সাফল্য লাভ করে। কংগোর বুকে লুমুম্বা হত্যা এবং ব্যাপক উৎপীড়ন, গণতন্ত্র ধ্বংসের পটভূমি নিয়ে 'কংগোর কারাগারে' রাজবন্দীদের অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। জোছন দস্তিদারের অনবদ্য অভিনয় শ্রোতা ও দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। এর পাশাপাশি অনেকগুলি বৈপ্লবিক গানও পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করে। পরবর্তীকালে এই নাটকটি 'প্রসেনিয়ম'

(উৎপল দত্ত সম্পাদক) পত্রিকায় প্রকাশিত হলে প্রশংসা ও নিন্দা একই সঙ্গে বর্ষিত হয়। কেউ কেউ একে 'কংগ্রেসি কারাগারে' আখ্যা দিয়ে উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও ছাড়েননি। 'লৌহমানব' নাটকটি লেখার সময় তাঁর সংগৃহীত (সেনসর্ড অ্যান্ড পাসড্ সিলমোহর লাগানো) বইপত্র পড়াশুনো ছাড়াও বার বার জ্যোতি বসু ও সমর মুখার্জির সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করতেন। উৎসুক শ্রোতা হিসেবে সেই সময় কাছাকাছি থেকে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করার সুযোগ ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের ঘটনা এবং পরবর্তীকালে বি-স্তালিনীকরণের একটি বিচারসভার মধ্যে কীভাবে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হল, তার অপূর্ব বিন্যাস নাটকটিকে জীবন্ত করে তুলেছিল। তিনি 'স্তালিন-১৯৩৪' শীর্ষক একটি নাটকও রচনা করেছিলেন এর পরে।

'দিন বদলের পালা'র প্রেক্ষিত এই সময়েই বুঝতে পারছিলেন কেউ কেউ। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। বাইরে বন্দি-মুক্তির আন্দোলনও তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৬৬-র প্রায় একশো শহিদের রক্তের তর্পণে পশ্চিমবাংলার আম-জনতা দিন-বদলের শপথ নেয়। উৎপল দত্ত পরবর্তীকালে যে 'দিন-বদলের পালা'র মতো নাটকের সাহায্যে গণআন্দোলনের পাশাপাশি থাকবেন, কারান্তরালেই সেই বার্তা তিনি জানিয়েছিলেন।

পরিস্থিতির চাপেই শেষ পর্যন্ত উৎপল দত্ত মুক্তি পেলেন। তার পরেও বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের আরও কিছুদিন বন্দিশালায় থাকতে হয়। তাঁর মুক্তিকে কেন্দ্র করে কিছু বিরূপ সমালোচনা হয়—যেন তিনি মুচলেকা দিয়ে নিজের বন্দিদশার অবসান ঘটিয়েছেন। কিন্তু এ ঘটনা বা রটনার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। মত-পথ যা-কিছু বদলেছেন, তা সম্পূর্ণ বামপন্থী ঘরানার মধ্যেই। বুর্জোয়া-স্বৈরাতান্ত্রিক শাসকদের সেবাদাসত্ব তিনি কোনো দিন করেননি।

তাই, উপসংহারে বলা যায় স্তুতি-নিন্দা যা কিছুই তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষিত হোক্ না কেন, ঝড়ের পাখি অ্যালবাট্রসের মতোই তিনি সেগুলিকে আমল দেন নি। তাঁর মতো মানুষের পক্ষে কখনও কারুর পোষা খাঁচায় বন্দি তোতাপাখি হওয়া সম্ভব ছিল না।

তাঁর জীবন ও সৃষ্টির গবেষক লেখক অরূপ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে মৃত্যুশয্যায় তিনি বেটোফেনের গান শুনতে শুনতে শেষ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যান আর তাঁর শয্যায় ছিল গণনাট্যের বইপত্র। কারান্তরালে যে উৎপল দত্তের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ এসেছিল, তা অবিস্মরণীয় হয়ে আজও সৃষ্টি ও সংগ্রামের প্রেরণা দিতে থাকবে। এই বহুমুখী প্রতিভার জ্যোতি এখনও অনির্বাণ ও ভাস্বর হয়ে আছে। কূটকচালি, কুযুক্তির ধূম্রজাল ছিন্ন করেই উৎপল দত্তের জীবন ও সৃষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন অব্যাহত রাখতে
সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

গোপগন্তার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ক্ষুদিরাম কোঁড়া
উপপ্রধান

শম্পা ক্ষেত্রপাল
প্রধান

Sl. No. 105

বিস্মৃতপ্রায় দুই বিপ্লবী
নিবারণচন্দ্র ঘটক ও দুকড়িবালা দেবী

অনুপ মিত্র

স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদী লড়াইয়ের এক অনন্য সেনানী রানিগঞ্জের সিয়ারশোলের নিবারণচন্দ্র ঘটক। অগ্নিযুগের এই বিপ্লবী বীরের মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাহসী লড়াই লড়েছিলেন। বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক রানিগঞ্জের সিয়ারশোল রাজ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে নিবারণচন্দ্র ঘটক সিয়ারশোল রাজ স্কুলে পঞ্চম শিক্ষক (Fifth Master) হিসেবে যোগ দেন। এই পদে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি তাদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে 'কনফার্মড' করে ১১ জুলাই তারিখে। তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল কুড়ি টাকা।

এই সিয়ারশোল রাজস্কুলেই পড়াশুনো করতে আসেন বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। বলা হয় নজরুল ইসলামের জীবনের বিপ্লববাদী চেতনার উন্মেষ ঘটানোর সলতেটুকু জ্বালানোর কাজ করেছিলেন নজরুলেরই অন্যতম শিক্ষাগুরু হিসেবে পাঠদানকারী বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক।

নিবারণচন্দ্র ঘটকের জন্মভূমি রানিগঞ্জের সিয়ারশোল গ্রাম। বাবা ইন্দ্রনারায়ণ ঘটক, মা মৃগনয়নীদেবী। ইন্দ্রনারায়ণ সিয়ারশোল রাজ স্টেটে কর্মরত ছিলেন। বাবা ছেলেকে হুগলি মহসীন কলেজে ভর্তি করান। কলেজে পাঠরত অবস্থায় নিবারণচন্দ্র তৎকালীন বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সাথে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তিনি তাদের 'আত্মোন্নতি সমিতি' তে যোগ দেন। এবং এক গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই আত্মোন্নতি সমিতি ছিল 'যুগান্তর' দলের গুপ্ত সমিতি। তাই নিবারণচন্দ্র ঘটক যুগান্তর দলের একজন কর্মী ছিলেন বলা যায়।

১৯১৪ সালের ২৩ অগস্ট রডা কোম্পানির পিস্তল লুঠ করার পর পুলিশের নজর এড়িয়ে চলার জন্য বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। তখন নিবারণচন্দ্র ঘটক তাঁকে অত্যন্ত গোপনে সিয়ারশোলে নিয়ে আসেন। বিপিনবাবুকে সিয়ারশোল রাজবাড়িতেই নিযুক্ত করে দেন। এখানে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী 'রনেন সেন' ছদ্মনাম নেন। প্রায় দু'বছর তিনি সিয়ারশোলে আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯১৫ সালে ১৫ অগস্ট পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯১৭ সালে বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক গ্রেপ্তার হন। তাঁর গ্রেপ্তারের আগে পর্যন্ত সিয়ারশোল এবং রানিগঞ্জ 'যুগান্তর' দলের অন্যতম গোপন ঘাঁটি ছিল এবং তা গড়ে তুলেছিলেন নিবারণচন্দ্র ঘটক।

জানা যায় নিবারণচন্দ্র ঘটক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ থেকে বিতারণের জন্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যান। আর এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষকতার আশ্রয় নেন। সিয়ারশোল রাজস্কুলে 'Fifth Master' হিসেবে নিয়োগের পর থেকে ছাত্রদের শিক্ষাদান করা ছাড়াও তাঁর নজর থাকত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ত ছেলেদের সংগ্রহ করা। এই সময়ে তাঁর নজর পড়ে তরুণ নজরুলের উপর। নজরুলকে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট করেন। নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাজকর্ম নজর এড়ায়না স্কুল কর্তৃপক্ষের। তারা নিবারণচন্দ্র ঘটককে সন্দেহ করতে থাকেন। স্কুল পরিচালন কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে গোপনে তদন্তও শুরু করেন। তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। স্কুল পরিচালন কমিটির ১৯১৭ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ''...that the fifth master babu Nibaranchandra Ghatak has been arrested on suspicion on some political crime. Resolved that he be summarily dismissed.....''

বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটকের গ্রেপ্তারির কারণ কী? এ প্রসঙ্গে জানা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালে আর. ডি. রজার কোম্পানি পঞ্চাশটি পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার কার্তুজের অর্ডার পায়। ঐ কার্তুজ এবং অস্ত্র বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে নিবারণচন্দ্র ঘটক জাহাজ থেকে লুঠ করে। এই লুঠ হওয়া অস্ত্র বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় নিবারণচন্দ্র ঘটকের উপর। কিন্তু অস্ত্র লুঠ হওয়ার পর ব্রিটিশ পুলিশ ব্যাপক তদন্ত শুরু করে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, নিবারণচন্দ্র ঘটক সহ বেশ কিছু বিপ্লবী আত্মগোপন করেন।

রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠের পর যখন পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজছে কারা এর সাথে যুক্ত তাদের চিহ্নিত করতে, তখন নিবারণচন্দ্র ঘটক তাঁর বীরভূম জেলার নলহাটির ঝাউপাড়ার মাসীর বাড়িকে আস্তানা করলেন। এখানে এসে পড়ে নিবারণচন্দ্র ঘটকের মাসীমা দুকড়িবালা দেবীর নাম। প্রায় অজানা এক নারী। ক'জনই বা আমরা তাঁর নাম জানি? কিন্তু বিপ্লববাদী আন্দোলনে দুকড়িবালা দেবীর নাম অম্লান হয়ে থাকবে। নিবারণচন্দ্র ঘটকের বিপ্লবী জীবন আলোচনাকালে তাঁর মাসীমা দুকড়িবালা দেবীর অসামান্য সাহসের বিবরণ উল্লেখ করতেই

হয়। এই লেখার শেষ অংশে দুকড়িবালা দেবী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

রডা কোম্পানির লুঠ করা পিস্তল ও কার্তুজগুলি নিবারণচন্দ্র ঘটক হাওড়ার বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে রেখে আসেন। এরপর তিনি অনুকূলবাবুকে পিস্তল ও কার্তুজসহ বীরভূমের ঝাউপাড়ায় মাসীমা দুকড়িবালাদেবীর কাছে রেখে আসেন। আর কিছু অস্ত্র নিয়ে সিয়ারশোলে চলে আসেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক, অধ্যাপক ড. আব্দুস সামাদ তার 'সিয়ারশোল রাজস্কুল : নজরুল ও তার মাস্টারমশাইরা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'অগ্নিযুগের রানিগঞ্জ' পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি করে লিখেছেন, ''...তদন্তে নেমে সি আই ডি খবর পায় চন্দননগরের বিপ্লবী ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্র লুঠের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ১৯১৬ সালের ১ ডিসেম্বর চন্দননগর থেকে ক্ষেত্রমোহনকে তোলা হয়। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় লুঠ করা একটি পিস্তল। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় দীর্ঘ ৩২ পৃষ্ঠার একটি চিঠি। এই চিঠিটিই বিপিনবিহারী, নিবারণবাবু, দুকড়িবালা দেবী সহ আরও অনেক বিপ্লবীর কাল হয়ে দাঁড়ায়। চিঠিতে নিবারণবাবু ও দুকড়িবালা দেবীর ভাসা-ভাসা উল্লেখ ছিল। তার ভিত্তিতে তদন্ত করে ১৯১৭ সালের ৮ জানুয়ারি তারিখে একযোগে দুকড়িবালার ঝাউপাড়ার বাড়ি, ঝাউপাড়ার সুরধুনী মোল্লানির বাড়ি ও সিয়ারশোলের নিবারণবাবুদের বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলে। ... নিবারণবাবুদের বাড়ি তল্লাসি করে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। ইন্সপেক্টর অক্ষয়কুমার গাঙ্গুলির নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ভোরের দিকে বাড়ি ঘিরে ফেলতেই অস্ত্রগুলি নিকটবর্তী কয়লাখাদে ও বাড়ির কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। সার্চ করে কিছু না পেলেও সন্দেহবশে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।" এরপর নিবারণচন্দ্র ঘটককে বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তোলা হয়। তল্লাসিতে কিছু না মেলায় তিনি ছাড়া পেয়ে যান। কিন্তু পুলিশ পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেয়। এরপর সিউড়ির স্পেশাল ট্রাইবুনালে নিবারণচন্দ্র ঘটক এবং তাঁর মাসীমা দুকড়িবালা দেবীর একসাথে বিচার চলে। বিচারে নিবারণচন্দ্র ঘটকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বাংলায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম সিয়ারশোল রাজস্কুলে পড়াশুনো করতে আসেন। তখন সেই স্কুলে ফিফ্‌থ টিচার হিসেবে শিক্ষকতা করছেন বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক। এইসময় কাজী নজরুল নিবারণচন্দ্র ঘটকের দ্বারা প্রভাবিত হন। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহম্মদের কাছে পরবর্তীকালে তা স্বীকার করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহম্মদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' তে (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) উল্লেখ করেছেন—''সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের আরও একটা কথা বলে রাখি। শ্রী নিবারণচন্দ্র ঘটক ওই স্কুলে নজরুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়িও ছিল সিয়ারশোলেই। তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পশ্চিমবঙ্গীয় দলের অর্থাৎ যুগান্তর দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পল্টন হতে ফেরার পরে নজরুল নিজেই আমার নিকটে স্বীকার করেছিল যে সে শ্রী ঘটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের যে আকর্ষণ ছিল তার পেছনে ছিল শ্রী ঘটকের প্রভাব। তাঁর মাসি এককড়িবালাদেবী (দুকড়ি) সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দলভুক্ত ছিলেন।" মুজফ্‌ফর আহম্মদ লিখেছেন, ''সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সে শ্রদ্ধা করত।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার কাজী নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকার কথা। এখানেও নজরুলের সন্ত্রাসবাদী আগুনকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টার কথা দেখা যায়। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী এবং তার শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের প্রভাব নজরুলের জীবনে যে পড়েছিল তাঁর লেখার মধ্যে বার বার তা দেখা গেছে। মুজফ্‌ফর আহম্মদ তার 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, '''ধূমকেতু' জনগণের নিকট পৌঁছাতে পারেনি। শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির ভিতরে তার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই 'ধূমকেতু' খুব বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও এই শ্রেণিরই লোক। কাজেই নজরুলের আবেদনে তারাই নতুন করে চেতনা লাভ করেছিলেন। ... সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দুটি বড় বিভাগের মধ্যে 'যুগান্তর' বিভাগের সভ্যরা তো বলেছিলেন 'ধুমকেতু' তাঁদেরই কাগজ।"

এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহম্মদ ঐ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছিলেন, ''নজরুল যে শ্রী নিবারণ ঘটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু সে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কোনো দলের সভ্য ছিল না। অতিমাত্রায় নিরুপদ্রবতা প্রচারের ফলে দেশ খানিকটা মিইয়ে গিয়েছিল। এই মিয়ানো হতে নজরুল তার লেখার ভিতর দিয়ে দেশকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছিল। এই করতে গিয়ে সে যে ঢেউ তুলেছিল তার দোলা লাগাল গিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাণে।"

আমরা বুঝতে পারি কাজী নজরুল বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটকের প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হন। এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহম্মদ স্পষ্টই তার মত ব্যক্ত করেছেন। ডক্টর সুশীল গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিত মানস' গ্রন্থে লিখেছেন, ''নজরুলের বরাবরই সন্ত্রাসবাদের প্রতি আন্তরিক টান ছিল। সিয়ারশোল রাজস্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের সংস্পর্শে তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদের প্রতি আসক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়।"

নজরুলের অত্যন্ত কাছের মানুষ ও তার অন্যতম জীবনীকার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নজরুলের সঙ্গে নিবারণচন্দ্র ঘটকের সম্পর্ক এবং বিপ্লবী আন্দোলনে তার অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করে তিনি তাঁর 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে লিখেছিলেন, ''.... নজরুল সহজাতভাবে বৈপ্লবিক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন এবং ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সাহচর্যে তৎকালীন যুগান্তর দলের এবং পরবর্তীকালে মুজফ্‌ফর আহম্মদ প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন।"

নজরুল এবং নিবারণচন্দ্র ঘটকের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নজরুলের জীবনে নিবারণচন্দ্র ঘটকের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে নজরুল জীবনীকার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের 'দ্বিতীয় পর্বে' (প্রকাশকাল—৫ অগস্ট, ১৯৮৩, প্রকাশক—হুগলি জেলা পরিষদ) উল্লেখ করে লিখেছেন, ''রানিগঞ্জ, সিয়ারশোল, আসানসোল কয়লাখনির জায়গা। নজরুল ঐ অঞ্চলের ছেলে, শৈশব থেকে দেখে আসছেন, আর তাদের সাথে মিশেছেন, ভাবপ্রবণ মন নিয়ে ভেবেছেন এদের জীবন পদ্ধতি কীভাবে বদলানো যায়। নজরুল সেই শৈশব জীবনকাল থেকেই কৃষক শ্রমিক দরদী হয়ে উঠেছিলেন। তখনই সশস্ত্র বিপ্লবী নেতা নিবারণ ঘটকের শিক্ষায় বৈপ্লবিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে স্বাধীন করে শোষিত মানুষের সুখী সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন।"

তিনি আরো লিখেছেন, ''১৯১৪ সালে সিয়ারশোল রাজস্কুলে অবৈতনিক ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। তাঁর শিক্ষার গোড়া পত্তন হয় বিপ্লবী নেতা নিবারণ ঘটকের হাতে, তিনি ছিলেন শিক্ষক। তিনি নজরুলকে যুগান্তর দলের গুপ্ত সমিতিতে কর্মী হিসেবে গ্রহণ করেন।"

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ড. রফিকুল ইসলাম 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'সিয়ারশোল রাজস্কুলে পড়ার সময় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক বিপ্লববাদে নজরুলকে প্রভাবিত করেন। পরবর্তী জীবনে বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের যে আকর্ষণ তার সূত্রপাত এখান থেকেই।"

''নজরুলও তাঁর প্রিয় শিক্ষক ও দীক্ষাগুরুকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রেখেছিলেন। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের (প্রথম প্রকাশ ২১ জুলাই, ১৯৩১) বিপ্লবী প্রমত্ত চরিত্রে নিবারণবাবুকে তিনি স্মরণীয় করে রেখে গেছেন। নজরুল 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি লেখেন ১৯২৮ সালে। (উপন্যাসটি 'নওরোজ' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের (১৯২৮ খ্রিঃ) আষাঢ় থেকে ভাদ্রে ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি কিস্তিতে বের হয়। অর্থাৎ রানিগঞ্জ ছাড়ার এক দশক পরেও পূজনীয় শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর স্মৃতি তাঁর চিত্তপটে অমলিন ছিল। নিবারণবাবুর মতো 'কুহেলিকা'-র বিপ্লবী নেতা প্রমত্তও স্কুল শিক্ষক। আর তাঁর মন্ত্রশিষ্য জাহাঙ্গীর আসলে নজরুলেরই আত্মপ্রতিকৃতি।'' (ড. আব্দুস সামাদ—'সিয়ারশোল রাজ স্কুল : নজরুল ও তার মাস্টারমশাইরা') নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছদটি পাঠ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

''জাহাঙ্গীর তখন বালক, স্কুলে পড়ে। এমনি দিনে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' মন্ত্রে এই কল্পনা প্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক তরুণ স্কুল-মাস্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লববাদী, এ ভীষণ সংবাদ স্কুলের কয়েকটি বিপ্লবপন্থী ছাত্র ব্যতীত হয়ত বিধাতা পুরুষও জানিতেন না। তবে সি.আই.ডি জানিতেন কিনা, বলা দুষ্কর।''

গবেষক, কবি ড. আব্দুস সামাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন, ''প্রমত্ত যে নিবারণ ঘটক এবং তাঁর ছাত্র জাহাঙ্গীর যে নজরুল, একথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। নিবারণবাবুর বিপ্লবী জীবন ও গোপন কর্মকাণ্ড যে কয়েকটি বিপ্লবী ছাত্র জানতেন, নজরুল যে সেই অল্প কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন, তাও এখানে বোঝা যাচ্ছে। আর ১৯১৫ সালে নজরুল যখন সিরারশোল রাজস্কুলে ভর্তি হলেন, নিবারণবাবু তখন ২৮ বছরের তরুণ। কাজেই প্রমত্তর 'তরুণ' বিশেষণটিও দুয়ে দুয়ে চারের মতো মিলে যাচ্ছে। তবে উপন্যাসে প্রমত্তের সাজা হয়েছে দ্বীপান্তর; নিবারণবাবুর পাঁচ বছরের জেল।'' ('সিয়ারশোল রাজস্কুল : নজরুল ও তার মাস্টার মশাইরা'—ড. আব্দুস সামাদ)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে রানিগঞ্জের সিয়ারশোল ছিল 'যুগান্তর' দলের বিপ্লবীদের অন্যতম গোপন ঘাঁটি। এই গোপন ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন সিয়ারশোল গ্রামেরই নিবারণচন্দ্র ঘটক। যিনি সিয়ারশোল রাজস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনে নিবারণচন্দ্র ঘটকের নাম উল্লেখ করার পাশাপাশি আর একজনের নাম উঠে আসে তিনি হলেন নিবারণচন্দ্র ঘটকের মাসীমা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মহিয়সী মহিলা দুকড়িবালা দেবী।

এক সাধারণ গ্রাম্য বধূ কীভাবে বিপ্লববাদী আন্দোলনে জড়িয়ে গেলেন তা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। দুকড়িবালা দেবীর বোনপো ছিলেন নিবারণচন্দ্র ঘটক। নিবারণবাবুই তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেন। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দুকড়িবালা দেবী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সৈনিক হয়ে ওঠেন। বীরভূম জেলার নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে দুকড়িবালা দেবীর জন্ম। বাবা নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, মা কমলকামিনী দেবী। গ্রামেরই ফনীভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর বোনপো নিবারণচন্দ্র ঘটক ছিলেন তাঁর খুবই স্নেহেরপাত্র। দুকড়িবালা দেবী প্রায়ই তাঁর দিদির বাড়ি রানিগঞ্জের সিয়ারশোলে আসতেন। সেখানেই তিনি নিবারণবাবুর বিপ্লবী আন্দোলনের যোগসূত্রের কথা জানতে পারেন। প্রথমদিকে কিছুটা আপত্তি করলেও পরে তিনি নিজেও এই বিপ্লববাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও লেখিকা কমলা দাশগুপ্ত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ—১৯৬৩, প্রথম র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন পরিবর্ধিত প্রকাশ : জানুয়ারি-২০১৫) উল্লেখ করেছেন, ''... তাঁর বোনপোর নাম নিবারণ ঘটক। তিনি ছিলেন মাইনিংক্লাসের ছাত্র। মাসীমা দুকড়িবালা নিবারণ ঘটককে খুব স্নেহ করতেন। বোনপো প্রায়ই তাঁর বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসতেন। স্বদেশি বই, বে-আইনি বই লুকিয়ে পড়বার আড্ডা ছিল মাসীমার বাড়ি। দুকড়িবালা দেবীর কেমন সন্দেহ হত। তিনি সকলের অলক্ষ্যে বইগুলি দেখে নিয়ে বোনপোকে ধমক দিলেন। বোনপো আমলেই আনেন না। ক্রমে তার বাড়িতে একদিন মাস্টারমশাই নাম নিয়ে এলেন অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। সিয়ারশোল রাজস্টেটে রনেনবাবু নাম নিয়ে এলেন ফেরারী বিপিন গাঙ্গুলী। ... এঁদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস দেখে দুকড়িবালা দেবী মুগ্ধ হয়ে যান, বিস্মিত হয়ে যান। তাঁর মনে এঁদের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন দেখা দিল তাঁর মনে।''

আমরা আগেই জেনেছি রডা কোম্পানির পিস্তল ও কার্তুজ লুঠ করা হয়। বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী এই কাজ করেন। নিবারণচন্দ্র ঘটক বীরভূমের ঝাউপাড়ায় তাঁর মাসীমা দুকড়িবালা দেবীর বাড়িতে কিছু পিস্তল ও কার্তুজ লুকিয়ে রাখেন।

তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরো লিখেছেন, ''১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে একদিন পুলিশ দুকড়িবালা দেবীর বাড়ি ঘিরে ফেলে। তল্লাশিতে পাওয়া যায় সাতটা মসার পিস্তল। শত জেরাতেও মাসীমার মুখ থেকে বের করতে পারলো না যে, কে দিয়েছে তাঁকে পিস্তলগুলি। গ্রামের মেয়ে, গ্রামের বৌ দুকড়িবালা দেবী কোলের শিশু বাড়িতে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের রায়ে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। নিবারণ ঘটকও রেহাই পাননি। তাঁর জন্য কারাবাসের আদেশ হয় পাঁচ বছরের।''

বিপ্লবী আন্দোলনের অপর এক বিপ্লবী ননীবালা দেবী যাকে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি করে রাখা হয় এবং চরম নির্যাতন চালানো হয়—কমলা দাশগুপ্ত তাঁর সম্পর্কে ঐ গ্রন্থে আলোচনা করতে গিয়ে দুকড়িবালা দেবীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন, ''রেখে দিল ননীবালা দেবীকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে স্টেট প্রিজনার করে প্রেসিডেন্সি জেলে। তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা স্টেট প্রিজনার।

জেলের মধ্যে একদিন সিউড়ির দুকড়িবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। জানতে পেলেন, সিউড়িতে তাঁদের বাড়িতে সাতটা মসার (Mauser) পিস্তল পাবার অপরাধে দুকড়িবালা দেবীর হয়েছে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড। রেখেছে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদী করে। ডাল ভাঙতে দিচ্ছে প্রতিদিন আধমণ।''

কিন্তু অদ্ভুদ মনের জোর ছিল দুকড়িবালা দেবীর। কমলা দাশগুপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন, ''... বন্দি জীবনের অসহ্য পরিবেশের মধ্যে থেকেও, প্রতিদিন আধমণ ডাল ভাঙতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাবাকে চিঠি লিখলেন, ''তিনি ভালোই আছেন। তার জন্য যেন তাঁরা চিন্তা না করেন, শুধু বাচ্চাদের যেন তারা দেখেন, শিশুরা যেন না কাঁদে।''

বাংলার প্রথম পর্যায়ের মহিলা বিপ্লবীদের অন্যতমা ছিলেন দুকড়িবালা দেবী। প্রথম সশ্রম সাজাপ্রাপ্ত মহিলাও তিনি। (সূত্র : কমলা দাশগুপ্ত, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী'—প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৩, প্রথম র‍্যাডিকেল পরিবর্ধিত প্রকাশ—জানুয়ারি, ২০১৫)

বিপ্লববাদী আন্দোলনের এই দুই মহান সৈনিক নিবারণচন্দ্র ঘটক এবং দুকড়িবালা দেবী সেই অখ্যাত বিস্মৃতপ্রায় দেশপ্রেমিকদের অন্যতম যাঁরা দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে হঠাবার সংগ্রামে নীরবে তাঁদের জীবনের সমস্ত সুখ, সংসারের মায়া ত্যাগ করে ঘর ছেড়েছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের কথা এই মানুষদের আমরা প্রায় ভুলেই গেছি।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সৌজন্যে

কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

কালনা-১ ব্লক

Sl. No. 140

নির্বাচিত শ্রীরামকৃষ্ণ : লোক-রস ও লোকসংস্কৃতি

ভব রায়

এই নিবন্ধ রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত কোনো আধ্যাত্মিক রচনা নয়। নয় কোনো ভক্তি-লালিত 'রামকৃষ্ণ বন্দনা' বা তার বিরুদ্ধে তথাকথিত যুক্তিবাদী সূক্ষ্ম কূট-কচালির বিতর্কিত গোলকধাঁধা। এ নিবন্ধ লোকসংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে রামকৃষ্ণের কথাবার্তা তথা 'লোকভাষ্য'র অতি সামান্য অংশের বিশ্লেষণ এবং সেই উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্তমূলকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে মূলত সেইসব সংলাপকেই, যেখানে লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে আলো ফেলা যেতে পারে। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণটি যে সাধারণভাবে 'লোক-ঐতিহ্য', সে কথাও সম্ভবত নতুন করে বলার নেই। আর, রামকৃষ্ণ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের সিংহভাগ নাগরিক পটভূমি ও পরিমণ্ডলে কাটালেও নিজে আজীবন ছিলেন নির্ভেজাল লোক-ঐতিহ্যের এক আ-কাঁড়া, অ-বিকল্প, অ-সাধারণ দৃষ্টান্ত, যাঁর উদ্দেশ্যে যেন আক্ষরিকভাবেই বলা যায়, 'তোমার তুলনা শুধু তুমি-ই!'

এখন প্রশ্ন হল—'লোক-ঐতিহ্য' তো এক বিশাল, ব্যাপ্ত, নানা সুষম-বিষম থাকবন্দি (Stratified) পরিসর, যা চিত্র-বিচিত্র নানা লোক-অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত। তাহলে, আমাদের 'আলোচ্য রামকৃষ্ণ' লোক-ঐতিহ্যের কোন অনুষঙ্গের শরিক? এর উত্তরে মোটামুটিভাবে বলা যায়, রামকৃষ্ণের সামগ্রিক লোকভাষ্যের একটি বড় অংশে মিশে রয়েছে লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিক অর্থে 'লোকভাষা', যা আসলে বিশেষ আঞ্চলিকতায় মূলত গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষা বা 'কথ্যভাষা'। আবার, 'ভাষা' তো শুধু ভাষাই নয়। তাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমাদের বাংলার নাগরিক কথ্যভাষা তথা সাহিত্য-সংস্কৃতির তথাকথিত মার্জিত বা 'স্ট্যান্ডার্ড' বাংলার রূপ-বৈশিষ্ট্য একরকম, অন্যদিকে লোকভাষা বা বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্যভাষার রূপবৈচিত্র্যেও অন্যরকম বা ভিন্নতর। আর, রামকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত এই লোকভাষার বর্ণবাহার এতটাই বহুধা-সজ্জিত যে তা আজও নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে এক তুলনাহীন 'লোকাভরণ'-এর দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

এই 'লোকাভরণ' বিষয়টি আবার লোকসংস্কৃতির একটি আধুনিকতর ধারণা, যার সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মহলে কিছু বিতর্ক থাকলেও সাধারণভাবে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, এই অনুষঙ্গকে লোকসংস্কৃতির 'নন্দনতত্ত্ব' (aesthetics)-এর মধ্যেই রাখা যায়। তাই, রামকৃষ্ণের ব্যবহৃত লোকভাষার মধ্যে দেখা যায় এই লোকাভরণের বিপুল-বৈচিত্র্যময় সমাবেশ, যেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'উপমা', লোককথা, লোকগান, অন্তর্লীন অর্থব্যঞ্জক রূপ-কল্প বা প্রতীকী প্রয়োগ এবং এসবই তাঁর সহজাত, অনায়াস, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছন্দ অথচ শ্রোতার অভিমুখে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী। পরবর্তীতে উদ্ধৃত তাঁর বিভিন্ন সংলাপে এর প্রমাণ মিলবে।

২৭ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ তারিখে তাঁর ভক্ত ঈশানের বাড়িতে আলিপুরের উকিল তাঁর নব্য অনুরাগী শ্রীশ (এম.এ, বি-এল; এনট্রান্স ও এফ-এ পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থানাধিকারী)-এর সঙ্গে সংলাপ ('অভ্যাসযোগ' প্রসঙ্গে) ছিল এইরকম—

শ্রীশ : সংসারে থাকতে তাঁর (ঈশ্বরের) দিকে যাওয়া বড় কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : কেন? অভ্যাসযোগ? ও দেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে বেচে। তারা কত দিক সামলে কাজ করে, শোন। ঢেঁকির পাট পড়ছে, হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে, আরেক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের এসেছে, ঢেঁকি এদিকে পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চলছে। খদ্দেরকে বলছে, 'তাহলে তুমি যে ক'পয়সা ধার আছে, সেই ক'পয়সা দিয়ে যেও, আর জিনিস নিয়ে যেও।'

দেখ,—ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, একসঙ্গে করছে। এরই নাম অভ্যাসযোগ। কিন্তু পনের আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে তাদের পনের আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্বনাশ—কালের হাতে পড়তে হবে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম কর।

ঈশ্বর-সাধনা-অভিমুখী অভ্যাসযোগের জন্য (আধ্যাত্মিক সারবস্তু এ নিবন্ধে বিচার্য নয়) সাধারণ মানুষের বহু-পল্লবিত বিক্ষিপ্ত মনকে কীভাবে তন্নিষ্ঠ একাগ্রতায় আনতে হবে, এক কালের গ্রামীণ গার্হস্থ্যজীবনের এক পরিচিত লৌকিক উপমা-সহযোগে জলবৎ-সহজভাবে তিনি উপস্থাপন করলেন। আর, এই সামগ্রিক উপমার সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গ তথা লোকাভরণগুলিও এতটাই নিখুঁত ও স্বাভাবিক যে বর্তমান নিবন্ধকারের চোখের সামনে যেন জ্বলজ্বল ভেসে উঠছে—৫০/৫২ বছর আগে তার গ্রামীণ শৈশব-কৈশোরে দেখা এই লৌকিক ছবির কোলাজ (কয়েক দশক আগেই ঢেঁকিতে চিঁড়ে বা ধান-ভানা প্রায় সমগ্র গ্রাম-বাংলাতেই বিলুপ্ত)। প্রসঙ্গত, এ-ও লক্ষ্যণীয় যে কীরকম নিক্তিমাপা পনের আনা-এক আনার আনুপাতিক গুরুত্বের বাঁটোয়ারা (যেহেতু এক আনায় চিহ্নিত কাজ দুটি ততটা আবশ্যিক নয়, তাই তুলনায় অনেকটাই গৌণ)।

এবার একটি বহুল-শ্রুত রামকৃষ্ণ-ভাষ্য প্রসঙ্গে আসা যাক। কথামৃতের দিনলিপি পটভূমি : ১৫ জুন, ১৮৮৩ : দশহরা দিবসে গৃহস্থাশ্রমকথা—

(রাখালের বাপের) শ্বশুর : মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান-লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মতো থাক। সে পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাঁক নেই। আর ঘুস্‌কির মতো থাক। সে ঘরকন্নার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারে সব কাজ কর।...

এখানে 'ঘুস্‌কি' (আভিধানিক বানান 'ঘুষ্কি')-র অর্থ হল 'অবৈধ প্রণয়িনী'-র প্রচলিত কথ্য বা অ-মার্জিত রূপ। এই সংলাপে আরও যেটা লক্ষ করার মতো—উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (ঈশ্বর সাধনা) মহৎ হলেও আপাত-অনৈতিক (অথচ অব্যর্থ) উপমা-প্রয়োগে রামকৃষ্ণ কখনোই শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না। এরই পরিপূরক একটি ভাষ্যে প্রায় অনুরূপ লব্‌জে তিনি 'ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া'র যে তিনটি সম্মিলিত শর্তের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল—বৈষয়িকতা বা সম্পদের উপর বিষয়ীর টান, সন্তানের প্রতি মায়ের টান এবং অসতী নারীর উপপতি বা অবৈধ প্রেমিকের (ভাষান্তরে বলেছেন—স্বামীর উপর সতী-স্ত্রীর টান) টান। এখানে মনে রাখতে হবে, শুধু রামকৃষ্ণের নয়, লোকঐতিহ্যের নিরিখে, যে-কোনো লোকভাষাতেই, মার্জিত বা মান্য ভাষার সাপেক্ষে, কোনো শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যই অ-মার্জিত বা 'নিষিদ্ধ' নয়—এমনকি, গালাগালির ভাষাও আঞ্চলিক কথ্যভাষা বা লোকভাষার চৌহদ্দিতে স্বচ্ছন্দে অনুর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

তাই, রামকৃষ্ণের হাজার কিসিমের লোকভাষ্যে প্রায় সর্বস্তরের বাঙালি-শ্রোতা-পাঠক মুগ্ধ, আবিষ্ট হয়ে রয়েছে একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে। এবং এই ভাষ্য-সম্মোহিত সু-পরিব্যাপ্ত লোকবৃত্তের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছেন প্রায় নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীণ ও শহুরে মানুষ, অন্যদিকে তেমনি রয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক-বিশেষজ্ঞ-বিদ্বজ্জন। এ-প্রসঙ্গে দু-একজন বিশিষ্ট মানুষের অভিমত ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ তুলে ধরা যেতে পারে। সৈয়দ মুজতবা আলি মন্তব্য করেছেন, ''...প্রাচীনকালে মহাকবি কালিদাসকে বলা হত 'উপমার সম্রাট', কিন্তু এ-যুগে উপমার সম্রাট হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।... এঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনও কথা বলেননি।... আর মনে হয়, উপমা-বৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন।... ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, 'তাঁর জাঁতায় যাই ফেল না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলায়ও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল। সময়মতো ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে।"

সাহিত্যিক তথা সাহিত্য-সমীক্ষক প্রমথনাথ বিশীর অভিমতও প্রায় অনুরূপ। ''কথামৃতের উপমা, সে এক আশ্চর্য জিনিস। আমি উপমার গদীর মালিকের (রবীন্দ্রনাথের) কাছে বছরের পর বছর কাটিয়েছি। উপমার ঐশ্বর্য কাকে বলে জানি। উপমা আমার কাছে সহজে আসে। কিন্তু কথামৃতের 'উপমা' আমাকে চমকে দেয়—কী কাণ্ড তিনি করে গেছেন! আগে জেনেছি, উপমা কালিদাসস্য, পরে বলেছি, উপমা রবীন্দ্রনাথস্য, এখন বলছি, উপমা রামকৃষ্ণস্য।"

রামকৃষ্ণের 'উপমা-সাম্রাজ্যে'র বাইরেও সাধারণভাবেও, কথামৃতের 'অসাধারণত্বের' একটি দিক খুব সুন্দরভাবে চিহ্নিত করেছেন পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদ ক্রিস্টোফার ঈশারউড। তাঁর অভিমতে, কথামৃত একদিকে যেমন লোকায়ত, অন্যদিকে তেমনি তা চিরায়ত অথচ চিরনবীন। তাঁর ভাষায়, কথামৃতের এই যে 'Nowness'-এর চির-প্রবহমানতা, তা এককথায় তুলনাহীন।

যাই হোক, আবার ফিরে আসা যাক কিছু প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তে। রামকৃষ্ণের লোকভাষ্যের ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার নির্বাচিত দৃষ্টান্ত এবার তুলে ধরা হচ্ছে, যেগুলিতে রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে লোককথার আঙ্গিকে রূপক, কিছুটা আদিরস ও অমার্জিত পরিবেশনে (যা লোকসংস্কৃতিতে অনেক সময়েই অপরিহার্য) অথচ অভ্রান্ত নিশানায়, আবার কোনোটিতে লোকায়ত দর্শন ও বিজ্ঞানচেতনার অতি-সহজিয়া প্রতিফলন। ভক্ত যদু মল্লিক ও রামকৃষ্ণের এক টুকরো কথোপকথন—

শ্রীরামকৃষ্ণ : সে কী! পুরুষ মানুষের এক কথা! 'পুরুষ কি বাত, হাতি কি দাঁত!' কেমন, পুরুষের এক কথা, কী বল?

যদু (সহাস্যে) : তা বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ : তুমি হিসাবী লোক। অনেক হিসাব করে কাজ কর, —বামুনের গড্ডী, খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড় হুড় করে দুধ দেবে। (সকলের হাসি) বুঝেছি তুমি রামজীবনপুরের শীলের মতো—আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। তোমার ঈশ্বরেতেও মন আছে আর সংসারেও মন আছে।

এই সংলাপে স্পষ্টতই লক্ষণীয়—শ্লেষাত্মক গ্রাম্য সরসতা—জুতসই লোকভাষার সহযোগে। 'গড্ডী' শব্দের অর্থ 'গরুটী' (গরু+টী)। 'নাদবে'র অর্থ 'মলত্যাগ করবে' (এখানে 'গোবর', যা গ্রামীণ চাষবাস ও অন্যান্য কাজে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান।

আরও সরস এবং আরও স্থূল-রস-সম্পৃক্ত একটি প্রাণীবৃত্তের (animal-lore) রূপকধর্মী লোককথা রামকৃষ্ণের মুখ থেকে আমরা শুনেছি, যেখানে মোসাহেবি, 'অতিচালাকি' এবং 'অতিলোভ'-এর পরিণতি কী হতে পারে, সেই গল্প-কথা রয়েছে। আজও এ গল্প হয়তো আমাদের ইয়ার-বন্ধুদের নিজেদের আড্ডায় শোনা যায় (সম্ভবত এর উৎসও শ্রীরামকৃষ্ণ তথা 'কথামৃত')। ১৮ডিসেম্বর, ১৮৮৩। এখানেও একই কুশীলব—শ্রীরামকৃষ্ণ ও যদু মল্লিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : তুমি অত ভাঁড় মোসাহেব রাখ কেন?

যদু (সহাস্যে) : তুমি উদ্ধার করবে বলে। (সকলের হাসি)।

শ্রীরামকৃষ্ণ : মোসাহেবরা মনে করে বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। এক শেয়াল এক একটা বলদকে দেখে তার সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চরে বেড়ায়, এটাও সঙ্গে সঙ্গে। শেয়ালটা মনে করছে ওর অণ্ডের কোষ ঝুলছে, সেইটে কখনো না কখনো পড়ে যাবে আর আমি খাব। বলদটা কখনও ঘুমোয়, সেও কাছে শুয়ে ঘুমোয়; আর যখন উঠে চরে বেড়ায়, সেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কতদিন এইভাবে যায়, কিন্তু কোষটা পড়ল না; তখন সে নিরাশ হয়ে চলে গেল। (সকলের হাসি)। মোসাহেবদের এই রকমই অবস্থা।

পরবর্তী রামকৃষ্ণ-ভাষ্যটি আপাত-অমার্জিত মনে হলেও এর আধ্যাত্মিক ভাব-গভীরতা (essence) যে-কোনও সংবেদনশীল মানুষকেই নাড়া দেবে। সেই যুগে নিরাকারবাদী ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে পৌত্তলিক বা সাকারবাদী সনাতন হিন্দুধর্মের তীব্র বিরোধকে বারে বারে রামকৃষ্ণ সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর অ-সাধারণ সমন্বয়ী সূত্রের মাধ্যমে। কেদারের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে রামকৃষ্ণ বলেছেন, ''সব মানতে হয় গো—নিরাকার সাকার—সব মানতে হয়। কালীঘরে ধ্যান করতে করতে দেখলুম রমণী খানকি। বললুম, মা তুই এই রূপেও আছিস। তাই বলছি সব মানতে হয়। তিনি কখন কী রূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 'সর্বজীবে ঈশ্বর'—ধর্মীয় মানবিক দর্শনের (Religion with a Human Face) আধুনিক আবিষ্কারক ও প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে তাই তাঁর পরমারাধ্যা 'মা কালী'র মধ্যেও 'খানকি' বা বারবণিতার রূপ-কল্পকে দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না—তথাকথিত সংকোচ বা সংস্কারগ্রস্ততার পিছুটানও তাঁকে নিরস্ত করতে পারে না। এখানে আরও যেটা বলার কথা—সেই আমলে 'মাগী', 'খানকি' ইত্যাকার শব্দগুলি ততটা অচ্ছুৎ ছিল না—সাধারণ মানুষের মুখের কথায় এগুলি আকছার শোনা যেত। আবার, লোকভাষার ঐতিহ্যগত উৎস-পটভূমিতে অনুসন্ধান কলে এ-ও

আবিষ্কার করা যাবে—বর্তমানে এই শব্দগুলিকে যতখানি 'অশ্লীল' ভাবা হয়, আদৌ তা নয়। 'মাগী' শব্দের আদি উৎসে রয়েছে 'মহিলা' সমার্থক পালি 'মাগ্গুতাম' শব্দ। আর, 'খানকি' শব্দ এসেছে ফার্সি 'খান্‌কা' থেকে, যার বঙ্গার্থ 'বৈঠকখানা'। আধুনিকতর বাংলা ও বাঙালির কাছে এ-জাতীয় শব্দগুলি ঠিক কোন সময় থেকে 'অশ্লীল' বা প্রায়-নিষিদ্ধ শব্দে রূপান্তরিত হল, তা-ও এক ভিন্নতর গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে!

এই পর্যায়ে, এবার এই প্রায়-নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষটি কীভাবে এক অভিনব ও অ-শ্রুতপূর্ব (কারণ এর আবিষ্কারক তথা প্রবর্তক রামকৃষ্ণ-ই) দার্শনিক তথা বিজ্ঞানচেতনার সূত্রায়ন করেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত তাঁর 'লোকভাষ্য' থেকেই দেওয়া হচ্ছে। 'অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান'—একই বিষয়ের (phenemenon) এই ত্রিবিধ অবস্থাকে নানা উপলক্ষে, কখনও উপমাসহযোগে, বিভিন্ন শ্রোতার কাছে বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু, ঘটনা হল—এ সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব মৌলিক উপলব্ধি বা দর্শনকে কেন্দ্রীয় 'সার-সত্য'কে অক্ষুণ্ণ রেখেই—সেখানে কোনোরকম স্ব-বিরোধিতা বা অসংগতি (inconsistency) নেই। প্রথমেই উল্লেখ্য, মাত্র দুটি ছোটো বাক্যে প্রকাশিত 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' সম্পর্কিত তাঁর স্ব-প্রণীত সংজ্ঞা—'নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান।... এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয়-বুদ্ধির নাম জ্ঞান।' অনেক আধুনিক বুদ্ধিজীবী হয়তো বলবেন, ''বড়ই উদ্ভট, অবিশ্বাস্য এই সংজ্ঞা!'' আবার, পাশাপাশি বিশ্বাসী মানুষ লঘুচিত্তে এরকম অতি-সরলীকৃত বিচার করতে চাইবেন, 'তাহলে কি তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন অতি-প্রচলিত সেই ইংরেজি প্রবচনে—Jack of all trades... ইত্যাদি, অথবা বিপরীতে, রূপকার্থে শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্যে—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

যাই হোক, এ-প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের মূল সংলাপে আসা যাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ : ...জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান! পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটি আহরণ করে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।

মণি : অজ্ঞান, জ্ঞান দুইই ফেলে দিতে হয়?

শ্রারামকৃষ্ণ : হ্যাঁ, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন। দেখ না, যার আলোজ্ঞান আছে, তার অন্ধকার-জ্ঞান আছে; যার সুখ-বোধ আছে, তার দুঃখ-বোধ আছে; যার পুণ্য-বোধ আছে, তার পাপ-বোধ আছে; যার ভালো-বোধ আছে, তার মন্দ-বোধ আছে, যার শুচি-বোধ আছে, তার অশুচিবোধ আছে; যার আমি-বোধ আছে, তার তুমি-বোধও আছে।

বিজ্ঞান কী—না তাঁকে বিশেষ রূপে জানা, কাঠে অগ্নি আছে—এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এই বোধে উপলব্ধি, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাস্যভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম—এরই নাম বিজ্ঞান।

জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। এক মতে দর্শন হয় না—কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে। কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না—আর ফিরে খবর দেয় না।

লোকায়ত-চিরায়ত রূপক উপমা সহযোগে 'অজ্ঞান-জ্ঞান-বিজ্ঞান' সম্পর্কিত আপাত অতি-প্রাঞ্জল এই জাতীয় বিশ্লেষণ রামকৃষ্ণের আগে বা পরে আর কারও মুখে আমরা শুনেছি কি? অথচ, এই ব্যাখ্যার প্রকৃত মর্মবাণী কত দূর-ব্যাপ্ত ও অতল-গভীর, বারবার শুনে বা পাঠ করেও তার কুল-কিনারা সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া নিশ্চিতভাবেই এক প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। হয়তো আমরা কিছুটা বুঝব... অনেকটাই বুঝব.. কিন্তু সবটা—! তাই, এ সম্পর্কে 'হাতে রইলো পেন্সিল'-এর মতো বলতেই হয়—বুঝহ রসিকজন, যে জান সন্ধান!' এই 'মর্মবাণী'-র আংশিক 'তুলনীয়' হিসাবে তাঁর পরবর্তী যুগের আর এক 'মহাজন'-এর বাণী স্বরূপ স্মরণ করতে পারি—'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি/অরূপরতন আশা করি...', 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না...' ইত্যাদি। পূর্বোক্ত রামকৃষ্ণ-ভাষ্য সম্পর্কে আরও একটি বলার কথা—'ঈশ্বর' এখানে উপলক্ষ বা রূপ-কল্প (অবশ্যই, তাঁর বিশ্বজগত দর্শন-অনুসারী)। এই বিষয়টিকে অন্যভাবেও তিনি উপস্থাপিত করেছেন কথামৃতে। যেমন তিনি বলেছেন : দুধ সে নিজের চোখে দেখেনি, এর নাম অজ্ঞান; দুধ সে স্বচক্ষে দেখল, লোকমুখ সে দুধের পুষ্টি গুণাগুণ শুনল, জানল—এর নাম জ্ঞান; আর দুধ পান করে তার প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল—এর নাম বিজ্ঞান। এ তো গেল 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' সম্পর্কে রামকৃষ্ণের 'আটপৌরে' ব্যাখ্যা। বিপুলতম বিস্ময়ের ঝট্‌কা লাগে তখন, যখন দেখি প্রায় একশো বছর আগে এই প্রায়-নিরক্ষর মানুষটি আধুনিকতম বিজ্ঞানের (Quantum Physics) মূল সূত্রটির প্রায় হুবহু উচ্চারণ করে ফেলেন—অবশ্যই তাঁর স্বভাবসুলভ লঘু ভঙ্গি এবং কিঞ্চিত উপমা-সহযোগে।

কী সেই অশ্রুতপূর্ব 'বৈজ্ঞানিক' তথা দার্শনিক ভাষ্য? তিনি বললেন, ''...জড় আবার কী? সবই চৈতন্য।... এক একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জলে থাকে—সেইরূপ এই চৈতন্যও জগৎ জুড়ে রয়েছে।'' বলা বাহুল্য, 'চৈতন্য', মানে 'চেতনা' বা consciousness, এবং যে 'চেতনা-বিজ্ঞান' নিয়ে সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে নোবেল-বিজ্ঞানী সহ বহু বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানী ও গবেষকরা কাজ করে চলেছেন। সে-সবের মধ্যে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে; ব্রিটিশ পদার্থবিদ রজার পেনরোজ প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করেছেন, ''...Consciousness is part of our universe, so any physical theory which makes no proper place for it falls fundamentally short of providing a genuine description of the world.'' অর্থাৎ, চেতনাবিহীন কোনো তাত্ত্বিকতা মহাবিশ্বের মূল বা সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কারণ চেতনা হল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরই অংশ; এই সূত্রে পেনরোজের আরও অভিমত—একমাত্র কোয়ান্টাম-বিজ্ঞানের মাধ্যমেই চেতনার 'প্রকৃত স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব। তাহলে, রামকৃষ্ণের ঢিলেঢালা গেঁয়ো ভাষায় 'চৈতন্যে'র ধারণার সঙ্গে যখন আধুনিকতম বিজ্ঞানীর 'consciousness' ধারণা মিলেমিশে প্রায় একাকার হয়ে যায়, তখন রামকৃষ্ণকে আর কোন্ অতিরিক্ত 'উপাধি'তে ভূষিত করব!

রামকৃষ্ণের অনন্ত অথচ স-চেতন 'বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড' ছেড়ে আবার ফিরে আসা যাক তাঁর 'গাঁয়ে-ঘরের চাতালে'। সেখানে তিনি যেন আমাদের অনেকদিনের চেনা, একেবারে আমাদের ঘরের মানুষ; আর আমরা যেন তার চেয়েও বেশি চেনা তাঁর কাছে। এর আগেই, তাঁর গ্রামীণ তথা লৌকিক জীবনচর্যা-অভিজ্ঞতা-জারিত কয়েকটি উপমা-অলঙ্কৃত 'ভাষ্যে'র দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এবার দেওয়া হচ্ছে আরও কয়েকটি খুঁটিনাটি লৌকিক উপমার সংক্ষিপ্ত সূত্র এবং এই সামগ্রিক দৃষ্টান্তের সাপেক্ষে আধুনিক 'লোকসংস্কৃতি-তত্ত্বায়নের' কাঠামোয় বিষয়টিকে চুম্বকে পর্যালোচনার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু, এ-ও তো সকলের জানা—সে বড় দুরূহ কর্ম! কারণ, কেন্দ্রীয় মানুষটি যেখানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ওরফে কোনো এক গণ্ডগ্রামের 'গদাধর চাটুজ্যে', কোনও 'আধুনিক তত্ত্বায়ন'-এর (theorisation) ঘেরাটোপে তাঁকে আটকানো বড় কঠিন কাজ। মূলত, পাশ্চাত্য-প্রণীত এইসব তত্ত্বায়নের অনেক আগেই সেই মানুষটা তাঁর যা বলার কথা, সব বলে ফেলেছেন! তিনি তো হলেন সেই

ব্যতিক্রমী, বিশেষ ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আক্ষরিকভাবেই বলা যায়, '...শেষ নাহি যার...!' তবুও, আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ তথা সমাজতাত্ত্বিকদের একটা চেষ্টা তো করতেই হবে—যুক্তি-তর্ক-কাঠামো-তত্ত্বের (structurilism) মাপকাঠিতে।

দৈনন্দিন গ্রামীণ জীবনের কতখানি নিখুঁত 'পর্যবেক্ষক' (observer) হলে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন, ধান থেকে খই ভাজার প্রক্রিয়ায় গরম কড়াই থেকে বাইরে ছিটকে পড়া দু-চারটে খই হয়ে থাকে নিষ্কলঙ্ক, দাগহীন। আর, কড়াইয়ে ভাজার পরে অবশিষ্ট খইয়ের সিংহভাগে কোনো-না-কোনো দাগ থাকবেই। সম্ভবত সকলেরই জানা—সাধনাসিদ্ধ সংসারত্যাগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও গৃহী-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে এই উপমা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। আরও কিছু অনুপুঙ্খ, গ্রামীণ উপমার সূত্র-বাক্য বা বাক্যাংশ এবার উল্লেখ করা হচ্ছে, অনুসন্ধানী পাঠকের সম্ভবত সংশ্লিষ্ট মূল গল্পাংশ বা 'ভাষ্য'টুকু বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না—

(১) 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছল।... খপর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?'

(২) ও দেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে, তাতে বঁড়শি লাগানো দড়ি বাঁধা থাকে। বঁড়শিতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ সেই টোপ খায় অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উঁচু দিকে বাঁশের মুখে ছিল সেই রূপই হয়ে যায়।'

(৩) 'মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধরে থাকে সে পড়লেও পড়তে পারে—যদি অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে সে পড়ে না।'

(৪) 'একটা মেয়ের ভারী শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে,—তারপর, ''ওগো! আমার কি হল গো' বলে আছড়ে পড়ল কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙে যায়।" (তুলনীয় : প্রচলিত প্রবাদ—'শাশুড়ি মলো সকালে/খেয়ে-দেয়ে, বাসন মেজে কাঁদবো আমি বিকেলে।')

(৫) 'ছেলে বলেছিল, মা, এখন আমি ঘুমুই; আমার বাহ্য পেলে তখন তুমি তুল। মা বললে, বাহ্যেতেই তোমায় তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।'

(৬) 'ফুলবাগানের মালিনী, জেলেনীর ঘুম ও আঁশচুপড়ি'র গন্ধের উপসংহারে রামকৃষ্ণ-ভাষ্য, '...তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহলে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই আনন্দ। ...যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, মরে যাবে।'

(৭) 'ঘুনির মধ্যে মাছ, যে-পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দে আর অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে না।'

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ গ্রামীণ লোকবৃত্তের নানা স্তরের দৈনন্দিনতার এরকম কত যে বিশদ ও নিখুঁত ঘটনা উচ্চারিত হয়েছে রামকৃষ্ণের মুখে, তার কোনো সমীক্ষা বা সঠিক হিসাব-নিকাশ সম্ভবত আজও হয়নি। এইসব অভিজ্ঞতার বেশিরভাগই এতটাই মৌলিকতা-সমৃদ্ধ যে তা সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতি গবেষণার 'বিরলের মধ্য বিরলতম' উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই যে মৌলিকতা, সেই প্রসঙ্গে পূর্ব-বর্ণিত দৃষ্টান্ত থেকে মাত্র দুটিকে আপাতত বেছে নেওয়া হচ্ছে—পূর্ব-ঘোষিত তত্ত্বায়নের তাগিদে। লোকসংস্কৃতির বহুমাত্রিক তত্ত্বের কাঠামোতেই বলা হয়েছে—গ্রামীণ পেশাগত জীবনের বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পেশা বা 'কৌম'র মধ্যে প্রচলিত রয়েছে তাদের নিজস্ব ভাষা; যেমন—মুচি বা চর্মকারদের ভাষা, চাষ ও চাষির ভাষা, গরু-মহিষের পাইকারের ভাষা ইত্যাদি। এই পর্যায়েই পড়ে—মাছধরা পেশাজীবী সম্প্রদায় তথা 'জেলে' বা 'ধীবরদের' ভাষা। বলাবাহুল্য, বিভিন্ন আঞ্চলিকতায় এইসব 'কৌম' লোকভাষাতেও দেখা যায় কম-বেশি পার্থক্য। যাই হোক, পূর্বোক্ত ২ নম্বর দৃষ্টান্তে পুকুরে নোয়ানো বাঁশ-টোপ-বঁড়শি' দিয়ে মাছ ধরার পুরো প্রক্রিয়াটিকে রাঢ় অঞ্চলে বলা হয়ে থাকে 'সট্‌কা'।

আর, রামকৃষ্ণ-প্রদত্ত 'ঘুনি'তে মাছ ধরার যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে (''৭' নম্বর), সেটি এতটাই জটিল অথচ কৌতূহলোদ্দীপক মৎস্য-শিকার-প্রকরণ (গ্রামীণ রাঢ়েও বর্তমানে কয়েক দশক মাছ ধরার এই পদ্ধতি পুরোপুরি বিলুপ্ত—শহরের মানুষরা তো বটেই, বর্তমান রাঢ়ের সিংহভাগ-গ্রামীণ মানুষও সম্ভবত 'ঘুনি'র নামই শোনেনি!) যে, প্রত্যক্ষ বা 'চাক্ষুষ' না দেখলে এই 'মাছ-জলের' আশ্চর্য প্রক্রিয়াটি (এই নিবন্ধকার তাঁর কৌশোরে বহুবার ঘুনিতে মাঝ ধরার পদ্ধতি দেখেছে) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা কার্যত অসম্ভব। সরু সরু বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি লম্বাটে 'বাক্স'-আকারের একটি কাঠামোকে 'ঘুনি' বলা হয়ে থাকে। বর্ষার প্রবহমান নতুন জলের উজানে পুকুর থেকে উঠে আসা চ্যাং-ল্যাঠা-কই-মাগুর ইত্যাদি মাছের দল সাঁতার কাটতে কাটতে আগে থেকে তৈরি করে রাখা 'দাঁড়া'র পার্শ্ববর্তী জলভর্তি গভীরতর ডোবার (আঞ্চলিক নাম 'আপা') মধ্যে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারে না। ঘুনি-আপা-দাঁড়া (জলের নালি) সহ মাছ ধরার এই গোটা প্রক্রিয়াটিকে বলা হয়ে থাকে 'আড়া' দেওয়া।

এইভাবে, আধুনিক লোকসংস্কৃতি-তত্ত্বের বহু অনুষঙ্গ, লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য, কম-বেশি মিশে রয়েছে তাঁর ভাষ্য ও কথনের এক বড় অংশ জুড়ে। এমনকি সেখানে রয়েছে কথকতার ভঙ্গিমা, কীর্তন-অধ্যাত্মসঙ্গীত-বাউল ইত্যাদি performing লোকশিল্পেরও কিছু কিছু নমুনা, তাঁর নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গিমায়—'আখর', 'ধুয়ো' ধরনের লোকগান-নৃত্য-শৈলীর প্রত্যক্ষ স্রষ্টা তথা প্রদর্শক রামকৃষ্ণদেবকেও মাঝে মাঝে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। একথা ঠিক, গ্রামীণ গার্হস্থ্য তথা সামাজিক জীবনের অনেক ঘটনা ও উপমার, বিভিন্ন উপলক্ষে, পুনর্কথন রয়েছে (এটাও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যগত লক্ষণ বিশেষ), কখনও বা ভিন্নতর আনুষঙ্গিকতায়, তবে আবারও যেটা বলার কথা—তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস, উপলব্ধি ও যুক্তিবোধের (তাঁর সঙ্গে কেউ একমত বা ভিন্নমত হলেও) নিরিখে কোথাও তিনি স্ব-বিরোধী বা inconsistent হন নি। অন্তত 'তর্কশাস্ত্র'র প্রেক্ষিতে এ এক দুর্লভ বৌদ্ধিক পূর্ণাঙ্গতা (intellectual perfection), যা বিখ্যাত, অতি-বিখ্যাত অনেক লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও দেখা যায় না। রামকৃষ্ণের মুখে বারে বারে উচ্চারিত এইসব লোকায়ত প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা কীভাবে লোকবৃত্তের শোতৃমণ্ডলীর অনুভবের জগৎকে অতি সহজে উদ্দীপিত করে, সেই সঞ্চরণ-প্রক্রিয়ার প্রতিধ্বনি শোনা যায় সমাজতাত্ত্বিক William Jones-এর এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়, ''A tune, an odor, a flavour sometimes carry this inarticulate feeling of their familiarity so deep in our consciousness that we are fairly shaken by its mysterious emotional power."

রামকৃষ্ণের লোকভাষ্য আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও লোকসংস্কৃতি-গবেষণার ক্ষেত্রে যে এক অতি-গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, ইতিহাসবিদ রমাকান্ত চক্রবর্তী সেই দিকটি তুলে ধরেছেন এই ভাষায়, ''মধ্য রাঢ়ের গ্রামীণ সংস্কৃতি, ভাষা, লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস তাঁর নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত। গ্রামকে, সম্ভবত বিদ্যাসাগর ছাড়া, আর কোনও তৎকালীন খ্যাতনামা মানুষ এমন নিবিড়ভাবে আত্মস্থ করেননি। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' তৎকালীন মধ্য রাঢ়ের সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণায় অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসূত্র।" আমরা হয়তো নিজেরাই নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি,

অধ্যাপক চক্রবর্তী-চিহ্নিত এই নির্ভুল ও সুস্পষ্ট প্রস্তাবনাকে মধ্য-রাঢ় তথা রাঢ়-সংক্রান্ত সিরিয়াস গবেষণায় এতাবৎ আদৌ কি কাজে লাগানো হয়েছে? তাঁর এই অতি-গুরুত্বপূর্ণ অভিমতের পরিপূরক হিসেবে সংযোজিত করা যায়—'লোকায়ত রামকৃষ্ণ'কে মুখ্য বিষয় হিসেবে রেখে খণ্ড-রাঢ়-সংক্রান্ত এক অন্য ধরনের বিশেষ গবেষণার পরিকল্পনাও তো ভাবা যেতে পারে। অনায়াসেই তিনি থাকতে পারেন মধ্য-রাঢ়-সংস্কৃতির বৃত্ত-বলয়ে বা পরিধিতে, আবার কখনও তিনি থাকতে পারেন সংশ্লিষ্ট গবেষণার কেন্দ্রভূমিতেও।

নিজের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে 'ঈশ্বর' সম্পর্কে তিনি প্রায়শই বলতেন, 'তাঁর ইতি করা যায় না।' ঠিক সেইভাবে আমরা লোকপ্রিয় রামকৃষ্ণের অনুরাগীরা সচ্ছন্দে বলতে পারি, তাঁর লোকরসেরও 'ইতি করা যায় না...'! সে যে এক অসীম, অনন্ত 'রস-সমুদ্র'! খোদ শ্রীমই তো তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি আস্ত 'কথামৃত'কেই বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক 'ভাবসমুদ্র' থেকে তুলে আনা মাত্র এক ঘটি জল।' যাই হোক, আমাদের শেষের কথায় দুটি উদ্ধৃতিমূলক অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হচ্ছে। একটি একেবারেই হাল আমলের, অন্যটি রামকৃষ্ণের সম-সময়ের। সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র (তিনি নিজেকে পরোক্ষভাবে 'নাস্তিক' ঘোষণাও করেছেন এই নিবন্ধে) 'রসের ঠাকুর রামকৃষ্ণ' শীর্ষক নিবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন, ''...এমন অনেক রসিকতা কিংবা অঙ্গভঙ্গি রয়েছে যা এককথায় বেশ লঘুরস। তিনি যখন বিয়ের আসরে পাছা চাপড়াতে চাপড়াতে নাচেন, কিংবা শাশুড়ির পিছে পিছে গান ধরেন, ... তখন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে তা বেশ অশ্লীলতার পর্যায়েই পড়ে।

কথাটা শুনেই আমার এক রামকৃষ্ণ-ভক্ত বন্ধু বললেন, যাঁর সম্পর্কে তুমি কথাগুলো বললে, তাঁর মানসিক চরিত্রটিকে সম্যকভাবে বুঝতে পারলে, এমনটা বলতে না। আসলে, শিশুর মতো সরল এই মানুষটি লজ্জা, ঘৃণা, ভয় জাতীয় জাগতিক ব্যাপার-স্যাপারগুলোকে তুড়ি মেরে এমন এক জগতে বিচরণ করতেন, যেখানে শ্লীল-অশ্লীল বিচার করবার মাপকাঠিটাই অবান্তর।...

বলি, হবেও বা। কিন্তু আমি তো ওই জাগতিক মাপকাঠগুলিকে পরিত্যাগ করে কিছু ভাবতে পারিনে।

বন্ধুটি গম্ভীর মুখে বলেন, সেটা তোমার সমস্যা, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নয়।

তবে ঠাকুরের কিছু কিছু উক্তি রঙ্গরসের সীমানা অতিক্রম করে যে আরও ব্যাপক অর্থ পেয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাত-সাধারণ এই উক্তিগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও বেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে টিকে গিয়েছে।"

দ্বিতীয়, উদ্ধৃতিটির লেখক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। তিনি লিখছেন, ''...প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করছি। খুব বিখ্যাত ব্যক্তি প্রতাপ মজুমদার, নিজেও একজন বড় বক্তা। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসে থাকতেন। তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছেন : What is there common between him and me?...মিল তো নেই কোনো জায়গায়। আমি একজন 'Enropeanised, civilised, self-centred, semi-sceptical so-called educated reasoner' ...আর শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনি তো একেবারে এর বিপরীত। 'a poor, illiterate' —লেখাপড়া কিছু শেখেন নি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ। 'unpolished'—অন্তত, তথাকথিত সভ্যতার মাপকাঠিতে তাঁকে খুব সভ্যভব্য বলা চলে না।... তাই বলছেন : 'unpolished', 'half-idolatrous'—অর্ধ-পৌত্তলিক। মূর্তিপূজা করেন। ...আবার 'নিরাকার উপাসনা, তাও মানেন।...'(A) friend-less Hindi divotee— ...আমার সঙ্গে তাঁর কোন মিলই নেই। তাহলে কেন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাঁর কথা শুনি? Why should I sit long hours to attend to him. I who have listened to Disraeli, Fawcet, Stanley. ...তবে আমি কেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ব্যক্তির কথা মুগ্ধ হয়ে শুনি?... শুধু আমিই নই, আমার মতো আরও অনেকে গিয়ে তাঁর কথা শোনে। এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন প্রতাপ মজুমদার।"

হ্যাঁ, তিনি মানে শ্রীরামকৃষ্ণই পারেন বৈপরীত্যের এরকম 'মিলন' ঘটাতে—মার্জিত-অমার্জিত, আস্তিক-নাস্তিক, গ্রাম্য-নাগরিক, সবকিছু একাকার করে দিয়ে একাধারে হয়ে ওঠেন 'লোকায়ত' এবং 'চিরায়ত', কারণ তিনিই তো ছিলেন আধ্যাত্মিক তথা মানবিক সমন্বয়ের এক অ-বিকল্প শ্রেষ্ঠ কারিগর। তাই, লোক-রসের 'রাজাধিরাজ'-এর হাতের মশালে মানবতার অনির্বাণ শিখাটি লীন হয়ে থাকবে—এটাই তো সহজ-বোধ্য, সুন্দর, স্বাভাবিক।

তথ্যসূত্র

১. চট্টোপাধ্যায়, পীযূষকান্তি (স.), *শ্রীমত কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত* (অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ), দেব সাহিত্য কুটির প্রা. লি. কলকাতা
২. স্বামী সুপর্ণানন্দ (স.), *জগবন্ধন* (১ম খণ্ড), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা
৩. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *তব কথামৃতম্*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৪. *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা, শ্রীরামকৃষ্ণ সংখ্যা, শারদ ১৪১৮
৫. *কবিতীর্থ*, গ্রীষ্ম-বর্ষা, ১৪১৯
৬. মুখোপাধ্যায়, ধনগোপাল, *শ্রীরামকৃষ্ণ : নৈঃশব্দের রূপ*, (ভাষান্তর : সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়), সুবর্ণরেখা, কলকাতা
৭. রায়, ভব, *রাঢ়ের লোকভাষা ও শব্দকোষ*, দীপায়ন, কলকাতা

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

পূর্বস্থলী এস.কে.ইউ.এস. লি.

পূর্বস্থলী, বর্ধমান, ডাকসূচক : ৭১৩৫১৩

অত্র সমিতিতে কে.সি.সি. মাধ্যমে কৃষিঋণ, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, স্প্রে মেশিন অল্প সুদে দেওয়া হয়। এস.এইচ.জি. ঋণ দেওয়া হয়। সমিতির ব্যাঙ্কিং ব্যবসা আছে। কে.ভি.পি, এন.এস.সি. কাঁসা পিতল বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হয়।

অজিতকুমার গুহ	দুর্গাদাস গুহ	প্রশান্ত কুণ্ডু
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

Sl. No. 97

With best compliments of

UNITED SAW MILLS

TIMBER MERCHANT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G.T. Road, Main Gate, Durgapur-713203, Phone : 0343-2582381
Contact : AMIT SINGH, 9434647691, 7699999426

Sl. No. 155

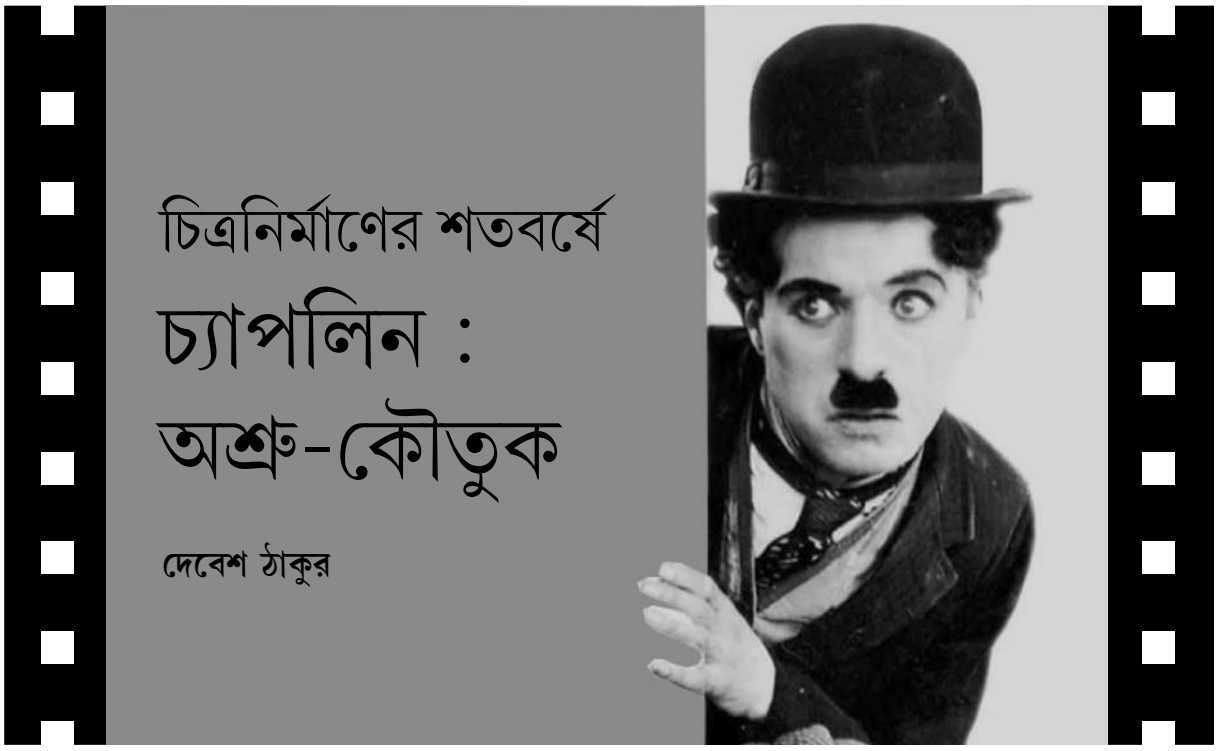

চিত্রনির্মাণের শতবর্ষে

চ্যাপলিন : অশ্রু-কৌতুক

দেবেশ ঠাকুর

চার্লি চ্যাপলিন মারা যান ১৯৭৭-এর ২৫ ডিসেম্বর, সুইজারল্যান্ডের একটি ছোটোখাটো গ্রাম ডেভেতে। জীবনের শেষ বেশ কয়েক বছর চতুর্থ স্ত্রী ঊনা এবং সন্তানসন্ততিদের নিয়ে এই শান্ত প্রায়-নির্জন গ্রামটিতে বাস করছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সেমেট্রির যাজকের চোখে পড়ে চ্যাপলিনের কবর খোঁড়া। মৃতদেহ উধাও! সুইজারল্যান্ড এমনিতে শান্ত দেশ। এইরকম ঘটনায় হতচকিত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পুলিশ বিভাগ। এই সময় ঊনার কাছে অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন আসে, লাশ গায়েব করা হয়েছে। কয়েক লক্ষ সুইস ফ্রাঁ দিলে দেহ ফেরৎ দেওয়া হবে। চ্যাপলিন জীবদ্দশায় ছিলেন অত্যন্ত মূল্যবান। হাইজ্যাকাররা ভেবেছিল, মরণের পরেও ভালো দাম পাওয়া যাবে। ঊনা জবাবে বলেছিলেন, চ্যাপলিনের স্থান তাঁর অন্তরে। দেহ চুরি করে কেউ যদি এই দাবি জানায়, তা মেটাতে ঊনা নারাজ। কিডন্যাপাররা জানায়, তারা চ্যাপলিনের প্রবল ভক্ত। যাই হোক, কয়েকদিন পর সুইস পুলিশ দেহ উদ্ধার করে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে এক গম খেতের মধ্য থেকে। সযত্নে সসম্মানে সমাধিস্থ ছিল দেহটি। গাছের ডালের ক্রুশও রাখা ছিল। দেহটি নিয়ে এসে পুনশ্চ যথোচিত মর্যাদায় ডেভেতে সমাহিত করা হয়। গম খেতের মালিক যখন জানতে পারেন, তাঁর শস্যখেতে লুকানো ছিল চ্যাপলিনের মরদেহ, তিনি একটি স্মারক বানিয়ে দেন। এটা ঘটনাটি থেকে চ্যাপলিনের উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে। মরদেহের হাইজ্যাক এবং মুক্তিপণ দাবি—বিষয়টি অভিনব সন্দেহ নেই। যদিচ ডেডবডি হাইজ্যাকের ঘটনা (মুক্তিপণ ছাড়া) বাংলায় ব্যতিক্রমী নয়।

প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, চ্যাপলিন এত সফল, এত জনপ্রিয় কীভাবে?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, আসলে পরিচালক ক্যামেরার সামনে এক অসামান্য অভিনেতাকে পেয়েছিলেন। তাঁর নাম চ্যাপলিন। আর অভিনেতাটিও পেয়েছিলেন অনবদ্য এক পরিচালককে। তাঁর নাম চ্যাপলিন।

এই কেমিস্ট্রি যদি চ্যাপলিনের সাফল্যের প্রথম কারণ হয়, প্রধান কারণ হল ভাষা। চলচ্চিত্রের ভাষা আর সাউন্ড ট্র্যাক্ গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সমগ্র ছবির একটি ভাষা আছে। ক্যামেরার ভাষা আছে। নীরবতার ভাষা আছে। চিত্রানুরাগীর চাহিদারও ভাষা আছে। চ্যাপলিনের সেই ভাষা আয়ত্ত করতে মাত্র কয়েকমাস সময় লেগেছিল। তাই মাত্র তিন মাসে দশটি এক/দু-রিল ছবিতে অভিনয় করার পর এগার নম্বর ছবিতে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটালেন। শুধু অট্টহাসির মজা তাঁর ভাবনায় ছিল না। বুঝলেন, তাঁর ছোটোখাটো চেহারাটি একটি সম্পদ। আর বাছলেন ভবঘুরে বা ট্র্যাম্পের চরিত্র। আশ্রয়হীন, কর্মহীন, বান্ধবহীন এক ক্ষুদ্র মানুষ। মানুষটি বড় নয়। বড় হচ্ছিল তাঁর ছায়া। যত উপেক্ষা, যত বঞ্চনা, যত বর্জন—ততই বাড়ছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা। নিজের দীনতা নিয়ে ক-জন পারে মজা করতে। 'মজা' শব্দটি তিনি নতুনভাবে চিনলেন। বুঝলেন নিছক মজা, যেমন Chase sequence ইত্যাদি, দীর্ঘস্থায়ী নয়। অল্পক্ষণেই বুদবুদের মতো ফেটে যাবে। চাই একটা দীর্ঘস্থায়ী বেদনা। হাসতে হাসতে অজান্তে কখন চোখ ভিজে যাবে। 'হা হা' কখন 'আহা আহা'তে রূপান্তরিত হবে! নিজের উচ্চতা, শারীরিক অক্ষমতা এবং সামাজিক অবস্থান—সব মিলিয়ে একটা বেঁচে ওঠার ইতিবৃত্ত। চ্যাপলিনের 'ট্র্যাম্প্' এই 'বেঁচে থাকা'-কে একটা ভিন্ন সুরে বাঁধতে চাইল। ট্র্যাম্প্ বা ভবঘুরে সব দেশেই আছে। কাজ নেই, কম্মো নেই। শুধু টিকে থাকা। সর্বত্র এরা থাকে। মাদারি-কা-খেল দেখার সময় আছে, মোচ্ছবেও আছে, কোর্ট-কম্পাউন্ডেও আছে। এরা প্রকটভাবে আছে। আবার নেইও। চ্যাপলিনের বন্ধু গ্রিফিথের (এর পরিচালনা 'বার্থ অব আ নেশন') ট্র্যাম্প্ চুরি করে। পেশাদার চোর। চ্যাপলিনের ট্র্যাম্প্ চোর নয়। পেটের জন্য খাবার তুলে দরিদ্রতরকে

গোল্ড রাশ্

দিয়ে দেয়। অসংগতভাবে সে স্বপ্ন দেখে, সে কল্পরাজ্যের যাদুকর। বাস্তবতা আর কল্পনার জগতে সে অধীশ্বর। 'গোল্ড রাশ্'-এ একদিকে স্বর্ণসন্ধানীদের লোভের বাস্তব ছবি। আর একদিকে জুতোর শুকতলা সেদ্ধ করে খাওয়া। নিজেকে নিয়ে এত নির্মম মজা ক-জন করতে পারে! তাই চ্যাপলিন অনন্য। প্রথাগত বিদ্যেবুদ্ধি না থাকলেও চ্যাপলিন ছিলেন শিক্ষিত। ভাগ্যিস ডিগ্রি ছিল না। তাই সাহসী হবার পথে বাধাও ছিল না। কোনোদিন প্রয়োজনের কাছে মাথা বন্ধক দেননি। ফ্যাসিস্টদের আক্রমণ করেছেন নির্ভয়ে। আক্রমণ করেছেন পুঁজিবাদকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বগ্রাসী লোভকে। পণ্য সংস্কৃতিকে। তাঁর কাছে একটাই সত্য সদা প্রকাশিত—মানবতা। গান্ধীজির সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার-এর পর বলেছিলেন, অসামান্য রাজনৈতিক বোধ। কিন্তু আন্দোলনের স্থিরতা নেই। নিজেকে কমিউনিস্টদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির জন্য চাঁদা তুলেছেন। মার্কসবাদের অনেক গভীর সত্য তুলে ধরেছেন 'দ্য কিং ইন নিউইয়র্ক'-এ ছোট্ট মাইকেলের মুখের কথায়, আবার জীবনের উপান্তে বাস করছেন সুইজারল্যান্ডে। জোটহীন এক ভুবনে। নির্বিবাদ এক ভবনে। অথচ বিশ্ব তখন অন্ধকার।

চ্যাপলিনের জীবন এবং সৃজন—দুটোই বিতর্কিত, নন্দিত এবং নিন্দিত। জীবন নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। একেবারে সংক্ষেপে দু-কথা বলে নেওয়া যায়। ১৮৮৯-এর ১৬ এপ্রিল লন্ডনে জন্ম। এই গ্রেট ডাইরেক্টরের জন্মবর্ষেই জন্মান দ্য গ্রেট ডিক্টেটর অ্যাডলফ হিটলার। মাত্র চার দিনের ব্যবধানে। সরকারি নথিতে অবশ্য এ নামে কোনো নিবন্ধীকরণ নেই। তাঁর আত্মজীবনীকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। মা-বাবা দু-জনেই থিয়েটারের শিল্পী। বংশানুবৃত্তির দিকে চার্লি চ্যাপলিনের প্রতিভা দু-দিক থেকেই সঞ্জাত। বাবা অবশ্য ছেড়ে যান স্ত্রীপুত্রকে। বৈমাত্রেয় ভাই সিডনির সঙ্গে, বিবাহবিচ্ছিন্না আধ-পাগল মা, চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা অনাদর অথচ শিল্পের ক্ষুধা—সব নিয়ে তাঁর বেঁচেবর্তে থাকা। লন্ডনের নিচের জগৎকে, অন্ধকারকে খুব কাছ থেকে দেখা। বাবার মৃত্যু, মায়ের পাগলামি, প্রবল খিদে আর অসহায়তা জীবনকে নির্মমভাবে চেনায়। পেটের জন্য ছোটোখাটো প্রায় বারো ধরনের জীবিকা বেছেছিলেন চ্যাপলিন। কাগজবিক্রি, কাচের নল ফোলানো, কাঠের কাজ—যার প্রায় সবগুলিই চ্যাপলিনের ছবিতে এসেছে। তবে শিল্পের জগৎটি তাঁর কাছে কম বয়স থেকে স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে। এই 'স্বাতন্ত্র্য'টি যে সহজাত সেটিও আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন। এখানে তিনি ভয়ঙ্করভাবে আপসহীন। অপেরা, থিয়েটার ইত্যাদির মাঝে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে চ্যাপলিন যোগ দেন ফ্রেড কার্নোর চলমান নাট্যদলে। ধীরে ধীরে সামান্য এক্সট্রা থেকে অল্পদিনে উঠে যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। ১৯১৩-তে ফ্রেড কার্নোর দলের সঙ্গে আমেরিকা যান। ১৯১৪-তে কি-স্টোন্ কোম্পানিতে যোগদান। প্রযোজক জ্যাক্ সেনেট। 'মেকিং আ লিভিং' মুক্তি পেল ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪। মাত্র এক রিলের মজাদার ছবি। ছবিটির নাম আর চ্যাপলিনের জীবিকা সন্ধান-কথা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেই সূচনা। অর্ধশতক ধরে তিনি রইলেন 'দ্য কিং ইন নিউইয়র্ক (হলিউড)'।

এইসব কথা-কাহিনি প্রায় সবার জানা। কিন্তু মেকিং আ লিভিং থেকে মেকিং অব্ চ্যাপলিন-এর আসল রহস্যটি কোথায়?

চ্যাপলিন একজন অভিনেতা। চিত্রনাট্যকার। পরিচালক। বহু ছবির সঙ্গীত নির্দেশক। কখনো কখনো ক্যামেরাম্যান। ১৯১৯ থেকে পর্দার আবির্ভাবের পাঁচ বছরের মাথায়, ছবির প্রযোজক। নিজের প্রযোজনা সংস্থা ইউনাইটেড আর্টিস্টস-এর শিরোমণি। সাইন অব ফোর-এর আর তিনজনও বিখ্যাত—গ্রিফিথ্, ডগলাস, ফেয়ারব্যাঙ্কস, মেরি পিক্‌ফোর্ড। এঁরা প্রথমেই এক পরীক্ষায় নামেন। চ্যাপলিনকে অভিনেতা হিসেবে বাদ রাখা হল। ব্যস, যা হবার। 'আ উওম্যান অব প্যারিস' অসামান্য ছবি হওয়া সত্ত্বেও নুন ছাড়া ব্যঞ্জন হল। ছবিটিতে তিরিশ সেকেন্ডের এক কুলির দৃশ্য আছে রেল স্টেশনে। ওই তিরিশ সেকেন্ডই অনুপম। আসলে মাথা-মুখ ঢাকা অনামা কুলিটিই ছিলেন চ্যাপলিন। ইউনাইটেড আর্টিস্ট বুঝে গেল চ্যাপলিনকে অভিনয় থেকে সরিয়ে আনলে যতই সরস্বতীবন্দনা হোক, লক্ষ্মী আসবেন না। চ্যাপলিনের ছবি নির্মাণের তথ্যগুলি বিস্ময়কর। ১৯১৪-তে এক রিল দুই রিল মিলে তাঁর অভিনীত ও নির্দেশিত ছবির সংখ্যা ৩৫টি। ১৯১৪তে এসানি কোম্পানিতে (প্রথম ছবি 'হিজ নিউ জব') ১৫টি। ১৯১৬ ফার্স্ট ন্যাশানাল-এ ১৯১৮ থেকে ১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারি—পাঁচ বছরে ছবির সংখ্যা কমে দাঁড়াল এগারোটি। এই সময়ের দুটি ছবির উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯২১-এ জ্যাকি কুগানকে নিয়ে 'দ্য কিড'। এক অনবদ্য বাৎসল্যের

দ্য গ্রেট ডিক্টেটর

আ কিং ইন নিউ ইয়র্ক

দলিল। আর এই বছরেই অন্য একটি ছবি 'লাইক্ অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি'। ছবিতে চ্যাপলিন, জ্যাকি কুগান ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটন্ এবং লেডি মাউন্টব্যাটন্। ভারতের শেষ দুঁদে ভাইসরয়। চ্যাপলিন সপাটে ম্যাউন্টব্যাটেনের মুখের সামনে বলে দেন, আপনার দ্বারা অভিনয় হবে না। ১৯২৩ থেকে ১৯৫৩—এই সুবর্ণমণ্ডিত তিরিশ বছরে চ্যাপলিনের ছবি মাত্র আটটি—আটটিই হীরকখণ্ড। আমেরিকা থেকে নির্বাসিত হয়ে চ্যাপলিন দ্য ব্রিটিশ প্রোডাকশন-এ দুটি ছবি করেন—১৯৫৭-তে 'আ কিং ইন নিউ ইয়র্ক', ১৯৬৭-তে 'আ কাউন্টেস ফ্রম হংকং'।

চ্যাপলিনের উত্থানের কাহিনিটি নজিরবিহীন। সামান্য দীনহীন প্রায়-অনাথ যে বালকটি একদিন লন্ডনে মায়ের নাচ-গানের শেষে পেনি কুড়িয়েছিল, মাত্র কয়েক বছরে তাঁর শৈল্পিক আর আর্থিক উন্নতি হয় গগনচুম্বি। 'বোম্বাই-এর বোম্বেটে'তে জটায়ু বলছেন, কোলকাতায় মান আর বোম্বাইয়ে মানি। আমাদের দেশে মান আর মানি একসঙ্গে খুব বেশি পাওয়া যায় না। প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা এবং পরিবেশক—এই চারটি নিয়ে বর্গক্ষেত্র বেশিরভাগই হয় না। চতুষ্কোণ হয় ঠিকই। তবে সব কোণ সমান নয়। ভালো পরিচালক সবসময় ভালো প্রযোজক পান না। প্রযোজকেরা অধুনা রাজনীতিতে ঢুকে শিল্প-অর্থ-পেশির আস্ফালন করেন। সত্যি বলতে কী, ভারতে চিত্র প্রযোজনা আজও পরিপূর্ণ শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি। (শিল্পের দুটি ইংরাজি প্রতিশব্দ—আর্ট এবং ইনডাস্ট্রি।) চ্যাপলিন নিজেই বুঝেছিলেন তাঁর মধ্যে 'ট্যালেন্ট' আছে। অপেরাতে ঢুকেছিলেন, সেদিনই মনে মনে বলেছিলেন, কিছু করে দেখাতে হবে। ফ্রেড কার্নোর দল গেল আমেরিকায় ১৯১৩-য়। চ্যাপলিন এখন কলম্বাস। পুরোনো ভবন ছেড়ে নতুন ভুবনের অন্বেষণ। ফ্রেড কার্নোর দলে জনপ্রিয় হয়েছেন। পঞ্চাশ ডলার মাইনে। নিউইয়র্কে অভিনয় করছেন। নিউইয়র্ক দুহাত দিয়ে বরণ করে নিল এই খুদে প্রতিভাকে। আবার এই নিউইয়র্কই একদিন ছুঁড়ে ফেলবে চ্যাপলিনকে। একেবারে নর্দমায়। অভিযোগের পঙ্ক তিলক মাখিয়ে। 'দ্য কিং ইন নিউ ইয়র্ক'....। আটলান্টিকের তীরে নয়, চ্যাপলিনের চোখ তখন প্রশান্তের তীরে। হলিউড। ১৯১৪তে কি-স্টোনে ঢুকলেন মাত্র পঁচাত্তর ডলারে। এক রিলের ছবিতে সামান্য রোল। এক বছরের মধ্যে বেতন বেড়ে হল হাজার ডলার। তারপর দশ হাজার। উনিশ শো কুড়ির আগে তাঁর বেতন পৌঁছে গেল ছ-অঙ্কে। অভাবনীয় মানি। সঙ্গে অভূতপূর্ব মান। ছোটোখাটো অনায়কোচিত চেহারার একজন প্রায় অশিক্ষিত (প্রথাগত শিক্ষা) না-আমেরিকান কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করলেন? এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতেই পারে।

আগেই উল্লেখ করেছি, চ্যাপলিন একই সঙ্গে অভিনেতা, পরিচালক, সঙ্গীত নির্দেশক এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযোজক। এই সর্বাত্মক স্বাধীনতা বিশ্বের কোনো চলচ্চিত্রী গ্রহণ করেননি বা করতে চাননি। সত্যজিৎ রায় অভিনয় করলে দারুণ কিছু করতে পারতেন বলে অনেক সহযোগী জানিয়েছেন। কিন্তু 'ইন ফ্রন্ট অব ক্যামেরা' আর 'বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা'—দুটোকে এক করতে চাননি সত্যজিৎ। আইজেনস্টাইন, ফেলিনি, দ্য সিকা, ব্রুশো, বার্গমান, কুরোসাওয়া—প্রায় সবার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রয়োজ্য। চ্যাপলিন এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কেউ কেউ বলেছেন 'নির্বাক' এবং 'কমেডি'—দুটোই ছিল চ্যাপলিনের কবচ। চ্যাপলিন যখন সাউন্ড ট্র্যাক ব্যবহার করলেন, তখন প্রয়োজনের বেশি কথা বলতে শুরু করলেন। যেন মলি লিখিত সুসমাচার। 'গ্রেট ডিক্টেটর', 'মসিএঁ ভের্দু', 'আ কিং ইন নিউইয়র্ক'-এ তিনি নাকি প্রচুর বকেছেন। আবার এ 'কাউন্টেস্ ফ্রম হংকং'-এ দুই বিশ্বখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে (মার্লন ব্রোন্ডো ও সোফিয়া লোরেন) উল্টো দিক থেকে ঝাড় খেয়েছেন। ব্রান্ডোর সঙ্গে হয়েছে ব্যক্তিত্বের তীব্র সংঘাত। চ্যাপলিনের বহুদিনের ক্যামেরাম্যান রোনাল্ড টোবেরোও ফ্রেম টু ফ্রেম কাজ করতে গিয়ে দেখেছিলেন, মানুষটি ভয়ংকর একা এক একক।

চ্যাপলিনের কমেডিকে বলা হয় 'কমেডি অব্ টিয়ার্স'। কমেডিয়ানরা কৌতুকাভিনয়ে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। চ্যাপলিন পেয়েছেন সহমর্মিতা। একজন ছন্নছাড়া ভবঘুরের ট্র্যাম্প-এর প্রতিষ্ঠা যেন ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন। চ্যাপলিন জানতেন, তাঁর ট্র্যাম্পের বেদনা, একাকীত্ব, বর্জন এবং প্রতিবাদ একটি ধারালো অস্ত্র হয়ে উঠতে পারবে। তিনি জানতেন ইতালির হাস্যকৌতুকাভিনেতারা কেমন ভাবে প্রতিবাদের অস্ত্র হয়ে উঠেছিলেন। কেমনভাবে ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে হার্লেকুইন এবং পিয়োরোর হাস্যকৌতুক ছিল সামাজিক চাবুক। তিনি জানতেন গ্রিমাল্ডি আর ডুবারুর হাস্য-বর্শা। ডিকেন্স গ্রিমালডিকে নিয়ে লিখতে গিয়ে দেখিয়েছেন দারিদ্র্য এবং প্রতিবাদ কোথায় যেন মিলেমিশে তরল অশ্রুকে 'সলিড' স্ফটিকে পরিণত করেছে। কমিক স্ট্রিপের মজার চরিত্রগুলোর মতো এরাও চ্যাপলিনের প্রতিষ্ঠার পূর্বসূরী। এরাই তাঁর উত্তরাধিকার। অপটুত্ব তাঁর অলঙ্কার। তাই তিনি বলশালী বক্সারের হাতে মার খান, নাচের আসরে উল্টে পড়েন। শারীরিক অপুষ্টতা তাঁর অহঙ্কার। তাই প্রতিটি

দ্য কিড

মডার্ন টাইমস্

শট্ ডিভিশনে তিনি কনট্রাসটিভ —বিপরীতধর্মী।

চ্যাপলিনের ছবি সীমান্তহীন। তিনি নিজেকে বলেছিলেন, বিশ্বনাগরিক। এ শুধু কথার কথা নয়। 'মডার্ন টাইমস'-এর আগে পর্যন্ত তাঁর ঘর বাঁধার স্বপ্ন অধরাই ছিল। বিত্তহীন মানুষের চিত্ত-ব্যাপ্তির প্রচুর নজির আছে। তবু অন্তপর্বে সে গৃহহীন। সিটিলাইটে তার ঠিকানা দেশ জননীর স্ট্যাচুর কোলে। তবু দেশ তাকে আশ্রয় দেয় না। সার্কাসে তার স্টারডম্ শুধু একটা ছিন্ন পোস্টারে। এখানেও সে ছিন্নমূল। 'গোল্ড রাশ'-এ সোনা পেয়েও সে ভয়ংকর একা। 'মডার্ন টাইমস্'-এ সে শ্রমিক। যন্ত্র তার অন্নদাতা। যন্ত্রই তাকে গিলে খায়। এই ছবিতে সিসিটিভি জাতীয় কৃৎকৌশলের প্রয়োগ বেশ আশ্চর্য লাগে। এখন তো সব কারখানায় এই কৌশল। এই ছবিতে সতর্কীকরণের লাল পতাকা হাতে নিয়ে সেই মূর্খ সামাজিক হয়ে ওঠে। সেই একক বিপ্লবী এবং কমিউনিস্ট আশ্চর্য করে এই দর্শন। মডার্ন টাইমস্-এ একটা গান আছে। মূল গানটি পলেট গডার্ড হাতের কাডলিং-এ লিখে দিয়েছেন। সেটা হারিয়ে যেতে বিপর্যয়। উদ্ভট এক ভাষায় চ্যাপলিন গাইতে লাগলো তার গান। ফরাসিরা ভাবলো স্প্যানিশ, ইংরেজ ভাবলো জুলু। শুধু অর্থহীন কিছু শব্দ ভাষাময় প্রেম হয়ে ভাসিয়ে দিয়ে দর্শককুলকে এই অর্থহীন ভাষা আর গ্রেট ডিক্টেটরে হিংকেলের হুঙ্কার 'ডিমোক্র্যাসি স্টংক'—কী পারম্পর্য! এরই পারিপার্শ্বিকতায় কিং ইন নিউ ইয়র্কে চ্যাপলিনের নিজের ছেলের বিজ্ঞ কমিউনিস্ট-সুলভ সুসমাচার—কী রকম একটা আত্তীকরণের কষ্ট জাগায়।

চ্যাপলিনের থ্রি-ইন-ওয়ান রূপকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখলে ছকটি হবে নিম্নরূপ : (ক) তিনি অভিনেতা-পরিচালক এবং যন্ত্রী (খ) তিনি তিন যুগের সারথী—নির্বাক সবাক এবং রঙিন, (গ) তিনি জনতায় নির্জনতায় এবং দায়বদ্ধ নন্দনবোধে, (ঘ) তিনি অভিনয়ের ধারা নিয়েছেন পূর্বসুরিদের কাছ থেকে, বর্তমানে প্রয়োগ করেছেন।

যদি কেউ 'গ্রেট ডিক্টেটর' আর একবার দেখার আগে উইলিয়াম স্যিরাকের লেখা রাইজ অ্যান্ড ফল অব্ দ্য থার্ড রাইখ পড়েন, দেখবেন 'হিটলার যাহা হইবেন' তা বহু আগে চ্যাপলিন যেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো বুঝতে পারছেন। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিচ্ছবি দেখবেন 'মসিএঁ ভের্দু'তে। 'মডার্ন টাইমস্'-এ যন্ত্রদানবের দাঁত-নখ-লালসাকে নিপুণ ভাবে বুঝেছেন। সে সবের অন্তে থাকে একজন ক্যালভেরো বা একজন দীন-রাজা স্যাডভের একাকীত্বের অন্তহীন হাহাকার।

চ্যাপলিন এক মূক সরবতার নাম। নন্দিত এবং নিন্দিত। অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার (অস্কার) নিতে তিনি ১৯৭২ সালে আমেরিকা আসেন—প্রায় কুড়ি বছর নির্বাসনের পর। দীর্ঘ অসম্মান ও বর্জনের পর এই রাজকীয় সংবর্ধনা। অশীতিপর বৃদ্ধের সংবর্ধনায় সারা প্যাভেলিয়ান ভেসেছিল চোখের জলে। অশ্রুসিক্ত চ্যাপলিনের ঠোঁট ফাঁক হয়ে বেরিয়ে এসেছিল : 'ওয়ার্ডস আর সো ফিউটাইল, সো ফিবল্।'

প্র কা শে র প থে

১

সুবোধ সৃজন

(বর্ধমানের এক সময়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সাহিত্যসেবী

ডা. সুবোধ মুখোপাধ্যায় রচনাবলীর অখণ্ড সংস্করণ

সম্পাদক : শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

২.

স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় লিখিত

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় (২য় খণ্ড)

ভূমিকা : নিরুপম সেন

সম্পাদনা : দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, জহরলাল সাঁই ও শিবানন্দ পাল

একটি 'উন্মেষ' প্রকাশনা

দ্বিতীয় অ্যাভিনিউ, রাস্তা নং ৬, ৩নং প্লট, উল্লাস, বর্ধমান-৭১৩১০১

Sl. No. 117

ওসমান সেমবেনে : সিনেমা যাঁর কাছে মানবমুক্তির শিল্পিত উপকরণ

সন্দীপ লাহা

ওসমান সেমবেনের সাহিত্যকৃতি বেশ উল্লেখযোগ্য, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর চলচ্চিত্রের দিকটিই আলোচিত হল।

ওসমান সেমবেনের নাম যখন থেকে শুনতে শুরু করেছি—পরিচয়ের সূত্র ছিল—'ফাদার অব আফ্রিকান সিনেমা', অর্থাৎ জেনেছি যে সেনেগালবাসী এই খ্যাতনামা ব্যক্তিটি তাহলে চলচ্চিত্র পরিচালক। হাতে গঙ্গাজল-হরিতকী নিয়ে তাই-ই বিশ্বাস করেছিলাম। বিশ্ব চিত্রপরিচালকের ছাপমারা ব্যক্তি-পরিচয়ের সীমানার পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি—প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে সে জীবন বহুধা-বিস্তৃত এবং এই ব্যাপক জীবনে মুক্তিকে সে পাখির মতো পোষ মানিয়েছে, কিন্তু খাঁচায় পোরেনি। তিনি আফ্রিকান সিনেমার পুরোধা ব্যক্তিত্ব হতে পারেন, কিন্তু সিনেমায় বিনোদনের পচা শামুকে তাঁর পা-ও কাটেনি বা 'ইন্টেলেকচুয়ালিটি'-র কানাগলিতে হারিয়েও যাননি, বরং সিনেমাকে আত্তীকরণ করে তার শক্তিশালী সংযোগ ভাষাকে উপকরণে পরিণত করেছেন—লক্ষ্য অর্জনের জন্য।

কী সেই লক্ষ্য? সদ্য স্বাধীন মাতৃভূমিকে, তার অভাবক্লিষ্ট, প্রায় নিরক্ষর দেশবাসীকে জীবনের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা। কিন্তু সেই বিষয়েই লেখা তাঁর সাহিত্য তো আছেই, কিন্তু সেসব তো ওই নিরক্ষর স্বদেশবাসী আর পড়তে পারবে না। তাই প্রান্তিক মানুষগুলির সাথে সংযোগের আবশ্যিকতায় তাঁর চলচ্চিত্রে পদার্পণ। কারণ তিনি যে জীবনকে তার নানা কৌণিক বিন্যাসেও দেখেছেন। হাজার প্রতিকূলতার স্রোতের মাঝে দাঁড়িয়েও ছিন্নমূল হয়ে যাননি—মনের এই দৃঢ়তার কারণেই তো তিনি মার্কসবাদে স্থিত হয়েছিলেন—ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের প্রচলিত চেষ্টার বাইরে সমষ্টির মুক্তির কথা ভেবেছিলেন—আর সেইজন্য সাহিত্যের বাইরে এসে অর্থাৎ ছাপা লেখার আক্ষরিক সীমার বাইরে এসে সিনেমার মতো শক্তিশালী জনসংযোগের মাধ্যমকে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের উপকরণ করেছিলেন—তার জন্য ৩৮ বছর বয়সে মস্কো গিয়ে সিনেমা তৈরির কৃৎকৌশল শিখেছিলেন—আর নিজের দেশে ফিরে এসে অতি কম খরচের সিনেমায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন—এই ছিল তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য। মনে রাখা দরকার যখন এ সব করছেন তখন কিন্তু তিনি নিজ দেশে ও ফ্রান্সে তথা আন্তর্জাতিক বাজারে একজন আলোড়ন তোলা সাহিত্যিক। কিন্তু তাঁর হাত ধরেই প্রথম আফ্রিকান উপভাষার (দ্বিভাষিক) সিনেমা তৈরি হয় এবং সেই সিনেমা আন্তর্জাতিক পরিচিতি পায়। তবু তাঁর যাপিত জীবন ও আদর্শে সমর্পিত কর্মভূমির প্রকৃত বিশ্লেষণে তাঁকে শুধু চলচ্চিত্রকার তথা সিনেমা পরিচালক হিসেবে দেখলে খণ্ডিতই করা হবে। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে তিনি একজন সৎ শিল্পী ও সংগ্রামী, যাঁর সৃষ্টির প্রেরণা তাঁর অর্জিত বিশ্বাস। আর লক্ষ্য—মানুষের মুক্তি। সিনেমাকে তিনি সেই মানবমুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তিনি ভীষণ জনপ্রিয় তাঁর নিজের দেশে। কখনো কখনো দেখা যায় কালো রঙ করা ট্যাক্সির গায়ে লেখা আছে—Le Docker Noir (The Black Docker)—তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম। বহু যুবকের গেঞ্জিতে লেখা থাকে সেমবেনের নাম। পাঁচতারা হোটেলে বিখ্যাত খাবার পদের নামও দেওয়া হয়—সেমবেনে। বোঝা যায় কীভাবে মজ্জায় মিশে আছেন তিনি নিজ দেশে।

জন্ম ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি, তৎকালীন পরাধীন সেনেগালের (ফরাসী উপনিবেশ) ক্যাসামানেস অঞ্চলের জিগুইনকোর গ্রামে। বাবা সামুদ্রিক মৎসজীবী। খুবই সাধারণ পরিবার, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব না থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না খুব একটা। ছোটো অবস্থাতেই বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ। ফলে বিভিন্ন আত্মীয়বাড়িতে আশ্রয় ও দিন-গুজরান। এই পর্বে বড় মামা স্কুল

শিক্ষক ও বিদ্বজ্জন আবদু রহমান দিওপ-এর কাছে থাকাকালীন তাঁর শীলিত জীবনচর্যা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন ও জ্ঞানার্জনের প্রতি আকৃষ্ট হন। দিওপ ১৯৩৫ সালে মারা গেলে আবার অন্যত্র। এই সময় প্রায় ১৪ বছর বয়সে (১৯৩৭) স্কুলে শিক্ষকের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ ও শিক্ষকের (মতান্তরে প্রধান শিক্ষক) সাথে মারামারি, ফলে অবধারিতভাবে স্কুল থেকে বিতাড়ন। ফল মাতৃ-পিতৃহীন ১৪ বছরের ছেলে নিজের ভাগ্য নিজে চালানোর 'দায়িত্ব' পেয়ে যায়। এই পর্বে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে, ছুতোরের কাজ, মেকানিক ইত্যাদি করে জীবিকা চালাতে হয়। কিন্তু কিছুতেই আর স্কুলে ভর্তি হতে চাননি—হয়তো স্কুলে শিক্ষার অসারতা তখনই বুঝে গিয়েছিলেন। সারা জীবনের জন্য অ্যাকাডেমিক শিক্ষার এখানেই ইতি, কিন্তু তিনি নিজের মতো পড়া চালিয়েই যাচ্ছিলেন, লাইব্রেরি বা অন্যান্য সাহচর্যে। এই সময়েই তিনি জীবনের বহুমাত্রিক যাপন-যন্ত্রণার স্বাদ পান।

এভাবে কয়েক বছর চলার পর তৎকালীন সময়ের নিয়ম অনুযায়ী উপনিবেশ অঞ্চলের যুবকদের ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল ফোর্সে যোগদান করতে হত। তাঁকেও যেত হল ১৯ বছর বয়সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ফ্রান্সের উপনিবেশ অঞ্চলের যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। ঘটনাটি এতটাই নাড়া দিয়েছিল তাঁকে যে পরে এই নিয়ে একটি ছবিও করেন—এমিটাই।

৪ বছর মিলিটারিতে কাটানোর পর ১৯৪৬ সালে ২৩ বছর বয়সে সেখান থেকে ছাড়া পান এবং সেনেগালের ডাকার অঞ্চলে থাকতে শুরু করেন ও রেল শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৭-৪৮ সালে পরাধীন সেনেগালে যে ব্যাপক 'ডাকাল-নাইজার রেল রোড স্ট্রাইক' হয়েছিল তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। পরপর দু-বছর এই ধর্মঘট হয়েছিল।

তারপর সেই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরাধীন দেশের চূড়ান্ত বিপর্যস্ত আর্থিক পরিস্থিতিতে কোনোরকম রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পেরে তিনি ফ্রান্সে চলে যান। প্রথমে প্যারিস পরে মার্সেইল বন্দর শহরে ডক-লেবার বা বন্দর শ্রমিকের কাজ নেন (কারণ কায়িক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোনো উপার্জনের মতো তো তাঁর পড়াশোনাই নেই।) বন্দরে জাহাজে মাল তোলা ও নামানোর কাজে প্রকৃতই হাড়ভাঙা খাটুনি ছিল সারাদিন। তারপর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শুরু হত তাঁর নিজের পড়াশোনা। সাহিত্য সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্র ছাড়াও মার্কসবাদের তত্ত্ব ও আনুষঙ্গিক নানা লেখা তিনি গভীর মনোযোগের সাথে পড়তেন। বন্দর শ্রমিকের আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং অচিরেই নিজস্ব শিক্ষা ও নেতৃত্বদানের দক্ষতার জন্য তিনি উচ্চতর নেতৃত্বের নজরে আসেন। তিনি ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নেন (১৯৫০)। এই সময় তিনি নিয়মিত মার্কসবাদের ওপর বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশ নিতেন।

সেই সময় বন্দর শ্রমিকের কাজ করত হত সর্বশক্তি দিয়ে। তখন কনটেনারে মাল তোলা নামানোর ব্যবস্থা ছিল না। ফলে একদিন শিরদাঁড়ায় ভীষণ আঘাত পেলেন। কেউ কেউ বলেছেন শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। ফলে অনেকদিন বিছানাবন্দি ও বিশ্রামে থাকার পর তিনি যখন কাজে যোগ দিতে এলেন তখন শ্রমিক-বন্ধুরা তাঁকে কায়িক পরিশ্রমহীন স্যুইচম্যানের কাজ করতে দিলেন। এতে পরিশ্রম নেই তেমন, তাই তিনি পড়াশোনার মাত্রাও বাড়িয়ে দিলেন। কাজের শেষে বিভিন্ন মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি ঘুরতে শুরু করলেন এবং এই সময় থেকেই লেখালেখিও শুরু করলেন।

সুইচম্যানের কাজে আসার পরেই তিনি লেখার সুযোগটা পেলেন, কারণ বন্দরের মাল তোলা-নামানোর কাজে দুটো হাতই তো 'এনগেজ' থাকত। প্রথম দিকে কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ছোটোগল্প লিখতে শুরু করেন। ১৯৫৬ সালে লিখলেন প্রথম উপন্যাস 'Le Docker Noir' (The Black Docker)—বন্দর শ্রমিক বা ডক লেবার হিসেবে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এতে। তারপর আরও একটি উপন্যাস ও অন্যান্য লেখালেখির পর ১৯৬০ সালে লিখলেন সেই বিখ্যাত লেখা Les bout de bois de dieu (God's Bit of Wood)—বিষয়টি ছিল ১৯৪৭-৪৮ সালের সেনেগালের রেল ধর্মঘট ও বহুস্তরীয় আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী। প্রকাশ হওয়া মাত্রই তা তাঁকে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ তথা সারা বিশ্বে একজন আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক হিসেবে খ্যাতিমান করে তুলল। এই ১৯৬০ সালেই সেনেগাল স্বাধীন হল—তার ঔপনিবেশিক দশা ঘুচল। সেমবেনে ফিরে গেলেন নিজের দেশে।

ফিরে তিনি দেশ দেখতে বেরোলেন। দেশের মানুষের প্রকৃত অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্য তিনি কঙ্গো নদীপথে ভ্রমণ করলেন। দেখলেন দেশবাসীর বেশিরভাগেরই আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন এবং তারা প্রায় সবাই নিরক্ষর। তখন তাঁর মনে হল, তাহলে যাদের জন্য তিনি লিখছেন তারা তো সেটা পড়তে পারবে না। তখন তিনি লেখ্য ভাষার অক্ষরবোধের সীমা ছাড়িয়ে সর্বজনবোধ্য ভাষা 'ছবির ভাষা'-কে বেছে নেন নিজের বক্তব্য জানানোর মাধ্যম হিসেবে। এই ঘটনার অনুষঙ্গে মনে পড়ে যায় আমাদের এক ক্ষণজন্মা চিত্রপরিচালকের কথা—ঋত্বিক ঘটক। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সিনেমাকে বেছে নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—এখনও পর্যন্ত মানুষকে প্রভাবিত করার এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, যদি কোনোদিন এর চেয়ে অন্য কোনো আরও শক্তিশালী মাধ্যমের খোঁজ পাই তাহলে সিনেমাকে ছেড়ে চলে যাব সেই মাধ্যমে। আরও একটি ক্ষেত্রে দু-জনের খানিকটা অনুষঙ্গগত মিল পাওয়া যায়—ঋত্বিকের যেমন দেশভাগের যন্ত্রণা ছিল আমৃত্যু, তেমনি সেমবেনের—ঔপনিবেশিকতা, তার যন্ত্রণাজর্জর জীবনের আখ্যান বহন করেছেন আজীবন।

তো, ছবি তৈরির ভাষা শিক্ষার লক্ষ্যে অর্থাৎ সিনেমা তৈরির কারিগরি শেখার জন্য তিনি রাশিয়া গেলেন, সেখানে মস্কোর গোর্কি স্টুডিওতে এক বছর সিনেমা তৈরির কৃৎকৌশল শিখলেন এবং অল্প পয়সায় একটি পুরনো রাশিয়ান মুভি ক্যামেরা কিনে দেশে ফিরলেন ১৯৬২-র শেষ দিকে। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা এখানে জরুরি যে, এই সময় চাইলেই তিনি গোর্কি স্টুডিওয় কাজ করতে পারতেন, এমনকি সাহিত্যিক হিসেবে তখন যা পরিচিতি ছিল তাতে প্যারিসে গিয়েও সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে পারতেন স্বচ্ছন্দে—তাতে তাঁর রোজগার নিশ্চিতভাবে অনেক ভালো হত এবং চলচ্চিত্রকার হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা পেতেন। কিন্তু তিনি সেমবেনে। ফিরে এলেন সদ্য ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত, দারিদ্র্যপীড়িত, শিক্ষাহীন ও বহুতর সমস্যায় দীর্ণ দেশবাসীর কাছে। তাঁর জীবনবোধের আদর্শের কেন্দ্রে যে তারাই। এরপর তিনি সিনেমা তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন বা বলা ভালো সিনেমার মাধ্যমে ওই অক্ষরপরিচয়হীন মানুষগুলিকে নিজের জীবনবোধের কথা, তাদের উত্তরণের ভিত্তিভূমির কথা বলতে শুরু করলেন।

১৯৬৩ সাল থেকে ছবি তৈরি করতে শুরু করেন। প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিটি সরকারের ফরমায়েশি। এরপর তাঁর নিজের স্বল্প

দৈর্ঘ্যের ছবি 'Borom Saret' (১৯৬৩), এখানে তিনি উপনিবেশ পরবর্তী সেনেগালের সমাজজীবনে কীভাবে পুরনো ও নতুনের বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের সংঘাত ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে তাই দেখান। ছবিটি ফ্রান্সের ত্যুর চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। পরেরটিও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'Niaye' (১৯৬৪), এটিও ত্যুর-এ পুরস্কৃত হয় এবং লোকার্নো উৎসবে সম্মানিত হয়। এরপর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'La Noir De' (The Black Girl) (১৯৬৬), চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে এই ছবিটি দারুন প্রশংসিত হয় এবং আফ্রিকান সিনেমাকে মর্যাদামণ্ডিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের স্তরে উন্নীত করে। ছবিটি তৎকালীন সময়ে সিনেমা-বোদ্ধা-দর্শকদের যথেষ্ট আলোড়িত করে। এটি কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রিমিয়ারে দেখানো প্রথম একজন ব্ল্যাক আফ্রিকানের ছবি। কান সহ অনেকগুলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয় ছবিটি। অর্থাৎ প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনি চিত্রেই সিনেমার মানচিত্রে স্বীকৃতি। 'পথের পাঁচালি'-র মতোই যেন। প্রথম ছবি, সেই কান, সেই খ্যাতির গরিমা। কিন্তু কী ছিল এই La Noir De বা The Black Girl-এ? এটি সেনেগালের একজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনি। সে একটি ধনী ফরাসি পরিবারে কাজ করত, পরিবারটি সেনেগালে থাকত, তারপর সেনেগাল স্বাধীন হওয়ার পর পরিবারটি পরিচারিকা সমেত ফ্রান্সে ফিরে যায়। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হল বটে কিন্তু প্রান্তিক মানবীটির কাছে তার স্বাদ পৌঁছাল না। তিনি বলতে চেয়েছেন—রাষ্ট্র স্বাধীন হলেই সেই রাষ্ট্রের সব শ্রেণির মানুষ স্বাধীনতা পায় না। তাদের জন্ম-যাপন-মৃত্যু সবই এক বৃহৎ উপনিবেশের খাঁচায় আবদ্ধ, সেখান থেকে মুক্তি শুধু দেশের স্বাধীনতায় আসবে না। লীলা মজুমদারর সেই প্রবচন হয়ে যাওয়া কথা একটু পাল্টে নিয়ে বলা যায়—দেশ থেকে উপনিবেশ তুলে ফেলা যায় কিন্তু উপনিবেশের খাঁচা থেকে প্রান্তিক মানুষদের তুলে আনা যায় না।

সেমবেনের এর পরের ছবি (১৯৬৮) তাঁর নিজের উপন্যাস 'Le Mandat' থেকে নির্মিত 'Mandabi' (The Money Order)। এটি তিনি ফরাসি ভাষার সঙ্গে উলুফ (Wolof) ভাষাতেও তৈরি করেন, দ্বিভাষিক ছবি। উলুফ আফ্রিকান ভাষা এবং সেমবেনের মাতৃভাষা। উলুফে তৈরির অর্থ হল যাতে সেই নিরক্ষর মানুষগুলো তাদের নিজেদের ভাষায় সিনেমাটি দেখতে পারে। পরে এটি একটি ট্রেন্ড হয়ে যায়, আফ্রিকার ছবি আফ্রিকার উপভাষাতেই তৈরি করার রীতি হয়ে যায়। সেমবেনে এর পরের সমস্ত ছবি ফরাসি সহ হয় উলুফ বা ডায়োলা উপভাষায় তৈরি করেন। ছবির বিষয় হল—সামাজিক সংস্কার ও অদক্ষ আমলাতন্ত্রের প্যাঁচে আটকে যাওয়া সাধারণের জীবন, অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ের অকারণ নিয়ম ও বেনিয়মের যাঁতাকলে পিষ্ট সাধারণ দরিদ্র মানুষের কাহিনি।

এরপর দুটি তথ্যচিত্র ও একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করেন। তারপর তৈরি করেন 'Emitai' ১৯৭১ সালে। এটিও ডায়োলা উপভাষা ও ফরাসি ভাষায় নির্মিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি সৈন্যদল তৎকালীন উপনিবেশ সেনেগালের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তরুণ ও যুবকদের জোর করে সেনাবাহিনীতে কাজের জন্য নিয়ে যেত। তার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের সংগ্রাম। মহিলারাও এই অসম সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

'Emitai'-এর পর দুটো তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন সেমবেনে। তারপর নিজের লেখা উপন্যাস থেকে 'Xala' (১৯৭৪) সিনেমাটি তৈরি করেন। আফ্রিকান উপভাষায় Xala কথারঅর্থ পুরুষত্বহীনতা। এটি সেমবেনের একটি হাল্কা চালে করা সিনেমা। একজন ইউরোপীয় ভাবধারায় অভ্যস্ত ধনী ব্যবসায়ীর অনেক কম বয়সী তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর সাথে বিয়ের রাতের ঘটনা।

তারপর Ceddo (১৯৭৬)। এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় সমস্যার ছবি। আফ্রিকার গ্রামে গ্রামে অন্য ধর্মের মানুষদের জোর করে ইসলাম ধর্মে রূপান্তরের ওপর এই ছবি। এটি আফ্রিকায় বাস্তবিকই একটি জ্বলন্ত সমস্যা এবং সেমবেনে যথারীতি তাই নিয়ে ছবি করেন। কিন্তু সেনেগালের সরকার এই ছবির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে, কারণ দেশের ৮০ শতাংশ মুসলিম অধিবাসীকে সরকার চটাতে চায়নি। সত্য ঘটনা অপ্রিয় হলে কবে আর ক্ষমতা বা রাষ্ট্র তাকে মান্যতা দিয়েছে! কিন্তু শিল্পীর দায় তো ভিন্ন।

'Camp de Thiaroye' (১৯৮৮) ছবিটি 'Emitai'-এর সিকুয়েল হিসেবে ধরা হয়। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে স্বদেশে ফিরে আসা আফ্রিকান সৈন্য, যারা ফ্রান্সের হয়ে লড়াই করতে গিয়েছিল, দেশের ফেরার পর ফরাসি কর্তৃপক্ষের দ্বারা সৃষ্ট তাদের নানা সমস্যা ও সংগ্রাম নিয়ে এই কাহিনি।

এরপর সেমবেনে নিজের লেখা কাহিনির ওপর 'Guelwaar' (১৯৯৩) ছবিটি তৈরি করেন। বিষয় এবং ট্রিটমেন্টের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছবি। এটি বহুস্তরীয় এবং সংলাপের মধ্যে অনেক দার্শনিক বক্তব্য আছে, আছে পুরানো সংস্কার থেকে বাইরে এসে নতুন করে ভাবানোর প্রচেষ্টা। এখানে গুয়েলওয়ার একজন জেলাস্তরের নেতা। তিনি বিদেশি সাহায্যে (ফরেন এইড) জীবনযাপনের বিরোধী ছিলেন। বলতেন বিদেশি সাহায্য ক্রমশ দাসত্ব নিয়ে আসে রাষ্ট্র-সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে। এরকম একটি বক্তৃতা দেওয়ার পর একদিন হঠাৎ তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল রাস্তায়। তারপর আবার মর্গ থেকে সেটি উধাও হয়ে যায়। অন্য একটি মুসলিম মৃতদেহের সঙ্গে তার বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই নিয়ে ক্যাথলিক এবং মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। আরও নানা ঘটনার সমাবেশ ছবির অবয়বে। ছবিটি ভেনিস ফেস্টিভ্যালে স্বর্ণপদক লাভ করে।

এরপর মহিলাদের সমস্যা ও সংগ্রাম নিয়ে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ও পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'Kaat Kine' তৈরি করেন ২০০০ সালে।

তাঁর শেষ ছবি 'Moolaade' (মুলাদে) ২০০৩-০৪ সালে তৈরি। বিষয়ে বা উপস্থাপনায় যথেষ্ট সাহসী ও বিতর্কিত ছবি। আফ্রিকার গ্রামে গ্রামে সংস্কারের বশে স্ত্রী লিঙ্গাগ্র কেটে ফেলার যে রীতি—তাই নিয়েই ছবিটি। এটি কান ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়, ফেসপ্যাকো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এটি 'বেস্ট ফরেন ফিল্ম' নির্বাচিত হয় এবং চিকাগো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও পুরস্কৃত হয়।

সেমবেনে সিনেমা তৈরি করে পুরস্কার পেয়েছেন বেশ কিছু, কিন্তু পুরস্কারের নিরিখে সেমবেনের সিনেমাকে বিচার করতে বসলে গোড়ায় গলদ হয়ে যাবে। এ সব ছবির যাত্রাপথ ভিন্ন। তিনি মোট ৯টি কাহিনি চিত্র তৈরি করেন। তার সাথে ৪টি তথ্যচিত্র ও ৪টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি।

সাহিত্যখ্যাতি অর্জন করার পরও সেমবেনের মাথায় কেন সিনেমা তৈরির ভূত চেপেছিল—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেই দিকে লক্ষ রেখেই তিনি তাঁর সিনেমায় কিছু সুচিন্তিত ও দিগদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমত, তিনি তাঁর সিনেমায় হলিউডি ধারার বিষয় ও উপস্থাপনার প্রচলিত প্রভাব পরিহার করেন। দ্বিতীয়ত, দেশীয় বিষয় নিয়ে, স্বদেশি লোকাচার ও সংস্কারকে ব্যবহার করে, দেশবাসীর চিন্তার ও চেতনার অধিগম্য করে তাকে উপস্থাপন করেন। তৃতীয়ত, তা করতে গিয়ে দেশীয় উপভাষাগুলিকে চলচ্চিত্রের ব্যবহারিক ভাষা করে তোলেন, যা আফ্রিকার চলচ্চিত্রে একটি নতুন ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। চতুর্থত,

অত্যধিক কম খরচে ছবি তৈরি করা (বলা হয় যে হলিউডি ছবির স্যুটিং-এর ক্যাটারিং চার্জে বা খাওয়ার খরচে তিনি একটি গোটা ছবি বানিয়ে ফেলেন), যাতে ছবির বাণিজ্যিক সফলতার বিষয়টি মূলেই গৌণ্য হয়ে যায় আর তাঁর দরিদ্র স্বজাতির কাছে পৌঁছানো সহজ হয়। পঞ্চমত, তাঁর সিনেমা অত্যধিক কম খরচে হলেও, ছবির কোথাও সেই দীনতার স্পর্শ নেই বরং বিষয় ও ভাবনার ঐশ্বর্যে তা পরিপূর্ণ।

কিন্তু সেমবেনে শুধু তাঁর স্বদেশবাসীর জন্যই লড়াই করেননি, সিনেমাকে নিছক বাণিজ্যের কানাগলি থেকে টেনে বার করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন—যাতে এই শক্তিশালী শিল্পমাধ্যমটি শুধুমাত্র মানুষকে সস্তা বিনোদনের খাঁচায় পুরে লগ্নি ও মুনাফার নোংরা আবর্তে ঘুরপাক না খায়, যাতে এই মাধ্যমটি নিজস্ব শিল্পকৃতির ইজ্জতের ওপর দাঁড়াতে পারে—আর এটা করতে গিয়ে তাবৎ ভোগবাদী দুনিয়ার মুনাফাবাজদের সামনে একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠেছিলেন—দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এখানেই তিনি চরম আন্তর্জাতিক।

সেমবেনেদের নশ্বর জীবনও একদিন শেষ হয়। ২০০৭ সালের ৯ জুন সেনেগালের ডাকার-এ নিজের বাড়িতে ৮৪ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মানুষের কল্যাণে সমর্পিত একটি আদর্শবাদী শিল্পী-জীবনের পথচলা শেষ হল। কিন্তু, যতদিন সিনেমা থাকবে, মানুষের মুক্তির জন্য তার যথার্থ প্রয়োগের প্রেরণা হিসেবে ওসমান সেমবেনের নাম চিরজাগরুক থাকবে।

সেমবেনে সৃষ্ট চলচ্চিত্রের তালিকা (Filmography)

1963 : ***Borom Saret***, short film
1964 : ***Niaye***, short film
1966 : ***La Noire De...*** (Black Girl), feature film
1968 : ***Mandabi*** (The Money Order), feature film
1969 : ***Taumatisme de La Femme Face a La Polygame***, documentary
1971 : ***Tauw***, short film
1971 : ***Emitai***, feature film
1972 : ***Basket Africain Aux Jeux Olympiades***, documentary
1973 : ***L'Afrique Aux Olympiades***, documentary
1974 : ***Xala***, feature film
1976 : ***Ceddo***, feature film
1988 : ***Camp de Thiaroye***, feature film
1993 : ***Guelwaar***, feature film
1999 : ***Heroisme Au Quotidien***, short film
2000 : ***Faat Kine***, feature film
2003 : ***Moolaade***, feature film

With Best Compliments of

A
Well Wisher

Sl. No. 7

হিপনস

গীস্পতি চক্রবর্তী

রণিতের অফিস সেক্টর ফাইভে। আই টি সেক্টরে রণিত ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে গেছে বহু কোম্পানির এক্সিকিউটিভের কাছে। রণিত দাস চৌকস কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। আই টি সেক্টরে রণিতের জুড়ি পাওয়া কঠিন। একটার পর একটা প্রজেক্টে হাত দেয়; আর সাফল্য ওর হাতের তালুতে। কোটি কোটি টাকার প্রজেক্ট। রণিতের হাতের ছোঁয়ায়, পরিচালনার গুণে কোম্পানিকে পৃথিবীর আই টি বাজারে এক জাঁদরেল খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। বাজারের নানা জটিল অঙ্কের মেলায় জিতে চলেছে রণিতের কোম্পানি। তাই রণিতের কদর কোম্পানিতে কতটা তা ও ভালোভাবে জানে। বহু কোম্পানি কিনে নিতে চেয়েছে ভালো প্যাকেজের অফার দিয়ে। সে-সব অফারের ফিরিস্তি শুনলে উঁচু পদের সরকারি আমলারাও হিংসেতে জ্বলে যাবে। সর্বোচ্চ স্তরের সরকারি আমলারা চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যে-সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, রণিতের কাছে সেসব নেহাতই হাসির খোরাক। অথচ রণিতের বয়স তিরিশের কাছাকাছি। বহু বড় বড় কোম্পানির অফার দূরে সরিয়ে রেখে ও মন দিয়ে করে চলে ওর বর্তমান নিয়োগকর্তাদের কাজ। সবাই অবাক হয়। কেন কাজ ছাড়ে না ও? লন্ডন, নিউইয়র্ক যাওয়ার হাতছানি উপেক্ষা করে ও কেন আঁকড়ে ধরে আছে পুরোনো কোম্পানিকে? এসব নিয়ে ওর সঙ্গে কেউ আলোচনা করতে গেলে এড়িয়ে যায় ও। নানা কথার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে গলে বেরিয়ে যায় ও। দু-বছর হল বিয়ে হয়েছে ওর। স্ত্রী উচ্চশিক্ষিতা। স্কুলের শিক্ষিকা। ওর অবস্থা সচ্ছলতাকে ছাড়িয়ে অনেক, অনেক ওপরে পৌঁছেছে। আর কী-ই বা চাইতে পারে রণিত? ও এখন মন দিয়ে সংসার করতে চায়। সুখী গৃহকোণ ওকে টানে। কিন্তু চারিদিকের রকেটগতিতে ধাবমান পৃথিবী ওকে যেন ঝড়ের গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আই টি ওয়ার্ল্ডের অমোঘ নিয়ম হল দৌড়। এখানে যে ছুটতে পারে সে টিকে থাকে। ছোটা বন্ধ হলে সে হারিয়ে যায় এই বিশ্ব থেকে। এ এক অন্য পৃথিবী। চারিদিকের দৃশ্যমান জগতের মধ্যে আরও একটা অন্য জগত। কম্পিউটারের পর্দার মধ্য দিয়ে, কি-বোর্ডের নরম ছোঁয়ায় ওই জগৎ আন্দোলিত হয় রণিতের চোখের সামনে। কোথায় হারিয়ে যায় সল্টলেক, রাজারহাট, এস্‌প্ল্যানেডের গরিমা। নতুন জগতের মায়াময় হাতছানি, ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত, কত জটিল হিসাব-নিকাশ, ওয়ালস্ট্রিট, লাসভেগাস, ঝিলিক মারে রণিতের চোখের সামনে। রণিত দিনের পর দিন কাজ করে এইসব চলমান ছবির সমুদ্রে। এসবের মধ্য দিয়ে, হাজার যোগাযোগের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ থেকে এক নিজস্ব কায়দায় রণিত লাভের কড়ি বার করে আনে কোম্পানির জন্য। ওর কোম্পানির বস একদিন স্নেহভরে ওর পিঠে হাত রেখে বলেছিল—'তুমি আমাদের সেরা সম্পদ।' এই কথাটুকু কতবার ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে। বৌকে বলতে বলতে রোমাঞ্চিত হয়েছে। আবেগে, উচ্ছ্বাসে ওর চোখে প্রায় জল চলে এসেছিল। সাফল্যের এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায় ও ছুটে গেছে। ওপরওয়ালা কোনোদিন মুখ ফেরায় নি।

এই রণিত হঠাৎ কামাই করে বসল। স্রেফ ভালো লাগছে না বলে অফিস গেল না ভরা কাজের দিনে। সপ্তাহের মাঝে কোনোদিন অফিস কামাই করতে দেখেনি ওকে সোমা। সে উদ্বিগ্ন হয়। স্কুলে যেতে মন চায় না তার। অফিসের সুন্দর ছোট্ট এ.সি. বাসটাকে রণিত যখন চলে যেতে বলল, সোমা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। অফিস যাওয়ার সব প্রস্তুতিই ছিল। খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল। স্রেফ বিনা নোটিশে কামাই করে বসল ও। সোমা জানতে চাইল—'শরীর ঠিক আছে?' ও হাসে। বলে—'ভয়ের কিছু নেই। এমনি যেতে ইচ্ছা করছে না।'

—এমন তো করো না কখনও।

—কখনও করি নি বলে কোনোদিন করব না?

—কিছু তো হয়েছে?

—বিশ্বাস করো; কিছু হয় নি।

—আমি স্কুল যাব? না-কি আমি অফ্ দেব?

—না, না। শুধুশুধু কামাই করো না।

—আমার মন চাইছে না।

—আরে বাবা কিছু হয় নি। হঠাৎ পাগলামি করতে ইচ্ছা করল। দেখো, বস ঠিক ফোন করবে।

দোনামোনা করতে করতে বেরিয়ে গেল সোমা।

একটু পরে বেরোলো রণিত। এস্‌প্ল্যানেড মুখো একটা ভিড় বাসে উঠল। বাস বিবাদিবাগ হয়ে যাবে। গরমে, ঘামে, ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচিতে মন্দ লাগছিল না ওর। বসার সিট নেই। দাঁড়ালো কোনো রকমে। কোনো রকমে টিকিটটা কাটা গেল। ওর মনে পড়ে ওদের কোম্পানির সুন্দর এসি বাস, নরম গদি, সুগন্ধিতে ভরপুর, হালকা নীল কাঁচের জানলার ভিতর নীরব পৃথিবী। কোথাও কোনো কথা নেই। ল্যাপটপে বা পত্রিকায় মগ্ন সবাই। ওই চলমান সুন্দর ঘরের বাইরে ধুলোয়, গরমে, ভিড়ে তখন খাবি খায় আরেকটা পৃথিবী। কোম্পানির বাসের ভেতরে বসে বাইরেটাকে কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়। অনেকদিন পর আজ পাবলিক বাসে উঠেছে রণিত। ওর ছোট্ট সুন্দর গাড়ি ওর বউ সোমাকে তখন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্কুলে।

বিবাদিবাগে বাস খালি হয়ে গেল। শাঁশাঁ করে বাস ছুটল এস্‌প্ল্যানেডের দিকে। এস্‌প্ল্যানেডে পৌঁছে রণিত বাস থেকে নেমে হাঁটতে থাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে। মন্দ লাগছে না ওর। সব কেমন নতুন বলে মনে হচ্ছে। ও যেন কোনো বিদেশি শহরে বেড়াতে

এসেছে। অথচ সবটাই ওর চেনা। চেনা-জানা জগতটা এমন অচেনা, অজানা লাগতে পারে, ও ভাবতেই পারছে না। ও এতটা বদলে গেছে? ফুচকার স্টল, কাটা ফলের খোলা দোকান, সারিসারি হলুদ মলাটের পর্নোর বই রাস্তার ধারে, ডাঁই করা সস্তা টি-শার্ট সব চেনা জিনিস নতুনভাবে ওর চোখে ধরা দিচ্ছে। মেট্রোয় নামার খোলামুখের কাছে পায়ে পায়ে পৌঁছে যায় ও। হঠাৎ জুতো পালিশওয়ালা দেখে এগিয়ে যায়। পা বাড়িয়ে দেয়। একজোড়া চপ্পল ওর দিকে এগিয়ে দেয় পালিশওয়ালা। রণিতের চোখ চলে যায় পালিশওয়ালার পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটার দিকে, পালিশওয়ালার বৌ হবে। মেয়েটার কোলের কাছে বছর তিন-চারেকের শিশু। সেও ঘুমে কাদা। এত শব্দ, এত আলো, এত ধূলো, এরই মধ্যে স্রেফ ছেঁড়া ব্যাগ মাথায় দিয়ে গামছা বিছিয়ে ঘুমোচ্ছে মা ও শিশু। অথচ রণিত? কাল সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারে নি। এসি ঘর, ভর-পেট, নরম বিছানা, নীল আলো, হালকা বাজনা, নীরবতা, কিছুই ঘুম আনতে পারেনি ওর চোখে। অথচ এই মেয়েটা? স্রেফ পালিশওয়ালার ওপর ভরসা করে খোলা আকাশের নিচে, মেয়ে বা না-মেয়ে বাচ্চাকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমের স্বর্গে পৌঁছে গেছে। রণিতকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে পালিশওয়ালা সাফাই গাওয়ার মতো করে বলতে থাকে—'বাচ্চাটা রাতে কষ্ট দেয়। জেগে থাকে। ঘুমোতে দেয় না।' লজ্জা পেয়ে রণিত চোখ ফেরায়। এস্‌প্ল্যানেডের ব্যস্ত চেহারা রণিতকে নাড়া দেয়। মানুষগুলো চারিদিকে ছুটছে। বাস, ট্যাক্সি ছুটছে নানা দিকে। এই প্রবলগতির নানা স্রোত রণিতের অপরিচিত নয়। তবুও আজ ও যেন বিদেশি। অবাক হয়ে চারিদিকটা দেখতে থাকে। রাতজাগা চোখে সবকিছু যেন অবাস্তব রকমের স্পষ্টতা নিয়ে ধাক্কা মারছে। ও সবকিছুই দেখছে। অথচ ঠিক যেন বুঝতে পারছে না। না ঘুমোলে এরকমটা ওর হয়। তবে আজ প্রথম অফিসের বাইরে এসবের মুখোমুখি হচ্ছে ও।

পঁচাত্তর থেকে একশো ট্রিলিয়ন কোষ দিয়ে তৈরি একজন পূর্ণাবয়ব মানুষের শরীর। এক অজানা ছন্দে কোষেরা কাজ করে চলেছে। আমরা ছন্দটা ধরবার চেষ্টা করি। আমরা যখন ঘুমের রাজ্যে, তখন কোষেরা যে আচরণ করে, আমরা যখন ধাক্কাধাক্কি করে বাসে উঠি তখন তারা যে আচরণ করে এই দুটি আচরণে বিস্তর ফারাক। ঘুমের সময় হার্টের যা গতি, বাসে ওঠার সময় হার্ট যদি সে গতিতে চলে, বাসে আর ওঠা হবে না। হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে হবে। এভাবেই ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন ডা. ঘোষ। মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের একজন শিক্ষক উনি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ ঘুমের রাজ্যে থাকবে প্রায় সাত ঘণ্টা। অবশ্য শিশুদের ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্ন। স্বাভাবিক নিয়মে শিশু অনেক বেশি সময় ঘুমোয়। যাই হোক, ঘুমের সমস্যা একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের জীবনে আসতে পারে বিভিন্ন কারণে। উদ্বেগ, দুঃখবোধ, হতাশা, পরিবেশের প্রতিকূলতা ঘুম কেড়ে নিতে পারে একজন মানুষের। ডা. ঘোষ বলেছেন, ''চারিদিকটা তো দেখছ। সমাজের নানা ঘটনা নাড়া দেয় না আমাদের? এই তো সেদিন একজন ভদ্রলোক এলেন আউটডোরে। পেশায় শিক্ষক। লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ওনাকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে, যে উনি অদ্ভুত এক মানসিক অবস্থায় বাস করছেন। ওনার স্ত্রী বললেন—দেখুন ডাক্তারবাবু, অপরের দুঃখ এতটা একজন মানুষকে টলিয়ে দিলে সে বাঁচবে কীভাবে? আমার সংসার তো টলোমলো। মনোরোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটা জানো? স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মধ্যে সীমারেখা টানা। সামাজিক প্রেক্ষিত এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক সমাজে যা সহজ, স্বাভাবিক আচরণ, অন্য সমাজে তা অস্বাভাবিক হিসেবে দেখা হতে পারে। মনোরোগের ক্ষেত্রে এসব জটিলতা রোগ নির্ণয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। এই যে ভদ্রলোক অপরের দুঃখে এতটা কাতর হলেন যে তার মন প্রায় বিকল হতে বসেছে, এই ব্যাপারটা তোমরা কীভাবে দেখছ? যে মানুষ বিপদগ্রস্ত মানুষকে পাশ কাটিয়ে অনায়াসে নিজেরটা গুছিয়ে নেয়, তাকেই সবাই দেখে সাফল্যের দরজায়। আর যে লোকটা অপরের দুঃখ অনুভব করে পথহারা হল, তার জন্য রইল ওষুধের শিশি, মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চেম্বার। কী শিখলে এই ব্যাপারটা থেকে? অপরের জন্য দুঃখে কাতর হওয়ার চেয়ে অনুভবের ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত করে শুধু নিজের টুকু নিয়ে থাকার নাম স্বাভাবিকতা। তাই তো? কোনো এক ছাত্র বলে—তা কী করে হয়?

—তাই তো দাঁড়াল।

—কোথাও একটা গোলমাল আছে।

—কোথায়?

—বুঝতে পারছি না স্যার।

—কে একজন ক্ষুদিরাম হওয়াকে বোকামি বলেছিল না? কত অনায়াসে ক্ষুদিরামের নামের আগে বোকা শব্দটা চলে এল। আত্মত্যাগ নয়, বোকামি। আজকের দিনে হলে হয়ত ক্ষুদিরামের মতো মানুষকে মনোরোগের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিত অনেকে। সমাজের এই উল্টো চলাটাই স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে তুলে ধরছে আজকের টিভি সিরিয়াল, সিনেমা, গল্প, উপন্যাস। মাঝে মধ্যে কেউ কেউ ব্যতিক্রমী কিছু করে বসে। এছাড়া সমাজের বর্তমান গতির নিরিখে ভদ্রলোক তো বোকা, বুদ্ধু, পাগল বা যাহোক একটা কিছু। কী ওষুধ দেবে ওনাকে?

ছাত্ররা এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

আউটডোরে ছাত্রদের পেছনে অনেক সময় ভিড় করে রোগী, রোগীর বাড়ির লোক, তারা মজা পায়। বিষয়টা যেহেতু নেহাতই ডাক্তারির নানা শব্দবন্ধের সীমা অতিক্রম করে সবার সমস্যার কাছাকাছি পৌঁছেছে, অনেকের মুখ মুসমুস করলেও কথা বলাটা ঠিক হবে না ভেবে সবাই চুপ করে থাকে। কিন্তু চঞ্চলতাটা ধরা পড়ে। এই ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল রণিত। ডাক্তারের বন্ধু। প্রথমে চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল সে। ভালো লাগছিল বন্ধুকে এভাবে, এই ভূমিকায় দেখে। কিছু না ভেবে হঠাৎই ডেকে বসল বন্ধুকে—এই সুজয়।

সুজয়, মানে ডা. সুজয় ঘোষ রণিতকে রোগীর ভিড়ে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সম্বিত ফিরতে চিৎকার করে ডাকে—আরে, রণিত মহারাজ যে, কোত্থেকে? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুজয়। রোগী, রোগীর বাড়ির লোকেরা পথ করে দেয় রণিতকে। দুই বন্ধু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। দুই বন্ধুর দৌলতে ছুটি হয়ে যায় ছাত্রদের। অন্য ডাক্তারের ওপর আউটডোরের বাকি রোগীদের ভার দিয়ে সুজয়-রণিত ফাঁকা জায়গা খোঁজে। সোজা রাস্তায় এসে বসে দু-জনে। ফুটপাথের ছোটো চায়ের দোকানে বসে। তারপর নানা কথা। কে কোথায় আছে, কী করছে এরকম বহু কথার স্রোতে দু-জনে ভাসতে থাকে। ঘণ্টাখানেক কথার পর দু-জনে চলে যায় দুদিকে। সুজয় ফিরে আসে আউটডোরে। রণিত অগত্যা বাড়ি ফেরে।

সেদিন রাতে ঘুমিয়েছে রণিত। অনেকদিন পর মোটামুটি ভালো ঘুম হয়েছে ওর। সকালে বেশ হালকা লাগছে। বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়া, মেঘমুক্ত নীল আকাশ, টুকরো টুকরো স্বপ্নের রেশ ওকে নির্মল আনন্দ দিল অনেক দিন পর। বিছানায় বসে চা খেতে খেতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল ও। ব্যস্ত শহরের চেহারা ওকে আস্তে আস্তে স্বপ্নের জগৎ থেকে নিয়ে এসে নামায় বাস্তবের ধূসর মাটিতে। অফিস যেতে হবে ওকে। সেই কম্পিউটার, এসি ঘর,

চেনা গন্ধ, পর্দাঢাকা নীল কাচের বড় জানালা। ধোঁয়া ওঠা কফি, ফাইল, বসের ফোন, ভিড় করে ওর মনে। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে ওর বুক থেকে। নিজের মনকে বোঝায়, সবাই তো এভাবেই বেঁচে আছে। যাদের এসব নেই তারা কি ভালো আছে? মোটেই নয়। বেকারত্বের ঘুনধরা একঘেয়েমি তাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। ওকে খাচ্ছে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড। অদ্ভুত একটা হাসি ওর মুখে। ও অবাক হয়। এরকম দুঃখের হাসিও লুকিয়ে ছিল ওর গভীরে? যন্ত্রচালিতের মতো অফিস যায় রণিত। প্রচুর কাজ করে। রাত করে বাড়ি ফেরে মাথাব্যথা নিয়ে। মাথা ধরার বড়ি খায়। রাত কাটে আধোঘুম, আধোজাগরণে।

রবিবার সুজয়ের বাড়িতে রণিত বসে চা নিয়ে। দুই বন্ধুতে আজ কাটাবে গোটা একটা বেলা। সোমা বাপের বাড়ি গেছে। বিকেলে ফিরবে। হালকা মুডে দুই বন্ধুতে ছেলেবেলায় হারিয়ে যায়। সেই সময়ের মারপিট, বড়দের কথা আড়াল থেকে শোনা, প্রথম সিগারেটের ধোঁয়ায় দম বন্ধকরা কাশি, প্রথম লুকিয়ে হোটেলে বসে বিয়ারের স্বাদ, উত্তেজনা, লঙ্কামেশানো বাদামভাজা, অল্প আলো আর ঝিমধরা বাজনার তালে গ্লাসে চামচ ঠুকে তাল দেওয়া—সব, সব গল্প ভিড় করে ওদের কথায়। তারপর কারও বা অসফল প্রেম, কারও প্রেম থেকে বিয়েতে উত্তরণ, চাকরি, প্রাইভেট-গভর্নমেন্টের চাকরির টানাপোড়েনে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার গল্প, আপাতত যাকে বলে 'স্মুথ লাইফ'-এর নিরাপদ ঘেরাটোপের সংসারের ঘূর্ণিতে পড়ে রোমান্টিক জীবনের অপমৃত্যুর মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করে হাসিতে ফেটে পড়ে দুজনে। সুজয়গিন্নি হাসতে হাসতে যোগ দেয় ওদের কথায় বলে—'দু-বন্ধুতে নতুন রোমান্সের খোঁজে বোরোবে নাকি?' রণিত হাসতে হাসতে বলে—এ জীবনের মতো রোমান্সের ছুটি। এখন সময় ছোটোদের স্কুলে লাইন দেওয়া—প্রেগন্যান্সি পজিটিভ হওয়ার পর থেকে। 'খবর আছে নাকি?' লাফিয়ে ওঠে সুজয়ের বউ। রণিত হাঁ হাঁ করে ওঠে। 'না, না, আমি এখনও ভেবে উঠিনি।' এভাবে হাসি, গল্প, খুনসুটি ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যায়।

রণিত সোজাসুজি ওর ডাক্তার বন্ধুকে বলে, ''সুজয়, ভালো-না-লাগা, ঘুমহীন রাত্রি, ভাঙা ঘুমের বিরক্তিকর চক্র আর অফিসের বোরিং রুটিম আমাকে পিষে ফেলছে, বিশ্বাস কর।'' সুজয় একটু জিজ্ঞাসু হয়ে তাকায়।

—কী হয়েছে বলতো?

—আমার ঘুম আসে না কেন?

—অনেকেই ঘুমের সমস্যায় ভোগে, ওষুধ খা।

—ঘুমটা আসলে কী?

—বিশ্রাম, মস্তিষ্কের। তবে পুরো বিশ্রাম নয়। নানা কাজ এই সময় মস্তিষ্ক করে। জেগে থেকে সেই কাজ হয় না। যেমন, স্বপ্ন দেখা, মস্তিষ্কের এটাও একটা কাজ। সিগমন্ড ফ্রয়েডের কথায়—মনের গভীরে অচেতন জগতে যাওয়ার রাজপথ হল স্বপ্ন। 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ', 'নন-র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ', এইসব টেকনিক্যাল ভাষায় ঘুমকে ভেঙে ভেঙে দেখে মনোবিদরা। এটুকু জেনে রাখ্, স্বপ্ন সাধারণভাবে 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ'-এ দেখে সবাই। সাধারণভাবে ঘুমের মধ্যে যে সময়টা আমরা কাটাই তার মধ্যে প্রায় পঁটাত্তর ভাগ সময় 'নন র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ', আর প্রায় পঁচিশ ভাগ সময় 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ'। ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফিতে নানা ধরনের তরঙ্গ পাওয়া যায় ঘুমের মধ্যে। সে-সব তরঙ্গ জাগা অবস্থার তরঙ্গ থেকে অনেকটাই আলাদা, ঘুম নিয়ে মানুষ ভাবছে বহু যুগ ধরে। স্বপ্ন সম্বন্ধে তার মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে বহু যুগ আগে। প্রাচীনকালে গ্রিকরা ঘুমের দেবতাকে নাম দিয়ে ছিল, হিপনস; আর তার ছেলে মরফিয়াস স্বপ্নের জন্ম দেয় ঘুমন্ত মানুষের ভেতর। গ্রিকদের সে-সব দেবতাদের আজ নির্বাসনে পাঠিয়েছে মানুষ। মানুষ এখন মাপছে মাথায় তৈরি হওয়া ইলেকট্রিক্যাল ওয়েভ। ওই ওয়েভ বা তরঙ্গ তাকে হদিশ দিচ্ছে ঘুমের রাজ্যের।

—আমার মাথার টেউগুলো মেপে দেখবি নাকি?

—খ্যাপামো করিস না।

—বিশ্বাস কর্, ঘুমের জন্য সাধনা করতে হয় আমাকে। পাশে সোমা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আমি ওকে বিরক্ত করি না। চুপ করে রণিত।

সুজয় বোঝে হতাশা নানাভাবে জড়িয়ে ধরছে ওর বন্ধুকে। কিছুটা উদ্বেগ, কিছুটা একঘেয়েমি, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের প্রাণহীন হাসি, কথার বোঝা, এটিকেট, নিয়মের শেকল, বন্ধুর প্রাণশক্তি শুষে নিচ্ছে প্রতিদিন। বিনিময়ে মাসের শেষে ধরিয়ে দিচ্ছে প্যাকেজ। যা দেখে হিংসায় জ্বলে যাবে আর সকলে। টাকা এখন রণিতের কাছে নেহাতই সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাকার পাহাড়। অথচ ও এখন আকর্ষণ অনুভব করে না। টাকার প্রয়োজন আছে। আবার অপ্রয়োজনীয় অলস টাকার পাহাড়ের চূড়োয় বসে নিচের দিকে তাকিয়ে ও ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। স্খলনের ভয়। এখন গাড়ি ছাড়া ভাবতে পারে না, এসি ছাড়া থাকা অসম্ভব। মোবাইল খুব দামি না হলে ও আর স্বস্তি বোধ করবে না। পাহাড়ের চূড়োয় কেউ নেই ওর পাশে। ভয় পায় ও। সুজয়কে বলে,—''প্রেসার, সুগার সব আসবে এরপর। হেল্‌থ ইনসিওরেন্স আমাকে হয়তো কোনোদিন চেক-আপ করে পৌঁছে দেবে আই.সি.ইউ.-তে; তার, নল, মুখোশ পরে হয়তো শুয়ে থাকব কোনোদিন, পরম নিশ্চিন্তে; আমার যে ইনসিওরেন্স আছে। টাকা দেবে কোম্পানি। তুমি শুয়ে থাকো নিশ্চিন্তে। জানিস, এভাবেই শুয়ে আছে আমার এক কোলিগ। এরা সব টাকার অঙ্কে বোঝে। কী করে বোঝাই, একটু হাঁটা, দৌড়ানো, পুকুরে সাঁতার, দুটো ফালতু কথা, বিগবাজারের প্যাকেট নয়, 'কে.এফ.সি.'-র মুরগির ঠ্যাং নয়, আমাকে রসনার তৃপ্তি দিতে পারে পুকুরের কলমি শাক, বুড়ির ভাঙা ঝুড়ির দুটো কুমড়োর ফুল, একটা সতেজ লাউ, একটু কাটা মাছের ঝোল কালোজিরে দিয়ে; এইসব খেতে খেতে মনে পড়বে কুমড়ো ফুল বেচা একলা টিকে থাকা বুড়ির ফোকলা হাসি, বাজারের সিধে সাপ্টা লোকগুলোর রাখঢাকহীন কথার ফুলঝুরি।''

—তুই জগত-ছাড়া চিন্তার আবর্তে পড়েছিস।

—ওই বাজারটাও তো একটা জগত।

—তুই ওই গ্রহের প্রাণী না।

—এত বিচ্ছেদ?

—সুজয়ের হাতের সিগারেট জ্বলতে থাকে। লম্বা ছাই ঝেড়ে বলে—কী হবে এসব ভেবে? যেখানে আচ্ছিস আনন্দে থাক। ওষুধ আছে। প্রবলেম হলে ওষুধ খা।

—আমাকে যাচাই করছিস? বিশ্বাস কর্ আমি বুঝিনি এই প্যাকেজের পেছনে এমন এক জগত।

—বুঝলে কি কুমড়োর ফুল বেচতিস্?

—তা ঠিক নয়। এই দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু একটা তো হতে পারে।

—তুই অন্যরকম মাসের পয়লা দেখিস নি। পাই-পয়সা হিসেব করে পা টিপে টিপে চললে বুঝতিস্।

—তুই বুঝিস?

—আমার কাছে ওই গ্রহের অনেক মানুষ আসে। তারা তোকে দেখলে ভাববে, কি বোকা লোকটা। আসল সমস্যা কিছু নেই। স্রেফ মাথার পোকা নড়েছে। আদিখ্যেতা। হোতো আমাদের মতো! ওইসব

ফালতু দুঃখের ন্যাকামি ঘুচে যেত।

—বলছিস? আমি কিন্তু সিরিয়াস। আমি চাই প্রতিরাতে নিটোল একটা ঘুম। স্বপ্নের পরীরা এসে বাসা বাঁধুক আমার মাথার ভিতর। গ্রিক পুরাণের হিপনস, মরফিয়াস নেমে আসুক দিকহীন আকাশ থেকে আমার দু-চোখে।

—তুই লেখক বনে যাবি। চাকরি টিকবে না তোর। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড তোকে রেখেছে কম্পিউটার চালানোর জন্য। তোকে ওরা পয়সা দেবে, কাজ বুঝে নেবে। ভালো প্রোজেক্ট ধর। আমাকে ফোন করবি মাঝে মাঝে। আমিও করব। সোমাকে বলিস আমার সঙ্গে দেখা করতে।

—ওঃ! তুই সোমাকে বোঝাবি আমাকে কিভাবে লাইনে আনতে হবে, এই তো?

—না রে পাগল, জীবনটা এখন তোর একার নয়, দুজনের।

—কখনও কখনও পাশের মানুষের সাহায্য লাগে। সোমা হয়তো ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তোকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। তখন তুই আমার দেওয়া ঘুমের ওষুধ ছুঁড়ে ফেলে দিবি জানলা দিয়ে।

বিকেলে রণিত বাড়ি ফেরে। সন্ধ্যায় ফেরে সোমা। সোমা জানতে চায় কেমন কাটালো সারাটা দিন ওর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে।

রণিত বলে—জমিয়ে খেয়েছে। সিগারেট খেয়েছে মনের সুখে। বিয়ার খেয়েছে। খাবার খেয়েছে দেশি-বিদেশি সব ধরনের। বলে—দুই বন্ধুতে তাসের জুয়ো খেলেছে। সিডি চালিয়ে ইংরেজি সিনেমা দেখেছে। একেবারে রগরগে সিনেমা; হাসিতে ফেটে পড়ে রণিত।

সোমা বলে—অবিশ্বাস্য। আমার হিসাবে মিলছে না।

—তুমি সুজয়কে, না, ওর বউকে ফোন কর।

সময় তো কারো জন্য বসে থাকে না। কোথা দিয়ে চলে গেছে তিন-চারটে মাস, সুজয়ের খেয়াল নেই। ফোন করব করব করেও ফোন করা হয়নি রণিতকে।

হঠাৎ শেষ রাতে সোমার ফোন পেল সুজয়। কাঁপা গলায় সোমা বলল—সুজয়দা, একসঙ্গে অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়েছে রণিত। বোধ হয় মাঝরাতে উঠে খেয়েছে। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। বুঝতে পারি নি। ওষুধের খালি স্ট্রিপ দেখে বুঝলাম, ওষুধ খেয়েছে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। ডেকে সাড়া পাচ্ছি না। প্লিজ সুজয়দা, একবার আসুন না।

''যাচ্ছি'' বলে মোবাইল নামিয়ে সোজা গ্যারেজে গেল সুজয়। বউকে বলল—''ইডিয়েটটা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। সোমা ফোন করেছিল।''

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল সুজয়। ফাঁকা কলকাতা। টপস্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে সুজয়। সবে ভোরের আলো আকাশ ভরিয়ে দিচ্ছে। শান্ত চারিদিক। প্রকৃতি যেন নিশ্চিন্ত আরামে একটু একটু করে চোখ মেলছে। সুজয়ের মনে পড়ে, ছোটোবেলায় দাদু বলেছিল—'দাদুভাই, ঊষালগ্নে প্রকৃতি থাকে শান্ত। ঊষালগ্নে গভীর শান্তিতে ডুবে থাকে বিশ্বচরাচর।'

With Best Compliments of

SHYAM GROUP

SHYAM SEL & POWER LTD.

Sl. No. 61

ওষুধে অসুখ

(ওষুধ থেকে ত্বকের অসুখ)

ডা. কৌশিক লাহিড়ী

সময়টা একদম ভালো যাচ্ছে না সৌমিতের। জ্বর সারতে না সারতেই ফের একটা উটকো ঝামেলা। দিন তিনেক হল নিচের ঠোঁটের বাঁ দিকে একটা বিশ্রি ব্যাপার হয়েছে। প্রথমে লাল হয়ে চুলকাতে শুরু করেছিল। প্রথমে সৌমিত ভেবেছিল পিঁপড়ে বা পোকাটোকা কামড়েছে বোধহয়। একই সাথে তলপেটেও একটা দাগ হয়েছে। সেটাও একই রকম চুলকাচ্ছে। লাল থেকে আস্তে আস্তে কালো হয়ে গেল দাগটা।

কদিন এটা-সেটা লাগিয়ে যখন কোনো লাভ হল না, তখন সৌমিত গেল ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু মানে ডা. মৈনাক গুপ্ত। ত্বক বিশেষজ্ঞ।

দাগ দুটো দেখলেন ডাক্তারবাবু। প্রথমে খালিচোখে, তারপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে। তারপর হাসলেন।

—কী ওষুধ খেয়েছিলে? জ্বর-টর হয়েছিল নাকি?

অবাক হল সৌমিত। গোয়েন্দা না ডাক্তার?

—হ্যাঁ, মানে, ওই পাড়ার ওষুধের দোকানের মানিকদা, ও-ই দিয়েছিল জ্বরের ট্যাবলেট। সাদা মতন।

—ওই ট্যাবলেট থেকেই এই গণ্ডগোল হয়েছে।

—মানে! ওষুধ খেয়ে? এটা ওষুধ খেয়ে হয়েছে?

—ঠিক তাই সৌমিত। এটা ওষুধ থেকেই হয়েছে। এটাকে বলে ফিক্সড ড্রাগ ইরাপশন। কিছু নির্দিষ্ট ওষুধে, নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় এই উৎপাতটি ঘটে বলে 'ফিক্সড' কথাটা বলা।

—কী ওষুধে হয়েছে, ডাক্তারবাবু?

—তোমার ক্ষেত্রে হয়ত সালফা ড্রাগস অথবা জ্বর কমার ওষুধ থেকে হয়েছে। তবে অন্য ওধুষ থেকেও হতে পারে।

—তবে কী করব, অসুখ করলে? সৌমিতের আকুল প্রশ্ন।

—ওষুধ খাবে। তবে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো। আর সচেতন থাকবে কোন ওষুধে তোমার অ্যালার্জি।

—বাবা!

—হ্যাঁ, এবার না হয় অল্পের ওপর দিয়ে গেল, ওষুধ খেয়ে কিন্তু বড় ধরনের বিপদও হতে পারে।

—বড় ধরনের বিপদ? মানে—

—যেমন ধর, সারা শরীরের চামড়া উঠে গিয়ে এক্সফোলিয়েটিভ ডার্মাটাইটিস।

—কী সাংঘাতিক! কোন ওষুধে?

—ধর সালফাড্রাগস, স্যালিসাইলেটস বা অন্য কিছু ব্যথা কমার ওষুধ, টেট্রাসাইক্লিন, পেনিসিলিন—এইসব।

—আর কী হতে পারে ডাক্তারবাবু, ওষুধ থেকে? দুর্বল গলায় জানতে চাইল সৌমিত।

—হতে পারে অনেক কিছুই। যেমন আমবাত থেকে অ্যাঞ্জিও

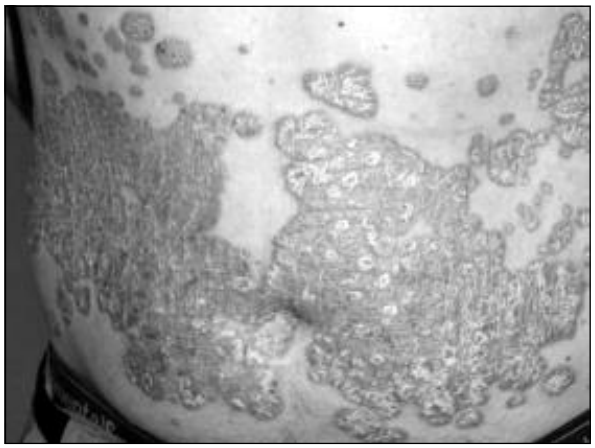

ইডিমা—ঠোঁট, মুখে ফুলে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে কেলেংকারি হতে পারে। হতে পারে প্রাণসংশয়কারী অ্যানাফাইল্যাক্সিস। অথবা ধর ফোস্কা। সারা গা জুড়ে। এরিথিমা মাল্টিফার্মি থেকে ভয়ংকর স্টিভেন জনসন সিন্‌ড্রোম—সবই সম্ভব।

মাথা ঝিমঝিম করছিল সৌমিতের।

—কী সব নাম, ডাক্তারবাবু!

—হ্যাঁ সৌমিত, শুধু নাম নয়, রোগগুলিও সাংঘাতিক। আমি কিন্তু তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য এত কথা বলছি না। বলছি তোমাকে সচেতন করতে। সাবধান করতে।

—হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি। শুকনো হাসার চেষ্টা করল সৌমিত।

—তারপর ধর, ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিড, সিপ্রোফ্লক্সাসিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে ফোটো অ্যালার্জি হতে পারে। ত্বক হয়ে যেতে পারে সূর্য-সংবেদী। চুলকে লাল হয়ে ফোস্কা পড়তে পারে শরীরের উন্মুক্ত অংশে। আবার ম্যালেরিয়ার ওষুধে কালো হয়ে যেতে পারে গায়ের রং।

—এছাড়া? সৌমিতের উৎসাহ বেড়েই চলেছে।

—ব্যথার ওষুধ খেয়ে আমবাত হতে পারে। আর্থাইটিস আর সোরাইসিসের ওষুধ মিথোট্রিক্সেট থেকেই হতে পারে মুখের ঘা। ক্লোরোকুইন, ক্লোরপ্রোমাজিন থেকে রং বদলে যেতে পারে চুলের। আবার গ্যাংগ্রিন হতে পারে কুমারিন থেকে।

—গ্যাংগ্রিন! সে তো শুনেছি সাংঘাতিক ব্যাপার!

—তা তো নিশ্চয়ই, তাহলে আর একটা অসুখের নামও জেনে রাখো। সেটা আরও সাংঘাতিক। নামটা বড়। টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস ব্যথার ওষুধ, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, এপিলেপ্সির

ওষুধ, টিবির ওষুধ এছাড়া আরও কিছু ওষুধ থেকে কারো কারো হতে পারে এই অসুখটা। এ-অসুখে সারা শরীরের ত্বক ঝলসে পুড়ে যাবার মতো উঠে যায়। মৃত্যু ঘনিয়ে আসে বেশ কিছু ক্ষেত্রেই।

—সে কী? স্কিন ডিজিজে মানুষ মারা যায় নাকি?

—হ্যাঁ সৌমিত, এরকম কিছু দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে যায়। আর সেটা যদি ওষুধ খেয়ে, মানে আমন্ত্রণ করে ডেকে আনা অসুখ হয়, তাহলে আর পরিতাপের সীমা থাকে না।

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওষুধ লাগিয়ে কোনো অসুখ হতে পারে?

—খুব সুন্দর প্রশ্ন সৌমিত। হ্যাঁ পারে। হয়ও। যেমন বোরিক পাওডার থেকে কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস, TEN এমনকি কিডনির সমস্যা হতে পারে। নিওস্পোরিনের নাম তো শুনেছো অথবা ক্যালাড্রিল। কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস হতেই পারে এসব লাগিয়ে।

—আর স্টেরয়েড?

হাসলেন ডা. গুপ্ত।

—ভালো ভেবেছ। না জেনে বুঝে কেউ যদি শক্তিশালী স্টেরয়েড ক্রিম (যেমন বেটনোভেট, লোবেট, টেনোভেট) মেখে চলে দীর্ঘদিন বিশেষত মুখে, তার থেকে সমস্যা হতে পারে।

—তবে যে শুনেছি ওগুলো মাখলে মুখ পরিষ্কার হয়!

—ভুল শুনেছ। ব্রন হতে পারে। ত্বক পাতলা হয়ে যেতে পারে। সরু সরু রক্তনালী দেখা যায় এই রকম ত্বকে। রোদে গেলেই মুখ টুকটুকে লাল। মেয়েদের মুখে লোম বেরিয়ে যেতে পারে এর থেকে। আবার কোয়াড্রিডার্ম, সারফাজ এস এন, ক্যানডিড-বি, স্টেটাম প্লাস জাতীয় মলমেও থাকে শক্তিশালী স্টেরয়েড। দাদের মলম বলে বগলে, কুঁচকিতে যখন খুশি তখন এসব লাগালে কেলেংকারি।

—কিন্তু বডি বিল্ডিং করতে গেলে নাকি স্টেরয়েড খেতে হয়।

—না সৌমিত। সেটা খুব ভুল আর মারাত্মক ধারণা। ওমনাকর্টিল, বেটনিসল জাতীয় ওষুধগুলি আসলে অতিপ্রয়োজনীয় আর জীবনদায়ী ওষুধ। শুধুমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ মতোই খেতে হবে। তা না করে কেউ যদি নিজের মতো খেয়ে চলে, তাহলে ঘোর বিপদ!

—বিপদ?

—বিপদ নয়? শরীরের ওজন বাড়তে থাকবে, মুখ গোল হয়ে যাবে, চর্বি জমবে ঘাড়ে-গলায়, হাত-পা সরু হয়ে যাবে। চামড়ায় ফাটা দাগ দেখা দেবে। গায়ে, পিঠে, মুখে দানা দানা ব্রন বের হবে। এছাড়া ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেশার, এসব জটিলতাও দেখা দিতে পারে। মেয়েদের কিছু শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

—ওরে বাবা।

—বন্ধুদের বোলো এসব কেমন?

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। ওষুধের দোকানের মানিকদাকেও বুঝিয়ে বলতে হবে, এভাবে ওষুধ না দিতে।

—ঠিক তাই সৌমিত।

—আর ডাক্তারবাবু, আমার ঠোঁটের দাগটা?

—ওটা সেরে যাবে। ওষুধ লিখে দিয়েছি। একটু সময় লাগবে। এরপর থেকে একটু সচেতন থেকো ওষুধের ব্যাপারে। কোন ওষুধে তোমার অ্যালার্জি, সেটা জেনে রাখাই ভাল।

হাসল সৌমিত।

সচেতনতার হাসি।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

খোয়াই

এই সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশনা

পুরুষোত্তম সামন্ত সরণি, কুণ্ডুপুকুর, বর্ধমান-৭১৩১০১

Sl. No. 89

বজ্রপাতে বজ্রশাসনের বজ্রগেরো

অচিন পত্রী

''খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়াছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে কটাক্ষ করিলেন। হারুর মাথার কাঁচা-পাকা চুল আর মুখের বসন্তের দাগ ভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মুক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়ে তোলা চিন্ময় জগতটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।...

কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুংকার ছাড়িলেন। তারপর জোরে বৃষ্টি ঝাঁপাইয়া পড়িল।...

মরে গেছে নাকি ছোটোবাবু?

মরে গেছে। বাজ পড়েছিল।''

উপরোক্ত অকাল মৃত্যুর বিবরণটি দিয়ে একটি বিখ্যাত উপন্যাসের সূচনা। গ্রামের শেষে সর্পসঙ্কুল ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে কিছু একটা পড়ে থাকার রহস্য অন্বেষণ করতে গোবর্ধনকে সঙ্গে নিয়ে আসা শশী খুঁজে পায় বজ্রপাতে মৃত হারু ঘোষকে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় বিবৃত এমন সহজ সাধারণ মৃত্যুর ঘটনা গ্রাম বাংলায় স্বাভাবিক ব্যাপার, বিরাম বিহীনভাবে ঘটেই চলেছে ঝড়-বৃষ্টি-বাদলায়। অমন দুয়েকটা মৃত্যুতে কারুরই কোনো হেলদোল দেখা যায় না। যার যায় তারই যায়, দু-তিনটে দিন গ্রামটা, পরিবারটা একটু থমথমে হয়ে যায়; দম মেরে থাকে, প্রিয়জন হারানের অমন অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকের মধ্যেই দলা পাকিয়ে গোঙরাতে গোঙরাতে হারিয়ে যায়। তারপর যে কে সেই।

জুন, জুলাই ২০১৫ মাসে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কিছু কিছু বিষয় সাধারণ মানুষকে তার স্বাভাবিক স্বভাবজ নির্লিপ্তি থেকে সামান্য হলেও কিছুটা চ্যুত করতে পেরেছে। এহেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের মৃত্যু, বিষয়-সম্পত্তির তথা অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট। জুন '১৫ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা ২০ ছাড়িয়ে গেছে। ঐ মাসের ২ তারিখে মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন এলাকায় ৮জনের মৃত্যু হয়েছে, মৃতরা সকলেই মাঠে চাষের কাজে রত ছিলেন। যখন এইসব ভাবনা তাড়িত করছে তখন মনে হল, জুন ৬ ২০১৪ 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'-তে প্রকাশিত গবেষণাধর্মী একটি নিবন্ধের কথা। ঐ নিবন্ধের আলোকে বজ্রপাত সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় উল্লেখ ও আলোচনার উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদনের অবতারণা।

বাজ পড়া প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র। প্রকৃতির রোষে সভ্যতাগর্বী মানুষের অসহায়তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। বজ্রাঘাতে মানুষের মৃত্যু তেমনই একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, যেখানে অসহায়তা তাকে প্রতিনিয়ত অস্থির করে তোলে; নীরবতা, সয়ে যাওয়া, মেনে নেওয়া যেন তার শক্তি-পরাক্রম-জ্ঞান-প্রযুক্তি উদ্ভূত কৃৎ-কৌশলকে ব্যঙ্গ করে অবিরত; তাই হতোদ্যম অস্থির মানুষ ও তার সমাজ তথা রাষ্ট্রশক্তি ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং প্রকৃতির বিধ্বংসী শক্তিকে মোকাবিলার জন্য গড়ে তোলে 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট' বা বাংলায় যাকে বলা যায় 'বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা'। এতকিছুর পরেও মানুষ, বজ্রাঘাতে মানুষের মৃত্যুরোধে স্থায়ী কোনো ব্যবস্থার উদ্ভাবন এখনো করতে সক্ষম হয়নি, শুধু কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ছাড়া।

বজ্রপাত কী বা কী কারণে হয় তা আবহাওয়া বিজ্ঞানের বিষয়। প্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে বাতাস বা মেঘের স্থানান্তর হেতু বা ধূলিঝড়ের অবাধ পরিক্রমার ফলে অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে কিংবা বায়ুমণ্ডলের অশান্ত বিনিয়ন্ত্রিত গতিবিধির কারণে উদ্ভুত তড়িত আধান একটি পরিবাহী আলোক বিচ্ছুরিত পথে ভূপৃষ্ঠের প্রতি প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানান ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভার নিয়ে। বিচ্ছুরিত আলোকিত পথকে আমরা দেখতে পাই কখনো মেঘ পরিবৃত বা কখনো মেঘমুক্ত আকাশ পানে। বলি বিদ্যুচ্ছটা বা বিদ্যুৎ চমক অথবা বিজলিঝলক। অধিকাংশ তড়িতাধান সৃষ্টি হয় মেঘ মধ্যে, তাই তা থাকে মানুষের নাগালের বাইরে। কৌতূহলের বিষয় এই যে, পৃথিবীর ভূবলয়ে সবসময় কোথাও না কোথাও এই তড়িতাধান উৎপন্ন হয়, যার সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে ৮(আট)। আরোও কৌতূহলোদ্দীপক যে, যে তড়িতাধান নির্গত হয় তার পরিমাণ ২,০০,০০০ অ্যাম্পিয়ার বা তারও বেশি। এর প্রবাহে পৃথিবী পৃষ্ঠের মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, বাড়িঘর, বৈদ্যুতিক কাঠামো, প্রাণী-অপ্রাণী সমস্ত বস্তুই আক্রান্ত হয়। এই প্রবাহে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ ৩০,০০০ ডিগ্রি কেলভিন বা ২৯, ৭২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ফলে বায়ুমণ্ডলে হঠাৎ উৎপন্ন চাপের তারতম্যের কারণে শক্তিশালী শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যাকে শুনি, চিনি বজ্রনির্ঘোষ বলে, যার পৃথিবীতে আসতে সময় নির্ণীত হয় শব্দের গতিতে, অর্থাৎ দেরিতে আর তার তড়িতচ্ছটা যাকে আমরা দেখি, চিনি বিদ্যুৎচ্ছটা বা বজ্রবিদ্যুৎ বলে, সে আসে আলোর গতিতে অর্থাৎ দেখার সাথে সাথেই। তাই প্রবাদ আছে যদি কেউ বজ্রপাত বুঝতে পারে তাহলে বুঝতে হবে, সে বিপদমুক্ত। পৃথিবীতে বজ্রপাতই ভূমণ্ডলীয় ভৌত প্রাকৃতিক উপাদান যা প্রাকৃতিক অগ্নির অশেষ ও স্থায়ী শাশ্বত উৎস।

পৃথিবীর কোথায় আর কখন বজ্রপাত হয় অর্থাৎ বজ্রপাত প্রবণ এলাকা কোনগুলি? মজার কথা মেরু অঞ্চল বা তার সন্নিহিত অঞ্চলে বজ্রপাত একেবারেই হয় না। মহাসাগরীয় বা তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় বজ্রপাতের পরিমাণ খুব কম। পক্ষান্তরে নিরক্ষীয় অঞ্চল উচ্চ বজ্রপাত প্রবণ বলা হয়, বিশেষত উত্তুঙ্গ পর্বত শ্রেণির তরাই অঞ্চল সমূহ। ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি, অধিকাংশ আফ্রিকান দেশসমূহ ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে বজ্রপাত বেশি হয়। পাকিস্তান বিশেষভাবে বজ্রপাত প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার কথা মানুষ ভুলে যায় কিন্তু ২০১০ সালের গ্রীষ্মে পাকিস্তানে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার আতঙ্ক সেখানকার মানুষ ভুলতে পারে না সেই সময় সেখানে ঘনঘন বজ্রপাত হওয়ার কারণে।

বজ্রপাতের কারণে সাধারণত প্রাণনাশের সংখ্যা একের বেশি হয়

না। একাধিক বা তার বেশি মৃত্যুর সংখ্যা অল্প। সেই কারণে সংবাদপত্র বা প্রচার মাধ্যমের কাছে তার গুরুত্ব কম। আবহাওয়ার পূর্বাভাষে উল্লেখিত হলেও বজ্রপাতের সতর্কীকরণের বিষয়টি গুরুত্বহীন থাকে। বজ্রপাতে মৃত ও আহতের সংখ্যা বিক্ষিপ্তভাবে জানানো হয়। প্রমাণিত তথ্যের জন্য প্রচার মাধ্যমের ওপর নির্ভর করতে হয়, যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়। সরকারি প্রচারমাধ্যম দুর্বল হওয়ার কারণে, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের তথ্যের ওপর একান্ত নির্ভরতা ও বিক্ষিপ্ত প্রচার মাধ্যমের দায়সারা রিপোর্টিং এর জন্য সঠিকভাবে বজ্রপাতে মৃত্যুর বা আহতের সংখ্যা ও সেই কারণে ক্ষয়-ক্ষতির বিস্তৃত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। চীন ও সুইজারল্যান্ড বজ্রপাত ও তৎসংক্রান্ত মারাত্মক ভয়ংকর পরিণতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়মূলক গবেষণায় প্রচারমাধ্যমের দৌর্বল্যের কথা ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবের কথা বলা হয়েছে। ভারত একটি বজ্রপাতপ্রবণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এখানে বজ্রপাত নিরূপণের কার্যকর ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি। সবেমাত্র ২০১২ সালে ভারতের মেটরলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বজ্রপাত উৎসের নিরূপণ করার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এতে বজ্রপাতের উৎপত্তি মেঘের অভ্যন্তর থেকে না মেঘে মেঘে ঘর্ষণে না মেঘ থেকে সরাসরি ভূমিতে পতন ইত্যাদি জানা যায়।

ভারতে জাতীয় স্তরে বজ্রপাতজনিত কারণে মৃত্যুর হার ও তজ্জনিত অরক্ষিত অবস্থার উন্নতিসাধন সম্পর্কিত বিষয়ে কোনো পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয়নি। এ সম্পর্কে প্রচলিত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশাসনিক স্তরে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করতে প্রয়াসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বজ্রপাতের কারণে সমাজজীবনে মৃত্যু সহ যেসব ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নির্ণয় করতে তিনটি তথ্যানুসন্ধানী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছেন। সেগুলি হল—১. ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেটা সেট (বি ই এস), ২. ডিজাস্টার আপডেট বুলেটিনস্ অব ন্যাশনাল ইন্সিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (এন আই ডি এম), ৩. ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো (এন সি আর বি) ডেটা। এইসব সংস্থাগুলি ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে সারা বছর বজ্রপাতের সংখ্যা, ঘনত্ব, মাত্রা ও ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করে, নথিভুক্ত ও প্রকাশ করে। সেই তথ্য অনুযায়ী ভারতের কোনো রাজ্যই বজ্রপাত মুক্ত নয়। প্রতিদিনের পাওয়া বজ্রপাতের যে বুলেটিন (২০০৪ থেকে ২০১২) বের হয় তাতে দেখা যায় ভারতের ১২টি রাজ্যে (কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কর্নাটক) বজ্রপাত জনিত মৃত্যুহার বিভিন্ন মাত্রায় ওঠানামা করে, কিন্তু বিপদ মুক্ত কোনোটাই নয়। এবং এই বুলেটিনে যে তথ্য পাওয়া যায় তা প্রচার মাধ্যম থেকে সংগৃহীত, তাই এতে প্রকৃত তথ্য প্রতিফলিত হয় না; বলা যায় প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রযুক্তি দপ্তর অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি তালিকা প্রণয়ন করে, তার বার্ষিক প্রকাশনায় ১৯৬৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ইতিহাস, প্রবণতা, বিপর্যয় অনুযায়ী মৃত্যুহার প্রভৃতি জানতে পারা যায়। যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো মানুষের প্রাণহানির জন্য দায়ি, সেগুলি হল মূলত বন্যা, ভূমিধ্বস, শৈত্যপ্রবাহ, দাবদাহ ও বজ্রপাত সঞ্জাত। বাকি মৃত্যুগুলো 'অন্যান্য দুর্যোগজনিত' হিসেবে ধরা হয়েছে। এইসব প্রকাশিত মৃত্যুহারে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা লক্ষ্যণীয়। ১৯৬০ থেকে এই বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১০০০ যেখানে অন্য সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মিলিত মৃতের সংখ্যা তার চেয়ে কম।

১৯৭১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ২৪ বছরের মৃত্যুতালিকা ঘেঁটে দেখা যায় যে, ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ বাদ দিলে বজ্রপাত জনিত মৃত্যুহার ১১৬৩ থেকে বেড়ে ২১৭৭ হয় যেটা সর্বসময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ১৯৯৩ সালে হিমালয়ান রেঞ্জে প্রকাণ্ড ভূমিধ্বস হয় ও ১৯৯৭ সালে সুপার সাইক্লোনের। ১৯৯৫ সাল থেকে এন সি আর বি সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত মৃতের তালিকা প্রণয়ন শুরু করে। সেখানে তুষারঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রবল বারিপাত সহ ১১টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ধরা হয়েছে, বাকিগুলো অন্য প্রাকৃতিক কারণে ফেলা হয়। ২০০১ সালে গুজরাটের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে প্রায় ১৩০০০ জনের মৃত্যু, ১৯৯৯ সালের ওড়িশা উপকূলে সাইক্লোনের তাণ্ডবে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, ২০০০ সালে ব্যাপক বৃষ্টি ও বন্যার ফলে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রাণহানি, ১৯৯৫ সালে প্রচণ্ড দাবদাহে অগণিত মানুষের মৃত্যু, এই চার মৃত্যু-হার বাদ দিলে দেখা যায় ১৭ বছরে (১৯৯৫-২০১২) বজ্রপাত জনিত মৃত্যুহার অন্যান্য বিপর্যয় অপেক্ষা বেশি। ৪৫ বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত মৃত্যুর পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখলে দেখা যায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১,৯৫,৭৪৫ তার মধ্যে বন্যা ১৮%, ভূমিধ্বস ১৩%, দাবদাহ ১৫%, শৈত্যপ্রবাহ ১৩% এবং বজ্রপাত ৩৯%। বার্ষিক মৃত্যুহার দাঁড়ায় বন্যায় ৭৯৫ জন, ভূমিধ্বসে ৬৭০ জন, শৈত্যপ্রবাহে ৫৭৩ জন, দাবদাহে ৬৭৩ জন আর বজ্রপাতে ১৭৫৫ জন। এই তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বজ্রপাতে প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সেই সঙ্গে ক্ষয়-ক্ষতিও। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, প্রশাসনিক স্তরে বজ্রপাতের মত মারাত্মক প্রাকৃতিক ঘটনা দুর্যোগ পদবাচ্য হয়ে বিপর্যয় তালিকায় স্থানলাভ করতে পারে নি, স্বীকৃতিহীন ব্রাত্য হয়েই আজও রইল পড়ে।

ক্ষয়-ক্ষতির পাদপূরণ শব্দটি ক্ষতিপূরণ। যখন ব্যক্তি ও সমষ্টির সাধ্যাতীত ক্ষতিসাধিত হয়, তখন রাষ্ট্রশক্তিকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায় তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিপূরণের একটি প্রাথমিক ধাপ আর্থিক আনুকূল্য বাড়িয়ে দেওয়া। রাষ্ট্র সেই হাত বাড়ায়। আমাদের দেশে দুর্গত মানুষের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সহায়তা পৌঁছনোর ব্যবস্থা করার দায়ভাগ বর্তায় দুই সংস্থার ওপর। একটি সেন্ট্রাল রিলিফ ফান্ড (সি আর এফ), অপরটি ন্যাশনাল ক্যালামিটি কনটিনজেন্সি ফান্ড (এন সি সি এফ)। প্রথমটি প্রতি বছর অনতিবিলম্বে দুর্গতদের ত্রাণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আগাম বরাদ্দ পাঠিয়ে দেয় যোজনা কমিশন দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য। আর বিপর্যয়ের পরিমাণ রাজ্যের সাধ্যাতীত হলে এগিয়ে আসে অপর সংস্থাটি। যদিও দুটি সংস্থাই একই মন্ত্রকের অধীন। পরবর্তীতে এই দুটি সংস্থার পুনর্গঠন হয় যথাক্রমে স্টেট ডিজাস্টার রেপপন্স ফান্ড (এস ডি আর এফ) ও ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এন ডি আর এফ)। পূর্বতন ও পুনর্গঠিত এই সংস্থা দুটির বজ্রপাত জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণের অধিকার ছিল না কোনোদিনও। তাই অদ্ভুত পরিহাস, বজ্রাঘাতে হতাহত পরিবারবর্গ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত পরিবারদের মতো কোনো ক্ষতিপূরণ কোনো সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া থেকে বঞ্চিতই থাকতে বাধ্য হয়।

যেহেতু বজ্রপাত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ত্রাণ-বহির্ভুক্ত, তাই হতাহত পরিবারের প্রিয়জনদের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল (সিএমআরএফ) থেকে অনুদান হিসেবে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো কোনো রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী এই ত্রাণ তহবিল 'মুখ্যমন্ত্রী দুর্গতদের ত্রাণ তহবিল' (সিএমডিআরএফ) নামে বা 'আপতবন্ধু' নামে পরিচিত। সাধারণের দান থেকে পুষ্ট এই তহবিলে অন্যান্য প্রয়োজনেও, বিশেষত দুরারোগ্য ব্যাধিতে (ক্যানসার, হৃদ্‌যন্ত্র, কিডনি প্রতিস্থাপন, মস্তিষ্কে টিউমার ইত্যাদি) আক্রান্ত অসুস্থ মানুষদের জন্যও ত্রাণ দেওয়ার বিধি আছে। ২০১৩ সালে গুন্টুরে বজ্রপাতে মৃত ৭টি পরিবারের অর্থসাহায্য, পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এরকম একটি

ঘটনায় মৃত পরিবারদের অর্থসাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারি নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানিকে দেয় ২৪.৩৯ কোটি টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে প্রতি পরিবারপিছু ৫০,০০০ টাকা ন্যূনতম ৬,০০০ পরিবারের জন্য এই সুবিধা চালু করেছে।

বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তালিকাভুক্তির চেষ্টা যে একেবারে হয়নি, তা নয়। ১৯৯৯ সালে আর্থিক সংস্কার নীতি রূপায়ণে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, বজ্র-বিদ্যুৎ জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় জল ও আবহাওয়া সংক্রান্ত বিপর্যয়ের আওতাভুক্ত করেছিল (এইচ পি সি, ২০০১)। চতুর্দশ অর্থ কমিশন ২ জানুয়ারি, ২০১৩ পাঁচ বছরের জন্য (২০১৫-২০২০) বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করে। অর্থ কমিশন বর্তমান প্রচলিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনার সাথে সাথে এই ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতিকল্পে গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দেরও পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রাণনাশ ছাড়া অন্যান্য আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়টিও আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ি, জমি, শিল্প কারখানা, বিদ্যুৎ, সড়ক রেল বিমান পরিবহন, পরিষেবা, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যে ক্ষতিসাধন বজ্রপাত করে, তার পরিমাণ কয়েক বিলিয়ন। সম্প্রতি অর্থবরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ দুই ক্ষেত্রেই বজ্রপাত জনিত প্রভাব উপেক্ষার বিষয় হিসেবে বিশেষজ্ঞরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। বজ্রপাত নিরোধ বিষয়ক না হোক শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণ সামলানোর প্রক্রিয়ায় বীমা খাতে খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে চলেছে সারা পৃথিবীব্যাপী। অবশ্য ভারতে এখনও বজ্রপাতকে বিমার সকল স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কতদিন বজ্রপাত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আওতার বাইরে রাখা যাবে, সেটা আপাতত প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন। আমেরিকায় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ৩০ শতাংশ বজ্রপাতের কারণে। বিমা খাতে বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় সেখানে। আই বি এম, জার্মানি সম্প্রতি তাদের একটি হিসেবে দেখিয়েছে বজ্রপাতের জন্য ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং-এর যে ব্রেকডাউন হয় তার ফলে কার্যত কোনো সংস্থাই ৪.৮ দিন কাজ শুরু করতে পারে না। অর্থাৎ বৈদ্যুতিন সকল মাধ্যম স্তব্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যাঙ্ক, পরিবহণ সহ মহাকাশ গবেষণা সবই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তড়িৎগতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য। বজ্রপাত জনিত মৃত্যুহার ও ক্ষয়-ক্ষতি ভারতে বড় রকমের একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলা হলেও সমাজজীবন ও প্রশাসনে এর গুরুত্ব খুবই কম, সম্ভবত এর অন্যতম কারণ বজ্রপাত খবরে পরিণত হয় না, একই সঙ্গে অনেক নয়, দুয়েকটি প্রাণনাশের কারণে। যেহেতু জাতীয় স্তরে স্বীকৃত কোনো তথ্যানুসন্ধান সংস্থা নেই যারা প্রাণনাশ ও আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়ার প্রতি দায়বদ্ধ, তাই বছরের পর বছর বিষয়টি অস্বীকৃত স্তরে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্ষতিপূরণ প্রকল্পে মান্যতা পায়নি। আশা করা যায়, এমন আলোচনাগুলি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং শীঘ্রই সমাজের সকল স্তরে এর প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা হবে, অন্তত আশু আর্থিক ক্ষতিপূরণ তৃণমূল স্তরে আক্রান্ত পরিবারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। অবশ্য তার জন্য উন্নততর প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, কৃৎকৌশলের দ্বারস্থ হওয়া জরুরি আর তার সাথে যুক্ত করতে হবে সর্বস্তরের, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের যৌথ উদ্যোগ যার পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে সরকার অনুমোদিত স্বশাসিত কোনো সংস্থা, যাকে অর্থ যোগানের দায়বদ্ধতা থাকবে সরকারের ওপর ন্যস্ত। তার আগে যেটা দরকার, সেটা আর কিছুই নয়, এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভাবনার, মানসিকতার পরিবর্তন, 'যেটা যেমন আছে তা ঠিক নয়, পাল্টাতে হবেই, কোনো না কোনোভাবে—এমনটা চলতে পারে না।' তবেই সুরাহা কিছু হতে পারে; আক্রান্ত মানুষগুলি বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পাবে, নইলে বিধাতার নয়, প্রতিবেশী, স্বজনের, সমাজের, রাষ্ট্রের অকর্মণ্যতা ও উন্নাসিকতার শিকার হয়ে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

পরিশেষে, এ বিষয়ে দু-একটি বিষয় সংযোজিত করার লোভ সামলাতে পারছি না। দেখা যায়, বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটে সাধারণত গ্রামে, মাঠে, প্রান্তরে। এর অধিকাংশ প্রান্তিক মানুষজন। লোকালয়, শহর, নগর, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি জায়গায় বজ্রপাত সাধারণ ঘটে না বা কম ঘটে, বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা থাকার ফলে। সম্প্রতি খেলার মাঠে বজ্রপাতে দুয়েকটি যুবকের মৃত্যু ঘটতে দেখা গেল। বজ্রপাতে সরাসরি মাটির সংযোগ বেশি সংবেদনশীল, অন্যত্র ততটা নয়। প্রান্তিক মানুষজন মাটির কাছাকাছি বেশি অবস্থান করেন, তাদের বাড়িঘরের বা কর্মস্থলের বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা অপ্রতুল, তাই তাদের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়িয়ে তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বজ্রপাতজনিত মৃত্যুকে বিমার আওতাভুক্ত করাটাও অন্যতম প্রধান কাজের মধ্যে পড়ে।

সারা পৃথিবীব্যাপী শুধুই অভাব শক্তির। এক সময় ছিল লক্ষ কোটি মানুষ বিবেচিত হত সম্পদরূপে। তাদের গতর, রক্ত, ঘাম, পরিশ্রম ছিল শক্তির আধার। দ্রুত বদল হচ্ছে শক্তির আধার। যদিও এখনও আখ্যা দেওয়া হয় পিঠ চাপড়ানার প্রয়োজনে মানুষকে 'মানবসম্পদ' রূপে। ক্রমবর্ধমান যন্ত্রশক্তির বিস্ফোরণ, উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কম্পিউটার যন্ত্রমানব তৈরির আড়ালেই প্রক্রিয়া চলে মানবসম্পদের প্রতিস্থাপন, মেঠো নাম তার 'মানুষ হটাও'। এবংবিধ প্রকল্প, পরিকল্পনা সবই সেই লক্ষ্যে। কেতাবের 'সম্পদ' এখন পরিগণিত 'আপদ'। নির্ভেজাল সত্য। অন্যদিকে চারদিকে বাড়ছে চাহিদা—শক্তির, বিদ্যুতের। হাহাকার। একমাত্র বিদ্যুৎ ছাড়া জগৎসংসার অচল। ভূগর্ভস্থ জ্বালানী ব্যবহার করতে করতে তলানিতে ঠেকেছে। দরকার বিকল্প। ভূপৃষ্ঠস্থ বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজনে জলের ব্যবহার তো কবেই শুরু হয়েছে, প্রায় তার বয়স কয়লা ব্যবহারের সমসাময়িক। সমুদ্র উপকূলে বেদম বাতাসেরও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা নেওয়া শুরু হয়েছে কবেই; বাকি ছিল ভূপৃষ্ঠ জুড়ে ঝলমলে সারাদিনমান ব্যাপ্ত পর্যাপ্ত রোদ। তাও বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। সৌরশক্তি। প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় শিল্পোৎপাদনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে জৈবজ্বালানির সঙ্গে তার সহাবস্থান। এরপর রইল পরমাণু শক্তি। দেশে দেশে প্রতিযোগিতা পরমাণু চুল্লি তৈরির। ঝুঁকি থাক, সস্তা ও সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রধান সংকট এখনও মেটেনি। তা হল, উৎপাদনের সাথে সাথে তাকে ব্যবহার করতেই হবে। বিদ্যুৎই একমাত্র শক্তি, যাকে সংরক্ষণ করে চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী পরে ব্যবহার করা যায় না। কোনোমতেই। চেষ্টা চলছে অবিরত। ওই কাজটা সম্পন্ন করতে পারলেই হাত পড়বে বজ্রবিদ্যুতের ওপর। বিশাল তার ভাণ্ডার। ব্যস 'বজ্রবিদ্যুৎ' হয়ে উঠবে সেরা শক্তির উৎস। হাটে, বাজারে হয়ত বিকোবে পৃথিবীর সেরা 'পণ্য' হিসেবে। সেদিন আর কত দূরে, অপেক্ষায় থাকা আশায় আশায়।

অভিন্নহৃদয় আমার এক বন্ধু নানান সময়ে অযাচিত উপদেশ বর্ষণে কখনও হয় না ক্লান্ত, খুব খেটেখুটে কী লেখা হচ্ছে শুনে তার মন্তব্য : এ যে বজ্রপাতে বজ্রশাসনের বজ্রগেরো! কার জন্য, কে পড়বে, কে-ই বা খুলবে এই জটিল গ্রন্থি—থুড়ি গিঁট?

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. *ই পি ডব্লিউ*, জুন ২, ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ
২. *লাইটনিং রিস্ক ইনি ইন্ডিয়া : চ্যালেঞ্জস্ ইন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট*, ফয়সেল ই ইলিয়াস, কেশব মোহন, শিবু আর মানি, এ পি প্রদীপকুমার

With best compliments of

DURGAPUR CONSTRUCTION

MECHANICAL, STRUCTURAL & PIPE LINE CONTRACTOR

J.P. Avenue, Durgapur-713211, Dist. Burdwan

Sl. No. 147

স্বপ্ন একাকার

ঘনশ্যাম চৌধুরী

নদীর এখন দুরন্ত যৌবন। ভরা বর্ষায় সে এখন উদ্ভিন্ন-যৌবনা। টইটম্বুর এই গাঙ বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। যেমন স্রোত, তেমনি তার ঢেউয়ের ছলাৎছল অহংকার। উপচে পড়ার মুহূর্ত-আগে দাঁড়িয়ে আছে সে। এর সঙ্গে আছে এলোপাথাড়ি ঘূর্ণি।

নৌকোর গলুইয়ে বসে সেই ঘূর্ণিজলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে গেল কাশীনাথের। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে ধাতস্থ হয়ে নিল। নদীর ডাইনে বাঁয়ে, দু-পারে অথবা সামনে সীমাহীন প্রবহমানতার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই কাশীনাথের মন দিশাহীন হয়ে যায়। তার মন নীরবেই সোচ্চার হয়। কোথা থেকে হাজারো প্রশ্ন এসে তাকে ভারাতুর করে তোলে তা সে নিজেই জানে না। তার নির্বাক চাউনি সবাক হয়ে ওঠে নিরুচ্চার প্রশ্নে—এই যে শুধুই অশান্ত বয়ে চলা, তারপর?

কিন্তু এই চলমান নদী কি তার প্রশ্নের জবাব দেবে? এখনও দেয়নি। হয়তো কোনোদিন দেবেও না। তাই জবাব নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। কখনও অশান্ত গতি, কখনও বা ধীর প্রশান্ত তার চলমানতা। এভাবেই চলতে চলতে নদী দেখে চলেছে তাবৎ জীবনের ওঠাপড়া। মানবজীবন বা প্রাণীকুলের সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না-পাওয়ার বিচিত্র কাহিনিও চলেছে একইভাবে, পাশাপাশি। এর কবে শুরু হয়েছিল, কবেই বা শেষ, কে জানে! নদী নিজেই কি তা জানে?

কাশীনাথ এইটুকুই বোঝে, এই গাঙের বুকে নৌকো নিয়ে বৈঠা বাইতে বাইতে, কিংবা মাছ ধরতে ধরতে কত মানুষেরই জন্ম-মরণ পেরিয়ে গেল। তার কোনো হিসাবের খাতা কেউ রাখে না। কত মাস-বছর, কত যুগও পার হল। তারই বা কোনো হিসাব আছে কি? তবে? তারপর? —এই সংশয়দীর্ণ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। নৌকোয় বসে বসে তার ভাবনা শুধুই ভেসে চলতে থাকে।

যুবক কাশীনাথের নৌকা এখন মাঝনদীতে। তবে এটা কাশীনাথের নৌকা না বলে তার বাবা দীননাথ মাঝির নৌকা বলাই ভালো। দীননাথ মাঝির এই নদীর

সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক পঞ্চাশ বছরের। দেশ-ভাগের পর এই বাংলায় এসে চালচুলোহীন, কর্মহীন বছর আষ্টেক কেটে যাবার পর দিনমজুরি, খেতমজুরি করে, কিছু টাকা ধারকর্জ করে একখানা নৌকোর ব্যবস্থা করেছিল সে। তারপর সেই যে নদীতে ভাসল জীবন, তা আজও চলছে। বিয়ে-থা, সন্তান, মাথা গোঁজার একটু শক্তসমর্থ ঠাঁই, সবই করেছে পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান দীননাথ মাঝি। এখন বয়স হয়েছে। তবে সবল দীননাথ মাঝির পেশীবহুল চেহারা এখনও তেমনি আছে। চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু শরীর আজও সুঠাম, সবল। সে যাই হোক, আসল কথা, দীননাথের বয়স হয়েছে। পরিপূর্ণ সংসারের মাঝখানে বসে সে এখন তার চারপাশটা একটু দেখে নিতে চায়। তাঁর এখন একটু অবসর দরকার। পরিশ্রম করতে সে জানে। তবুও সে সংসারের কাছে কিছুটা আলস্য দাবি করে। তাই সে তার একমাত্র ছেলে কাশীনাথকে হামেশাই বলে, কাশী, তুই অ্যাহন সংসারের হাল ধর। সেয়ানা হইছস। পড়াল্যাখাও করাইসি। আর ক্যান? এইবার আমি একটু হাত-পা গুটাইয়া বহি।

এই জন্যেই মাঝে মাঝে নৌকো নিয়ে বেরোতে হয় কাশীনাথকে। যেমন কাল রাত্রি থেকেই সে নদীতে ভাসাভাসির বৃত্তান্তের মধ্যে আছে। এই প্রবল স্রোতধারা তার কাছে নতুন নয়। ছোটোবেলা থেকেই সে দেখছে এই নদী। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত নদী থাকে শান্ত, সুভদ্র, তবে প্রাণবান। কিন্তু আষাঢ়ে বর্ষা নামার পর থেকেই সে ক্রমশ প্রশান্তি থেকে দূরে চলে যায়। তখন নদীর অন্য রূপ। সে রূপ সর্বনাশা, ভয়ংকর। সেই দামাল, দুরন্ত স্রোতের মাঝখানেই অশান্ত নৌকোখানা নিয়ে কাশীনাথ ভাবছিল নানা কথা। সারা রাত মাছের পেছনে হন্যে হয়ে ছোটার পর এখন নৌকোর পেটে রুপোলি মাছের ছড়াছড়ি। এই মাছ যাবে সকালের বাজারে। বিক্রির জন্য।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়েছিল। ভোরের আলোয় নদীর ভয়ংকর রূপ কাশীনাথের চোখে আরও দৃশ্যমান। মাঝনদী থেকে নৌকো আস্তে আস্তে ওদের গ্রামের পারের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সে সেভাবেই দাঁড় বাইতে শুরু করেছে। নৌকোয় আর এক মাঝি আছে। সে কাজ শেষ করে বসে ঝিমোচ্ছিল। এবার কাশীনাথ তাকে ডাকল।

—সাদেক চাচা। এইবার হালডা ধর। নাও পাড়ে ভিড়ামু।

বাবা দীননাথ মাঝির বয়সী সাদেক মিঞা বরাবরই এই নৌকোয় কাজ করে। হাল ধরে, বৈঠা বায়। আবার নদীতে জালও ফেলে। দীননাথ সবসময়ই বলে, বুজলি কাশী, ছাদেক মিঞা আমার খুব পয়া মানুষ। হ্যায় নৌকায় থাকলে দিনডা ভালো যায়। মাছ ওডে অ্যাক্কেবারে বাছা বাছা।

তাই কাশীনাথ যেদিন মাছ ধরতে নদীর গহিনে নৌকো ভাসায়, সে কিন্তু সাদেক চাচাকে সঙ্গী করতে ভোলে না। সাদেক মিঞার ইচ্ছা না থাকলেও যায়। বলে, আমার ভাইপোর যহন এমনই ইচ্ছা, গাঙে যামু তাইলে।

অবশ্য সাদেক মিঞার এটাই রুজি। কারোর না কারোর নৌকোয় তাকে মজুর খাটতেই হয়। ছোটোবেলা থেকে সেও এই নদীর সঙ্গে গাঁঠছড়া বেঁধেছে। খাটতে পারে, কিন্তু সে অতটা চালাক-চতুর নয়। তাই এতদিনেও নিজস্ব একটা নৌকো করতে পারেনি। সে মাঝে মাঝেই বলে, সারা জীবন পরের গোলামি কইরাই কাটাইলাম। নিজে কিসুই করতে পারলাম না। হালায় হগ্‌গলই নসিব। নসিবে না থাকলে আর ট্যাহা পয়সা আইব কী কইর‍্যা?

সাদেক মিঞা মন্দভাগ্যের দোহাই দেয়। আল্লাকে ডাকে। খোদাতালা, শরীলডা আমার ঠিক রাইখ্যো, বাকি কয়ডা দিন এই ভাবেই কাটাইয়া দিমু।

কিন্তু দীননাথ মাঝি ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে শেখেনি কোনোকালেই। শূন্য হাতে ওর বাবা মা-র হাত ধরে নিজ ভূমি ছেড়ে এই বাংলায় এসে নিজের ভাগ্য গড়তে নেমে পড়েছিল লড়াইয়ে। সে এক অমানুষিক পরিশ্রম। আজ যখন একান্তে নির্জনে চোখ বুজে সে ভাবতে বসে ফেলে আসা দিনগুলির কথা, মাঝে মাঝে তা অবাস্তব, অকল্পনীয় মনে হয়। নিকানো উঠোন, গোছানো বাড়ি, আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, আতা, লিচু—এমন সব গাছের সমাহার তার দেড় বিঘা জমির বসত বাটিতে। বউয়ের সারাদিন রান্নাঘরেই কেটে যায়। এছাড়াও আছে দুটো দুধেল গাই। সঙ্গে দুটো বাছুর। যতটুকু সময় দীননাথ বাড়ি থাকে, গোয়ালঘর সে-ই সামলায়। বাদবাকিটা দেখে তার বউ।

এক ছেল, এক মেয়ের মধ্যে দীননাথ মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল। মেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছিল। ছেলে কাশীনাথ বি.এ. পাশ করেছে। কাশীনাথকে নিয়ে তার চিন্তা হয়। এখনো একটা চাকরি জোটাতে পারল না। গতকাল দুপুরে সে কাশীনাথকে বলেছিল, কাশী, আইজ আমি গাঙে যামু না। নৌকাডা লইয়া তুই বাইরা। ছাদেক ভাইরে ডাইক্কা ল। গাঙ অ্যাহন ফুলভাসে। ভরা বর্ষা। মাছ অ্যাহন উঠবো ভালো।

কাশীনাথের ডাকাডাকিতে তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল সাদেক মিঞার। সে উঠে এসে নৌকার হাল ধরল।

দুই

প্রবল স্রোত বেমক্কা ঢেউ কাটিয়ে নৌকা পাড়ে ভেড়াতে সময় লাগছিল অনেক। উজানে বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে হল। দু-জনকেই কসরত করতে হচ্ছিল।

আগ্রাসী নদী হা-হা করে ছুটছে। সামনে যা কিছু পাবে, তাই যেন গিলে খাবে। তার মধ্যেই নৌকো সামাল দিয়ে পাড়ে ভেড়াতে হবে। কাশীনাথের তর সইছে না। তার মন ছটফট করছে। আর গহিন গাঙে নয়। এবার নামতে হবে মাটিতে। সেখানে আছে তার উদ্বেলিত আনন্দ, যৌবনের উপবন। এই দুরন্ত নদী এখন কাশীনাথের বুকের মধ্যে এসে তরঙ্গ তুলছে। কাল সারা রাত, তারপর ভোর, কাশীনাথের সময় কেটে গেছে কাজের মধ্যে। কাজ যেই শেষ হয়ে গেছে, ওমনি তার মন বাঁধনহারা। নদীর মতোই তার মনে ঢেউয়ের পর ঢেউ। অগুনতি তরঙ্গের রাশি। খরস্রোত জলধারা।

—কাশী, কাছিডা ধর দিহিনি বাপ।—সাদেক মিঞার কথায় তার সম্বিৎ ফিরল।

নৌকো পাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। নদী ফুলতে ফুলতে এখন স্থলের প্রায় কানায় কানায়। উদ্‌ভ্রান্ত ঢেউ বিপুল শক্তি নিয়ে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। জলঘাসগুলো কিছুক্ষণের জন্য ডুব দিচ্ছে তাতে। ফের জেগে উঠছে।

কাশীনাথ গলুইয়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা দড়িদড়া হাতে তুলে নিল। নৌকা পাড়ে এসে ঠেকেছে। কিন্তু স্রোতস্বিনী তাকে স্থির দাঁড়াতে দিচ্ছে না।

সাদেক মিঞা তার মেদহীন ঋজু শরীর নিয়ে লাফ দিল পাড়ে।

—কাশী, কাছিডা ফিক্কা ফ্যালাও। আমি খুডির লগে বাইন্ধ্যা দিতাসি। তাড়াতাড়ি কর। নাও সোজা রাখাই

মুশকিল। হালায় আবার বিষ্টি নামলে কাকভিজা হয়্যা যামু।

কাশীনাথ দড়ি ছুঁড়লো। দক্ষতার সঙ্গে তা লুফে নিল সাদেক মিঞা। পাড়ের খুঁটির সঙ্গে গিঁট লাগিয়ে দিল দড়ির। নৌকা ঢেউয়ের ধাক্কায় নাচানাচি করলেও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। কাশীনাথ চেঁচিয়ে বলল, চাচা, ডালাডা ধইরো। একটু আউগ্‌গাইয়া আহ। দেইখ্যো, হাত ফসকাইয়া না যায়।

নৌকো প্রচণ্ড দুলছিল। তার সঙ্গে নদীস্রোতের প্রবল শব্দ। দু-জনেই চিৎকার করে কথা বলছিল। নদীস্রোতের কল্‌কল্‌ ধ্বনি অতিক্রম করে ওদের কথা পৌঁছে যাচ্ছিল আর একজনের কানে। যার জন্য মনের মধ্যে জলতরঙ্গ বাজছিল কাশীনাথের। সেই মেয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে গাঙপাড়ে আসার রাস্তার ধারে ঘন পত্রআচ্ছাদিত অশ্বত্থ গাছের নিচে। তারই পাশে বিশাল এক শতবর্ষের আমগাছ।

এই ভোরবেলায়, সূর্য ওঠার প্রাক্‌মঙ্গল মুহূর্তে, সেই মেয়ের আসার কথা ছিল। যার জন্য কাশীনাথের মন নতুন দিনের ঊষালগ্নে উন্মাদপ্রায়। সারারাত্রি তরঙ্গসঙ্কুল এই নদীকে সামাল দিলেও রাতশেষে এই যুবক নিজের বুকের মধ্যেকার ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ সামাল দিতে পারছিল না। তার অনুসন্ধানী চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেই নারীকে। বুকের মধ্যেকার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে বাজছিল তার।

সাদেক মিঞা কাশীনাথের আনমনা ভাব লক্ষ করছিল। নদীর কলধ্বনি ছাপিয়ে তার গলা চড়ল—কাশী, ভালা কইরা ডালা ধইরো। নাইলে উল্‌টাইয়া আবার সব মাছ গাঙের পানিতে ভাসবো।

কাশীনাথ সচকিত হল। সবল দুই হাতে মাছভর্তি অত বড় ডালা তুলে এনে নৌকার কিনারে এসে দাঁড়াল। সাদেক মিঞা বলিষ্ঠ হাত বাড়িয়ে দিল।

তরতাজা রুপোলি মাছ ভর্তি ডালা নামলো মাটিতে। এবার কাশীনাথও লাফ দিয়ে ডাঙায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে এই মাছ যাবে বাজারে। কথামতো দীননাথ মাঝির বাজারে থাকার কথা। সাদেক মিঞা মাথায় চাপিয়ে আধ মাইলটাক হেঁটে ডালা সমেত এই মাছ বাজারে নিয়ে যাবে। কাশীনাথ পকেট থেকে টাকা বের করে সাদেক মিঞার হাতে দিল।

—একশো ট্যাহা দিলাম। বাজারে গিয়া বাবারে মাছ বুঝাইয়া দিয়া গোপীনাথের দোকানে চা-পাউরুটি খাইয়া নিবা। এক প্যাকেট বিড়ি কিন্যা লইও। আর অ্যাকটা দিয়াশালাই। বেলার দিহে বাবার থন হিসাবপত্র বুইঝ্যা লইও।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ডালাডা তুইল্যা দাও দিহিনি এইবার। বিষ্টি আইতাসে। পোড়কপাইল্যা আকাশ ম্যাঘে ঢাকতাসে। আবার ভাসাইবো সব।—কাঁধের গামছাটা গোল করে বিড়ে পাকিয়ে মাথার ওপর রাখল সাদেক মিঞা। কাশীনাথ ধরাধরি করে মাছের ডালা তার মাথায় তুলে দিল। দারুণ দক্ষতায় প্রায় দুইমন মাছ মাথায় নিয়ে বাজারের দিকে ছুটল তিন কুড়ি ছাড়িয়ে যাওয়া সাদেক মিঞা।

তিন

ফের উথালপাথাল ঝড় কাশীনাথ মাঝির বুকের মধ্যে। সব কাজ শেষ। নৌকোর মধ্যেকার জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে সে এবার বাড়ির পথ ধরল। তার পেছনে পড়ে রইল নদী। যার উদ্দাম ছুটে চলা ছিল বিরামহীন। তবে যুবক কাশীনাথ এগোচ্ছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু তার মন ছুটছিল নদীর মতোই উদ্দাম গতিতে।

কাশীনাথ হাতঘড়ি দেখল। সকাল ছটা দশ। এই সেই সন্ধিক্ষণ, যখন আকাশে সবিতা এবং পৃথিবীতে ঊষা একই রেখায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ তা হবার উপায় নেই। আষাঢ়ের ঘন কালো নিবিড় মেঘপুঞ্জ ছেয়ে আছে আকাশ পরিব্যাপ্ত করে। চারচরে অন্ধকার নেমে আসছিল। কাশীনাথ পথচলা দ্রুত করল। কেননা, তার পথ চেয়ে ওই অশ্বত্থ গাছের নিচে অপেক্ষায় আছে একজন। তার কাছেই কাশীনাথের সুখ-অসুখ, বিরহ-মিলনের ভাণ্ডারটি রাখা আছে।

অশ্বত্থ গাছের প্রচ্ছন্ন আঁধার থেকে সামনে এগিয়ে এল সেই নারী।

—লীলাবতী, এই বিষ্টি, দুয্‌যোগের মইধ্যে না আইলেই হইতো।

—না, হইতো না। তোমারে খবরটা না দিলে ভাল্লাগতো না।

—কী খবর?

—পাশ করসি। ফার্স্ট ডিভিশন।

—খুব ভালো! খুব ভালো! এইবার কলেজে পড়বি।

—হু পড়ুম। তুমি অ্যাক্‌টা চাকরির খোঁজ খবর করো। গ্র্যাজুয়েট হইসো। অ্যামন আর রাইত জ্যাইগ্‌গা মাছ ধরবা ক্যান?

কাশীনাথ তাকিয়ে রইল লীলাবতীর দিকে। এরা নতুন দিনের মানুষ। দীননাথ মাঝি থেকে কাশীনাথ মাঝি—এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম। দীননাথের স্বপ্ন ছিল একটি নৌকো। সে-ই ছিল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। তা থেকে দীননাথ তার জীবনরেখার দিক পরিবর্তন করে আলোকমুখী করে তুলেছিল।

এখন কাশীনাথ-লীলাবতীরা শান দিচ্ছে তাদের মস্তিস্কে। এদের স্বপ্ন-উজ্জ্বল জীবনের দিকে। লীলাবতীর কথা শুনে কাশীনাথের মন ছুটে চলল সেই স্বপ্নের খোঁজে... লীলাবতী এখন আর জেলেপাড়ার একটি গ্রাম্য মেয়ে নয়। দু-দিন পরেই সে হবে কলেজে পড়া এক যুবতী। তার আশা আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন পূরণের রূপ পাল্টাতে থাকবে।

—আমারে কিছু করতেই হইবো! লীলাবতীর কাজলকালো চক্ষুসায়রে হারিয়ে যেতে যেতে কাশীনাথের মন বলে উঠল সেই কথা।

—বি.এ. পাশ কইরা আমিও চাকরি করুম। লীলাবতীর এই কথার মধ্যে ফুটে উঠল প্রচণ্ড দার্ঢ্য। তখনই দিগ্‌দিগন্ত ছাপিয়ে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল। গুড়ুম-গুড়ুম শব্দে আকাশ ফাটিয়ে বাজ পড়ল।

চমকে উঠল কাশীনাথ-লীলাবতী। ছুটে ওরা অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়াল। লীলাবতী বলল, কী গো, বাড়ি যাইবা না?

—যামু, বিষ্টিটা একটু ধরুক। বাজ পড়তাসে। সবুর কর।

লীলাবতী কাশীনাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। দুর্যোগ ভেঙে পড়ছে চারধারে। এক নারী পরম নির্ভরতায় তার সমস্ত চিন্তাভাবনা পুরুষটিকে সঁপে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাশীনাথ ক্রমশ পরিপূর্ণ পুরুষ হয়ে উঠেছে। লীলাবতীর স্বপ্নের সঙ্গে তার স্বপ্ন একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

মনে মনে বলল কাশীনাথ, একটা ভালো কাজ খুঁজি। তারপর তো—!

With best compliments of

DURGAPUR SAW MILL

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G. T. Road (Main Gate), P.O. Durgapur-713203, West Bengal
Phone : 0343 2585184, 6452480, Mobile : 9832163188

Sl. No. 149

এক হপ্তার দিনলিপি

গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী

দরজায় ঠক-ঠক আওয়াজ। শিখা দরজা বন্ধ করেই বসেছিল। আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে একদল পুলিশ, ওদের মধ্যে একজনকে শিখা চেনে। সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার-ইন-চার্জ। উনি এগিয়ে এসে বললেন, ''শিখাদি, আপনাকে একবার আমাদের সাথে আসতে হবে, আপনি তো এলাকার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা, আপনাকে কতকগুলো সিজার লিস্টে সাক্ষী হিসেবে সই করতে হবে।'' শিখা জিজ্ঞাসা করে, ''কেন?'' ইনচার্জবাবু বলেন, ''ওই কমল মাস্টারের বাড়ি থেকে যেসব জিনিসপত্র সিজ করেছি তাতে সাক্ষী হিসেবে সই করতে হবে।'' অবাক হয়ে শিখা প্রশ্ন করে, ''কমল স্যারের বাড়িতে আবার কী পেলেন যে আমাকে সাক্ষী হিসেবে সই করতে হবে। উনি কী এমন করেছেন?'' ইনচার্জবাবুর উত্তর, ''চলুন না, গেলেই দেখতে পাবেন।'' শিখা খুব কৌতূহলের সাথে বলল, ''চলুন, দেখি আপনারা কী এমন গুপ্তধন উদ্ধার করেছেন, গিয়েই দেখি।'' ফাঁড়ির পুলিশের সাথে কমল স্যারের ঘরে উপস্থিত হয়ে ভেতরে ঢুকে শিখা অবাক। সমস্ত ঘরটাতে যেন ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। সব ছড়ানো ছিটানো। বইপত্রগুলো এদিক ওদিক গড়াগড়ি খাচ্ছে—কলম, খাতা—সব। আসলে পুলিশের সাথে সাথে ওরা মানে অঞ্চল সভাপতির দলবল গোটা ঘরটাকে ছত্রখান করে দিয়েছে। ''এভাবে কেউ ঘর সার্চ করে নাকি? এটা আপনাদের কাজ না ওদের কাজ—'' বলেই শিখা লম্বা ঝুলওয়ালা সবুজ পাঞ্জাবি পরা লোকগুলোর দিকে আঙুল বাড়াল। ইনচার্জবাবু আমতা আমতা করে বলেন, ''আমরা এখানে আসার আগে জনরোষে এসব হয়েছে আমরা কী করব বলুন? আর আপনি শুধু শুধুই এদের দোষ দিচ্ছেন। এরাই তো ঘরটাকে বাঁচিয়েছে, না হলে ঘরটা আস্ত থাকত?''

''নিন নিন, খুব হয়েছে,'' রাগত স্বরে

শিখা বলে ওঠে। ওদিকে এক কোণে এক অফিসার এক মনে কমল মাস্টারের ঘরে কী কী মারাত্মক জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার তালিকা তৈরি করছিলেন। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে শিখা বলল, ''আপনার হয়েছে? বলুন, কোথায় সই করতে হবে?'' অফিসারের উত্তর, ''হ্যাঁ হয়েছে, এখানে সই করুন।'' সই করতে গিয়ে শিখা অবাক হয়ে বলল, ''শুধুমাত্র এগুলোর জন্য এত কাণ্ড। একটা সামান্য মুড়ির টিন, একটা শাবল, খানিকটা কেরোসিন তেল, একটা ছেঁড়া সাইকেলের চেন, খানিকটা সরু লোহার পাইপ আর একটা ছোট্ট ছুরি, ব্যাস। এই বইগুলো যেগুলো ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, টলস্টয়, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, শেক্সপিয়ার, মধুসূদন আর এই খাতাগুলো এগুলো লিখবেন না?'' ইনচার্জবাবুর উত্তর, ''ওসব অনেক লিখতে হবে। আরে বই সিজ করে আমরা কী করব? তাও যদি মাওবাদী বা সেরকম কোনো বইপত্র হত তাহলে না হয় ভাবা যেত, এসবের দরকার নেই।'' ''ঠিক আছে, কর্তার ইচ্ছাই কর্ম,'' বলে শিখা সিজার লিস্টে সই করে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে বলে, ''আচ্ছা ইনচার্জবাবু আমি কি আসতে পারি?'' সম্মতি জানিয়ে তিনি বলেন, ''হ্যাঁ, আপনি আসুন, প্রয়োজনে আমরা আবার আপনার কাছে আসব।'' ''ঠিক আছে,'' বলেই শিখা আর কথা না বাড়িয়ে হন হন করে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই শিখা বাড়ির পথে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় পাড়ারই একটা বাচ্চা মেয়ে বকুল শিখার কাছে দৌড়ে এসে বলল, ''দিদি, ওই লোকগুলো যখন স্যারের বাড়িতে ঢুকে সব ভাঙাভাঙি করছিল আর জিনিসপত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল, তখন এই দেখ আমি এটা কুড়িয়ে পেয়েছি।'' শিখা বলে ওঠে, ''কী পেয়েছিস দেখি।'' বকুল একটা মোটা খাতা শিখার হাতে দিয়ে বলে, ''এই দেখ, এই খাতাটা ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, ওটা উড়ে এসে স্যারের ঘরের পিছনদিকে আম গাছটার কাছে পড়ল, আমি তখন আমার পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। খাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে আমি ওখানে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কাউকে কিছু বলিনি। তোমাকে পুলিশগুলোর সাথে স্যারের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে ভাবলাম, এটা তোমাকে দিয়ে দিই। এই নাও।'' শিখা হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিয়ে বকুলের চিবুকটা ধরে আদর করে বলল, ''হ্যাঁরে, এই খাতাটার ব্যাপারে আর কেউ কিছু জানে?'' বকুলের উত্তর, ''বললাম তো, কাউকে বলিনি। পুলিশগুলোকেও না। মাকেও বলিনি। কাউকে বলব না।'' শিখা আস্তে করে ওকে আদর করে বলল, ''খবরদার কাউকে বলবি না। আমি এটা রেখে দিচ্ছি।'' খাতাটা হাতে নিয়েই হন হন করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে শিখা। মনে মনে ভাবে সামান্য একটা খাতা, এটাতে কী আর থাকবে? কিন্তু খাতাটা খুলেই বুঝতে পারে—এটা খাতা নয়, একটা কমদামি ডায়েরি। ওপরের কভারটা নেই। বোধহয় ওরা যখন ডায়েরিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তখন কভারটা কোথাও খুলে বেরিয়ে গিয়েছে। শিখা সন্তর্পণে ডায়েরিটা তার বইপত্রের ফাঁকে রেখে দেয়। রাত্রি তখন অনেক গভীর। শিখা ডায়েরিটা খুলে বসে।

অন্যের ডায়েরি তাঁর বিনা অনুমতিতে পড়া উচিত নয়। কী করবে ভাবতে ভাবতে শিখা ডায়েরির পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল। ডায়েরিটা তারিখ অনুযায়ী পর পর লেখা নেই। প্রথমেই শিখা ডায়েরির শেষদিক থেক দেখতে শুরু করে। কারণ ওদিকটা ফাঁকা ছিল। কিন্তু শেষদিকে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর নাম লেখা—কে কোন ক্লাসে পড়ে, কোন্ স্কুলে পড়ে ইত্যাদি নানা হাবিজাবি বিষয়ে লিখে রেখেছেন কমল স্যার। কয়েকটি পাতাতে আবার কোন ছাত্রের বাড়ি থেকে কত টাকা করে পেয়েছেন এসব লেখা। এসব দেখতে দেখতেই সামনের দিকের পাতাগুলো শিখার নজরে পড়ে। সেখানে কমল কিছু লিখে রেখেছেন। কিন্তু তারিখ ধরে পর পর লেখা নেই। পাতাগুলো পর পর উল্টে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে কখন যে শিখা পড়তে শুরু করেছে তা নিজেই বুঝতে পারেনি।

□ ১৭ই পৌষ, ১৪২০, বৃহস্পতিবার (ইং ২রা জানুয়ারি, ২০১৪)

দিনভর টিউশন করতে ভালো লাগে না, কিন্তু উপায় নেই, বাঁচতে তো হবে! সঙ্গী একটা সাইকেল, এটা নিয়ে সারাদিন এখানে ওখানে ছাত্র পড়িয়ে জীবিকা অর্জনের তাগিদে দৌড়ে বেড়াতে হয়। আগে তবুও বা খানিকটা স্বস্তি ছিল। কোলিয়ারির একটা পরিত্যক্ত ধাওড়ার এক চিলতে কোয়ার্টারে, কোলিয়ারির ইলেকট্রিক লাইনটা পাশের বাড়ি থেকে টেনে নিয়েছিলাম, তাতেই আলোর সমাধান হয়। এলাকায় লোকজনের সাথে ভালই সম্পর্ক ছিল, সবাই ভালোবাসত, এখনো ভালোইবাসে, কিন্তু সব যেন কেমন পাল্টে গিয়েছে। যারা আগে দেখা হলেই কথা বলত, দাঁড়াত, তারাও কেমন যেন ভয় ভয় ভাব নিয়ে কথা বলে, একটু এড়িয়ে যেতে চায়। কারণ আর কিছুই নয়, গত নির্বাচনের সময় পোলিং এজেন্ট হয়েছিলাম, বামপন্থী পোলিং এজেন্ট। এলাকায় সবাই চেনে আমাকে—সে কারণেই আমার কাছে পার্টির নেতারা এসে অনুরোধ করেছিল, পাড়ার মেয়ে শিখার পোলিং এজেন্ট হতে, সাত পাঁচ না ভেবে রাজিও হয়ে গিয়েছিলাম। ভোটের দিন শিখার বিরোধী দলের নেতারা আমাকে প্রথমে ভালোভাবে, তারপর হুমকি দিয়ে বুথে আসতে নিষেধ করেছিল, শুনিনি। ফলস্ ভোট দিয়ে ভোটটা করতে চেয়েছিল বিরুদ্ধ পার্টি। আমার জেদের ফলে তা সম্ভব হয়নি। শিখা জিতেছিল। কিন্তু নির্বাচনে ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের কাছে শিখাদের পার্টির ব্যাপক পরাজয় হয়। তারপর থেকেই কেমন যেন সব পাল্টে গিয়েছে। আমাকে এক ঘরে করার ফতোয়া দেওয়া হয়। এখন এই ধাওড়ায় শ্রমিকরা আমার সাথে কথা বলতে, সামনা সামনি আসতে কেমন যেন ভয় ভাব নিয়ে থাকে। কোলিয়ারির এই পরিত্যক্ত কোয়ার্টার থেকেও আমাকে তাড়াবার চেষ্টা কম হয়নি। আমার জেদের কাছে হার মেনে কিছু করতে না পেরে শেষমেস ঘরের কোলিয়ারির ইলেকট্রিক কেটে দিয়েছে, রাতের বেলায় এখন কেরোসিনের বাতিই ভরসা। অবশ্য সারাদিনই টিউশন করে কেটে যায়, মাঝে দুপুরটা রান্না-খাওয়া, খানিকটা রেস্ট—তারপর আবার টিউশন, আর রাতে ফির রাতটুকু থাকাখাওয়া। এভাবেই চলে।

□ ২২শে পৌষ, ১৪২০, মঙ্গলবার (ইং ৭ই জানুয়ারি, ২০১৪)

আসলে রাজনীতি কোনোদিনই করিনি, সত্যি কথা বলতে আমি যে কোনো সময় শিখাদের পার্টির সমর্থক ছিলাম তাও নয়। অনেকদিন ধরে আছি এই কোলিয়ারি এলাকায়। চাকরি-বাকরি না পেয়ে শেষে ছাত্র পড়ানোকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছি। এটা করেই জীবন যাপন, আর শিখা মেয়েটাকে সেই ছোট্ট থেকে দেখেছি, জানি। ভালো মেয়ে, কিন্তু ভয়ে ওর হয়ে কেউ প্রচার করা তো দূরে থাক, পোলিং এজেন্ট হতেও চাইছিল না,

যখন পাড়ার একজনের সাথে শিখা এসে আমাকে অনুরোধ করে তখন আর 'না' বলতে পারিনি, ভেবেছিলাম কী আর ব্যাপার, সামান্য পোলিং এজেন্ট তো? কী এমন হবে? কিন্তু পোলিং এজেন্ট হিসেবে বসার পর থেকে আমাকে যে এভাবে কট্টর বামপন্থী ভেবে নেবে ওরা, তা ভাবতেও পারিনি। শুধু ইলেকট্রিক লাইন নয়, আশে পাশে বেশ কয়েকটা টিউশন পর্যন্ত, যাদের দীর্ঘ ৩/৪ বছর ধরে পড়াচ্ছি, সেইসব বাড়িগুলো থেকেও আমাকে আসতে মানা করে দিয়েছে। কারণ ওই একই। ফলে কাছেপিঠে টিউশনগুলো সব বন্ধ—এখন সামান্য দূরে দূরে যেগুলো আছে সেগুলো করতে হয়—আরও নতুন কয়েকটা খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছি। গত তিন চার দিন হল কয়েকটি পেয়েওছি, সপ্তাহে ২ দিন করে যেতে হবে। সোম আর মঙ্গল এই দুদিন ওখানে যাবো। গতকাল থেকে ভেঁসালোটন ধাওড়াতে দুটো নতুন টিউশন ধরেছি। ভেঁসা লোটন নাম শুনে অনেকেই অবাক হবেন। আসলে কোলিয়ারি ধাওড়ার নাম এরকমই হয়। এখানে এক সময় মহিষ চরত, পরে এখানে কোলিয়ারি ধাওড়া হয়, শ্রমিকরা আদর করে এই ধাওড়ার নাম রেখেছে ভেঁসা লোটন ধাওড়া। এখানেই যেতে হবে—বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র পড়াতে যেতে হবে, দুটো বাড়িতে। একটা বাড়িতে ২ জন ক্লাস টু, আর একটা বাড়িতে ক্লাস ফোর-এর দু-জন। ওদের কোয়ার্টারে সপ্তাহে দুদিন করে যেতে হবে। কোয়ার্টার মানে দুই কামরার ঘর, সামনে একটা বারান্দা। পিছনের দিকে একটা বাথরুম, পায়খানা আর ওদিকেও একচিলতে বারান্দা। গতকাল থেকে শুরু করেছি, আজ মঙ্গলবার আবার যেতে হবে।

□ **২৯শে পৌষ, ১৪২০, মঙ্গলবার (ইং ১৪ই জানুয়ারি, ২০১৪)**

একে শীতের সন্ধ্যা, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা তার ওপর আবার মাইল দুয়েক দূরে নতুন টিউশন বাড়িতে যেতে হবে। সাইকেলটা বার করে ছাতাটা নিলাম। কারণ খানিক আগেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে টিপ টিপ করে। ছাতাটা মাথায় নিয়ে সাইকেলে চেপে বসি। বৃষ্টিটাও জোর ধরছে, তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে জগন্নাথ গড়াই-এর কোয়ার্টারের বারান্দায় হাজির হয়ে সাইকেলটা দেওয়ালের এক পাশে রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথাটা মুছে নিই, এদিকে বারান্দাতেও বৃষ্টির ঝাপটা আসছে—জামা, প্যান্টটা ভিজে যাবার জোগাড় হল, তাড়াতাড়ি বন্ধ দরজায় টোকা দিলাম, ভিতরে জোরে জোরে টিভি চলছে, সিনেমার গান হচ্ছে, বোধহয় দরজায় টোকার আওয়াজটা ভেতর থেকে কেউ শুনতে পায়নি। আবার জোরে জোরে টোকা দিলাম। এদিকে বৃষ্টির ঝাপটা জোরে জোরে আসছে, দরজার পাশে জানালার সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা জগন্নাথের ছাগলটাও বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে—ম্যা, ম্যা করে অনবরত ডাকছে। আর ভিতরে এত জোরে টিভিটা চলছে যে এবারও দরজায় টোকার আওয়াজ কেউ শুনতে পেল না। অগত্যা জোরে জোরে দরজাটাতে ধাক্কা দিলাম, এবার হঠাৎ করে টিভিটা থেমে গেল। ভেতর থেকে জগন্নাথের হেঁড়ে গলার আওয়াজ, ''ও মিন্টু-পিন্টুর মা, দেখ তো দরজাটায় কে ধাক্কা দিচ্ছে, মাস্টারটা না পাঁঠাটা!'' দু-কান গরম হয়ে উঠলেও চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, এবার দরজা খুলল। দেখি জগন্নাথের বৌ রুটি করার জন্য আটা মাখছিল, আটা মাখা হাতেই দরজা খুলে এক পাশে দাঁড়িয়ে বলল, ''ও, মাস্টারমশাই আসুন আসুন।'' ভেতরে ঢুকতে আদৌ ইচ্ছে করছিল না, ব্যাটার কথা বলার ছিরি দেখে ব্রহ্মতালু জ্বলে গিয়েছে, বলে কি না—''দেখ তো মাস্টারটা না পাঁঠাটা!'' দেখ কথার ছিরি! জগন্নাথের বৌ বুঝতে পারে বিষয়টা খুব খারাপ হয়েছে, মুখে কিছু না বলে মিন্টু-পিন্টু দুই ছেলেকে ভিতরের ঘর থেকে ডেকে বলে, ''মাস্টারমশাই এসেছেন, যাও বসে পড়।'' ছাত্র দু-জন সাথে সাথে ব্যাগ-বইপত্র নিয়ে চৌকিতে বসে পড়ে। চৌকির যা চেহারা! এতদিন জানতাম গায়ে বা জামাতে চিমটি কাটলে নাকি ময়লা ওঠে। কিন্তু জগন্নাথের তেলচিটে চৌকিটা দেখলেও বেশ বোঝা যায় এখানে পাহাড় প্রমাণ ময়লা কালো হয়ে চৌকির কাঠগুলোতে লেগে আছে। যেন চেঁছে তুললে ইঞ্চি খানিক পুরু ময়লা উঠবে। ভাবি কীভাবে এরা এখানে শোয়! কীভাবে বসে? কী মনে করে একবার হাত দিয়ে দেখলাম, হাতের তালু জোরে চৌকিতে চেপে ধরতে হাতের তালুটা সামান্য চিটে গেল চৌকির কাঠের তক্তার সাথে। হাতের চেটোটা ছাড়াতে সামান্য জোর লাগে। ইচ্ছে করছিল না চৌকিতে ছেলেগুলোকে পড়াতে। চৌকিতে হাত পাড়তেই গা-টা কেমন যেন ঘিন ঘিন করছিল। তবুও চৌকির পাশে রাখা চেয়ারে বসে ওদের অঙ্ক পড়াতে শুরু করি—আর চেয়ারের বর্ণনা না-ই বা করলাম। চেয়ারের হাতলগুলোতে ময়লার স্তর জমে আছে। টিভি বন্ধ আছে, এদিকে জগন্নাথের স্ত্রী এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট প্লেটে নিয়ে এসে বলল, ''নিন মাস্টারমশাই চা খেয়ে নিন, আর ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, ওর কথাগুলোই ওমনি।'' ইত্যবসরে জগন্নাথও এসে দাঁড়িয়েছে। বলে, ''কমলদা কিছু মনে করবে না, আসলে বৃষ্টির ঝাপটার জন্য বাইরে বাঁধা পাঁঠাটা ঠাণ্ডাতে বাইরে থাকতে চাইছে না।''—এটা বলার সাথে সাথেই আবার দরজায় ধাক্কা, এবারে ওইদিকে তাকিয়ে জগন্নাথ বলে ওঠে, ''দেখ, পাঁঠাটা ভিতরে ঢোকার জন্য অনবরত দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। আমিও ভেবেছিলাম হয়ত পাঁঠাটাই ধাক্কা দিচ্ছে, তাই বলে ফেলেছি কিছু মনে কোরো না মাস্টার।'' ভেতরের উষ্মা মুখে প্রকাশ না করে বলি, ''না, না। মনে করার কী আছে? আপনি তো আর জেনেশুনে বলেননি, আমি কিছু মনে করিনি।'' এবার পড়াশোনার দিকে মন দিয়ে অঙ্ক নিয়ে শুরু করলাম। ক্লাস টু-এর ছাত্র কিন্তু অঙ্কের কিছুই জানে না। ২ বেশি না ৪ বেশি বলতে পারে না। বুঝলাম এদের ঠিকঠাক গড়ে তুলতে সময় লাগবে। জগন্নাথকে বললাম, ''দাদা, আপনার ছেলেদুটো বড্ড কাঁচা, ২ আর ৪-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারছে না। ২ বেশি না ৪ বেশি বলতে পারছে না। জগন্নাথ উত্তর দেয়, ''দেখ মাস্টার, আমি তো পড়াশোনা কিছুই শিখিনি, আর পিন্টু-পিন্টুর মা-ও তো একই রকম, এখন তুমিই ভরসা। দেখ যদি কিছু করতে পার।'' আবার জগন্নাথ মিন্টু-পিন্টুর দিকে ফিরে বলল—''হ্যাঁরে ২ না ৪ বেশি বলতে পারিসনি?'' ওরা চুপ করে থাকে। এবার জগন্নাথ বলে—বলতো দুটি রুটি বেশি না চারটে বেশি? এবার ওরা একসাথে বলে ওঠে 'চারটে'। জগন্নাথ বলে, 'কী করে বুঝলি?'' ''কেন, দুটো রুটিতে যে আমাদের পেট ভরে না, আর দুটো নিতে হয়, তাহলে চারটে বেশি হল না?'' পাল্টা প্রশ্ন করে জগন্নাথকে। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এরা কী? কত সহজভাবে দেখে জীবনটাকে! এদের জীবনধারণের রসায়নটাই বা কোথায় লুকিয়ে আছে?

□ **১লা মাঘ, ১৪২০, বুধবার (ইং ১৫ই জানুয়ারি, ২০১৪)**

বেশ চলছিল। অনেকগুলো নতুন নতুন টিউশন ধরেছি। মোটামুটি রোজগার ভালোই হচ্ছে, এখন পরিত্যক্ত কোয়ার্টার ছেড়ে পাশেই একটা ফাঁকা কোলিয়ারির জায়গাতে মাথা গোঁজার মতো নিজেই বাড়ি বানিয়ে নিয়েছি, তাতেও প্রথম প্রথম অনেক বাধা, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, অবশ্য বাড়ি করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু যেখানেই ভাড়ার জন্য গিয়েছি সেখানেই বাধা। অবশেষে শিখাই এই জায়গাটা দেখিয়ে বলেছিল, ''স্যার, এখানে একটা কিছু বানিয়ে নিন, ফাঁকা জায়গা, কোলিয়ারিও এখানে কিছু কাজ করবে না, কারণ তালাটা ফাঁপা, এই জায়গায় জীবনে কিছু হবে না। আপনি এখানে একটা ঘর বানিয়ে নিন, মনে হয় কোনো বাধা কেউ দেবে না, যদি কোনো সমস্যা হয় আমি বুঝে নেব।'' শিখার পরামর্শ মতো এখানেই একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছি। শিখা একথা বললেও ওর গাঁয়ের এলাকার পার্টির লোকেদের ভয়ভীতি কিন্তু এতটুকুও কমেনি। সাহস করে কেউ একটা পোস্টারও লাগাতে পারে না। কিন্তু যাক গে এসব কথা, এসব নিয়ে আর ভাবি না, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো নিজের রুজিরুটির ধান্দা নিয়েই টিকে থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এসব ঘটনার পর পাড়ার পাণ্ডাগুলোকে একদম সহ্য করতে পারি না, অনবরত এদের নানাবিধ জুলুমে এলাকার মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে, তা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পাড়ার নেতাদের কোনো হেলদোল নেই, সবাই যেন কেমন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। খানিকটা সাহস করে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করবে তা নয়, শুধুই বাইরে বাইরে মিছিল মিটিং-এ গিয়ে ভিড় বাড়াচ্ছে। কিন্তু নিজের পাড়া, গ্রামে কিছুই করছে না—পাছে শত্রুদের কুনজরে পড়তে হয়। এসব দেখেশুনে এদের উপরও মনটা বিষিয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এদের ডেকে বলি, আবার মনে হয় কী দরকার, 'তেড়ে ক্যাঁকলাস গায়ে তোলার?' এদের যে কার সাথে যোগাযোগ আছে তাও বোঝা মুশকিল। কয়েকজনকে তো দেখলে মনে হয় তলায় তলায় নিজেরা বেশ সেটিং করে বসে আছে, না হলে কেমন করে এরা পরিবর্তনের আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। আমাকে পোলিং এজেন্ট হওয়ার জন্য কত হেনস্থা হতে হল আর কয়েকজন নেতাকে দেখে তো তা মনে হয় না। আগেও যেমন খাদানে ডিউটিতে যেতে হত না এখনও তেমনি যেতে হয় না, ঘর বসে হাজরি হয়, কী ভাবে হয়?—নানা মিথ্যা মামলাতে কত সাধারণ মানুষ জর্জরিত, মাসে প্রায় দিনই কোর্ট আর জেলখানা, কই এই কয়জনের নামে তো কোনো মামলা হয়নি, এদের তো জীবনে কোনো পরিবর্তন হয়নি, অথচ এরাও পরিবর্তনের সরকারে বিরোধীদের সাথেই আছে। কিন্তু এদের নাম কেমন করে পরিবর্তনপন্থীদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে? ভেবে পাই না। এসব দেখেশুনে কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে চিন্তাভাবনা, বুঝতে পারি না কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না। এসব সাতপাঁচ ভেবে নিজেকে চুপ রাখাই শ্রেয় বলেই মনে করেছি।

□ **৩ মাঘ, ১৪২০, শুক্রবার (ইং ১৭ই জানুয়ারি, ২০১৪)**

সেদিন হঠাৎই একটা অন্য ব্যাপার ঘটল। সাইকেল নিয়ে টিউশন বের হয়েছি, এমন সময় কয়েকজন ছেলে মোটর সাইকেল নিয়ে পিছু ধাওয়া করে সামনে মোটর সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দাঁড়াতে বলল। জিজ্ঞাসু চোখে সাইকেল থেকে নেমে বলি, কী ব্যাপার? এভাবে ঘিরে দাঁড়ানোর মানে কী?'' ওদের সবাইকে চিনি, পাড়ারই ছেলে, ওরা সবাই সম্মান করে, মান্যও করে। তবুও ওদের কেমন যেন চোখমুখের ভাষা। খানিকটা অবাকই হলাম। ওদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে বলল, ''স্যার কিছু মনে করবেন না, আমাদের উপরের নির্দেশ, কিছু করার নেই তাই বলতে এলাম। আপনি জগন্নাথের বাড়িতে পড়াতে যাবেন না। আপনার ভালোর জন্যই বলছি।'' খানিকটা অবাক হয়েই বললাম, ''পড়াতে যাব না? কিন্তু কেন? আমি কোথায় টিউশন করব কী করব না তা একান্তই আমার ব্যাপার। তোমাদের ওপরওয়ালা আমাকে মানা করার কে? আর আমি শুনবই বা কেন? ছাড়, পথ ছাড়, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'' আমার কঠোর মনোভাব দেখে ওরা পথ ছেড়ে বলল, ''স্যার, আপনার ভালোর জন্যই বললাম। বাকি আপনার অভিরুচি।'' প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেও মনের ভাব চেপে রেখে আমি বললাম, ''সে আমি ভাবব। তোমাদের ওপরওয়ালারা তো আমার ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারেনি, যেটুকু আমি করেছি তাতেও ধুলো দেবার চেষ্টা করছ কেন বলতে পার? সে যা করার করুক তোমাদের ওপরওয়ালারা। আমার মতো করে আমি চলব। আমি কোথায় কী টিউশন করব, সে ব্যাপারে ভাই তোমাদের ফরমান আমি মানতে পারব না, বলে দেবে তোমাদের ওপরওয়ালাদের।'' আর কথা না বাড়িয়ে আমি আমার টিউশনির রাস্তা ধরি। ওরা পিছন থেকে বলে ওঠে—''কাজটা ভালো করছেন না স্যার।'' ইচ্ছে হল সাইকেল থেকে নেমে একটা জুতসই উত্তর দিই কিন্তু রুচিতে বাধল। কথাগুলো শুনেও না শোনার ভান করে আমি এগিয়ে চললাম।

□ **৮ই মাঘ, ১৪২০, বুধবার (ইং ২২শে জানুয়ারি, ২০১৪)**

জগন্নাথের কোয়ার্টারে গিয়ে মিন্টু-পিন্টুকে পড়াতে বসেছি। ওদিকে পাশে চেয়ারে বসে কিছু খুচরো টাকা গুনে গুনে গার্ডারে জড়িয়ে রাখছিল জগন্নাথ। রাগতভাবে বলি, ''জগন্নাথবাবু, আমি এখানে পড়াব আর আপনি টাকা গুনবেন—তাহলে কী ভাবে পড়াব?'' উত্তরে জগন্নাথ বলে, ''মাস্টার, আমার একটা কাজ করে দেবে? আসলে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভালো করে লিখতে পড়তেও পারি না, খুব অসুবিধা হয়।'' আমি জিজ্ঞাসা করি, ''কী করতে হবে?'' ''আমাদের কোলিয়ারিতে তো আর লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়ন নেই, প্রায় সবাই এখন ওদের দলে যোগ দিয়েছে, কিন্তু অনেক সমর্থক আছে, মেম্বার করার কেউ নেই। বড় বড় যারা খাদানে নামত না, কোনোদিন আসত না, ঘরে বসে হাজরি হত, এখন ওনারা ইউনিয়ন করতে চাইছেন না, কারণ ইউনিয়ন করলেই খাদানে নামতে হবে, আট ঘণ্টা কাজ করতে হবে। ঘরে বসে হাজরি হবে না—সবাই কেমন যেন ভদ্র মানুষ হয়ে গেছে, ইউনিয়ন করার কেউ নেই। শেষে আমিই যোগাযোগ করে ইউনিয়নের মেম্বারশিপের দুটো রসিদবই নিয়ে এসে গোপনে শ্রমিকদের মেম্বারশিপ কাটছি। কিন্তু লিখতে তো পারি না, মনে রেখে দিয়েছি, এখন রসিদ কাটতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। তা যদি খানিকটা সাহায্য কর তো ভাল হয়। দাও না মাস্টার রসিদগুলো কেটে, তাহলে ইউনিয়ন অফিসে রসিদ আর টাকাগুলো কাল জমা করে দেব।'' এতটা বলেই থামে জগন্নাথ।

এতক্ষণে এই বাড়িতে টিউশন করতে নিষেধ করার কারণ বুঝতে পারি, আমারও কেমন জেদ ধরে যায়। মিন্টু-পিন্টুকে বলি, ''এই যা আজ তোদের ছুটি।'' এবার জগন্নাথকে বলি, ''দিন আপনার কাজ করি আজ।'' জগন্নাথ এক এক করে মজুরদের নাম, কোন পদে চাকরি করে বলে যেতে থাকে আর রসিদগুলো লিখে যেতে থাকি, এইভাবে একশো জনের নামে রসিদ কাটা হলে তারপর থামে জগন্নাথ। বলে, ''জানো মাস্টার, আমি ঘুরে ঘুরে দেড়শো জনের কাছে মেম্বারশিপ কেটেছি কিন্তু লিখতে তো জানি না, চাঁদা নিয়ে রেখেছি ভাবছিলাম অফিসে গিয়ে নেতাদের হাতে জমা করে রসিদ কেটে নিয়ে আসব। তা তুমি করে দিলে ভালোই হল। এখনও বিরুদ্ধ পার্টির নেতারা জানে না এইভাবে আমরা মেম্বারশিপ করছি।'' আমি এর উত্তরে বলি, ''কে বলল, জানে না? ওরা সব জানে। আজকে যখন আপনার বাড়িতে আসছিলাম তখন ওরা আমাকে আপনার এখানে টিউশন পড়াতে আসতে মানা করেছে। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি কেন মানা করছে, এখন বুঝতে পারছি কেন?'' জগন্নাথ বলে ওঠে, ''ভালোই হল জানুকগে, আমার কী করবে? আমি রীতিমতো খাটি আর রোজগার করি। শালা টবগাড়ি ঠেলে ঠেলে হাতে কড়া পড়ে গিয়েছে, আমাকে কী করবে? আমি তো হারামের পয়সা রোজগার করি না! রীতিমতো গায়ে-গতরে খেটে রোজগার করি। যদি কিছু বলে, হুমকি দেয় আমিও লড়ে যাব।''

এতক্ষণ ধরে আমার মনে যে কথাটা জাগছিল এবার সেটাই জগন্নাথকে বলে ফেলি—''আপনি তো এখন এসব করছেন, দেখবেন যখন দিন বদলে যাবে আপনাদের সময় আসবে, তখন দেখবেন ওইসব দালালগুলো যারা আপনাদের এখন ছেড়ে গিয়ে তলে তলে ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, বশ্যতার বিনিময়ে সুখ আরাম ভোগ করছে, তারাই সামনের সারিতে চলে আসবে, তখন ওদেরই আদর করে আপনাদের অনেক নেতা ডেকে আনবে।'' আমার পিছনে কখন যে জগন্নাথের স্ত্রী এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা শুনছে তা লক্ষ করিনি, হঠাৎ কিন্তু পিছন থেকে শুনতে পেলাম, ''শোনো তোমাকে বলছি, আমরা অনেক কষ্ট করে টিকে আছি, আমি তোমাদের রাজনীতি-টাজনীতি বুঝি না, তবুও বলছি যদি তখন এমন হয় তাতে তোমাদের ফাঁসি জরিমানা যা হয় তবে, তোমাকে একটা বন্দুক জোগাড় করতে হবে, আর যদি তার জন্য পয়সা না থাকে আমার গয়না বিক্রি করে জোগাড় করবে, তারপর ওই হারামির বাচ্চাগুলোকে কিছু না করে যে ব্যাটা নেতা ওদের তোল্লা দেবে, সামনে নিয়ে আসবে, প্রথমে গিয়ে তাদের বুকে গুলি মারবে তাতে যদি আমাকে সর্বস্ব হারাতে হয় হবে, এই কাজটা করবে কিন্তু।'' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে ভাবি, বলে কী? ভদ্রমহিলা মনের মধ্যে এত ঘৃণা জমিয়ে রেখেছে? বাপরে! জগন্নাথ খেঁকিয়ে ওঠে, ''থামো তো, মেয়েছেলে হয়ে পুরুষ মানুষের কাজের সময় ঢুকে পড়া খুব খারাপ, যাও তোমার নিজের কাজ কর গিয়ে।'' কথা না বাড়িয়ে জগন্নাথের স্ত্রী রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ওখানে গিয়ে শিলনোড়াতে মশলা কুটতে বসে। মশলাগুলোকে শিলের ওপর চাপিয়ে এত জোরে জোরে কুটতে থাকে যেন শিলই ভিঙে ফেলবে, আসলে জগন্নাথের ওপর রাগে এটা করতে শুরু করেছে বেশ বুঝতে পারছিলাম। জগন্নাথ এ ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলে, ''কী করছ, ওটা যে ভেঙে যাবে।'' ওঘর থেকে জগন্নাথের স্ত্রী জবাব দেয়, ''ভাঙুক গে,'' বলে আরো জোরে জোরে মশলা কুটতে থাকে যেন সমস্ত রাগটা ওই দালালদের ওপর পারলে এখনই ঝেড়ে দেয়। জগন্নাথ মুচকি হেসে বলে, ''খুব রেগে গিয়েছে, বুঝলে মাস্টার।'' এরপর আমরা আবার নিজের কাজ করতে শুরু করি।

লেখা শেষ হলে জগন্নাথ বলে, ''মাস্টার আজ আমার ঘরে চারটি সেবা করে যাবে নাকি? মাংস ভাত।'' ইচ্ছে থাকলেও বলি, ''না।'' শেষে জগন্নাথের পীড়াপীড়িতে আর না করতে পারি না। খাওয়া শেষ হলে জগন্নাথ বলে, ''বুঝলে মাস্টার, আমার সেই পাঁঠাটা আজ রাস্তাতে চরছিল, হঠাৎ একটা মোটর সাইকেল ধাক্কা মারে। পাঁঠাটা প্রায় মরে যাবার জোগাড় হয়েছিল, মরেই যেত, তাই তাড়াতাড়ি তুলে এনে কেটে ফেললাম। তা কেমন খেলে? রান্নাটা ভালো হয়েছিল?'' অনেকটা মাংস খেয়েছি। কিন্তু যেই শুনলাম অ্যাক্সিডেন্টে মরা পাঁঠাটার মাংস খেয়েছি সাথে সাথে মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল। বলে উঠলাম, ''অ্যাক্সিডেন্টে মরা পাঁঠা? কই আগে তো বলেননি।'' জগন্নাথের নির্লিপ্ত উত্তর, ''কী বলব? মরেনি তো। আধমরা হয়েছিল। তবে না কাটলে খানিক পরে মরেই যেত। তাহলে কি খেতাম? ফেলে দিতাম।'' এই কথা শুনে পাশে বসা মিন্টু বলে ওঠে, ''না মাস্টারমশাই, পাঁঠাটা মরেই গিয়েছিল, মুণ্ডুটা একদম থেবড়ে গিয়েছিল। বাবা ওটাকে তুলে এনে কাটলো।'' এবার আবার জগন্নাথ ধমকে ওঠে—''ফালতু কথা বলিস না তো, তুই দেখেছিস? মাথা ভেঙে গিয়েছিল?'' মিন্টু আবার বলে ওঠে, ''দেখলাম তো, আমার সামনেই তো অ্যাক্সিডেন্ট হল। পাঁঠাটা ঠ্যাং ছটপট করতে করতে মরে গেল। আর মোটর সাইকেলবালা পালিয়ে গেল। তুমি তো তখন ঘুমোচ্ছিলে। তোমাকে তো ডেকে তুললাম। তারপরে তো তুমি পাঁঠাটাকে তুলে আনলে। নিজে ভুল কথা বলে এখন আমাকে বকছে।'' ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়াচ্ছে বুঝতে পেরে মিন্টুর মা মিন্টুকে ডেকে নেয়। জগন্নাথ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, ''ছোটো ছেলের কথায় তুমি কান দিয়ো না মাস্টার, আমি কি আর মরা পাঁঠার ঝোল খাব, তুমি এটা কী করে ভাবতে পারলে?'' কী আর বলব, যা ভাবার তা ভেবে নিয়েছি। তবুও এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম—কতবার তো হোটেলে মাংস খেয়েছি, তখন কি আর দেখেছি ওই মাংস বাঁচা না মরা ছাগলের? এবার ওঠার পালা। ওঠার সময় জগন্নাথ বলে ওঠে, ''মাস্টার মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি-টিঠি লিখে আর কাগজপত্র যা পাবো সেগুলো পড়ে যদি খানিকটা সাহায্য করতে তো আমার ইউনিয়ন করতে সুবিধা হতো, করবে?'' দেখ দেখি ঝামেলা, তবুও বললাম, ''কিন্তু আমি আপনার ছেলেদের পড়ালে কখন এসব করব?'' তারপর কী ভেবে বললাম, ''ঠিক আছে দেবেন, আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব অবশ্যই করব।''

জগন্নাথের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে পড়ি, আর একটা বাড়িতে টিউশন আছে, যেতে হবে। ওই বাড়িতে পড়াতে এসে খানিকটা অবাকই হলাম, আজকে ওদের ব্যবহারটা কেমন যেন ঠাণ্ডা। অন্যদিন বাচ্চাগুলোর মা বা দিদি চায়ের কাপ নমিয়ে দিয়ে যায় আজকে ওদের কাজের মেয়েটা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে পড়াতে শুরু করলাম। পড়ানো শেষ হওয়ার পর সাইকেলে চেপে বসেছি, এমন সময় 'মাস্টারমশাই' ডাক শুনে সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। দেখি বাচ্চাদুটোর বাবা পিছন থেকে ডাকছেন। উনি এগিয়ে এসে বললেন, ''চলুন, আপনার সাথে কথা আছে।'' বলেই ভদ্রলোকে একটা

সিগারেট ধরিয়ে কীভাবে কথা শুরু করবেন ভাবছেন। আমি মোটামুটি ধরেই নিয়েছি উনি কী বলবেন?—ওঁকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলে উঠলাম, ''আমাকে আর আসতে হবে না, তাই তো?'' যেন তিনি হাঁফছেড়ে বাঁচলেন। বলে উঠলেন, ''ঠিক ধরেছেন, আসলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার করি। আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি। গতকাল ওরা এসে ধমকি দিয়ে গিয়েছে, যদি আপনাকে আসতে না মানা করে দিই তাহলে আমাকে দেখে নেবে। কী করি বলুন তো!'' বললাম, ''না, না, আমার জন্য কেন আপনাদের বিপদ হবে, বরং আমিই আসব না। আপনারা তো ভালো থাকবেন, আমার যা হবার হবে—'' বলেই আবার সাইকেলে উঠে বসি।

''ও মাস্টারমশাই, শুনুন না,'' অবাক হয়ে আবার নামলাম। বললাম, ''কী?'' এবার ছাত্রদুটির বাবা পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে বললেন, ''আপনার এ মাসের বেতনটা মাস্টারমশাই।'' হাত বাড়িয়ে টাকাটা গুনে দেখলাম ৮০০ টাকা, এ মাস শেষ হতে আরও ১৫ দিন বাকি আছে, সেখান থেকে ৪০০ টাকা ফেরত দিয়ে বললাম, ''এখনও ১৫ দিন বাকি আছে বিমানবাবু, আমি কাজ না করে পারিশ্রমিক নিই না, আপনি বাকি ৪০০ টাকা রেখে দিন।'' খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বিমানবাবু বলে ওঠেন, ''না, না মাস্টারমশাই, আপনার তো কোনো দোষ নেই, নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে এটা করতে হল—আপনি ৮০০ টাকাই রেখে দিন।'' ''না।'' বলে বাকি টাকা বিমানবাবুর পকেটে গুঁজে দিয়ে ওঁকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জোরে সাইকেলটা চালিয়ে দিলাম। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে সাইকেলটা চলছে—মোটামুটি এই আওয়াজে পাড়ায় অনেকেই বুঝতে পারে কমল মাস্টার আসছে।

□ ১৭ই মাঘ, ১৪২০, শুক্রবার (ইং ৩১শে জানুয়ারি, ২০১৪)

বাসায় পৌঁছে তালা খুলতে গিয়ে বেশ অবাকই হলাম, দেখি দরজার তালার সাথে দুটো ঝাণ্ডা আড়াআড়ি করে বাঁধা। দুটোই তেরঙ্গা। মনে মনে ভাবলাম, কী ব্যাপার, ওরা কি ঘরটা দখল করে নিল? ঘর ঢুকতে দেবে না তার জন্য ঝাণ্ডা বেঁধে দিয়েছে? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? দেশটা 'মগের মুলুক' না কি, যা খুশি তাই করবে? দেশে আইনকানুন কিছু নেই নাকি? কী করব বুঝতে পারি না। দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবতে থাকি, শেষে ঠিক করলাম, সামনেই তো পুলিশ ফাঁড়ি। গিয়ে সবটা জানিয়ে আসি। তারপর যা হোক কিছু করা যাবে। আবার সাইকেলে চেপে বসি, কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পর লক্ষ করলাম আমার পিছু পিছু কয়েকজন মোটর সাইকেলে আসছে। বুঝতে পারি ওরা লক্ষ করছে আমি কোথায় যাচ্ছি। খানিকটা আতঙ্ক, ভয় নিয়েই হাজির হলাম ফাঁড়িতে। ফাঁড়ির ইনচার্জ তখন টেবিলে পা তুলে বসে আছেন। নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিয়ে ইনচার্জকে সবটা বলতে থাকি। ইনচার্জ টেবিলে পা তুলে রেখেই কথাগুলো শুনতে থাকেন। ইতিমধ্যে মোটর সাইকেলে যারা ফলো করছিল সোজা এসে ইনচার্জের ঘরে ঢুকে বলে, ''এই যে বড়বাবু, কী করছেন?'' বড়বাবু ধড়মড় কর টেবিল থেকে পা নামিয়ে সাথে সাথে বলে ওঠেন, ''আরে কালোবাবু, আসুন আসুন, বসুন বসুন।'' বড়বাবু হাঁকিয়ে ওঠেন, ''এই সেন্ট্রি তাড়াতাড়ি দুটো চেয়ার নিয়ে এসো, দেখছো তো কালোবাবুরা এসেছেন আর তুমি কার্তিকের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে আছো?'' অবাক হয়ে ব্যাপার স্যাপার দেখছিলাম—আর মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই 'ক-অক্ষর গোমাংস', 'ব্যাটা কালো' একটা চোর, তাকে এত ভয় পাবার কী আছে? কালোর হাতে একটা ঠোঙা। সেটি এগিয়ে, যেন আমাকে দেখতেই পায়নি এমন ভাব করে কালো বলে, ''বড়বাবু পেঁয়াজি খাবেন নাকি, গরম আছে, পরিবর্তনের পেঁয়াজি খান, ভালো লাগবে।'' বড়বাবু দেঁতো হাসি হেসে বলে ওঠেন, ''তা যা বলেছেন, দিন দিন।'' এরপর হাত বাড়িয়ে দুটো পরিবর্তনের পেঁয়াজি নিয়ে খেতে থাকেন।

এসব দেখে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিলাম, রাগও হচ্ছিল। এবার বড়বাবুকে আবার বলি, ''কিন্তু স্যার'' মুখের কথা মুখেই থাকে। বড়বাবু ধমক দিয়ে বলে ওঠেন, ''থামুন তো মশাই, আপনি এসেছেন এদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে? নিশ্চয়ই আপনি কিছু করেছেন, যান, কালোবাবুদের অফিসে গিয়ে সব ঠিক করে নেবেন, যত্তসব।'' আবার কিছু বলার চেষ্টা করি। আবার ধমক দিয়ে সেন্ট্রিকে ডেকে বড়বাবু বলে ওঠেন, ''এই, একে বার করে দাও তো।'' সেন্ট্রি আমার হাত ধর হিড় হিড় করে টেনে এনে ফাঁড়ির বারান্দা থেকে এক ধাক্কা মারে। আমি হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ি মাটিতে। শুনতে পাই, ওদের হো হো হাসির আওয়াজ। ''স্যার উঠুন,'' বলেই আমার হাতদুটো ধরে কে যেন ওঠানোর চেষ্টা করে। তাকিয়ে দেখি শিখা। ওর সাথে কয়েকজনকে নিয়ে কখন যে আমার পিছু পিছু ফাঁড়িতে এসেছিল বুঝতেও পারিনি। ফাঁড়ির ভেতরে তখন পরিবর্তনের পেঁয়াজির আর হাসির ফোয়ারা চলছে। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সাইকেলটার কাছে পৌঁছে সাইকেলে চাপতে গিয়েই বুঝতে পারি চাকা দুটোতেই হাওয়া নেই। অগত্যা হাঁটা পথেই সাইকেল সহ বাড়ির দিকে শিখার সাথে রওনা দিই। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরেই শিখা আমাকে বলে, ''স্যার আজকে আর ওই বাড়িতে যেতে হবে না, চলুন আমার বাড়িতেই থাকবেন।'' আমি বলি, ''না, না। আমার ঘরেই ফিরে যাবো।'' আবার শিখা অনুরোধ করে, কিন্তু আমি আবার ওদের কথা না শুনেই বলি, ''না, তোমরা ফিরে যাও, আমি আমার ঘরে যাই। দেখি না ওরা কী করে? কতটুকু ওদের ক্ষমতা?'' শিখারা বুঝতে পারে অনুরোধে কাজ হবে না। আমি ওদের কথা শুনব না। অগত্যা ওরা যে যার বাড়ি ফিরে গেল। আমিও হাঁটা দিলাম আমার বাড়ির দিকে।

দরজার কাছে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলাম কী করব? ঝাণ্ডা দুটোকে খুলে ফেলে দেব, না একপাশে সরিয়ে রেখে তালাটা খুলব। শেষে সমস্ত হতাশা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে পকেট থেকে চাবি বার করে ঝাণ্ডাটা সরিয়ে দেওয়ালের একপাশে রেখে তালাটা খুলতে থাকি। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে, ''থামুন।'' কোনো গুরুত্ব না দিয়ে তালাটা খুলে ঘরের ভেতরে পা দিয়েছি এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমার জামার কলারটা ধিরে হিড় হিড় করে টেনে বাইরে বার করে আনে। আলো-আঁধারি থাকায় তাকে চিনতে পারি না। সব থেকে হতভম্ব হয়ে গেলাম তখনই, যখন সারা শিক্ষকতার জীবনে যা হয়নি তা হল। সে কষিয়ে এক চড় মারে আমার গালে। আধা বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে বলে, ''ঝাণ্ডা মে কাহে হাত দিয়া, তালা কেন খুললি শুয়োরের বাচ্চা?'' কোনোদিন কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করিনি। আজকে কেন জানি না মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গেল। এক ঝটকায় কলার থেকে ওর হাতটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, ''বেশ

করেছি, আমার ঘরে আমি ঢুকবো না তো তুমি ঢুকবে, তুমি আমার ঘরে ঝাণ্ডা লাগাবার কে হে?" ছেলেটির মুখ থেকে ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। ছেলেটি বলে উঠল, ''দেখবি কে, দাঁড়া দেখাচ্ছি—" বলেই ঝেড়ে একটা ঘুষি মারে আমার মুখে। ঠোঁটটা ফেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। এবার সমস্ত চেতনাকে একত্র করে খুব জোরে এক ধাক্কা মারি ছেলেটার বুকে। ছেলেটা টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে। ও আবার উঠে দাঁড়ায়। দৌড়ে চলে আসে আমার কাছে। ছেলেটার সাথে যারা ছিল তারাও এসে ছেলেটাকে ধরার চেষ্টা করে। শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ছেলেটি চিৎকার করে ওঠে, ''শালা আমাকে মারা, ইতনা হিম্মত!" রাগে বলেই ফেলাম, ''হ্যাঁ ইতনা হিম্মত। আমার ঘরে ঢুকেই দেখ তারপর বুঝবে ঠেলা। তোমরা কী ভেবেছো? সবাইকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখবে? একবার আমার ঘরে ঢুকেই দেখ কেমন মজা।" ওরা খানিকটা থমকে গিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না। হঠাৎ সেই মাতাল ছেলেটা আবার আক্রমণ করতে আসে। এবার ওর সঙ্গীরা কোনোরকমে আটকে দেয়, না হলে কী হত বলা মুশকিল ছিল। তবুও ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ''স্যার, কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না। এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে।" ওরা আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। দেখি আগামীদিনে কপালে কী আছে?

পড়া শেষ হলে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাবধানে ডায়েরিটা নিজের বইপত্র রাখার আলমারিতে একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখে শিখা। জানালাটা খোলা আছে, শিখাদের বাড়িটা আবার জোড়বাঁধের কাছেই। এখান থেকে তিন দিকটা ভালোভাবেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু সমস্যা একটাই, জানালাটা প্রায় দিনই বন্ধ রাখতে হয়। খুললেই জানালা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যেই জোড়বাঁধের শ্মশানটা নজরে পড়ে। প্রায়ই ওখানে আশপাশের গ্রামের শবদাহ দেখতে পাওয়া যায়। কটু গন্ধ এদিক দিয়ে হাওয়া বইলেই সোজা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। তাই জানালাটা প্রায় সময়ই বন্ধ রাখতে হয়। আবার এদিক দিয়ে হিমেল হাওয়াও ঢুকছে। লাশ পোড়ানোর গন্ধটা বেশ জোরালো ভাবে পাওয়া যাচ্ছে। ইচ্ছে করেই জানালাটা খোলা রেখেছে শিখা। জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোড়বাঁধের শ্মশানের দিকে তাকিয়ে থাকে। জোড়বাঁধের শ্মশানে একটু আগেই সার বেঁধে ছ-ছটা লাশ পোড়ানো শুরু হয়েছে। জ্বলছে দাউ দাউ করে। ছ-ছটা লাশ পোড়ানোর কটু গন্ধে গোটা এলাকাটা কেমন যেন নরককুণ্ড হয়ে উঠেছে। একে শীতের রাত্রি, সন্ধেবেলায় রান্নার জন্য জ্বালানো কয়লার ধোঁয়া ভারি আবহাওয়ার জন্য এখনও মাটির সঙ্গে কথা বলছে। আবার কুয়াশাও পড়তে শুরু করেছে। তার ওপর ছটা চিতার আগুনের ধোঁয়া গোটা এলাকাটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে। ওখানে দাঁড়ানো লোকগুলোকে কেমন যেন ভূতের মতো অশরীরী মনে হচ্ছে শিখার। ছটা লোকের লাশ কম কথা নয়। একটা কমল স্যারের, আর বাকি পাঁচটা ওদের। এই পাঁচজন মিলে গতকাল প্রকাশ্যে জোড়বাঁধের তেমাথার কাছে গুলি করে খুন করে কমল স্যারকে। গত কয়েক বছরে এলাকার মানুষগুলো কেমন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল, সাত চড়ে রা ছিল না। এদের মধ্যেই কারা যেন ভয়ানক জীঘাংসায় এই কাজটা করে ফেলেছে। কেমন করে করল? কমল স্যারকে গুলি করার সময় ওখানকারই লোকজনেরা ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিল। ওদেরই মধ্যে কারা যেন হল্লা শুরু করে। ''আরে মাস্টার কো মার দিয়া, সব নিকালো।" ব্যস, শুধুমাত্র একটা আওয়াজেই বেরিয়ে আসে আশপাশের অনেক অনেক মানুষ। ঘিরে ফেলে ওই পাঁচজনকে। এরা খুব ভয় দেখিয়েছিল বেরিয়ে আসা লোকেদের। বন্দুক উঁচু করে গুলি করারও হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। উগ্র জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই পাঁচজনের ওপর। কী করে কী হল বোঝা যায়নি। কিন্তু ওই পাঁচটা লোকেরই দলাপাকানো লাশ পড়েছিল কমল স্যারের পাশে। চেনা যাচ্ছিল না। অনেক পরে পুলিশ কমলস্যারের লাশের সাথে ওই পাঁচজনের লাশ তুলে নিয়ে যায়। এখন এগুলোই জ্বলছে দাউ দাউ করে। লাশ পোড়ানো আগুনের আভাতে এলাকাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শুধুই পুলশি আর পুলিশ। ভারি বুটের শব্দ। মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়িগুলো যাতায়াত করছে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে ওখান থেকে সরে আসে শিখা। দূরে তখনও শোনা যাচ্ছে পুলিশের হুটারের শব্দ।

With Best Compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 142

With best compliments of

M/S TIWARI CONSTRUCTION

Fabricators, Erectors, Mechanical Engineers, Civil Contractors

Specialist in :
Stainless Steel & Pipeline Job, Dealing with Earth Moving Machine,
JCB & Hydraulic Crane Etc.

ESBY Industrial Estate
Sanjib Sarani, Durgapur-713201, Dist. Burdwan, E-mail : vinodtiwarig@gmail.com
Phone : 0343-2554757 (R), G.T. : 9002390791
V.T. : 9333950979, R.T. : 9333907643 / 9932697055

WORKS SITE
(1) Graphite India Ltd., (2) Ganga Rasayanie (P) Ltd. (3) Jai Balaji Group, (4) Ultratech

Sl. No. 146

রাস্তায়, অন্ধকারে

রূপক মিত্র

রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে ট্রেন থেকে নামলেন সরোজবাবু। তাঁর সঙ্গে আরও তিনজন। প্ল্যাটফর্মেও দাঁড়িয়েছিল জনা পাঁচ। ওদের মধ্যে থেকে জীবন আর সমর এগিয়ে এসে সরোজবাবুর দুটো হাত ধরতে যায়। মুচকি হেসে উনি বলেন, আমি পারব। ধরতে হবে না তোদের।

জীবন বলে, দুর্বল শরীর।

—নাঃ, আমি পারব। নিজেই তো উঠেছি ট্রেনে, কোনো অসুবিধে নেই।

—এখানে ওভারব্রিজে উঠতে হবে।

—ঠিক আছে। তোরা আছিস পাশে, ওতেই হবে। আমি পারব।

সত্যিই কোনো অসুবিধা হল না। ওভারব্রিজে উঠে, নেমে, স্টেশনের গেট পেরিয়ে বাইরে এলেন ঊনসত্তর বছরের সরোজ ভট্টাচার্য। কয়েক পা হাঁটার পর একটু থামলেন ধুতি, সাদা শার্ট পরা কৃষ্ণকায় সরোজবাবু, লম্বা শ্বাস টেনে তাকালেন আকাশের দিকে। পরিষ্কার নীল আকাশ, কোথাও কোনো সন্দেহ বা ভয় নেই। অসুখের চিহ্ন নেই কোনোখানে।

সতেরো দিন আগে অবশ্য এমন আশা কেউই করেনি যে তিনি নিজের পায়ে হেঁটে আবার এই শহরে ফিরবেন। হতচেতন অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ডাক্তারবাবুরাও আশার কথা কিছু শোনাতে পারেননি প্রাথমিক পর্বে। কিন্তু ওঁর ওই শীর্ণকায় শরীরে যে এত প্রাণশক্তি, আন্দাজ করতে পারেনি কেউ। ঘুরে দাঁড়ালেন মাস্টারমশাই। রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে, নিজের জন্মভূমি রাঢ়বঙ্গের ছোট্ট এই মফস্‌সল শহরে এসে তিনি দেখলেন আকাশ আদিগন্ত নীল, শ্বাস টানলেন বুকের খাঁচা পূর্ণ করে। বুঝলেন তিনি ভয় নেই আর, বেড়ে যাচ্ছে জীবন!

এখনো, ঊনসত্তর বছর বয়সেও অনেক রাত পর্যন্ত বইপত্র নিয়ে বসে থাকেন শহরের মাস্টারমশাই সরোজ ভট্টাচার্য। স্কুলে পড়ানো থেকে অবসর নিয়েছেন ন বছর হয়ে গেল, কিন্তু ছাত্ররা আসে তাঁর কাছে। উজ্জ্বল মুখচোখের ছাত্ররা সব। আনন্দ হয় মাস্টারমশাইয়ের, সেই সঙ্গে কিছুটা গর্ব। ওদের কেউ কেউ প্রৌঢ়ত্বে পা রেখেছে আজ, কেউ বা সদ্য যুবক। বন্ধু এখন ওরা, মুক্তমনা মাস্টারমশাই এরকমই ভাবেন। ছাত্রদের আচার আচরণে অবশ্য মিলেমিশে আছে কিছু অন্যরকম অনুভব। সোনালি শৈশব কৈশোরের সেইসব শাসনের দিনগুলো ভুলে যাওয়া মুশকিল ওদের পক্ষে। দূরত্ব একটা তাই থেকেই যায় কোথাও না কোথাও। ওখানেই হয়তো লুকিয়ে থাকে জরুরি কোনো ভারসাম্য।

অনেক রাতে বাইরের বারান্দায় গ্রিলের দরজাটা ঝনঝন নাড়িয়ে কেউ

ডাকছিল। বিভূতিভূষণ থেকে চোখ তুলে মাস্টারমশাই সাড়া দেন, কে?

—দরজা খুলুন, আমরা—

—কে তোমরা? বলতে বলতে ঘরের দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় আসেন সরোজবাবু। সেই সতেরো দিন আগে।

—বারান্দার দরজাটা খুলুন, কথা আছে।

রাস্তায় আলো নেই। বারান্দার আলো ওদের গায়ে মুখে পড়ছে না ঠিকঠাক। দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন, কাউকেই চিনতে পারছেন না মাস্টারমশাই।

—কী কথা?

—দরজাটা খুলুন, বারান্দায় উঠে বলছি।

একটু দোলাচলে পড়ে গেলেন মাস্টারমশাই। ওরা কি আমার ছাত্র? শহরে দুটো হাই স্কুল, একটায় তিনি পড়াতেন। ওদের চিনতে পারছেন না। সব ছাত্রকে অবশ্য মনে রাখাও শক্ত। সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে দু-জন, বাকিরা ওদের পেছনে, অন্ধকারে। ওখানের কেউ তাঁর স্কুলের ছাত্র হতেও পারে। যদি তা না-ই হয়, এক হিসেবে ওরা তো ছাত্রই আমার, এই অনুভবে আচ্ছন্ন মাস্টারমশাই গ্রিলের দরজার চাবি খুলে ওদের আসতে দিলেন বারান্দায়। কাছাকাছি এলো তিনজন, বাকিরা নিচে।

—বলো, কী কথা। মাস্টারমশাই বললেন।

সামনের ছেলেটার মুখ সম্পূর্ণ অচেনা, কখনো দেখছেন বলে মনে করতে পারলেন না মাস্টারমশাই। চাপা হিসহিস গলায় সে বলল, ওকে ডেকে দিন।

—কাকে, চমকে উঠলেন মাস্টারমশাই।

—আপনার বড়ো ছেলে প্রবীরকে।

—প্রবীর! সে তো ঘরছাড়া। অনেকদিন আসেনি।

—এসেছে। খবর আছে আমাদের।

—না, ওসব মিথ্যে।

—সত্যি মিথ্যে আমরা বিচার করব। আমরা দেখব, সরুন।

—কী দেখবে?

—ঘরে ঢুকে সার্চ করব।

—না। কে তোমরা?

—পরে বলছি। সরুন।

—না। মাঝরাতে এসব বাঁদরামি—

—এই বুড়ো, সরবি কিনা—

প্রথম ধাক্কাটা খেয়ে মাস্টারমশাই টলে পড়লেন দেয়ালে। সামলে নিয়ে ভেতরে ঢোকার দরজা আড়াল করে দাঁড়ান তিনি দু-হাত ছড়িয়ে। প্রথম ঘুষিটা মুখে, ছিটকে গেল চশমা। চোখের দৃষ্টি আবছা হয়ে গেল বটে, কিন্তু তিনি ছাড়বেন না দরজা। এদের মধ্যে কেউ কি আমার ছাত্র নয়? কেউ একজন নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে সারা জীবন কী করলাম আমি? তারই আশায়, দরজা আগলে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময়, অবিশ্বাসের তীব্র আঘাতের পর আঘাতে, ঘন অন্ধকারে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিলেন মাস্টারমশাই...

ট্রেনের গণ্ডগোলে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। প্রতুল স্টেশনের বাইরে এসে দেখে চারপাশ কেমন অচেনা লাগছে। একটু ধাতস্থ হবার পর বুঝতে পারে দোকানপাট সব বন্ধ, রিকশা স্ট্যান্ড ফাঁকা, লোকজন খুবই কম। প্রতুল দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। স্টেশনের ঘড়িটা বলছে বারোটা দশ। একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে, তার কাছে গিয়ে প্রতুল বলে, কী ব্যাপার, সব ফাঁকা—

লোকটা উদাসীন গলায় বলে, ঝামেলা হয়েছে।

—কোথায়?

—এখানে, বাইরের রাস্তায়। মারপিট।

সাইকেল স্ট্যান্ড খোলা থাকবে না এটা জানাই ছিল, এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায়। রিকশ নেই হেঁটেই যেতে হবে। বাড়ি অবশ্য খুব বেশি দূরে নয়। আস্তে হেঁটে গেলেও মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছানো যায়। মূল ব্যাপার হচ্ছে আজকের এই ঝামেলাটা। স্টেশন থেকে সোজা বেরিয়ে ডানদিকে বাঁক নেওয়া রাস্তাটা যতদূর দেখা যায় শুনশান। টিমটিমে আলোর বাইরে জমাট অন্ধকারই বেশি। প্রতুল ওইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আরও কিছুক্ষণ। বাড়িতে অবশ্য ফোন করে জানানো হয়েছে ট্রেনের গণ্ডগোলের কথা। বাবা তো এমনিতেই জেগে থাকে রোজ। আজ বাকি সবাই জেগে বসে আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মা, বউদি, ছোটোবোন। আসলে ওই ব্যাপারটার পর থেকেই...

দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে হেঁটে প্রতুল বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরে। বাঁকের মুখে এসে একটু দাঁড়ায়, নাঃ একটাও মানুষ নেই রাস্তায়। ছ-বছরের ডেলি প্যাসেঞ্জার প্রতুল। সকাল আটটা থেক রাত আটটা, বারো ঘণ্টা সে থাকে না এই শহরে। সরকারি অফিস, শনি-রবি ছুটি। তবু কোন ফাঁকে আজন্ম পরিচিত শহরটা তার কাছে একটু যেন অচেনা হয়ে গেছে, প্রতুল টের পায় আজকাল। ঠিক বিশ্বাস হয় না চারপাশ, রাস্তাঘাট। অনেক বেড়ে গেছে অচেনা মানুষের মুখের সংখ্যা। অনেক চেনামুখ আবছা হয়ে গেছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়!

কিছুটা হাঁটার পর কেমন সন্দেহ জাগে প্রতুলের মনে, ফিরে দেখে, দু-জন আসছে পেছন পেছন। কোথায় ছিল ওরা? এত সতর্ক ছিল সে, তাও চোখে পড়েনি কেন! হাঁটা থামায় না প্রতুল। মিনিট দু-তিন পরে আবার সে ফিরে দেখে, আসছে ওরা, এমনকি ওদের খানিকটা পেছনে আরও দু-জন। মাটি ফুঁড়ে উঠল নাকি! হাঁটায় এবার একটু জোর বাড়ায় প্রতুল। আর মিনিট দশ। রাস্তায় আবার একটা বাঁক, সেখানে প্রতুর দেখে নেয়, এখন দুই দুই চার নয়, আরও একজন জুটেছে ওদের সঙ্গে। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! নিজেকে একটু শক্ত করার চেষ্টা করে প্রতুল, আশ্চর্যের কী আছে, ওরাও ট্রেন থেকে নেমেছে হয়তো, সে লক্ষ করেনি। হেঁটেই তো আসতে হবে ওদের। তাছাড়া শীত আসছে। সন্ধের পর থেকে ধোঁয়াশা নামে। টিমটিমে আলোর সঙ্গে ধোঁয়াশা মিশেছে, তাই অতো রহস্যময় মনে হচ্ছে ওদের।

বড়ো রাস্তা থেকে বাঁ দিকে প্রতুলদের পাড়ার রাস্তা, আঁকাবাঁকা, প্রায়ান্ধকার। প্রতুল মোড় ঘোরার ঠিক আগেই পেছন থেকে ওরা চেঁচিয়ে বলে, অ্যাই, দাঁড়া। যাচ্ছিস কোথায়?

ধক্ করে ওঠে প্রতুলের বুকের ভেতর। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে যেন। সে নিজে দাঁড়ায় না, কেউ তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় ওখানেই। গলায় কী একটা আটকে যাচ্ছে মনে হয়।

ওরা কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। রাস্তায় টিমটিমে আলো ওদের পেছনে, মুখ অন্ধকার। প্রতুল শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদের একজন বলে, খুব ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে।

প্রতুল কোনো উত্তর দেয় না।

—মাস্টারমশাইয়ের ছেলে, প্রবীরের ভাই, তাও এত ভীতু কেন তুই? কিছুদিন ধরে দেখছি ভয়ে সিঁটিয়ে কুঁজো হয়ে চলাফেরা করিস। চারপাশ দেখতে হবে তো মুখ তুলে, না হলে বাঁচবি কী করে? আমাদের চিনিস?

প্রতুল মুখ তুলে ওদের দিকে তাকায়।

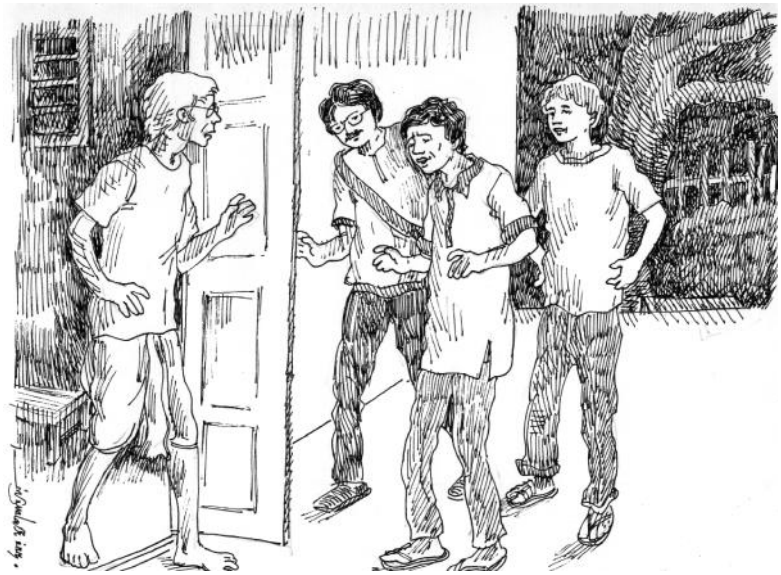

ওরা এখন একটু সরে দাঁড়িয়েছে, মুখের এক পাশে পড়েছে ল্যাম্পপোস্টের আলো। একটু যেন চেনা চেনা লাগছে ওদের।

—আমরা স্টেশনের বাইরে বসে থাকি অনেক রাত পর্যন্ত। আড্ডা দিই। তোকেও নজর রাখি, তুই জানিস না। আজ আমরা তোর জন্যেই অপেক্ষায় ছিলাম ওখানে। আমরা তোর পিছু নিয়েছি দেখে তুই ভয়েই মরে যাবি মনে হচ্ছিল। এক সময় তুই ভালো ব্যাট করতিস না? বাউন্সারের ভয়ে মাঠ ছেড়ে পালিয়ে যাবি? খেলবি না একটু?

মুখে কপালে ঘাম জমেছিল প্রতুলের। এখন সেখানে লাগছে ঠাণ্ডা হাওয়া।

—এখানে আমরা পাঁচজন। আরও দু-জন আসছে, ওই দ্যাখ। আরো অনেকে অপেক্ষায় আছে আড়ালে আবডালে। তুই একা? তাই কখনো হয়? চোখ মেলে চারদিক দেখতে হবে, না হলে তো ভয়েই মরে যাবি। এসব অন্ধকার ঘরবাড়িগুলো, ওখানেও অনেক মানুষ আছে মনে রাখিস। কত মানুষ ঘিরে আছে তোকে, তাও তুই ভয়ে মরিস।

একবার ডাকতেই বারান্দায় আলো জ্বেলে বাইরে আসেন সরোজ ভট্টাচার্য। আজও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, সেই দু-মাস আগের মতো। বিদ্যুৎ চমকালো যেন মাথার ভেতর।

—কী ব্যাপার, তোমরা?

—প্রতুলকে বাড়িতে দিয়ে গেলাম মাস্টারমশাই।

—বাড়িতে দিয়ে যেতে হবে কেন?

—অন্ধকার রাস্তা। ভয় পাচ্ছিল খুব।

—তাতে কী? ভয় পাবে কেন?

—আর হয়তো পাবে না ভয়। ওকে বললাম, কেউ একা নই। সবাই আছি আমরা, শ্বাস-প্রশ্বাসে জড়িয়ে...

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

মোরা এই করেছি পণ
শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শৌচাগার সকলের জীবনের ধন

খানো গ্রাম পঞ্চায়েত

গলসী-২নং ব্লক, বর্ধমান

জয়ন্ত চ্যাটার্জি
উপপ্রধান

জয়ন্তী রায়
প্রধান

Sl. No. 48

With best compliments of

M A L A K A R E N T E R P R I S E

CIVIL, MECHANICAL CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIER

D-25/S, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Burdwan
Contact : 9474444867

Sl. No. 145

With best compliments of

Ratan Dutta

ASSOCIATED ENGINEERS

MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Specialist in
Tool Room, Gear, Penion Shaft & Maintenance Works
Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Dist. Burdwan
Phone : 9932244082, 8001762157

Sl. No. 154

তিন সত্যি উন্নয়ন

তপোময় ঘোষ

উন্নয়নের বাঁকে

জ্যৈষ্ঠ মাসের ঠা ঠা দুপুর। রায় পুকুরের কাছে পাকা রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানকার সেই বুড়ো পাকুড় গাছতলায় বসে বসে মাধাই বাউরি ঢুলছিল। আর আশেপাশে তার দুটো ধাড়ি, চারটে খাসি আর পাঁচটা ছা চরছিল। ফাঁকা মাঠের ঘাস রোদে পুড়ে ধাপুড়ি হয়ে গেছে। তবু পেটের দায়ে ছাগলগুলো খুঁটছিল।

পাশে পাকা রাস্তা, তাই ভয়। কারণ আজকাল এখান থেকে ছাগল চুরি হয়ে যায়। গত মাসে পাশের গাঁয়ের মধু বাগদির দুটো বড় খাসি সাদা অ্যাম্বাসাডারে তুলে নিয়ে স্পিড বাড়িয়েছিল। ওরা সব নাকি শহরের চোর!

তা আজও একটা সাদা অ্যাম্বাসাড়ার পাকুড়তলায় দাঁড়ালো। মাধাইয়ের ভয় হল। তারপর গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই দেখল, দরজা খুলে গাড়ি থেকে তিন চারজন নামছে। তাদের মধ্যে একজন তাদের গাঁয়ের মিন্টু মজুমদার। যাক্, বাঁচা গেল। ছাগলচোর নয়।

আবার গাছতলায় এসে বসল মাধাই। মিন্টু অন্য বাবুদের কী সব বলল। আর তারা গাড়ি থেকে যন্ত্রপাতি, বিশেষত একটা লম্বা ফিতে আর একটা চেন নিয়ে, রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের মুখে নেমে সোজা মাপতে মাপতে চলতে থাকল। মাধাই পঞ্চায়েতের সরকারি কাজে মাটি কাটতে গিয়ে দেখেছে ব্লকের বাবুরা এসব চেন, ফিতে দিয়ে মাপজোক করেন। আজও তাই করছেন হয়ত...

মিন্টু শুধু দাঁড়িয়ে দেখছে। মাপছে অন্য দু-জন ছোকরা গোছের বাবু। আর মাধাইয়ের মতো একজন, সেই মাপ বরাবর চুন দিয়ে দাগ দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে পালেদের বাকুরি, মোড়লের দশকাঠা, হাটুইদের পাঁচবিঘে চাটুজ্জেদের পরনে চুন পড়ছে। মিন্টু বলল, সরকার রাস্তাটা সোজা করবে। ঘণ্টা ঘানেক কসরত করার পর চেন গুটিয়ে মিন্টুর বাবুলোকরা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

বার্তাটি গ্রামে রটে গেল। বেশি রটালো, মানে সত্যি করেই বলল মাধাই। রাস্তা সোজা হবে। পিচ রাস্তা...

সন্ধ্যায় মিন্টুর বাড়িতে চাষিদের ভিড়। —ও মিন্টু, একটু বলে কয়ে দ্যাখো তোমার ইঞ্জিনিয়ারকে যাতে অন্তত ফুট দশেক সরায়। আমার জমিটা বাদ দিতে বলো বুঝলে? ভালো জমি গো... গদাই পাল অনুরোধ করে। নেড়া হাটুই বলল, যাঃ, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে! কিছুই উপায় নেই, মিন্টু?

মিন্টু মাথা চুলকে বললল, আমাকে বললে হবে? তোমাদের পঞ্চায়েতকে বলো। তাদের সরকারই তো করছে। ইঞ্জিনিয়ারটা না হয়, আমার বন্ধু হয়, শুনেছে আমার গ্রাম, তাই খবর পেয়ে আমাকে ডেকেছিল। আমি শুধু গিয়ে সাইটটা দেখিয়ে দিয়েছি। আমি কিছু নই কাকা। সব তোমাদের কমরেডরা... তাদের গভমেন্ট...

—আরে আমরা ওসব গভমেন্ট ফবমেন্ট জানি না। তোমার সঙ্গে ওই অফিসারদের লাগ আছে, তুমিই কিছু ধরিয়ে দাও। একটু সরিয়ে দেবে।

এই শুভক্ষণটিরই অপেক্ষা করছিল মিন্টু। মুখে বলল, বেশ, বলছ যখন, আমি চেষ্টা করে দেখব। ওরা কি ঘুষ খাবে?

—খুব খাবে। তুমি চেষ্টা করো, আমরা টাকা দেব।

পরের সন্ধ্যায় কয়েক লাখ টাকা কামিয়ে নিল মিন্টু মজুমদার। ডান পাশের চাষিদেরকে বলল, ঠিক আছে বাঁ দিকে দশ ফুট সরাবো। আবার তারা চলে গেলে, বাঁ দিকের চাষিরা এলে, তাদেরকে বলল, ডান দিকে দশ হাত সরাবো।

কিছুদিনের মধ্যেই চাষিরা জেনেছিল : সবটাই ভাঁওতা। প্রতারণা। কোনো রাস্তা সোজাসুজির ব্যাপারওটা ছিল না। ওই লোকগুলো ছিল ধুরন্ধর মিন্টুর বাইরের সাগরেদ। আর দু-জন সেরেফ লেবার। সাঁট করে ভাঁওতা দিয়ে টাকা তুলছিল।

বনেদি বাড়ির ছেলে। রাজনীতিতে কংগ্রেসি ঘরানা। ম্যাট্রিকে তিনবার ফেল। তবু চাকরির আশায় বাহাত্তরে অনেক কিছু করেছিল। শিকে ছেঁড়েনি। হতাশা থেকে প্রতারণার ব্যবসা। রাজনীতিগতভাবেও লাভবান। যা একটু আধটু বিভ্রান্ত করা যায় লাল পার্টির কমরেড আর তাদের পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। হিসেব ছিল এই। সাত বছর পরে টাকা ফেরত দিলেও অর্ধেক লাভ...

গল্প এটা নয়। গল্প হল, এ হেন মিন্টু মজুমদার এখন এখানকার প্রধান। আরও খবর : পদটা নাকি নগদ দশ লাখ টাকায় তাকে বেচে দিয়ে গেছেন জেলার দিদি ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক চন্দ্রকান্ত দত্ত।

গয়নাবাড়ি ছাগলঘর

বাউরিদের মিলির মা শুনেছে : দু-খানা মাত্র 'ইনদিরাবাসী' ঘর এয়েচে এবার। তার একখানা তাকেই ভালোবেসে দেবে বলেছে মজুমদার বাড়ির ছেলেটা। এক কথায় খুব ফুর্তি মিলির মা বাদুলি বাউরির। আজ বিশ বছর ধরে আগের 'নাসুনেদের' বলে বলে হয়রান হালাক্কা হয়ে গেয়েচে সে। 'বাঁশ বুকো'রা হেরেচে ভাল হয়েচে। ভাগ্যে ওই মমতা জিতলো, মজুমদাররা এ গাঁয়ের আবার মাথা হয়ে দাঁড়াল।

বাগদি পাড়ার হাবুর বাবা ডুবো বাগদি শুনেছে সেও একটা 'ইনদিরাবাসী' ঘর পাবে। গাঁয়ে মাত্র দু-খানা এসেছে, তার একটা বহু কষ্ট কসরৎ করে তাকে দেবে। নাম বানিয়েছে মজুমদারদের ছেলেটা। বুড়ো ডুবো এ খপর পেয়ে ডগমগ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিটির বাড়িতে পর্যন্ত খপর দিয়েচে। জামাই এখনো সিপিয়েম। বলেচে, বাবা, তোমরা তো পারোনি। এরা দ্যাকো আমার নাম 'নেকে' লিয়েচে। বলেচে, ষাট হাজার পাবো। তা তুমি বাবা এলে দেখেশুনে ঘরটা করে দিয়ে যাবা। তুমিই তো আমার ছেলে।

ওদিকে চন্দ্রকান্ত দত্তর বিরুদ্ধ গোষ্ঠী, মানে নীহার পালের খোঁচায় মিন্টু মজুমদারের 'প্রধান' পদ চলে গিয়েছে। মিন্টু নাকি প্রতারক। সেই নিয়ে ঘরে ঘরে কত দ্বন্দ্ব। মন্টুর ভাইপো সুদীপ এখন এখানকার প্রধান।

ফের আস্থা ভোট নিয়ে প্রধান নির্বাচিত হওয়ার দিনেই কাকা-ভাইপো এক বাইকে চেপে বাড়ি এসে, বারদরজায় দাঁড়িয়ে সুদীপ পাড়ার/গাঁয়ের লোককে শুনিয়ে হেঁকেছিল : ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, আবার মজুমদার বাড়ির প্রধান গো...

মানে, গাঁয়ের লোক তো বটেই, চন্দ্রকান্ত বা নীহারকান্তিদের মতো নেতাদেরও চোখে ধুলো। প্রতারণা নয়, উন্নয়ন। উন্নয়নের পরের ধাপ। তো সুদীপ এখন গাঁয়ের যুবরাজ। রাজা সেই মিন্টুই।

সেদিন সন্ধ্যার পর বাউরি পাড়ার বাদলির বাড়ি ঢুকল যুবরাজ। কাগজপত্র আর টিপছাপ নিল। ফটো তুলতে বলল। ঘর ভেঙে ঘর হবে, তাই ছাগল-টাগল থাকবে কোথায়? বেচে দাও...

পরদিন মুস্তাক পাইকারকে বাদলির বাড়ি নিয়ে গেল সুদীপের ভাই। ছাগলের খাসি দুটোর পনেরো হাজার টাকা দরদামও করে দিল মজুমদার বাড়ির শিক্ষিত ছেলেটা। বাদলি সরল বিশ্বাসে খাসি ছাড়ল। দুপুরে কাঁদল খাসি শুধু নয়, এ খাসির আসল মালিক প্রয়াত স্বামী মাধাইয়ের শোকেও... চুপ করল সন্ধ্যায় টাকা পাবার কথা মনে আসায়...। মুস্তাক বলে দিল মজুমদারবাবুকে দিয়ে যাবো, ওরা তোমাকে সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে।

বাগদিপাড়ার ডুবো এখন মাঝে মাঝেই গাঁয়ের ভেতর মজুমদার বাড়িতে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আসল দলিল পরচা নাকি নিয়ে নিয়েছে সুদীপের ভাই, সৃদীপ। দিন দশেক ঘোরার পর বলেছে, পনের হাজার টাকা যোগাড় কর, লাগবে। অগত্যা বিটির গয়না বেচে টাকা পাঠালে ছাড়িয়ে এনেছে তার পৈতৃক সম্পত্তির প্রমাণপত্তর। জামাই নাকি হার্মাদ। এসেই শ্বশুরকে বলেছিল, তাই ভাবছি, ষাট হাজার কেন। এখন তো আই এ ওয়াই পঁচাত্তর হাজার টাকা। যাক্ যা পেয়েছেন! পনের দিয়ে ষাট! কাদা দিয়ে গাঁথুন। একশ দিনের কাজ এখানেই করুন।

গল্প এ-দুটো কাহিনিও নয়। গল্প হল : মাধাই বাউড়ির খাসির টাকা পাওয়ার সেই সন্ধ্যাটা এখনো নামেনি। যে সন্ধ্যা নামলেই সুদীপের ভাই পনের হাজার টাকা দিয়ে যাবে। আর বুড়ো ডুবো বাগদি, তার কন্যার খালি গলা দেখ হাঁকুটে কাঁদে। সে কান্না থামাতে না মিন্টু, না সুদীপ, না তার ভাই...

ঠাকুর ঘরে

পুনো ঘোষের নাতনি গীতা নাইনে পড়তে পড়তে 'কন্যাশ্রী'র জন্য ফরম ফিলাপ করে দরখাস্ত করেছিল। হেডস্যার যা করার করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন গীতা টেনে। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সুদীপের ভাই প্রদীপ তাকে 'কন্যাশ্রী'র টাকার সুবিধা পাওয়াতে আসে।

পুনো সেদিন বলল, ''ঠাকুর, কী ব্যাপার বলো তো? নাতনিটাকে পড়াশোনা করতে দেবা না নাকি?''

প্রদীপ বলেছিল, তোমরা দিদির 'কন্যাশ্রী'টার উন্নয়ন বুঝলে না। গোয়ালা হয়েই থেকে গেলে।

তিন দিনের মধ্য কিশোরী গীতাকে স্কুলের পেছনে পরিত্যক্ত বাথরুম থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে।

পুনোর বউ হাসপাতালের বেডের পাশে বসে স্যালাইনের নল ঠিক করছে আর উন্নয়ন বুঝছে। ঝুলন্ত বোতলের দাগে দাগে মিলছে।

আর পুনো ঘোষ, গোয়ালা মানুষ, গরু চরানো বা লাঠানো অভ্যাসে তার লাঠিটা খুব করে খুঁজছে। বউ বিটি ব্যাটাদের গাল দিয়ে বলছে, আমার লাঠিটা খুঁজে দে...

গল্প এটাও নয়। গল্প হল : এ রাজ্যে চারদিকে শুধু উন্নয়ন চলছে।

পকেটমার

কাকলি ঘোষ

রৌনক বাসস্ট্যান্ডের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালায়। রুচিরার বাসস্ট্যান্ডে আসার সময় হয়ে গেছে। আজকে না মিস্ হয়ে যায়। গলির বাঁক পেরিয়েই বাসস্ট্যান্ড। রৌনক হাঁফাতে হাঁফাতে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে যায়।

—যাক বাবা রুচিরা আছে, রৌনক মনে মনে বলে।

ওই তো বাস আসছে। রুচিরা বাসে উঠে পড়ে। রৌনকও কোনোরকমে হ্যান্ডেল ধরে বাসে উঠে যায়। রুচিরা লেডিস সিট পেয়ে গেছে। রৌনক একটু দূরত্ব রেখে রড ধরে নেয়। বি.টি. রোড পর্যন্ত নিশ্চিন্তি। রবীন্দ্রভারতীতে রুচিরা নেমে যাবে। ফিরতি বাস ধরে নেবে রৌনক।

বাস থেকে নেমেই মায়ের ফোন—কী রে এখনও বাজার নিয়ে ঢুকলি না। বাবা দোকান থেকে চলে আসবে। কখন রাঁধব? কখন খেতে দেব?

—এই যে বাড়ি ঢুকছি রৌনক ফোনটা কেটে দেয়।

এই হয়েছে এক জ্বালা। বেকার হবার এই এক জ্বালা। বাড়ির সব কাজ কর, অথচ সকাল থেকে এক কাপ চায়ের দেখা নেই। বাজারের ব্যাগটা নামিয়ে রৌনক হাঁক পাড়ে—মা বাজার বুঝে নাও। আমি বেরোচ্ছি।

—এই দুপুর বারোটায় আবার কোথায় বেরোচ্ছিস? টো টো করে না ঘুরে বাবার দোকানেও তো একটু বসতে পারিস।

—বাবার দোকানে বসে এত হিসেব দিতে পারব না। চললাম আমি। রৌনক বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাবে, কী করবে। পাড়ার মধুদার চায়ের দোকানেই ঢুকে পড়ে।

—আরে রুনু এসে গেছিস। বসে যা বাবা। অর্চি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে।

—তোদের আর কী? বাবার পয়সায় ফুটানি করছিস।

—আরে বাওয়া বাপের পয়সা মানে আমার পয়সা। মধুদা, রুনুকে একটা ডিম টোস্ট করে দাও আর চা দাও।

—তা রুনুবাবু সকালের ট্রিপটা কেমন হল? কিছু বলতে টলতে পারলে? না শুধু দেখেই গেলে।

—ধুস ওসব পাখি কি আমাদের জন্য। মাধ্যমিকটাই পাশ করতে পারলাম না, তা আবার ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ের পেছনে লাইন দিচ্ছি!

—আরে বাবা লাইনই তো মারছিস। বিয়ে করতে তো যাচ্ছিস না।

—নে নে বলে নে। তোর মতো সুখের কপাল কি আমাদের? রুনু টোস্টে কামড় দিতে দিতে বলে।

চা শেষ করে রুনু উঠে দাঁড়ায়—চালের জন্য রেশন দোকানে এখন লাইন দিতে হবে। রেশন না পেলে আজকে বাবার জুতো খেতে হবে।

—আরে বাবাটাবাকে অত পাত্তা দিস না।

—পাত্তা না দিলে হবে? তোর মতো আমার মাসোহারা নেই। এই দু-চার টাকা যা রেশন বাজার থেকে মারতে পারি।

—কেন রে রৌনক? তোর বাবার অমন মুদির দোকান। ওখানে একবেলা করে বসলেই তো পারিস। দোকানদারি শেখাও হবে আবার দু-পয়সা আমদানিও হবে—অর্চি ওর দিকে তাকিয়ে বলে।

—হ্যাঁ অত সহজ। বাবাকে হিসেব বোঝাতে গেলে প্যান্ট ঢিলা হয়ে যাবে। যা যা তুই তোর চরকায় তেল দে। আমি চললাম।

রৌনক মনে মনে ভাবে তার বাবাটা যেন কী? সবাই জানে তাদের মতো বয়সের

ছেলেদের চলতে গেলে টাকা লাগে। আর তার বাবা বোঝেই না। এক পয়সার ফাদার-মাদার। মনে মনে বক্‌বক্‌ করতে করতে রৌনক রেশনের দোকানে লাইন দেয়।

দুই

সন্ধে হতেই শুরু হয়ে যায় রৌনকদের বাড়ির রোজনামচা।

—কী ব্যাপার সন্ধ্যা, দেড়শ টাকা দিলাম বাজার করতে। টাকা ফেরেনি। গোপাল দোকান থেকে ফিরে চেঁচায়।

—টাকা ফিরলে তো দিতাম। তোমার টাকা কি আমি চিবিয়ে খাব? সন্ধ্যাও চেঁচায়।

—তুমি কেন চিবিয়ে খাবে? গুণধর ছেলে থাকতে? তিনি তো সিগারেট ফুঁকে এলেন।

—সব সময় ছেলেকে অত ট্যাঁক ট্যাঁক কোরো না। উঠতি বয়সের ছেলে। সবদিক দেখে কথা বোলো। সন্ধ্যা জবাব দেয়।

—হ্যাঁ ছেলেকে তো লাই দিয়ে মাথায় তুলেছ। আমাকে হিসেবটা বুঝিয়ে যেতে বোলো।

রৌনক বোঝে অবস্থাটা খারাপের দিকে যাচ্ছে। দশটা টাকা মাত্র ম্যানেজ করতে পেরেছিল। এখন সেটাও দিতে হবে।

দশ টাকা মায়ের হাতে দিয়ে বলে তখন ভুলে গেছিলাম। এখন রেখে দাও।

গোপাল গোঁফ পাকায়—হুঁ হুঁ বাবা আমার হিসেব। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

রৌনক ভাবে, এটা কি একটা জীবন! হাতে দশ-বিশ টাকাও থাকে না, ধুত্তোর! রৌনক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

আজকে একটু সকাল সকালই বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যায়। একটু দাঁড়াতেই রুচিরা চলে আসে। রুনু অন্য দিকে তাকায়। বাস এসে যায়। রুনু রুচিরার পেছু পেছু বাসে উঠে পড়ে। আজকে বাসে একটু ভিড় বেশি। কোনোরকমে রুচিরা দাঁড়িয়ে। রৌনকও একটু ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। আরে ওই লোকটা, ওই লোকটা ভদ্রমহিলার ব্যাগের চেন খুলল। আরে পার্সটা তুলে নিল। চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রুনু। অনেক গ্যাঙ থাকে। রুচিরা নেমে যেতে রুনুও বাস থেকে নেমে গেল।

তিন

রাত একটা হবে। রুনুর চোখে ঘুম নেই। হাতে একটা টাকাও নেই। কী করে টাকা রোজগার করবে। মাধ্যমিকও পাশ করতে পারেনি। কোথায় কাজ পাবে? বাবার মুদির দোকানে ও বসবে না। বাবাকে চার আনার আট আনার হিসেব ও দিতে পারবে না। অথচ অর্চি, ওদের পকেটমানির কখনও অভাব হয় না। হঠাৎ ওর মাথায় আসে আচ্ছা বাসের ওই পকেটমারটা আজও এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে পার্স বার করে নিয়েছে না! ভিড় বাসে পার্স তোলা কোনো ব্যাপার হলো। টাকা রোজগারের কী সহজ পদ্ধতি। এটা ওটা ভাবতে ভাবতে রুনু ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ঘুম ভাঙে বাবার চিৎকারে।

—এই যে নবাবপুত্তুর, কালকে এক ঘণ্টার জন্য দোকানে বসিয়েছিলাম। ক্যাশ সরিয়েছিস?

—না বাবা, বিশ্বাস করো, আমি তোমার ক্যাশে হাত দিইনি।

—নিস নি তো একশ টাকার হিসেবে মিলছে না কেন? গোপাল গলা চড়ায়।

—ওই তো বিনোদকাকু এক কেজি চিনি আর এক প্যাকেট মুড়ি নিলেন। পাঁচশো টাকা দিলেন। ওঁকে খুচরোটা ফেরত দিরাম।

—হ্যাঁ ফেরত দিলে আর নিজের ট্যাঁকে একশ টাকা রেখে দিলে। যা দূর হয়ে যা সামনে থেকে।

রুনু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। বাসস্ট্যান্ডে এসে শান্তি। রুচিরাকে একবার দেখতে পেলেই ওর শান্তি। বিকেলে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে। কিন্তু ওকে দেখতে পায়নি। বিকেলে ও মনে হয় গানের রেওয়াজ করে। ওদের একতলার ঘর থেকে গান ভেসে আসে। ওর গান শুনলে মনে হয় শরতের শিউলি ঝরে পড়ছে টুপটাপ করে।

বাসে উঠেই রুনু একটা ভিড় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনেই এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের হিপ পকেটে মানিব্যাগটা উঁকি দিচ্ছে। রুনু হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবে। রুনুর হাত নিশপিশ করছে।

মনে মনে ভাবে, ব্যাগটা তুলে নেবে। ওই লোকটা তো প্রতিদিন কারোর না কারোর ব্যাগ তোলে। কেউ ধরতে পারে না।

—না না সে চুরি করবে না। বাবা মাকে লুকিয়ে দু-দশ টাকা নেয়। সে কথা আলাদা। তা বলে চুরি করবে!

আবার ভাবে, চুরি করবে না তো কী করবে? বাবা টাকা চাইলে দেন? বন্ধুরা সবাই সিনেমা দেখায়, খাওয়ায়। ওদেরও তো খাওয়াতে হবে। সিনেমা দেখাতে হবে। ব্যাগটা পকেট থেকে বেরিয়ে আছে তোলা খুব সহজ। রৌনক নিঃশ্বাস বন্ধ করে ব্যাগটা তুলে নেয়।

ভদ্রলোক সামনের স্টপেজে বাস থেকে নেমে যায়। পাশে দাঁড়ানো বয়স্ক মানুষটি বলে, —খোকা, তুমি একটু সরে দাঁড়াও না, একটু বসি।

—বসুন না দাদু।

—আহা কী লক্ষ্মী ছেলে আমার। আজকালকার ছেলে-ছোকরা তো ভালো করে কথাই বলে না।

রৌনক ভাবে সে তো ভালো ছেলে। তবে এ কাজ করল কেন? ও বাস থেকে নামার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

—কন্ডাক্টর দাদা দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমার স্টপেজ পেরিয়ে গেছে।

—উঃ, ঠিক সময়ে গেটে আসবে না। আর স্টপেজ পেরোলেই চেঁচাবে।

রৌনক প্রায় লাফ দেয় বাস থেক। নেমেই লোকটিকে খুঁজতে থাকে। আরে ওই তো ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে। রৌনক একটু ইতস্তত করে দোকানের দিকে এগিয়ে যায়—

—আরে ব্যাগটা তো পকেটেই ছিল। কোথায় গেল? এখন ওষুধ না কিনতে পারলে! মেয়েটার তিনদিন ধরে জ্বর কমছে না। কী করি এখন? ভদ্রলোক প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়।

—ব্যাগের আর কী হবে? কোনও পকেটমারের হাতে গেছে। ঠিক আছে আমি ওষুধগুলো রেখে দিচ্ছি। বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসুন, দিয়ে দেব। দোকানদার বলল।

রৌনক আর থাকতে পারে না—কাকু, দেখুন তো এটা আপনার ব্যাগ কী না। নামতে গিয়ে বাসের পাদানিতে পড়ে গেছিল। আমি পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি আপনাকে দেবার জন্য।

—কই দেখি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো আমার ব্যাগ।

—টাকাটা দেখে নিন কাকু।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। টাকাটা তো ঠিক আছে। বাবা, তুমি খুব সৎ ছেলে বাবা। আহা বাবা-মায়ের কী শিক্ষা। মানুষ হও বাবা, মানুষ হও। ওষুধ না পেলে মেয়েটা মরেই যেত। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক বাবা।

—দাদা, আপনার ভাগ্য ভালো। ব্যাগটা কোনো পকেটমারের হাতে পড়েনি। দোকানদার বলে ওঠে।

রৌনক তখন উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে। পকেটমার কথাটা কানে বাজে। ভাবে ওই ভদ্রলোকের থেকে তার ভাগ্যটাই ভালো, সে শেষ পর্যন্ত পকেটমার হয়ে উঠতে পারেনি!

যাদের দুর্গাপূজা নেই

রত্না রশীদ

আমার বহুদিনের পোষা রাগ—'নেই কাজ/তো খই ভাজ' এখনো তাড়িয়ে বেড়ায়। যত ভাবি,—খুব হয়েছে আর নয়, এই একটা বিষয় নিয়ে এত-এতদিন কাটিয়ে দেবার কোনো মানে হয়! কিন্তু ওই 'খই'-এর ভূত আমার ঘাড় থেকে নামে না,—নামেই না। অথচ 'খই ভাজার ভজখটও তো কম নয়! ও কম্ম কখনোই একা করার নয়। শুধু ভাজুনির খাটুনিটিই তো সব নয়! আরও কত-কত জনের—লাঙ্গল দেওয়া, ধান রোয়া, নিড়িনি দেওয়া, ধান কেটে ঝেড়ে ঘরে তুলে দেওয়া, জ্বালানির জোগান দেওয়া—তবে না খই ভাজুনির কুচি কাঠির গোছা বাগিয়ে মাটির খোলায় সাদা ফুলের তুফান তোলা! 'খই ভাজবে'—অমনি বললেই হলো!

যে-কোনো লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রমূলক সমীক্ষা করতে বহু-বহু জনের সাহায্য লাগে। আমার অতীব সৌভাগ্য—বাঢ়-বাগড়ি দুই বঙ্গেই অসংখ্য দাদা-বৌদি-দিদি-ভাই-বোন পেয়ে গেছি, যারা আমার 'খই ভাজার' রসদ জোগাতে নাওয়া-খাওয়া—নিজের কাজ ভুলে আমার প্রয়োজনে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরেছেন আমার খামখেয়ালির সঙ্গে সঙ্গে। শুধুই যে আমার সঙ্গে ঘুরেছেন, তাও তো নয়, সারা দিন মাঠের হাড়ভাঙা খাটুনির পর আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আরামে স্নান-খাওয়া-ঘুম সেরে পরের দিনের ভোরে যাতে কাজে লেগে পড়তে পারি, তার ব্যবস্থা করেছেন। শ-য়ে শ-য়ে এমন পান্থবন্ধু আছেন আমার, যাদের কাছে ঋণে আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি বিকিয়ে আছে, যে ঋণ শোধ দেওয়া যাবে না কখনো,—সাধ্য নেই আমার।

এঁদেরই একজন—থুড়ি একজোড়া—মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের সাহিত্যিক দম্পতি বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কাজী আমিনুল ইসলাম ও কল্পনা ইসলাম। আমিনুলদা প্রাজ্ঞ, উদারমনস্ক, অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। কল্পনাবৌদি আদ্যোপান্ত এক কবি এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। বিয়ের গান সংগ্রহের কাজে আমি একাধিকবার এঁদের কাছে গেছি, থেকেছি। শেষবার যখন গেলাম—তখন ওঁদের জিজ্ঞেস করে আরও বিয়ের গানের সন্ধানে 'আলের উপর' নামক এক গ্রামের নাম শুনে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। গ্রামের নাম 'আলের উপর'! এমনটা হয় নাকি! জানালেন, ''হয়তো বটেই,—চলো ও-বেলাতেই নিয়ে যাই তোমাকে,—যত খুশি বিয়ের গান খুঁজো।''

'আলের উপর' নামক গ্রামে গেলাম তো ধান ভানতে, তো ধান ভানার কাজ যেটুকু হবার হলোও। উপরন্তু তার পাশের গ্রাম ধনপতনগরে গিয়ে কুড়িয়ে পেলাম 'শিবের গীত'—চাঁই সম্প্রদায়ের বিয়ের গান।

সত্যি বলতে এই 'চাঁই'দের কথা আমি আগে কখনো শুনিনি। পশ্চিমবঙ্গের বহুধাবিস্তৃত লোকসংস্কৃতির শতাংশের কণামাত্রও আমার ধারণার পরিধিতে নেই। লোকসংস্কৃতি নিয়ে কোনো শিক্ষাদীক্ষাও আমার নেই। নেহাতই জীবিকার খাতিরে একজন দিদিমণি। তবু যে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে 'লোকায়ত প্রবন্ধ' লেখার ফরমায়েস আসে, এ আমার পরম শ্লাঘার বিষয়। পড়াশুনো নেই, সেকারণেই গায়ে-গতরে খেটে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে কাজটা করে নেবার চেষ্টা করি।

যা হোক, চাঁই সম্প্রদায়ের গ্রাম মুর্শিদাবাদের 'রঘুনাথগঞ্জ'—'আলের উপর' লাগোয়া ধনপতনগরে গিয়ে পৌঁছালাম। যেতে যেতে সঙ্গী আমিনুলদার মুখে শুনেছিলাম—আদতে এই 'চাঁই'-রা মৈথিলী হিন্দু উপজাতি হলেও বর্তমানে বাঙালিদের সঙ্গে কোনো পার্থক্যই নেই। আগে থেকে বলে না দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে এরা বাঙালি নয়। বস্তুত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি বাংলায় এসেছে। সংমিশ্রণ ঘটেছে। আমিনুলদা তাঁর বইতে লিখেওছেন—''মধ্য এশিয়ার আর্য, হুন জাতি যেমন ছিল, ছিল কালো ব্লাকিসিফেলস্ জাতিও। তাদেরও এক শাখা এদেশে চলে আসে। তাদের ঘটনাক্রমে পূর্বভারতে চলে আসতে হয়। বাংলা-ওড়িশায় সাদা আর্য, রাজপুত ও কালো দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয়দের মধ্যে ব্লাকিসিফেলস্ জাতি বাস করতো। বাঙালি এই ব্লাকিসিফেলস্ জাতি থেকে উৎপন্ন।'' (প্রবন্ধ : বাঙালি, পৃ. ৪৬) কাজেই 'চাঁই' উপজাতির মানুষেরাও যে মিথিলা-উদ্ভূত হলেও মিলেমিশে বাঙালি হয়ে যাবেন, এ আর নতুন কথা কী! কিন্তু হ্যাঁ, বঙ্গের বাঙালি হিন্দুর থেকে এই 'চাঁই' বাঙালি হিন্দুর আচার-আচরণ, মোটামুটি একই হলেও, কয়েকটা ধর্মীয় উৎসবের ক্ষেত্রে তাদের একশো আশি ডিগ্রি উল্টো ব্যবধান। সে প্রসঙ্গে আসতেই হবে, তবে একটু পরে।

ধনপতনগরে গিয়ে উঠলাম আমার সঙ্গী আমিনুলদার একদা সহকর্মী তুলসী মণ্ডল মহাশয়দের বাড়িতে। 'দের' শব্দটা ব্যবহার করলাম এই জন্যে যে সব ভাই-কাকা-মামা-জ্যাঠাদের বাড়ির সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি—লাগালাগি সব বাড়ি। আলাদা সংসার, আলাদা হাঁড়ি হলে কী হবে, ঘরের চালের সঙ্গে চাল লাগানো বাড়িগুলো দিয়ে ঘেরা গোটা পাড়া, বলতে কি গোটা গ্রামটাই। একটা বাড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে একেবারে ভেতর-ভেতর পাড়ার ভিন্নপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া একেবারে জলভাত। সব বাড়ির সঙ্গে অন্য সব বাড়িতে যাতায়াত করার জন্য প্রত্যেকের উঠোন দিয়ে চলাচলের পথ সবার জন্য (নিজেদের জ্ঞাতিগুষ্ঠির মধ্যে) উন্মুক্ত। বাইরের পথে না বেরোলেও চলে। এঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ। এঁরা সংঘবদ্ধ।

এই ধনপতনগর গ্রামে তুলসী মণ্ডল মহাশয়ই সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। এখন অবশ্য ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট। তবে তুলসী মণ্ডল

মহাশয় যেমন পাশ করে রঘুনাথগঞ্জ পোস্টঅফিসে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন, এখনকার গ্র্যাজুয়েটরা অত সহজে চাকরি-বাকরি পাচ্ছে না। ছোটোখাটো ব্যবসা করছে। চাষবাস করার চেষ্টা করছে। তবে ধানচাষ করতে এরা তেমন পটু নয়, এরা ভাগীরথী তীরবর্তী উর্বর পলিসমৃদ্ধ জমিতে খুব ভালো সবজি ফলায়—তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে এই সবজি-চাষের সিংহভাগই নারীদের দখলে, পুরুষেরা সাহায্যকারী মাত্র। ধনপতনগরের এই চাঁই জনগোষ্ঠী মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার ট্র্যাডিশন বহন করে চলেছে। এখনও।

আলাপচারিতায় জানা গেল, একদা এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-মহামারী লেগেই থাকত। উপরন্তু ছিল কলেরা-বসন্তের মৌরসিপাট্টা। এরকমই এক দুর্যোগে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে জনমানবহীন হয়ে গেলে, দেশীয় জমিদারেরা মিথিলা থেকে এই চাঁইদের এদেশে নিয়ে আসেন, নতুন করে জনপদের পত্তন করেন। তুলসী মণ্ডল মহাশয় এবং আমিনুলদা দু-জনেই আলাপচারিতায় জানালেন ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপাড়ে ১৮৯২ সালে পশ্চিমে যাবার লোকপথ তৈরি হয়। তার আগে-পরের কয়েক বছর ধরে চাঁইরা এখানে আসে, এবং থিতু হয়। সবাই তো একসঙ্গে আসেনি, কিছু কিছু করে পরেও চাঁইরা এসেছে। এরা শহরের লাগোয়া উপকণ্ঠে এসে বসবাস শুরু করে। শুধু এই রঘুনাথগঞ্জ লাগোয়া ধনপতনগরেই নয়, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূমের কিছু কিছু জায়গাতেও এসে বসবাস শুরু করে চাঁই জনগোষ্ঠী।

ধনপতনগরে বসবাসকারী চাঁই গোষ্ঠীর জনসংখ্যা এখন ৬ থেকে ৭ হাজার হবে। এঁরা হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী উপজাতিভুক্ত। পদবি—দাস, মণ্ডল, সরকার ইত্যাদি। এঁরা মূলত কৃষিজীবী—সবজি চাষে অতি দক্ষ। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ। পুরুষেরা তুলনায় অলস। গান-বাজনায় এঁদের স্বাভাবিক দক্ষতা। সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ। নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে স্থানীয়দের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে না। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই বংশপরম্পরায় ঘুরপাক খায়। স্থানীয়দের মধ্যে তাই ছড়িয়ে যেতে পারেনি। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও খুব বেশি। নারীরা অধিক পরিশ্রমী, তুলনায় পুরুষ অলস। তবুও এ সমাজের মানুষ কখনো ভিক্ষাবৃত্তি করে না।

আমি ক্রমে ক্রমে গায়ে-গায়ে লাগোয়া ২০-২২টা বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করতে থাকলাম। দেখলাম সবাই শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া পরা বাঙালি হিন্দু রমণী। প্রত্যেকের ঘরের যে ঠাকুরঘর, তার মেঝে লাগোয়া দেওয়ালের নিচের দিকে বাস্তুদেবতার আসন। প্রত্যেকের বাড়িতে এই একই ব্যবস্থা। ঠাকুর কোনো তাকে তোলা নয়, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত নয়। ওঁরা জানালেন—বাস্তুর দেবতা যখন, তাঁকে তো বাস্তুমাটির সংলগ্নই রাখতে হবে, খামোকা আসন-সিংহাসন দিয়ে তাঁকে বাস্তুমাটি বিচ্ছিন্ন করতে যাব কেন? প্রত্যেকে পুবের দেওয়ালে পশ্চিমমুখো করে, মেঝে সংলগ্ন করে বাস্তুদেবতার প্রতিকৃতি গেঁথে রেখেছেন, পুবমুখো বসে পূজার্চনা করেন। দেবতা নড়েনও না, চড়েনও না, গ্যাঁট হয়ে থিতু থাকেন গৃহস্থের ভিটেতে। দেবতা যে কোন্ দেবতা, ছোটো ছোটো কুটিরের আলো-আঁধারিতে ঠাহর করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলে বারংবার একই উত্তর পেলাম, —বাস্তুদেবতা।

চাঁই সংসারে নারীর প্রাধান্য। তবে প্রতিবেশী সমাজের দেখাদেখি ইদানীং পুরুষেরাও আপারহ্যান্ড নিতে চাইছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও তারা। কারো সদ্‌গুণ রপ্ত করা যত কষ্টেরই হোক, বদ্‌গুণ রপ্ত করা তো জলভাত। তো, এঁদের সমাজে প্রচলিত একটি বৈবাহিক লোকাচার এরকম : বিয়ের পর সংসার চালানোর ঝুটঝামেলায় পড়তে না চেয়ে নতুন বর বাড়ির চালে অথবা কোনো গাছে উঠে বসে থাকে, তখন নববধূ তাকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে ঘর-সংসার করার অনুরোধ জানায়। বলে, কোনো চিন্তা নেই, ঘর-সংসার চালিয়ে নেবার দায়িত্ব তার (নববধূর)। সে-ই স্বামীকে খাওয়াবে-দাওয়াবে, যত্নআত্তি করবে। স্বামীকে কোনোরকম দায়-দায়িত্ব নিতে হবে না। চাঁই সম্প্রদায়ের এক বিয়ের গানে এই বিচিত্র লোকাচারটির হুবহু বর্ণনা পাওয়া যায়।

মূল গান শুরু হবার আগে একটু কথোপকথন আছে, খানিকটা 'কাপ্'-এর মতো। 'কাপ' কথাটা এসেছে 'কাপট্য' থেকে, যার লক্ষ্যই হলো বিবিধ সাংসারিক কপটতাকে সরাসরি বিদ্ধ করা। যা হোক, কথোপকথন শুরু হল এইভাবে—

গাঁ-ঘরের বউমেয়েরা :

হাঁ গো,—তুমি কুথাকার মেয়ে গো! বিয়ে করে বউ সেজেছো, আর শউরবাড়ীর রীত্-কানুন জানো নি?

নতুন কনে ও তার সঙ্গিনীরা :

খুব জানি বুন, খুব জানি, তুমাদের দ্যাশে বুন, বিয়ি-শাদি লাগলে আঁদোরকুশি পাকোয়ান হয়, বিশদিন ধরি ঢোলক বাজে বুন। আর নতুন বরটোকে সাজিয়ি-গুজিয়ি এক্কেরে সেই গাছের টঙে চাপোয়ে দ্যায়,—তাপ্পর তার কেতোই না তোয়াজ,—কেতোই না সাধ্না—বউগুলান তেখুন হাপুস নয়নে কান্দে, আর গাছে উঠা বরের পায়ে ধরে সাধে—

গান

ওগো গাছ থেকি নামোগো তুমি,
ওগো হাবু খেটে খয়াবো (হাপু গান গেয়ে খাওয়াবো) আমি।।
ওগো গাছ থেকে নামোগো তুমি,
ওগো সব্‌জি চষে খয়াবো আমি।।
ওগো গাছ থেকি নামোগো তুমি,
ওগো সব্‌জি বেচে খয়াবো আমি।।
ওগো গাছ থেকি নামোগো তুমি,
ওগো, রেঁধি-বেড়ি খয়াবো আমি।।....

গাছের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে নতুন বর তখন গানের সুরে বলবে—

ও রাঁধা-বাড়া, সব্‌জি বেচা সব মেয়েতে জানে
তু হাপু কেমন গাইতে জানিস প্রেমাণ দিবি গানে।।

নতুন কনে—"প্রেমান মানে খরন্‌টন্ প্রেমান দুবো আমি—" বলেই ডান হাতের পাতা বাঁ বগলে পুরে দিয়ে চটাস্ চটাস্ করে বগল বাজাতে বাজাতে অতি দ্রুত লয়ে হাবু বা হাপু গান ধরবে—

গান

আতা চিক্‌চিকি—বাতা চিক্‌চিকি
চিকিচিকি—চিকিচিকি-চাদর—
কুথা গেয়েছেলে হে নাগর!

তুমার সাথে ভাব করিতে
মুনে ছেলো আশা,
গুয়াল ঘরের বাতা ধরি
কয়েছেলাম কথা।
ভেজে শোলা চক্‌মকি
পাড়ে ডেঁইরে লোক দেখি।
বিল্লি চোকের শাউড়ি—
মার ঝেঁটার বাড়ি।
উর্-র্-র্-র্—হ্যাসাক্ ধুম্,
হ্যাসাক্ ধুম্—ভ্যাড়ো কুম্....

এরপর খুব জোরে আওয়াজ করতে করতে ফটাস্-ফটাস্ করে তোড়ে বগল বাজাবে অনেকক্ষণ—(এই গানের মধ্যে মধ্যে থেমে জোরে জোরে বগল বাজানো হাবু বা হাপু গানের আবশ্যিক আঙ্গিক)—বগল বাজানো হলে তারপর গান ছেড়ে সাধারণ

আটপৌরে কথা বলার ঢঙে আবার শুরু করবে বরকে তোষামোদ করা, সাধ্যসাধনা করা। বর আবার হাপু গাইতে বললে এবার দু বগলের মধ্যে দুহাত দিয়ে খুব জোরে জোরে ফটাফট আওয়াজ তুলে আর মুখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে হাপু গেয়ে যাবে বহুক্ষণ—

কান কট্‌কট্—চোখ পট্‌পট্
খট্‌খটে গাঁ-ঘর,
কুথা গেয়েছেলে হে নাগর?

তুমার সাথে মন সাজাবো
মনে ছেলো আশা,
পুকুরপাড়ের গাছতলাতে
কয়েছেলাম কথা।
ভেজে শোলা চকমকি
পাড়ে ডেঁইরে লোক দেখি।
খটাস্ চোকি শাউড়ি—
মার্ জুতোর বাড়ি।
উর্-র্-র্-র্ হেস্যাক ধুম্
হেস্যাক্ ধুম্—ভ্যাড়ো কুম্—....

এতক্ষণে নতুন বরের মা এসে সাধাসাধি করবে ছেলেকে—''নেমে আয় বাপ্, নেমে আয়। এই চেরা জিভের বউ নইলে খিস্তি দিয়ে আমার গুষ্টির তুষ্টি করে দেবে। ভাল্লাগছে তোর মায়ের এমন খোয়ার শুনতে!'' এরপর ছেলে গাছ থেকে নেমে আসা মাত্র ছেলের সঙ্গে একযোগে ছেলের মা-ও হাপুগান ধরবে—

গান

বিয়ের সিন্দুর পরলি পরে
মাগিরা এমুন পারমিট পায়—
যে শউর-শাউড়ি-ননদকে ফেলে
পয়লাভাত ভাতারের সঙ্গে খাঁয়।
কেয়ার করে না কারুক্কে মাগীরা
যেমুন লাগাম ছাড়া ঘোড়া,
উদুম্ দ্যাহো আর গুদুম্ দেখিয়ে
উরা ভাতারকে করে ভ্যাঁড়া।
উর্-র্-র্-র—হ্যাসাক্ ধুম্—
হ্যাসাম ধুম—ভেড়ো কুম্—
মাগীর মুখে পান জরদা
আর মরদের মুখে কালি-চুন,
উর্—র্-র্-র্—হ্যাসাক্ ধুম্—
হ্যাসাক্ ধুম্—ভেড়ো কুম্...

শুধু হাপু, কাপ্, আর বিয়ের গানই নয়, এই চাঁই সমাজে নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে গান-বাজনা-নৃত্যগীত, রঙ্গরস সৃষ্টি এবং পরিবেশনায় জন্মগতভাবে পটু। লোকসংস্কৃতির বিবিধ ধারায় এঁদের অনায়াস গতায়াত। গ্রামে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের বেশ কিছু পেশাদার গোষ্ঠী রয়েছে। লেটো, আলকাপ, পঞ্চরস, হাপু, বন্দের গান, সত্যপীরের গান—ইত্যাদি পরিবেশনায় বংশপরম্পরায় এঁরা অতীব দক্ষ। সুবিখ্যাত আলকাপ সম্রাট 'ঝাঁক্‌সু', যাঁর প্রকৃত নাম ধনঞ্জয় সরকার, এই ধনপতনগরের চাঁই সমাজের সন্তান। তাঁর বংশধর দেবেন সরকার, প্রেমেন সরকার এঁদেরও সঙ্গেও আলাপ হল। ঝাঁকসুর রেখে যাওয়া আলকাপ্-এর ঐতিহ্য এঁরা পরম মমতায় বহন করে চলেছেন। আলকাপ-এরই পরিমার্জিত রূপ হল 'পঞ্চরস'।

ধর্মবিশ্বাসে এঁরা হিন্দু। প্রত্যেকের বাড়িতে ঠাকুরঘর আছে, প্রতিষ্ঠিত বাস্তুদেবতা আছেন, একথা আগেই বলেছি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পূজা হয়। ঠাকুরঘরে দেওয়া আলপনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এঁরা লক্ষ্মী মানেন, লক্ষ্মীর বাবাকে মানেন, কিন্তু লক্ষ্মীর মাকে মানেন না। এঁরা অন্যান্য সব পূজার্চনায় স্থানীয় বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে একযোগে মেতে উঠলেও কস্মিনকালেও কখনও দুর্গাপূজায় সামিল হন না। নিজেরা আয়োজন করে খুব বড় মাপের কালীপূজা করেন, সরস্বতী পূজা করেন, কিন্তু দুর্গাপূজা নৈব নৈব চ। দুর্গাপূজা করা তো দূরস্থান, তাতে সামিলও হন না এই চাঁই সমাজের লোকেরা। চাঁদা দেন না, প্রসাদ নেন না, এমনকি দুর্গাপূজায় আয়োজিত গান-বাজনা-লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানেও এঁরা অংশগ্রহণ করেন না। দুর্গাকে এঁরা ঘৃণা করেন, কারণ দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন এবং এঁদের ভাষায় তা পুরোপুরি অন্যায়ভাবে। এঁদের ভাবনায় মহিষাসুর এক অতীব ধার্মিক নিষ্ঠাবান সাধক। তিনি নারীজাতিকে সম্ভ্রমমিশ্রিত শ্রদ্ধা করতেন। দুর্গার প্রতি দুর্বল হয়ে তিনি প্রেম নিবেদন করেছিলেন। তাই দুর্গার পদতলে তাঁর অবস্থান। দুর্গার প্রতি তিনি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারেননি, শুধু ঢাল দিয়ে দুর্গার অস্ত্র নিবারণ করছিলেন মাত্র। —''আপনাদের নিজেদের পূজিতা প্রতিমাই দেখুন না। অসুরের অবস্থান দুর্গার পায়ে। আর অনেকখানি ওপর থেকে (যুদ্ধটা পাহাড়ের ওপর হচ্ছিল তো!) একটা পা মহিষাসুরের বুকে তুলে দিয়ে দুর্গা মহিষাসুরের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়েছিলেন। তৎকালীন মহিলারা দেবী হলেও বড়জোর কাঁচুলি পরিধান করতেন, আন্ডারওয়্যার প্যান্টি তো পরতেন না। ব্যস্, মুহূর্তের স্খলনে দুর্গা ত্রিশূলে বিদ্ধ করলেন মহিষাসুরকে।'' একটু থেমে কী ভেবে—''অনেকটা দাঁড়ি মারবার কৌশল হিসেবে অসৎ মাছওয়ালি মাসিদের দুই জানু ফাঁক করে বসার কৌশলের মতো জঘন্য ঘৃণ্য এক কৌশল। কী করে ভক্তি আসবে বলুন! আর ওই কারণেই তো দুর্গার আর এক নাম 'ভগ-বতী', যোনী যার অস্ত্র।''

বক্তার বর্ণনায় আমার কান-মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল, তবু সাহস সঞ্চয় করে বললাম—''অসুর বধ করেছিলেন বলে আপনারা দুর্গাপূজা করেন না, তাহলে অজস্র অসুরবিনাশী মুণ্ডমালা পরিহিতা 'কালী'কে পূজা করেন কীভাবে?—''কালী তো আমাদের মা। রক্ষাকালী। আমাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। মা সন্তানের রক্ষায় অশুভকে নাশ করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। তিনি সম্মুখ সমরে আহ্বান করে অশুভ শক্তি নাশ করেছেন। কোনো ছল-কপটতার আশ্রয় নেন নি। তিনি তাই শুভদা,—তিনি বরদা। তিনি তো বিভিন্ন দেবদেবীর কাছ থেকে ধার করে ভিক্ষে চেয়ে অস্ত্র-শস্ত্র-গয়নাগাটিতে নিজেকে মোহিনী করে তোলেননি। তিনি যেমন, ঠিক তেমনটি, মাত্র একটা খড়্গ হাতে নিকেশ করেছেন অশুভ শক্তি। তিনি আমাদের আরাধ্যা, পূজিতা।''

দুর্গার প্রতি ঘৃণা এঁদের এতই প্রবল যে, যে বাঙালি পরিবারে দুর্গাপূজার চল আছে, অর্থাৎ যারা কিনা দুর্গাপূজায় কোনোভাবে সামিল হন, তাদের সঙ্গে এঁরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না। কালীপূজা করলে ঠিক আছে, দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ।

বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে নামব-নামব করছে। এক অদ্ভুত, অপার্থিব সূর্য ডোবা সোনালী আলোয় আবিষ্ট হয়ে আছে গোধূলির ত্বরিত সময়। আমরা ফেরার পথ ধরেছি। এমন সময় বছর সাত-আটেকের একটা বাচ্চা ছেলে কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে চারটে পেয়ারা গুঁজে দিল আমার হাতে, আর এক অতীব মিষ্টি বুলি—''ও কুটুম, আবার এসো।''

আমার নাম জানে না, ধাম জানে না—কিন্তু তাতে সম্বন্ধ পাতাতে আটকালো কোথাও! প্যারা বালক পেয়ারা হাতে 'কুটুম' সম্পর্কে সম্পর্কিত করে নিল সম্পূর্ণ অজানা অচেনা বৃত্তের এক বয়স্কা মহিলাকে। গ্রামবাংলার মাঠে-ঘাটে-ধুলো প্রান্তরে এমনি সব ভালোবাসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লীন হয়ে আছে, ভালোবেসে কখনো কেউ জড়িয়ে নেবে বলে।

With best compliments of

GULSON CONSTRUCTION

CIVIL, REFRACTORY, MECHANICAL & GENERAL ORDER SUPPLIERS

In Front of Hindustan Refractories
Sagarbhanga (Near 112 No. Rail Gate)
Durgapur-11, Dist. Burdwan

Sl. No. 158

With best compliments of

LUTHRA FORKLIFTER

Sl. No. 159

রিপুরাজের গুণ্ডামি ও তৎকেন্দ্রিক

সুকৃতি ঘোষাল

> ''It would be easier to process this heinous crime if the perpetrators were monsters... perhaps their hanging will even mask the real problem, which is that these men are not the disease, they are the symptoms.'—*Leslee Udwin*

দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ডের পর দূরদর্শনে মেগাবাইট, ঘন্টার পর ঘন্টা বিতর্ক-আলোচনা, মুদ্রণমাধ্যমে পাতা-জোড়া হেডলাইন দেখে একটা আশা জাগছিল—এবার বোধহয় ধর্ষণ নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত হবে। কিন্তু তারপর গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়াল, কাজের কাজ খুব একটা হল না। সারা দেশে, বিশেষ করে এই রাজ্যে, মেয়েদের ওপর পুরুষের যৌনবলপ্রয়োগ বেড়েই চলেছে। পুরুষের রিরংসা এমন বেসামাল হয়ে উঠেছে যে ধর্ষণ থেকে গণধর্ষণের ইতিহাস চর্চা করতে হচ্ছে আমাদের। লজ্জার কথা, এ নিয়ে রাজনীতির বিরাম নেই। সরকার কেন এবং কতটা প্রশ্রয় দিচ্ছে, ধর্ষকের রাজনৈতিক পরিচয় কী, ক্ষতিপূরণ কি মুখবন্ধের কৌশল—এইসব আলোচনা চলছে। ফলে যে যার মতাদর্শের ভিত্তিতে ঘটনাকে দেখছে, সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারছে না, উদ্‌ঘাটিত সত্যকে আমরা নিঃসংশয়ে নিতে পারছি না। কিন্তু এমনটা তো হবার কথা নয়, কারণ যে ধর্ষক তার অন্য পরিচয়, অন্তত বিচারকালে, নিতান্তই গৌণ। বিষয়টা স্পর্শকাতর ও বহুমাত্রিক। তাই আইন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—সবদিক থেকে খতিয়ে দেখেই ধর্ষণকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ধর্ষণ (< সংস্কৃত 'ধৃষ্', হিংসা বা জোর করা) মানে হল বলপ্রয়োগ করে যৌনাচরণ। ইংরাজি 'rape' শব্দের অর্থও প্রায় কাছাকাছি, কারণ 'rape' এসেছে ল্যাটিন ক্রিয়া 'rapere' থেকে যার মানে হল দখল করা বা পাকড়ানো (to seize)। মূল ব্যঞ্জনার বিশেষীকরণ হয়েছে সম্ভবত ঐতিহাসিক কারণে। মানবেতিহাসের একেবারে সূচনাপর্বে যুদ্ধশেষে বিজয়ী নায়ক বিজিতের স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে তার ঘরের বা দেশের নারীরও দখল নিত, তাকে উপপত্নী বানাত। তাই আন্দাজ করা শক্ত নয় যে যৌনতার সঙ্গে হিংস্রতার যোগ হলে কেন তাকে ধর্ষণ বলে। প্রকৃতিগতভাবে পুরুষের দেহ এমনভাবে তৈরি যে তাকে কমোত্তেজিত না করে তাকে যৌনাচরণের সঙ্গী বানানো সম্ভব নয়। আর যখন সে কামোত্তেজিত অবস্থায় রয়েছে, এমনকি কারাগারেও, তখন যৌনাচরণ অসম্মতিসূচক বলা চলে না। তাই পুরুষকে ধর্ষণ করা যায় না; যদি বা যায়, যেমন পায়ুকামে, সেখানেও ধর্ষক পুরুষ। অন্যদিকে প্রকৃতিগতভাবে কোনো কামোত্তেজনা ছাড়াই নারীদেহ পুরুষের যৌনক্ষুধা মেটানোর সহায়ক। তাই ধর্ষণের ঘটনায় পুরুষ বলাশ্রয়ী, নারী সে হিংসার শিকার। আহার-নিদ্রার মতন মৈথুনও একটা জীবধর্ম। কিন্তু সেটা অপরাধ হয়ে ওঠে যখন পুরুষ একা বা দলবদ্ধভাবে কোনো নারীর ওপর চড়াও হয়, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিজের বা নিজেদের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে। বলপ্রযুক্ত যৌনতা বলেই এর অন্য নাম বলাৎকার। যৌনতা এক্ষেত্রে অংশীদারত্বের (partnership) সম্পর্ক থেকে

স্খলিত হয়ে শিকার-শিকারি সম্পর্কে পরিণত হয়, যৌনসাথী হয়ে ওঠে যৌনদাসী। এটা ভাবলে ভুল হবে যে বর্তমান নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার নানা কদর্যতার একটা মুখ হল ধর্ষণ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্য ঘাঁটলে ধর্ষণের প্রাচীনত্ব সহজেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যাকে ছদ্মবেশে ধর্ষণ করে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। যেহেতু অহল্যা ছদ্মবেশী ইন্দ্রের পরিচয় বুঝতে পেরেছিল, এ ঘটনা তাই ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা উচিত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু রম্ভার সাথে রাবণের সহবাস যে ধর্ষণ তা সন্দেহাতীত। গ্রিক দেব অ্যাপোলো ক্রেউসাকে নির্দ্বিধায় ধর্ষণ করে। দেবতারাই যদি এই, ইতিহাসের নায়করা পিছিয়ে থাকবেন কোন দুঃখে। সাহিত্যে বর্ণিত সবচেয়ে ঘৃণ্য চরিত্র সম্ভবত রোমরাজ টারকুইন, যিনি যৌনলালসা মেটাতে লুক্রেসিয়ার ওপর বলপ্রয়োগ করেন। বেচারি লুক্রেসিয়া আত্মহত্যা করে। সভ্যসমাজ নরনারীর যৌনাচরণে অংশীদারিত্বের কথা বলে। এই ধরনের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক সভ্যসমাজ অনুমোদন করে না। তাই ধর্ষণ অপরাধ, গুরুতর অপরাধ।

ধর্ষণের মূলে যেহেতু যৌনতা আর সমাজ যেহেতু শরীরের চাহিদাকে গর্হিত মনে করে না, স্বামী কখনো স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে পারে কি না, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। ধর্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমেরিকার আইন বইতে লেখা হয়েছে যে, ধর্ষণ হল 'the perpetration of an act of sexual intercourse with a female, not one's wife, against her will and consent.' অর্থাৎ স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করলে তা হবে ধর্ষণ। সম্ভবত এই ধারণা থেকেই দিল্লি হাইকোর্ট সম্প্রতি একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে বলেছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্কে জবরদস্তি থাকলেও তা ধর্ষণ বলে বিবেচিত হবে না এবং শাস্তিযোগ্য হবে না। ('the sexual intercourse between the two, even if forcible, is not rape and no culpability can be fastened upon the accused.')। শাস্তি দেওয়া না-দেওয়া পরের ব্যাপার, জবরদস্তি সহবাসকে এখানে ধর্ষণ বলা হল না শুধু এই যুক্তিতে যে অভিযুক্ত নিগৃহীতার স্বামী। কথাটা ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, বিবাহ করলে অন্তত একজন নারীকে ধর্ষণের অধিকার আইনসিদ্ধ হয়। এই প্রাক্-সভ্য ভাবনা থেকেই মোদি সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হরিভাই চৌধুরী ভারতীয় সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে বৈবাহিক ধর্ষণকে বে-আইনি করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। একথা সত্য যে এ-বিষয়ে আইন করার সমস্যা আছে। বিবাহ হল বিপরীত লিঙ্গের দু-জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সমাজস্বীকৃত বা আইনসিদ্ধ সহবাসবন্ধন। প্রাপ্তবয়স্ক দু-জন ব্যক্তি যখন এই উদ্দেশ্যে পরস্পরকে গ্রহণ করছে তখন ধর্ষণের অভিযোগ তোলা সঙ্গত হবে না। সহবাসে সম্মতি আছে বলেই পুরুষটিকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যেই সম্মতি বর্তমান। তাহলে তো নারীর পক্ষে বিবাহ যৌনদাসীত্বের নামান্তর মাত্র। যৌন ক্রিয়ার আনন্দ সম্ভোগমাত্র নয়—এক যৌথ উদ্যোগ। জবরদস্তি নয়, সম্মতিই এখানে একমাত্র বিবেচ্য। যৌন অংশীদারের, সে স্ত্রী হলেও, সম্মতি তাই এক অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত। বৈবাহিক ধর্ষণের বিরুদ্ধে যাঁরা আইন করার পক্ষপাতী তাঁরা এই সরল সত্যটা পুরুষকে সমঝে দেবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা সঙ্গত কারণেই আশাবাদী। মীনা কন্দস্বামী স্বামীদের সাবধান করে বলেছেন—সতর্ক হও : 'Soon enough our struggle will ensure that men do not get away with raping their wives.'

বৈবাহিক ধর্ষণ নিয়ে এদেশে আইন হয় নি কিন্তু অন্য ধরনের ধর্ষণ নিয়ে আইন আছে এবং তা যথেষ্ট কড়া। তবু বলাৎকারের ঘটনা কমার লক্ষণ নেই। কিন্তু কেন? এর অনেক কারণ আছে—বিলম্বিত বিচার, সাক্ষ্যপ্রমাণের জটিলতা, শাস্তিপ্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা। এ সবই ঠিক, কিন্তু অন্য একটা বিষয় আমাদের বিবেচনা করা দরকার। সম্ভাব্য কারণ নিয়ে যে যার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা ঘটনাটাকে লঘু ফেলছি না তো? সমাজ থেকে ধর্ষণব্যাধি যদি আমরা সত্যিই নির্মূল করতে চাই তাহলে উল্টোপাল্টা প্রতিক্রিয়া দিলে চলবে না। তাতে দৃষ্টি মূল ঘটনা থেকে ঘুরে যাবে—যৌনসঙ্গিনীর সম্মতির প্রশ্নটি গৌণ হয়ে যাবে। ধর্ষণ নিয়ে সাম্প্রতিককালে উচ্চারিত কয়েকটি প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে সম্মতির প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনায় কেউ ততটা আগ্রহী নয়। আশঙ্কার বিষয়, প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করতে গিয়ে এই সবজান্তারা বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস—সব গুলিয়ে ফেলছে। হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌতালা ধর্ষণ আটকাতে বাল্যবিবাহের দাওয়াই বাতলেছেন। এ তো ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ঘোরানোর অপচেষ্টা। তাছাড়া, আইন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না করলেও, বিবাহিতা নারী যে স্বামীর দ্বারা ধর্ষিতা হতে পারে, এটা তো মিথ্যা নয়। সিপিআই-এর এক উচ্চপদস্থ নেতা অতুলকুমার অনজান সেদিন দুম করে বলে দিলেন যে সানি লিওনের কন্ডোমের বিজ্ঞাপন পুরুষদের ধর্ষণে উৎসাহিত করছে। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনের বিষয় যতই আপত্তিকর ঠেকুক এর সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক কী? এটা বড় জোর পুরুষকে কামার্ত করতে পারে। তবে কামার্ত হলেই তো ধর্ষণের অধিকার জন্মায় না। কামোত্তেজক শরীরী বিভঙ্গকে ধর্ষণের জন্য দায়ি করলে পুরুষের সংযমের স্বাধীনতা আর নারীর আক্রান্ত না হবার অধিকার—দুটোই খর্ব করা হয়। জিতেন্দর ছাতর, হরিয়ানার এক পঞ্চায়েত প্রধান, ফাস্টফুডের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। ছেলেমেয়েরা নাকি বেশি চাউমিন খাচ্ছে, তাদের শরীরে হরমোন ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, তাই বাড়ছে ধর্ষণ। আলটপকা এ মন্তব্যের কোনো বিজ্ঞানভিত্তি নেই—চাউমিন খাওয়ার সঙ্গে পুরুষের লিবিডো উদ্দীপ্ত হওয়ার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। চাউমিন যে দেশে প্রধান খাদ্য সে দেশে পুরুষরা সবাই ধর্ষক নয়, এটা সাধারণ জ্ঞান। এই ধরনের অজ্ঞতা থেকেই বিধায়ক চিরঞ্জিৎ বলে ফেলেন—মেয়েরা ছোটো পোশাক পরছে বলেই যৌন হেনস্থার ঘটনা বাড়ছে। আমি provoked হতে পারি, তাই তোমার পোশাকের ঝুল ঠিক করার হক আমার আছে—এ তো তালিবানি যুক্তি! পোশাকের কাটছাঁট-সাইজে যদি প্ররোচনা দেওয়াও হয়, ছেলেদের যে প্ররোচনায় পা না দেবার স্বাধীনতাও রয়েছে, এ কথাটা এখানে বেমালুম চেপে যাওয়া হল। কার, কখন, কিসে কামোত্তেজনা হবে সেটা না ভেবে আত্মসংবরণের কথা বলাই ভালো, কারণ তাতে অন্তত অন্যের অধিকার হরণের অভিযোগ উঠবে না।

এসব না হয় অ-পণ্ডিতের কথাবার্তা—পাত্তা না দিলেই হল। কিন্তু পণ্ডিতদের মতকে সমীহ করতেই হয় এবং অনেক সময় তাতে আমাদের বিভ্রান্তি বাড়ে বই কমে না। এ প্রসঙ্গে ব্রাউনমিলার-থর্নহিল বিতর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত *Against Our Will: Men, Women and Rape* বইতে সুসান ব্রাউনমিলার দেখালেন যে ধর্ষণের মূলে রিরংসা নয়, রয়েছে হিংসা ও দাপট। তাঁর মতে, ধর্ষণ হল এক ধরনের যৌন দখলদারি—নারীকে স্বদেহাধিকারচ্যুত করে, পুরুষের ক্ষমতা জাহির করার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত। কথাটা ফেলে দেবার নয়, কেন না এই একবিংশ শতাব্দীতেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শাসাতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি প্রকাশ্য সভায় নির্দ্বিধায় বলতে পারেন—'ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে রেপ করিয়ে দেব।' অর্থাৎ বলাৎকার যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির নয়, আধিপত্য

স্থাপনের লক্ষ্যেও সংঘটিত হতে পারে। আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা কত উগ্র, কত কদর্য হতে পারে উত্তর প্রদেশের এক খাপ পঞ্চায়েতের সাম্প্রতিক ফতোয়া তার বড় প্রমাণ। এক বিবাহিতা মহিলাকে নিয়ে গ্রাম থেকে একটি ছেলে পালিয়েছে তাই বাগপত গ্রাম পঞ্চায়েত তার দুই বোনকে ধর্ষণ-শাস্তি দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যথার্থভাবেই এ ঘটনাকে মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের জঘন্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছে। অবশ্য অধিকার হরণের বা আধিপত্যবিস্তারের এই প্রতিপাদ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন দুই নৃবিজ্ঞানী—থর্ন হিল এবং পামার। *A Natural History of Rape: Biological Basis of Sexual Coercion* (2000) গ্রন্থে ধর্ষণের জীবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন এই দুই বিজ্ঞানী। তাঁদের মতে ধর্ষণ প্রকৃতিসূত্রে পাওয়া এক সহবাস-কৌশল বা mating strategy—একে যৌন-দখলদারিত্ব হিসেবে দেখা তাই ভুল। অবশ্য প্রকৃতিসূত্রে পুরুষ ধর্ষণের তাড়না পায় বলে বিজ্ঞানীদ্বয় এ কাজকে বৈধ বা সঠিক বলেন নি : ''just because something is 'natural' does not make it right.'' অর্থাৎ প্রকৃতির নির্দেশ বললেই সাতখুন মাপ হয়ে যায় না। জৈবপ্রকৃতির ওপর বুদ্ধিবৃত্তি-বিবেককে প্রতিষ্ঠা করা, প্রবৃত্তিদাসত্বমুক্ত হতে সভ্য অনুশাসন মেনে চলাই তো জীবত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণ। ধর্ষণে সে উত্তরণের সুযোগ নেই।

ধর্ষণ সমস্যার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে নিজের শরীর ঘিরে মেয়েদের মনে গড়ে ওঠা এক অবাঞ্ছিত সংস্কার। নারীর ওপর নিজের অধিকারকে নিরঙ্কুশ করতে পুরুষ নারীকে অনন্যভোগ্যা হিসেবে দেখতে চায়। সেই চাহিদা মেটাতে গিয়ে ভালোবাসা নয়, শরীরী শুচিতা হয়ে ওঠে সতীত্বের সূচক। অন্যের দৌরাত্ম্যে কোনো মেয়ে ক্ষতযোনি হলে অথবা কোনো স্ত্রীর দেহে পরপুরুষের হাত পড়লে সেটা একটা দুর্ঘটনা না ভেবে মারাত্মক অপরাধ ভাবা হয়। সবচেয়ে ক্ষতি ধর্ষিতার নিজের। সে শুধু শারীরিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছে না, সে পীড়নের দায়, সে কলঙ্ক তাকে বহন করতে হচ্ছে। ফ্রেডা অ্যাডলার তাই যথার্থই বলেছেন যে ধর্ষণই সম্ভবত একমাত্র অপরাধ যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই অভিযুক্ত হয়ে যায় : 'Rape is the only crime in which the victim becomes the accused.' গায়ের জোরে সবল দুর্বলের মাথা ফাটাতে পারে, আমরা এক্ষেত্রে আঘাতকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াই। কিন্তু ধর্ষিতা নিজের আক্রান্ত পরিচয় তুলে ধরতে চায় না—লোকে 'ছিঃ ছিঃ' করবে, আত্মজনেরা সম্পর্কচ্ছেদ করবে। অর্থাৎ ধর্ষিতার মনে নিজের প্রতিও একটা ঘৃণাবোধ জন্মায়। যে কেউ যে কোনো সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। সেটা আক্রান্তের নয়, আক্রমণকারীর দোষ। ধর্ষণের ক্ষেত্রে পুরুষের আগ্রাসনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়াটাকে, সমাজ শুধু নয়, মেয়েটি নিজেও নিজের দোষ বা ব্যর্থতা বলে মনে করে। দেহকেন্দ্রিক শুচিতার বোধ একটি ভ্রান্তি যা ধর্ষণের বিচার অনর্থক জটিল করে তোলে।

আর একটা শরীরকেন্দ্রিক ভ্রান্তি, যার শিকার পুরুষ নিজে, স্পষ্ট হওয়া দরকার। পুরুষ নারীকে মানুষ হিসেবে না দেখে নিছক কামপ্রশমনযন্ত্র হিসেবে যদি দেখে, যেমনটা ঘটে ধর্ষণের প্রতিটি ঘটনায়, সেটা একটা মস্ত ভুল। জনৈক কবি ঠিকই বলেছেন যে, ৭৪ দিনের শিশু বা ৭৪ বছরের বৃদ্ধা, স্তনরেখা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, ত্বক পেলব বা বলিরেখা চিহ্নিত—যেমনই হোক, অনেক পুরুষের দৃষ্টিতে নারী নিছক 'মাংসপিণ্ড', যার ওপর হামলে পড়াই দস্তুর। এই যে নারীকে মানুষ না ভেবে মাংসপিণ্ড ভাবা, পুরুষের কামতাপ মোক্ষণের উপকরণ ভাবা, এই বিভ্রান্তিই, এই অজ্ঞতাই ধর্ষণকে সম্ভব করে তোলে। পুরুষের মতো নারীরও যে নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ অধিকার আছে, সম্মতিহীন সহবাসে যে সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়—এই সত্য ধর্ষক জানে না বা মনে রাখে না। নারীকে ব্যক্তি হিসেবে না দেখে রতি-সহচরী হিসেবে দেখার ফলে তার যৌন পরিচয় হয়ে ওঠে তার একমাত্র পরিচয়, তৈরি হয়ে যায় এক আদিম খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, যেটা অসঙ্গত, কেননা এটা অস্তিত্বের লড়াই নয়, এর সঙ্গে বাঁচা-মরার সম্পর্ক নেই। সম্ভবত এই কারণেই কলকাতার এক সভায় এসে হোমি কে. ভাবা মেয়েদের ওপর যৌন নির্যাতনকে 'an act of a closed mind' বলে চিহ্নিত করেছেন।

ধর্ষণ তাই পুরুষত্বের সেই বে-শরম প্রদর্শন যাতে সভ্য পুরুষের মাথা হেঁট হয়ে যায়। সম্মতিসাপেক্ষেই নারীকে রতিক্রিয়ায় সামিল করা উচিত, কারণ সম্মতিহীন সহবাস আক্রমণ ভিন্ন কিছু নয়। শুধু এটুকু মনে রাখলেই ব্যক্তি হিসেবে নারীকে মর্যাদা দেওয়া হবে, নিজের শরীরের ওপর তার যে অধিকার তা রক্ষা করা যাবে। আর যে-কোনোভাবে ধর্ষিতা নারীকে খেয়াল রাখতে হবে যে সে ভ্রষ্টা নয়, সে আক্রান্ত। সে যেন শুচিতার প্রশ্নে হীনমন্যতায় না ভোগে কারণ শুচিতার এই দেহকেন্দ্রিক ভাবনা এক পুরুষতান্ত্রিক নির্মাণ। জুলিয়া ক্রিস্তেভা হয়তো একে abjection বলবেন, কারণ এই নষ্টতাবোধ মেয়েটিকে আত্মপরিচিতির কেন্দ্র থেকে উৎখাত করে পুংব্যাখ্যাত শুচিতার তত্ত্বটিকে বৈধতা দেয়। অব্রাহ্মণের ছায়াপাতে ব্রাহ্মণ অপবিত্র হয়ে যায় বলে ভাবা হত এক সময়। এমনকি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মনেও আজ আর সে সংস্কার নেই। নারীও তেমনি যেন ধর্ষিতা মানেই অপবিত্র এই ভ্রান্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে। তাহলে যৌন নিপীড়নের ঘটনা সে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্যে আনতে পারবে, সংযত হতে বাধ্য হবে লিবিডো-দাস পুরুষ। এটা খুবই জরুরি, কেননা ধর্ষক চায় নারী নির্বিবাদে মেনে নিক এই আগ্রাসন। দিল্লির যে পৈশাচিক ধর্ষণের ঘটনার পর লেসলি আডউইন নির্মাণ করেছেন 'India's Daughter', সেই ধর্ষণে অভিযুক্ত ড্রাইভার মুকেশ সিং তাই অবলীলায় বলতে পারেন—ধর্ষণে মেয়েদের বাধা দেওয়া, ধস্তাধস্তি করা উচিত নয়। তাহলে সম্ভোগের পর ধর্ষক তাকে ছেড়ে দেবে। আর যত অভিযোগ হবে, শাস্তির মাত্রা বাড়বে, তত ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হবে অন্য হিংস্রতা : 'Now, when they rape, they won't leave the girl like we did. They will kill her.' এটা আসলে হুমকি, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আটকানোর চিরকালীন কৌশল। ধর্ষিতা ঘটনাটি চেপে গেলে বা অপরাধের আইনি বিহিত না চেয়ে মানরক্ষার্থে ধর্ষককে বিয়ে করে নিলে, এই অত্যাচার বেড়েই চলবে। কেলি ম্যাকগিলিস যথার্থই বলেছেন : 'By not coming forward you make yourself a victim for ever.' শুধু তাই নয়, ঘটনা চেপে যাওয়ার কারণে উৎসাহিত কামী অন্য কোনো নারীকে ধর্ষণ করলে স্বলিঙ্গভগ্নীর দুর্দশার জন্যও পরোক্ষভাবে তাকে দায়ি হতে হবে। তবে সম্মত সহবাসকে অন্য কোনো লাভের প্রত্যাশায় ধর্ষণ হিসেবে উপস্থাপনের চালাকি থেকেও বিরত থাকতে হবে নারীকে। তা না-হলে সাময়িকভাবে কাউকে হয়তো বে-কায়দায় ফেলা যাবে কিন্তু ধর্ষণের অভিযোগের ধার ক্রমশ কমতে থাকবে। অভিযোগ নিয়ে অবিশ্বাস যত বাড়বে, সমাজ ধর্ষণকে তত লঘু করে দেখতে থাকবে। এতে আখেরে মেয়েদেরই ক্ষতি—তারা আক্রান্ত হয়েও সুবিচার পাবে না।

Happy Pooja Greetings From

M&B TRADERS

GOVT. ELECTRICAL & INSTUMENTS CONTRACTOR
&
GENERAL ORDER SUPPLIERS

Govt. Electrical Licence No. 10241

Gopinathpur, Durgapur-713219
Mobile : 9434388056, 9474698366, 9434647573
E-mail : ashokghosh_dgp@rediffmail.com

Sl. No. 156

With best compliments of

SUPARNA TRADING

CONTRACTOR & EARTHMOVERS

REGD. OFFICE : 2/18, Derojio Path, SAIL Co-Operative
City Centre, Durgapur-713216, Phone : (0343) 2566021

CITY OFFICE : Urvashi Commercial Centre, 1st Floor, Unit No. 017
Bengal Ambuja Housing Dev. Ltd., City Centre, Durgapur-713216
Mobile : 93337 46254

Sl. No. 157

পশুদের জীবনচরিত

মানিকলাল অধিকারী

গঙ্গার তীরে মহাশ্মশান। সেই সন্ধে থেকেই এই মহাশ্মশানে বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে বেতালের চলছে রুদ্ধশ্বাস খেলা। খেলার শেষে ক্যুইজ কন্টেস্ট। ক্যুইজ মাস্টার বেতাল, আর বিক্রমাদিত্য তার একমাত্র প্রতিযোগী।

ঘোর অমাবস্যা। তার ওপর সেই সন্ধে থেকে অবিশ্রাম বৃষ্টি। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বজ্রপাত। অনর্গল বিদ্যুৎ চমক আকাশের বুক চিরে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে।

শুধু বিক্রমাদিত্য খোলা তরবারি হাতে একা দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে আছেন এক আকাশ বৃষ্টি মাথায় শিংশপা গাছটার দিকে। শিংশপার ডালে ঝুলছে বেতাল। তার বিকট হাসি এবং কখনো বা বিকট কান্না এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতের ঝড়, বৃষ্টি, মেঘগর্জন, শনশন দুরন্ত হাওয়াকেও ছাপিয়ে আছড়ে পড়ছে বিক্রমাদিত্যের কানে।

একবার ওপর দিকে তাকালেন বিক্রমাদিত্য। ডানহাতে খোলা তরবারি ধরে বৃষ্টিভেজা শিংশপার ডালে যেখানে দোল খাচ্ছে বেতাল সেখানে তরতর করে পৌঁছে গেলেন তিনি। তারপর তিনমনি লাশটা কাঁধে চাপিয়ে অনেকটা হিম্যান স্টাইলে কিংবা স্পাইডারম্যানের মতো নামতে লাগলেন। একদম নিচের একটা ডালে পৌঁছে লাফ দিয়ে নামলেন জমিতে।

''উঃ, আস্তে। আস্তে বিক্রম,'' ব্যথায় ককিয়ে উঠল বেতাল।

''কী হল আবার?'' বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন।

''আমার যে হাড়গোড় সব গেল।''

বিক্রমাদিত্য নিরুত্তর। কোথাও বাজ পড়ল মনে হল। নিঃশব্দে পথ চলেন তিনি। বেতাল নড়েচড়ে জাঁকিয়ে বসেছে বিক্রমাদিত্যের কাঁধে। চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন বিক্রমাদিত্য। বেতাল বলে, ''আস্তে, বিক্রম। আস্তে। কী দরকার এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার?''

বিক্রমাদিত্য পথ চলেন নীরবে। উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। বেতাল বলে, ''বিক্রম! তুমি বীর। কর্মেই তোমার মুক্তি। তাই শেষের সেই দিনে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে না জেনেই তুমি যোগী শান্ত শীলের খপ্পরে পড়তে চলেছ।''

''বেশি তেল দিও না বেতাল। যা বলার সোজাসুজি বল!''

''তুমি তো জাননা।... শেষের সে দিন কী ভয়ঙ্কর! অন্য সবে কথা কবে। তুমি রবে নিরুত্তর।'' গুনগুন করে বেতালের স্বগতোক্তি, অনেকটা গানের কলি ভাঁজার মতো।

''তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ বেতাল? তুমি কি জানো না দেব, দানব, দৈত্য, ব্রহ্মদৈত্য, ভূত, প্রেত—কাউকে আমি ডরাই না, কেবল মানুষ ছাড়া?''

''ধৈর্য ধর বিক্রম। সব বলব তোমায় সময় হলেই। সেই সন্ধে থেকে তুমি অক্লান্ত পরিশ্রম করছ। তাছাড়া উপায়ই বা কী? এসো। পথ চলতে চলতে তোমায় একটা গল্প বলি। পথের ক্লান্তিও দূর হবে, সময়ও কাটবে।''

''বল।''

''তবে কি, গল্প নয় এটা। একটা ঘটনা।'' তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বেতাল।

বিক্রমাদিত্যের কাঁধ টনটন করছে। বেতালকে নিয়ে যেতে হবে যোগী শান্ত শীলের কাছে। বিক্রমাদিত্য যোগীকে কথা দিয়েছেন। পথ চলতে চলতে তাকে শুনিয়ে চলেছে একের পর এক গল্প। প্রতিটি গল্পের শেষে একটা প্রশ্ন, যার সঠিক উত্তর দিতে বিক্রমাদিত্য অঙ্গীকারবদ্ধ। সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল গিয়ে আবার লটকেছে

শিংশপার ডালে। তারপর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শাট্‌ল ককের মতো একবার শিংশপার ডালে আর একবার পথের মাঝে। তা থেকে মুক্তি নেই তার।

বেতাল কথা শুরু করে।

''আচ্ছা বিক্রম, তোমার এতবড় সাম্রাজ্য। তার মধ্যে রঙ্গদেশ নামের এই অঙ্গরাজ্যটির তো ভয়াবহ অবস্থা। তোমার মন্ত্রীরা তো শুনি কতরকম কেলেংকারীর পাণ্ডা। তুমি তো আজকাল কোনোকিছুতেই মাথা ঘামাও বলে মনে হয় না। জনশ্রুতি বলে তুমি নাকি বাণপ্রস্থে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছ? পোলিটিশিয়ানরা তো বুড়ো হয় না। রিটায়ারমেন্ট বলে তো তাদের কিছু হয় না, যতই পাবলিক চ্যাঁচাক না কেন? তোমাকেই দেখি কেবল দলছাড়া।''

বিক্রমাদিত্য বিরক্ত। ''কী সব আটভাট বকছ বেতাল? আসল কথায় এসো।''

''তোমার এই অঙ্গরাজ্যটির কোনো খোঁজখবর রাখ? সেখানে যে এখন ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য! আইন শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বলে কিছুই নেই। জনজীবন বিপন্ন। বিশেষ করে মেয়েদের মানসম্মান নিয়ে চলাফেরা করাটাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।''

''তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ বেতাল। আমি তো আমার মন্ত্রিসভার দুজন সদস্যকে এই রাজ্যের পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য পাঠিয়েছি। তাদের রিপোর্ট তো খারাপ কিছু বলছে না।''

''তা তো হবেই। তোমার মন্ত্রীরা ফাইভ স্টার হোটেলে স্ফূর্তি করে চিকেন, বিরিয়ানি, চপ কাটলেট ধ্বংস করে ম্যানুফ্যাকচারড্ রিপোর্ট নিয়ে ফিরে গেছে। অথচ, এদিকে আসল ঘটনা কী হচ্ছে তার মাথামুণ্ডু কিছুই তুমি জান না। ছিঃ বিক্রম। ছিঃ।''

বেতালের মৃদু ভর্ৎসনায় কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করলেন বিক্রমাদিত্য। চুপ করে রইলেন। বেতাল আবার কথা শুরু করল। ''ইট, কাঠ, পাথর, কংক্রিটের শহর এই রঙ্গদেশের রাজধানী। কোলাহল মুখর। হাওয়াই আড্ডা, যানজট, মিছিল আর মেট্রোরেলের কল্লোলিনী শহর। সেই উচ্ছল শহরের মানুষদের আজ কী ভয়ঙ্কর আতঙ্কময় জীবন!''

''কেন?''

''সন্ধের পর শহরের মানুষেরা যে যার ঘরে দুয়ার বন্ধ করে রাত কাটায়। রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে কখন রাত্রি ভোর হবে। পথঘাট জনমানবহীন। শুনশান। বাস ট্রামের আওয়াজ নেই। দিনের উচ্ছল শহর রাতের অন্ধকারে নিষ্প্রাণ, নির্জীব।''

''অবিশ্বাস্য।''

''ঠিক। দিনের চঞ্চল কোলাহল মুখর শহর রাতের অন্ধকারে এক দুঃস্বপ্নের নগরী। বন্ধ দরজার ওপারে সন্ত্রস্ত শহরবাসী। যানবাহনহীন রাস্তায় শুধু নিঃসঙ্গ ল্যাম্পপোস্ট। পথের ধারের গাছগুলোতে পাখিরা কেবল মাঝে মাঝে কোনো এক অজানা ভয়ে ডেকে উঠছে। আঁতকে উঠছে বলতে পার। আর...''

বেতালের অসমাপ্ত কথা। বিক্রমাদিত্য অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আর...।''

''আর শহরের উপকণ্ঠ থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে বিকট আর্তনাদ। সে যে কী ভয়ঙ্কর শব্দ বিক্রম, তুমি না শুনলে বিশ্বাস করতে পারবে না।''

বিক্রমাদিত্য হাসলেন। ''আর আমার বীরপুঙ্গব সৈন্য সামন্তের দল কী করছিল?''

''তাদের কথা আর বোলো না। তুমি নিশ্চয়ই খবর রাখ। তোমার রাজ্যে কোথাও কোথাও থানার একশ মিটারের মধ্য বহাল তবিয়তে চলে তোলাবাজি, বোমাবাজি। পাহারারত প্রহরীর সামনেই খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ। সেখানে তোমার সৈন্য সামন্তের দল কী করতে পারে!''

একটু থেমে বেতাল বলল, ''প্রথম প্রথম তাদের কেউ কেউ বন্দুক হাতে এখানে ওখানে ছোটাছুটি করেনি যে তা নয়। তবে, কয়েক দিনের মধ্যেই সেই উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল।''

''তারপর?'' বিক্রমাদিত্য উৎসুক।

''ব্যাপারটা এভাবেই চলতে থাকল। দিনের আলোয় রাতের এই ঘটনাটা মনে হয় একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু, অন্ধকার নামলেই জনজীবনে নেমে আসে ভয়ের হিমেল স্রোত।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলল। দিনের আলো থাকতে থাকতে সব কাজকর্ম সেরে ফেলা। তারপর যে যার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যায়। কিন্তু, কতদিন চলতে পারে এভাবে? এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? অফিসে, কাছারিতে, ক্লাবে, মাঠে, ময়দানে, মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়, ঘরে, বাইরে—সর্বত্র একই আলোচনা। সবাই খুঁজতে লাগল এই সমস্যা সমাধানের উপায়।

একদিন আলোর সন্ধান পাওয়া গেল। কেউ একজন খবর নিয়ে এল। হরিদ্বার থেকে এসেছেন এক সন্ন্যাসী। অভিরামপুরের ওদিকে গঙ্গার ধারে তার আশ্রম। তার কাছে বিধান নিতে ছুটল বয়স্করা। এই রাজ্যের ওপর শনি দেবতার কুদৃষ্টি পড়েছে। সন্ন্যাসী পথ বাতলে দিয়েছেন। শনি দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে হবে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে। চাঁদা তুলে শহরবাসী এক শনিবারে ঢাক ঢোল পিটিয়ে শনি পুজো করল।

যারা এরকম বৈষ্ণবীয় নিরামিষ বিধানে খুশি ছিল না, তারা বিধান নিয়ে এল এক তান্ত্রিকের কাছ থেকে। শ্মশানকালী রুষ্টা হয়েছেন। তাই, দুর্যোগের ঘনঘটা। তন্ত্রসম্মতভাবে পূজা অর্চনার বিধান দিয়েছেন তান্ত্রিক। পুজো করতেই হবে অমাবস্যার গভীর রাতে। জীব বলি অতি অবশ্যই চাই। সৌভাগ্যক্রমে অমাবস্যা ছিল রোববারেই, অর্থাৎ শনি পুজোর পরের দিনই। তন্ত্রমতে রবিবার গভীর রাতে শ্মশানকালীর পূজাও সম্পন্ন হল। উপচারের প্রাচুর্যে ভক্তকুল আহ্লাদে আটখানা। পাঁঠাবলি আর কারণবারির কল্যাণে সবাই আত্মপ্রসাদে ডগমগ—শ্মশানকালীর রুষ্টা থাকার আর কোনো কারণই থাকতে পারে না।

কয়েকদিন দূর থেকে ভেসে আসা বিকট আর্তনাদ থেমেছিল। শহরবাসী একটু ধাতস্থ হল। তাদের এত পূজার্চনা তবে বৃথা যায়নি। আবার, কেউ কেউ এমনও ভাবতে শুরু করেছিল যে বোধহয় অলীক কল্পনায় তারা কোনো এক দুঃস্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। সবকিছু আবার স্বাভাবিক। জীবন শুরু হল জীবনের নিয়মে।''

একমনে বিক্রমাদিত্য শুনে চলেছেন বেতালের কথা। দীর্ঘ সময় নিয়ে বেতাল বলে গেছে অনেক কিছু। কথার মধ্যে কোনো কথাও বলেননি তিনি। বেতাল জিজ্ঞাসা করল, ''বিক্রম কি ঘুমিয়ে গেলে?''

''শুনছি। বল।''

''কিছুদিন ব্যাপারটা থমকে থাকার পর আবার একদিন শুরু হল নতুন উদ্যমে।''

বিক্রমাদিত্য বললেন, ''মাঝখান থেকে শ্মশানকালীর নামে কিছু নিরীহ পাঁঠার প্রাণ গেল।''

বেতাল হাসল, ''তা গেল। তবে, খ্যাঁটনটা কেমন জম্পেশ হল বল। এবার কিন্তু সঙ্গে এক বাড়তি উপসর্গ।''

''কী রকম?'' বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন।

''তোমার এই অঙ্গরাজ্যের রাজধানীর মধ্যভাগে রয়েছে চিড়িয়াখানা। সন্ধের পর শহরের দূর প্রান্ত থেকে যখন ভেসে আসছে তীব্র চিৎকার, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে দমবন্ধ করা তীব্র আর্তনাদ, তার সঙ্গে সমবেত কোরাস জুড়েছে

চিড়িয়াখানার পশুপাখিরাও।”

বিক্রমাদিত্য হো হো করে হেসে উঠলেন।

“তুমি হাসছ বিক্রম! ওদিকে নগরবাসীর নাভিশ্বাস। নাভিশ্বাস উঠেছে সরকারি কর্মচারী, প্রশাসনিক আধিকারিকদের। রাজপ্রাসাদ থেকে ছুটে এল পদস্থ ব্যক্তিরা। মন্ত্রী আমলারা সব যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হাজির হল চিড়িয়াখানায়।”

বিক্রমাদিত্যের হাসির তোড় ক্রমাগত বাড়তে লাগল। দমবন্ধ করা হাসি কোনোরকমে সামলে জিজ্ঞাসা করল, “তারপর? তারপর কী হল?”

“চিড়িয়াখানার জীবজন্তু, পাখি, সরীসৃপ, জলচর, উভচর যে যেখানে ছিল তারা এইসব সরকারি কর্মচারী, প্রশাসনিক আধিকারিক, মন্ত্রী, আমলা, পদস্থ ব্যক্তিদের বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের নিজের সুরে স্বরে চিৎকার জুড়ে দিল।”

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে বেতাল ক্লান্ত। একটু থামল।

“সরকারি কর্মচারী, প্রশাসনিক আধিকারিক, মন্ত্রী, আমলা, পদস্থ ব্যক্তিরা রণে ভঙ্গ দিলেন। তারা পশ্চাৎপ্রদর্শন করলেন। শ্বাপদকুলের অসভ্যতায় দ্বিপদদের সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হল। ডাক পড়ল সাইক্রিয়াটিস্টদের। ওপর মহলের নির্দেশে সেই রাতে তারা আর নার্সিংহোমে যাবার সময় পেল না। সরাসরি যেতে হল চিড়িয়াখানায়। কিন্তু, হায়! মহামান্য ডাক্তারবাবুদের ন্যূনতম সম্মানটুকু পর্যন্ত দিল না চিড়িয়াখানার বাসিন্দারা। তাদের ক্রমাগত চিৎকার দিক দিগন্ত ভরিয়ে তুলল।

বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে একটা প্যাঁচা। ডেকে চলেছে কর্কশ স্বরে। শেয়ালেরা বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। তাদের মধ্যরাত্রির ধ্রুপদী খেয়ালে চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যেও বিক্রমাদিত্য শুনতে পেলেন দূর কোন গ্রাম থেকে ভেসে আসছে কুকুরের প্রত্যুত্তর। বেতালকে কাঁধে নিয়ে বিক্রমাদিত্য পথ চলেছেন নিরলস। বেতালও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার তার গল্প শুরু হল।

“তবে কি জানো বিক্রম, চিড়িয়াখানার পশুপক্ষীদের সমবেত কোরাস থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হল। দিনের পর অজানা আতঙ্ক আর উদ্বেগে থাকা শহরবাসী জেনে গেল প্রতিদিন সূর্যাস্তে দিনের আলো নিভে গেলে শহরের উপকণ্ঠে যে ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ আর আর্তনাদ তাদের জীবনকে ভয়ের গহ্বরে ঠেলে তার প্রকৃত উৎসস্থল। কিন্তু, বুঝতে পারল না কেন এভাবে বন থেকে সমস্ত পশুপাখি বেরিয়ে এসে শহরকে ঘিরে ধরে একসঙ্গে চিৎকার শুরু করেছে।”

“অর্থাৎ, শহরবাসী জানতে পারল প্রতিদিন সন্ধেবেলায় আশেপাশের বনজঙ্গল থেকে পশুপাখিরা চলে আসে শহরের উপকণ্ঠে। ঘিরে ধরে শহরটাকে। তারপর, সমস্বরে শুরু করে চিৎকার।”

“তুমি কী করে জানলে, বিক্রম?” বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে বেতাল।

বিক্রমাদিত্য বললেন, “তুমি কি জানো না বেতাল, যে আমি মাঝে মাঝেই মন্ত্রীদের ওপর ভার দিয়ে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ি রাজ্য পরিক্রমায়?”

“যাই হোক। তারপর থেকে প্রতিদিনই অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই সরকারি যত্নে ও তৎপরতায় সতর্ক বার্তা ঘোষিত হতে থাকে, কেউ যেন সন্ধের পর শহরের কোনোদিকের প্রান্তসীমায় না যায়। আচ্ছা বেশ। আমার গল্প শেষ। এবার প্রশ্নের পালা। আমার শর্তের কথা মনে আছে তো?”

“আছে, আছে। আর ভালো লাগছে না। চটপট তোমার প্রশ্নটা করে ফেল।”

“প্রশ্ন আমার দুটো, বিক্রম। প্রথম প্রশ্ন, বন জঙ্গল থেক শহরের উপকণ্ঠে সমবেত হয়ে পশুপাখিরা বেশ কয়েকদিন ধরেই চিৎকার করছিল। কিছুদিন পর তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল শহরের মধ্যভাগে অবস্থিত চিড়িয়াখানার পশুপাখিরা। কেন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এভাবে পশুপাখিরাই বা কেন চিৎকার জুড়ে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল?”

বিক্রমাদিত্য হাসলেন, “তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা সহজ এবং ছোটো। কমরেডশিপ বা ব্রাদারহুড।”

“একটু সহজ করে বুঝিয়ে বল, বিক্রম।”

“আবার সলিডারিটিও বলতে পার। দ্যাখো, তোমরা একা নও। তোমাদের পাশে তোমাদের সাথে তোমাদের সমর্থনে আমরাও আছি।”

“মানে? পরিষ্কার করে বল বিক্রম। সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।” বেতালের কণ্ঠস্বরে এক অসহায় অধৈর্য উচ্চারণ।

“এক্সাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট। ধর, ইউনিভার্সিটির ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বয়কট শুরু করল কারণ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী কোনো একজন অধ্যাপকের পেপারে ফেল করেছে। তাদের কেউ নেতা, কেউ অভিনেতা, আবার কেউ কেউ সাধারণ ছাত্রছাত্রী। প্রত্যেককে পাশ করিয়ে দিতে হবে এই দাবিতে তাদের ক্লাস বয়কট আন্দোলন কয়েকদিন চলার পর যখন কর্তৃপক্ষ কান দিল না, তখন এই আন্দোলনকে জোরদার করতে এগিয়ে এল ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। তাদের ছাত্রছাত্রীরাও ক্লাস বয়কট শুরু করল। একে একে পল্‌সায়েন্স, হিস্ট্রি, বেঙ্গলি, স্যান্‌স্ক্রিট, ফিলসফি, জিওগ্রাফি, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস্ এবং আরও অন্যান্য সাবজেক্টের ছাত্রছাত্রীরাও ক্লাস বয়কট আন্দোলনে সামিল হল। দুনিয়ার মজদুর কোনোদিন এক হয়েছিল কি না কিংবা ভবিষ্যতে হবে কি না আমার জানা নেই। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এক হয়ে এক সঙ্গে সব ক্লাস বয়কট করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বারোটা বাজিয়ে দিল বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, বৃহত্তর সাম্যের খাতিরে যে কাউকে ফেল করানো চলবে না। ফেলুদা বলে কেউ আর থাকবে না।”

বিক্রমাদিত্য একটু থামলেন। বেতাল তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে তার কথা। পথ চলতে চলতে বিক্রমাদিত্য আবার শুরু করলেন। “তোমাকে সলিডারিটির একটা লেটেস্ট এক্সাম্‌পলও দিতে পারি।”

‘কী করকম?” বেতাল কৌতূহলী।

“রাতের অন্ধকারে মাধবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে আলো নিভিয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের সংবেদনশীল পুলিশ ডেকে পিটিয়ে দিলেন। ছাত্রীরাও শ্লীলতাহানি থেকে রেহাই পেল না। এই ঘটনায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সমস্ত মানুষ। বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ল এই রঙ্গদেশের রাজধানীর পথপ্রান্তরে। জেলায় জেলায়। রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যে, ভিন দেশে। রিজেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীতোষ কলেজ এবং আরও আরো অসংখ্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একজোট হয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ করল। কিংবা ধর কিস্‌সা কিস্ কা। কোচিতে কোনো এক কাফেতে প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের চুম্বনে পুলিশি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে এই রঙ্গদেশের রাজধানীর পথে প্রান্তরে ছাত্রছাত্রীরা চুম্বনে ব্যারিকেড গড়ে তুলল। বুঝলে বেতাল—এই হল সলিডারিটি।”

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে

বেতালের পাল্‌সটা বোঝার চেষ্টা করলেন বিক্রমাদিত্য। বেতাল বলল, ''বাঃ! কত সহজভাবে তুমি বুঝিয়ে দিলে। সত্যিই, তুমি একটা জিনিয়াস।''

''আর, এই কারণেই বনের পশুপাখিদের প্রতিবাদ আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল চিড়িয়াখানার পশুপাখিরা।''

''বাঃ! দারুন বলেছ বিক্রম। একশোয় একশো। কিন্তু, কিসের প্রতিবাদ? আর, তার জন্য সমস্ত পশুপাখিদের এই সর্বজনীন প্রতিবাদ আন্দোলন? শহরটাকে একেবারে ভীত স্তব্ধ নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে!''

''সেটাই তো তোমার আসল প্রশ্ন বেতাল। ধৈর্য ধরে শোন। মনুষ্য সমাজ আজ পশুদের চরিত্র হননে নেমেছে। এ ব্যাপারে নারী, পুরুষ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নেতা, চামচে—সমস্ত মানুষ একই সুরে একই স্বরে কথা বলছে। আর বৈদ্যুতিন মিডিয়াগুলো এবং সংবাদপত্রগুলো সেই মতামতকে নির্লজ্জের মতো প্রচার করছে। তাই, পশুপাখিদের এই সমবেত প্রতিবাদ আন্দোলন।''

''তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে পারছি না বিক্রম। একটু বুঝিয়ে বল।''

''ঠিক আছে। একটু ভেঙেই বলি। ধৈর্য ধরে শোন।''

বেতাল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। বিক্রমাদিত্য বলতে থাকেন।

''মানব সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ হল গণতন্ত্র। আর, সবচেয়ে ন্যক্কারজনক নারকীয় ঘটনা হল ধর্ষণ। আজকাল আবার খুব সুপরিচিত শব্দ হল গণধর্ষণ। কিছু কিছু দ্বিপদ 'জন্তু' সরি 'জন্তু' শব্দটা ব্যবহার করাটা অন্যায় হল।''

'' 'জন্তু' শব্দটা ব্যবহার করাটা অন্যায় হল কেন?'' বেতাল জানতে চাইল।

''বেতাল, তুমি বড্ড অধৈর্য। একটু সবুর কর। যেকথা বলছিলাম। কিছু কিছু দ্বিপদ আবার এই ধর্ষণকরাকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে পর্যবসিত করেছে। সংবাদপত্র কিংবা টিভি চ্যানেলে চোখ রাখ। যেখানে সেখানে গণধর্ষণ। রক্‌স্ট্রিট থেকে ঝড়োয়া, রামখনি থেকে আনন্দগড়, নির্বাণতলা থেকে হৈমন্তী, স্টেশন, রেলইয়ার্ড, বাসস্টপ, গোডাউন...। কত আর নাম করব! গণধর্ষণ হয়েছে এমন সব জায়গায় ক্রমবর্ধমান নামের তালিকা কলেবরে মহাভারতের মতো চেহারা নিতে পারে।''

বেতাল শিউরে উঠল। তার শরীরের কম্পন টের পান বিক্রমাদিত্য। বললেন, ''কোথায় না এই ধর্ষণ বা গণধর্ষণ হয়ে চলেছে? স্কুল ভ্যান, পুলকার, চলন্ত অটো, চলন্ত ট্যাক্সি, চলন্ত বাস, চলন্ত ট্রেন। কোথাও আর নিরাপদে নেই আমাদের মেয়েরা। শুধু এই রঙ্গদেশই নয়, সম্প্রতি একটি রিপোর্টে প্রকাশ যে সুদূর ন্যু ইয়র্কের রাস্তায় মেয়েদের পথে চলার সময় শুনতে হয় অশ্লীল টীকা টিপ্পনী, মন্তব্য এমনকি ধর্ষণেরও হুমকি।''

''আর উড়ন্ত প্লেন?'' পরিহাস করে বেতাল।

''তেমন কোনো ইনফরমেশন এই মুহূর্তে অবশ্য আমার কাছে নেই। তবে সেখানেও মাঝে মধ্যে শ্লীলতাহানির ঘটনা খবরের কাগজেই দেখা যায়। এবং সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে যে এই ব্যাপারে আমাদের শিশুরাও নিরাপদ নয়। তা না হলে তিন বছরের শিশুকন্যাকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ....! সেই পুরুষটি কোথাও স্কুলভ্যানের চালক, কোথাও শিক্ষক, কোথাও নিকটতম প্রতিবেশী। কোথাও বা পারিবারিক বন্ধু। রেহাই নেই শারীরিক কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধী কোনো নারীর। তুমি সংবাদপত্রে কিংবা টিভি চ্যানেলে চোখ রাখলেই টের পাবে। এইরকম নারকীয় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে প্রায় দিনের পর দিন। আমরা বলি—'অতিথি দেবোভব।' অথচ, আমাদের দেশে বিদেশিনী পর্যটকেরাও সুরক্ষিত নয়।''

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে একটু থামলেন বিক্রমাদিত্য। বেতাল বলল, ''কিন্তু বিক্রম, আমার প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না।''

''আমার সব কথা এখনো শেষ হয়নি বেতাল।''

''বল।''

''এরকম নারকীয় ঘটনা ঘটে যাবার পর নিউজপেপার, টেলিভিশন চ্যানেলে চ্যানেলে শুরু হবে তাত্ত্বিক আলোচনা, নিন্দা। কোনো কোনো মহামান্য ব্যক্তি মন্তব্য করেন—এসব সাজানো ঘটনা। ছোটো ঘটনা। সংবাদপত্র আর টিভি চ্যানেলের কারসাজি। যে যাই বলুন না কেন, সবার অবিসংবাদিত মত হল—পশু পশু। পশু না হলে এমন করতে পারে? আদালতে এমন নারকীয় ঘটনায় অপরাধী কখনও কখনও কারাদণ্ডে দণ্ডিতও হয়। নির্যাতিতা রায়দান পর্বে আদালতে অনুপস্থিত থাকলে আক্ষেপ করেন। শাস্তি পেয়ে 'পশুগুলো'র মুখগুলো কেমন হয়েছিল, তিনি দেখতে পেলেন না।''

একটু থেমে বিক্রমাদিত্য হঠাৎই বেতালকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কি একই মত পোষণ কর বেতাল যে পশুরাই এরকম কাজ করে।?''

''উত্তরটা তোমাকেই দিতে হবে বিক্রম।''

বিক্রমাদিত্য বললেন অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। ''সন্তানের প্রয়োজনে পশুরা মিলিত হয় প্রকৃতির নিয়মে। একমাত্র মানুষই প্রকৃতির নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের কামনা বাসনা তৃপ্তির পথ খুঁজে নিয়েছে। তা না হলে কি 'জাপানি তেল' কিংবা 'রকেট কাপসুল'-এর বাজার এমন রমরমা হয়? সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় টেলিভিশনের চ্যানেলে চ্যানেলে মানুষের আদিম কামনাবাসনা লিপ্সা চরিতার্থ করার এমন অজস্র উপকরণ এভাবে নির্লজ্জের মতো বিজ্ঞাপিত হয় কী করে? তারপরেও আছে কিছু বিকৃত দ্বিপদ যাদের লালসার জন্য মনুষ্যসমাজ তুলনা করে পশুর সঙ্গে।''

''বেতাল শোনো,'' হঠাৎ বিক্রমাদিত্য দাঁড়িয়ে পড়লেন পথের মাঝে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ''শহরের উপকণ্ঠে জড়ো হয়ে চতুষ্পদ আরণ্যক শ্বাপদকুল তাই প্রতিবাদ করতে চেয়েছে তাদের নিজস্ব ভঙ্গিমায়। নিজস্ব ভাষায়। পশুদের এই প্রতিবাদ আন্দোলন কিন্তু একদম অহিংস। পশুদের আক্রমণে কোনো মানুষ আক্রান্ত হয়নি। আহত বা নিহত হয়েছে কোথাও এমন কোনো খবর কিন্তু নেই। এমন কোনো খবর নেই যে পশুরা কারো পোশাক কিংবা ধুতি খুলে নিয়েছে বা ছিঁড়ে দিয়েছে যা সভ্য মানুষের অনায়াস কাজ। পশুরা তাদের এই অহিংস প্রতিবাদে বলতে চেয়েছে যে 'তোমরা দ্বিপদদের (পড়ুন মানুষদের) গর্হিত কাজের জন্য আমাদের (পড়ুন পশুদের) সঙ্গে অকারণেই তুলনা করছ। এটা অযৌক্তিক, অন্যায়। ধর্ষণ বা গণধর্ষণ করতে পারে একমাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক কিছু দ্বিপদেরাই। আমরা পশুরা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে বড় জোর কামড়ে বা আঁচড়ে দিতে পারি। ধর্ষণ? নৈব নৈব চ'।'

হঠাৎ বিক্রমাদিত্যের কাঁধটা হাল্কা হয়ে গেল। সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার গিয়ে লটকেছে শিংশপার ডালে।

বাংলা প্রবাদে রসময় পিষ্টক

ভাস্করব্রত পতি

শীত এলেই শুরু হয় পিঠের মরশুম। আয়েশ করে পিঠে খাওয়ার ধুম পড়ে যায় বাঙালির ঘরে ঘরে। এ নিয়ে একটা প্রবাদ খুঁজে পাওয়া যায়—

পান পানি পিঠা/জাড়ে লাগে মিঠা

এখন 'জাড়' হল শীত বা ঠাণ্ডা। কিন্তু, তালের মরশুম এলে এখনও পিঠে খাওয়ার বেদম চল লক্ষ করা যায়। আর তালের 'পাঁকি' দিয়ে তৈরি পিঠে তো অভাবনীয়!

চৈতে গিমা, বৈশাখে নালিতা মিঠা
জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল।
আষাঢ়ে খই, শাওনে দই,
ভাদরে তালের পিঠা, আশ্বিনে শসা মিঠা,
কার্তিকে খল্‌সের ঝোল।
আগনে ওল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল,
ফাল্গুনে গুড় আদা বেল।

স্বভাবতই পিঠের স্বাদ এমনই যে কেউ এর গন্ধ পেলে আর নড়তেই চায় না। প্রবাদের আঙিনায় তা—

যে বাড়ি দেখে পিঠের গুঁড়ো
ছাড়ে না তার দরজার মুড়ো।

পিঠে মানেই মিষ্টতার একটা প্রতীক। যা কিনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মিঠে স্বাদের পিঠে যে খেয়েছে, সে কেবল অনুভূতি দিয়েই উপলব্ধি করতে পারে এর গুণমান। এই পিঠে নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবাদের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে—

মিঠের লোভে খায় পিঠে,
যদিও এঁটো লাগে মিঠে

পিঠে খায় মিঠের জোরে
হাত নেড়ে বেড়ায় নানীর জোরে।

যে পিঠে বিস্বাদ লাগে সেই পিঠেও রসনা তৃপ্ত করতে পারে তাতে গুড় বা মিঠে কিছু প্রয়োগ করলে। তেমনি কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা না থাকলেও তাঁর যদি খুঁটির জোর (এখানে নানী বা পিতামহী) থাকে তবে সেও হাত নেড়ে ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করতে পারবে। সামাজিক এই বিষয়টি সুন্দরভাবেই প্রতিভাত '*পিঠেয় পিঠে চেনে*' প্রবাদের মাধ্যমে।

তেমনি আমরা নিজের কোনো জিনিসের তুলনায় অন্যের জিনিসকে বেশি পছন্দ করি। নিজের বউ ছেড়ে অন্যের বউকে বেশি আকর্ষণীয় বলেই মনে করতে ভালোবাসি। পিঠে-র অনুষঙ্গে সেই বিষয়টি প্রতিভাত এভাবে—

পরের পিঠে / বড্ড মিঠে।

যাঁর যেমন স্বভাব, সে তো তেমনই আচরণ করবে। অন্যথা হয় না। এ নিয়ে একটি সুন্দর প্রবাদ মেলে পিঠে-র অনুষঙ্গে—

কুকুরকে দিলেও পিঠে পায়েস,
ছাড়ে না তবু গুয়ের আয়েস।

পিঠে এমনই জিনিস যা খেলে নাকি হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কখন কী করে বসে তা ঠিক থাকে না। তাই প্রবাদে শোনা যায়—

চার কড়ার পিঠে খেয়ে বাপকে বলে শালা।

এই অপবাদটি গাজনের অনুষঙ্গে অন্যরকমভাবে চল রয়েছে—

গাজনে উঠলে, বাপকে শালা বলে।

পিঠে এমনই জিনিস তা যদি কেউ সাধ করে যেচে দেয় তা ফেলে দিতে নেই। 'না' বলতে নেই।

সাধলে জামাই খান না পিঠে
শেষে মরেন ঢেকশাল চেঠে।

উপরোক্ত প্রবাদটি পিঠের রসনাকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতার কথা বলা হলেও আদপে কিছু বোঝানো হচ্ছে যে, ভালো জিনিসকে সময় মতোই গ্রহণ করতে হয়। নইলে আপশোশের সীমা থাকবে না। এই জামাইকে কেন্দ্র করে আর একটি প্রবাদ বেশ উপভোগ্য—

জামাইয়ের লাগি পিঠা বানাই
এসে খায় জামাইয়ের ভাই।

যাঁরা অকর্মা হন তাঁরা মুখে বড় বড় 'বাতচিত' ঝাড়েন। তাঁদের এ হেন স্বভাব নিয়ে এক অন্যরকম প্রবাদ পিঠে কেন্দ্রিক—

পিঠের সবই মজুত করি
অভাব কেবল গুড় আর গুঁড়ি।

পিঠে তৈরিতে মূল উপকরণ তো গুড় আর চালগুঁড়িই প্রয়োজন। এ-দুটিই যে মজুত করতে পারে না তাঁর মুখে '*পিঠের সবই মজুত করি*' কি মানায়?

এরম ব্যতিক্রমী স্বভাবের লোক আকছার দেখা যায় সমাজে। অন্যের কষ্ট হোক বা দুরবস্থা আসুক তাতে কোনো মাথাব্যথা নেই। নিজের কাজটি ভালোয় ভালোয় পূরণ হলেই হল। এই স্বভাবের মানুষ নিয়েই পিঠের প্রবাদ—

তোর পুড়ুক আর হাজুক, মোর পিঠের গুড় মজুক।

কিছু কিছু মানুষ আবার যা ঘটে তার বেশি প্রচার করতে ভালোবাসে। অতিরঞ্জিত করে ঘটনার ঘনঘটা করতে চায়। ইনিয়ে বিনিয়ে ফেনিয়ে ঘটনার 'ইলাসটিসিটি' বাড়ানোর এই স্বভাব নিয়েই আমরা প্রবাদের মাধ্যমে উচ্চারণ করি—

খায় ধান, উছড়ায় পিঠে।

গ্রামাঞ্চলে যেসব পিঠেপুলি তৈরি হয় সেগুলির মধ্যে 'আসকে' পিঠের ব্যাপকতা একটু বেশি। এই আসকে পিঠের অসংখ্য ফোঁড়। কিন্তু যাঁরা আসকে পিঠে খায় তাঁরা কেউই এর ফোঁড় গুনে খায় না। এই বিষয়টি নিয়ে যে প্রবাদ চালু রয়েছে তা হল—

আসকে খায়, তার ফোঁড় গনে না।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় পাই '*ক'সে ক'সে খাও আসবে গুনে গুনে ফোঁড়*' আবার গোপাল উড়ের কথায় '*আসকে খেয়েছ যাদু, ফোঁড় ত গননি।*' আসলে বিষয়টা এরকম—'*ঘুঘু দেখেছ বাছা, ফাঁদ তো দেখনি।*'

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে রয়েছে—'*মৎস্য চিনে গভীর গঙ্গা, পক্ষী চিনে ডাল / মায়ে জানে পুত্রের মায়া, জীয়ে যতকাল।*' আবার গোপীচন্দ্রের পাঁচালিতে পাই—'*মৎস্য চিনে উঁচ খোঁচ, পানি এ নিচে নাল / মায়ে চিনে পুত্রের বেদন যার গর্ভের শাল।*' স্বভাবতই যে জিনিসটা ভালো তা ঠিক খুঁজে নেয় সমঝদাররা। তাই তো মণ্ডা মিঠাই ছেড়ে খাদ্যরসিকরা অনায়াসে বেছে নেন পিঠাকে। প্রবাদে তা এরকম—

মণ্ডা চলে না পিঠে খান।

পিঠেকে কেন্দ্র করে প্রবাদের অজস্র উপঢৌকন এই বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অনেকেই অবশ্য আমাদের অজানা। এরকম কিছু প্রবাদ হল—

ভুলি লো ভুলি
খর জ্বালে খই আসকে
ধিকি জ্বালে পুলি।

এখানে পিঠে তৈরির নিয়মকানুন বলা হয়েছে। 'খর' জ্বাল অর্থাৎ বেশি মাত্রায় আগুনের প্রয়োজন আসকে পিঠে এবং খই তৈরিতে। আর ধিকি ধিকি আগুন প্রয়োজন দুধপুলি তৈরির জন্য।

গড় করি পিঠে, দাঁত ছেড়ে দেয়।

গেরস্থে অলক্ষ্মী পায়, চাল কুটে পিঠে খায়।

পিঠে পিঠে করেন বউ
এক পিঠে তিন বউ
আর তো খেতে নারেন বউ।

পিঠে বল, মিঠে বল
ভাতের সমান নয়।
পিসি বল, মাসি বল
মাসের সমান নয়।

অবশ্য এইসব প্রবাদ আমরা অনেকেই ব্যবহার করি না। অনেকেই তা জানিও না। কিন্তু কি সুললিতভাবে সেইসব প্রবাদের মূল উপজীব্য বিষয় উপাদেয় পিঠা।

With Best Compliments of

A Well Wisher

With best compliments of

ELCON ENGINEERING

ELECTRICAL CONSTRUCTION, ELECTRICAL CONSULTANCY & TESTING

5/9, Guru Nanak Road, Durgapur-713204
Mobile : 9434388560, 9832167426
E-mail : elcon.engg@gmail.com

Sl. No. 151

শিশুমেধ যজ্ঞের কথা
অজিত ত্রিবেদী

একবার স্বদেশের দিকে চোখ রাখি, একবার সিরিয়ায়
কোথাও কি মৃত্যুমিছিল থেমে আছে একবারও—

যে শিশু গর্ভমুক্তির পর অবলীলায় ঢুকে গেল গ্যাস চেম্বারে
যে একটিবার দুহাত ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে বলার সুযোগ পেল না:
এ খেলা বন্ধ করো—
তার কোন অপরাধ ছিল, নাকি জন্মানোই অপরাধ তার
সেই অভিশপ্ত শিশুদের লাশে ঢেকে গেল সময়, ইতিহাস
সভ্যতা ক্রমশ ফিরে যাচ্ছে গুহায়, একদিন যে অন্ধকার থেকে
যাত্রা শুরু হয়েছিল তার

এই নরমেধ যজ্ঞ ঘটেছে বহুবার ইতিহাসে, মানবসভ্যতায়
মুখ লুকোবার আড়ালটুকুও অবশিষ্ট নেই আর
সিরিয়ার শিশুমেধ যজ্ঞের নেপথ্যেও সেই একই অন্ধকার
এত অন্ধকার এত মৃত্যুরচনা করে যে রাজনীতি
তার রক্তৃষ্ণা মিটতে আর কত বাকি, নাকি
একদিন নীরক্তকরবীতে পৃথিবী উদ্যান ভরে যাবে, যেদিন
রক্তকরবীর রাজার চিরবিদায়, সিরিয়া সম্রাট
একজন মানুষের চেয়েও কি রাজা বড়, নার্ভগ্যাসে সভ্যতাকে
দিলে শুধু মৃত্যু উপহার

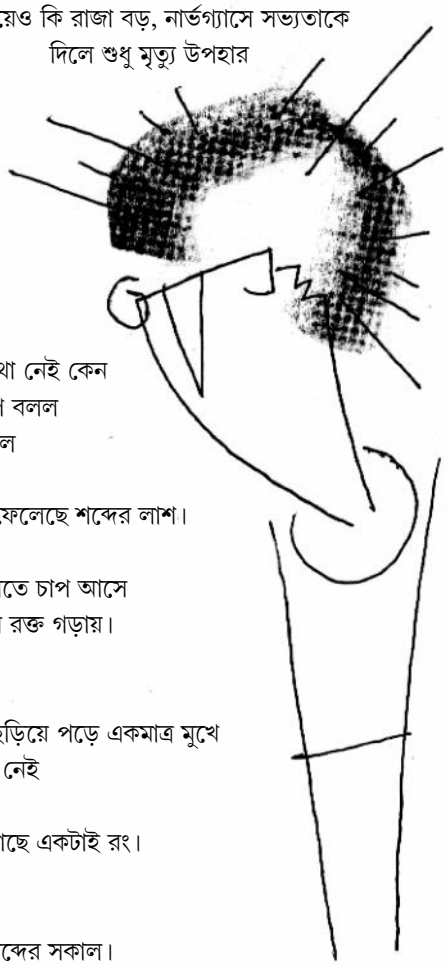

শব্দ সকাল
চণ্ডী অধিকারী

জিজ্ঞেস করলাম, কথা নেই কেন
বাতাস এসে চুপিচুপি বলল
কোনো শব্দ নেই বলে
এখানে ভয়
হাঙরের মুখ গিলে ফেলেছে শব্দের লাশ।

কথা কইলে কণ্ঠনালিতে চাপ আসে
শব্দের চোয়াল বেয়ে রক্ত গড়ায়।

এখানে একটাই শব্দ
হাজারো কথা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে একমাত্র মুখে
যার চোখ বলে কিছু নেই
মন বলে কিছু নেই
চারপাশে ছড়ানো আছে একটাই রং।

পাখি ডাকছে
শীঘ্রই ফুটে উঠবে শব্দের সকাল।

কবি-নাকবি
রতন রায়চৌধুরী

ফুলের তোড়া, মানপত্রে যেদিন সংবর্ধিত হলাম,
সেই দিনই ঝটকা লাগল চেতনায়।
—সত্যি কি কবি খ্যাতির যোগ্য আমি!

যেদিন ধর্ষিতা এবং খুন হল নারী,
খালি হল মায়ের কোল, কিংবা মুছে গেল
তার সীমন্তের রক্তিমা,—একবারের জন্যও
কেন ঝলসে উঠলো না লেখনী আমার!

রক্ষকের ঘোষণা; এমন ভক্ষণের ঘটনা ঘটবে।
এইসব তুচ্ছ, ছোট্ট ঘটনা এবং রটনায় কান দেবেন না
দীক্ষা নিয়েছি তাই সচেতন বধিরতার।

কবিকে হতে হয় সুন্দরের পূজারী,
প্রতিবাদী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, জাগ্রত বিবেকের অধিকারী।
চাঁদির জুতোর তলে এই গুণ বন্ধক দিয়ে
চাটুকার হওয়া যায়,—কবি নয়।

তুমিই সূর্য
মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি

আজ আকাশে সূর্য ছিল না, কিন্তু
তুমি ছিলে পাশে, তাই সূর্য আলোর
অভাব অনুভূত হল না, তুমিই
হাজার সূর্য হয়ে দীপ্ত আলোর শিখায়
আমাকে ছুঁয়ে গেলে, আমার দুচোখে
জ্বাললে খুশির রঙমশাল

তোমার ঠোঁটের স্নিগ্ধ হাসি, পেলব
বুকের উষ্ণ পরশ, কুসুম-কোমল
হাতের আলতো ছোঁয়া আমাকে অনন্ত
ভালোবাসার সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে
গেল।

তুমি কথা বলছিলে, কত কথা! আমি
তা শুনতে শুনতে বারে-বারেই
আনমনা হয়ে যাচ্ছিলাম, আবারো
নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম—তুমি এমন
একটা কিছু, যার সান্নিধ্য আমাকে কেবল
মোহিতই করে না, আমাকে সুগভীর
প্রেমের শীতল বারিধারায় সিক্ত করে,
বসন্তের নব পল্লবের মতো পল্লবিত
করে আমার আমার হৃদয়-মনকে।
আমার চেতনার জগতে নতুন বীজমন্ত্র
প্রতিস্থাপিত করে, যা আমার চলার
পথের অনির্বচনীয় সম্পদ!

আইনের শাসন

তপন মণ্ডল

আইন চলেছে আইনের পথে
এ আর নতুন কথা কি
বহুপদী পতঙ্গের বিষাক্ত লালা ছড়িয়ে
দেশ, রাজ্য, জেলা, শহর ও গ্রামের আনাচে কানাচে
আইন চলেছে আইনের পথে!

হাত হাতের জায়গায়, পা পায়ের, মাথা মাথার জায়গায়
যে যার মত এলোমেলো, বিচ্ছিন্ন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে
আইনি আশ্বাসে—
রক্ত সাগরে করে চান।

আমরা সকলে বিনিদ্র রাত্রি জাগি, মুখে কারফিউ
কারফিউ মগজে, স্ফুরিত চেতনায়,
সাদা ক্যানভাসে নীলের আঁচড়ে
নগ্ন অস্থিরতা, কুয়াশা এসে ঢেকে দেয়
কিশোরী বোনের মুখ।

দেবীর অভয়বাণী স্বর্গ থেকে উচ্চারিত হয়
কবরে জেগে ওঠে হাত পা মাথা বিহীন
গোটা কতক কঙ্কাল শোনার জন্য
শুধু শোনার জন্য
আইন চলেছে আইনের পথে!

নৈঋত কোণে কুকুরের উল্লাস প্রতিধ্বনি হয়ে
ফিরে আসে ঘরের চৌকাঠে, গিলোটিন,
হাজারো ক্রুশবিদ্ধ যিশু
আইন চলেছে আইনের পথে!

শঙ্খচিল

পরেশ কর্মকার

মধ্যাহ্নবেলার মায়াবী নদীচরে ঝিনুক ছিনিয়ে নেয়
সমুদ্রে ঝড়ো বাতাসে বাস্তুহারা সাজে আকাশ চক্করে
উঠে আসে জীবনের মজুত সুধার ভাণ্ডার পেনশন কার্ড
কোঠাবাড়ির ছাদে বসে সে ভালো অভিনয় দেখে জগত সংসারের
স্থূল কার্নিশের গায়ে কিংবা ঝুল বারান্দায় কেমন ভাবে খসে পড়ে
জন্মমৃত্যুর প্রতিটি আনাচে কানাচে
চোখে আবদ্ধ মানুষ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত অবধি
ঠোঁটে দোদুল্যমান সময়ের হিলাইলে মাছ
যার নেই কাঁটাতার নেই পড়শির পাঁচিলঘেরা দ্বিচারিতা
তাকে দেখে মনে হয় দুঃস্বপ্ন হলেও উড়ি
ওভাবে একবার অন্তত যদি উড়তে পারি।

স্মৃতি

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

সেই ছোটো ছোটো খুশিগুলো কবে যেন হারিয়ে ফেলেছি
মনে পড়ে একটা পয়সা পেলে এক্সপ্রেস ট্রেন হয়ে
এক ছুটে চলে যেতাম দোকানে
সব বন্ধু মিলে ভাগ করে খেতাম ঝাল মটর
অমৃত সমান ফুচকার জল
দারুণ একটা ফিস্ট হয়ে যেত গ্রীষ্মের দুপুরে!

আজ আর আমাদের মধ্যে ছেলেবেলা নেই
সেই শিশুটি বুড়িয়ে গেছি কবে
মনে পলি পড়েছে হিংসের
কে কার থেকে একটা বাড়িতে এগিয়ে গেল
কার দামি গাড়ি নেই বলে খুব অপ্রস্তুত
সাজানো সম্পর্ক নিয়ে কেউ কেউ বিদেশে ভ্রমণ করে
আর বাতাসে জানায় খুব সুখে আছি!

এক সকাল : দুই রং

তপন পাল

একটি সকাল ফুলকে ফোটায়
সূর্য ওঠার আগে,
একটি সকাল শিউলি ঝরায়
ব্যথার অনুরাগে।
একটি সকাল ঢাকের বোলে
ছন্দে ভরে থাকে,
একটি সকাল কাঁসর তানে
কান্না যেন ডাকে।
একটি সকাল পাখির সুরে
ঘুম ভাঙানি গান,
একটি সকাল বানভাসিদের
দুঃখে ভরা প্রাণ।
একটি সকাল কাশের বনে
পালক সাদা ঢেউ,
একটি সকাল ন্যাংটা ছেলের
মা ছাড়া নেই কেউ।
একটি সকাল আটচালাতে
নতুন পোশাক মেলা,
একটি সকাল ছেঁড়া জামায়
ভিক্ষু মেয়ের বেলা।
একটি সকাল ফুল ধুনোতে
আগমনীর সুর
একটি সকাল সবহারাদের
বেদনা-নিষ্ঠুর।

তারপর একদিন...

সত্যনারায়ণ মাজিলা

দেখা নেই কতদিন
পাইনিকো চিঠিও
বয়সের বসন্ত
পার হওয়া বিকেলে
লেখা কটা অক্ষর
খবরের কাগজে
তুমি আর ফিরবে না
চলে গেছ রিমঝিম।

দুই ঠোঁট নির্বাক
চোখদুটো বন্ধ
কত স্মৃতি নিমেষে
ঢেউ তোলা ছন্দ—
হাতে হাত ময়দান
তুমি যেন বর্ষা
চোখে এসে নামছো
বৃষ্টির নামতা;
বেদনার প্লাবন
বাঁধভাঙা ঢেউ তার
ডানা মেলা মনটা
হয়ে গেছে কারাগার।।

কত কথা বন্ধু
দেহে দেহ
নয় কেহ
শিশিরের বিন্দু।

রাতভর জেগে থাকা
দুই চোখ ধন্য
উত্তাল স্রোতধারা
আমাদেরই জন্য।
শিউলি-সুরভি মাখা
প্রকৃতি বেঁধেছে খোঁপা
কাশফুল পদ্ম
তুমি অনবদ্য।।

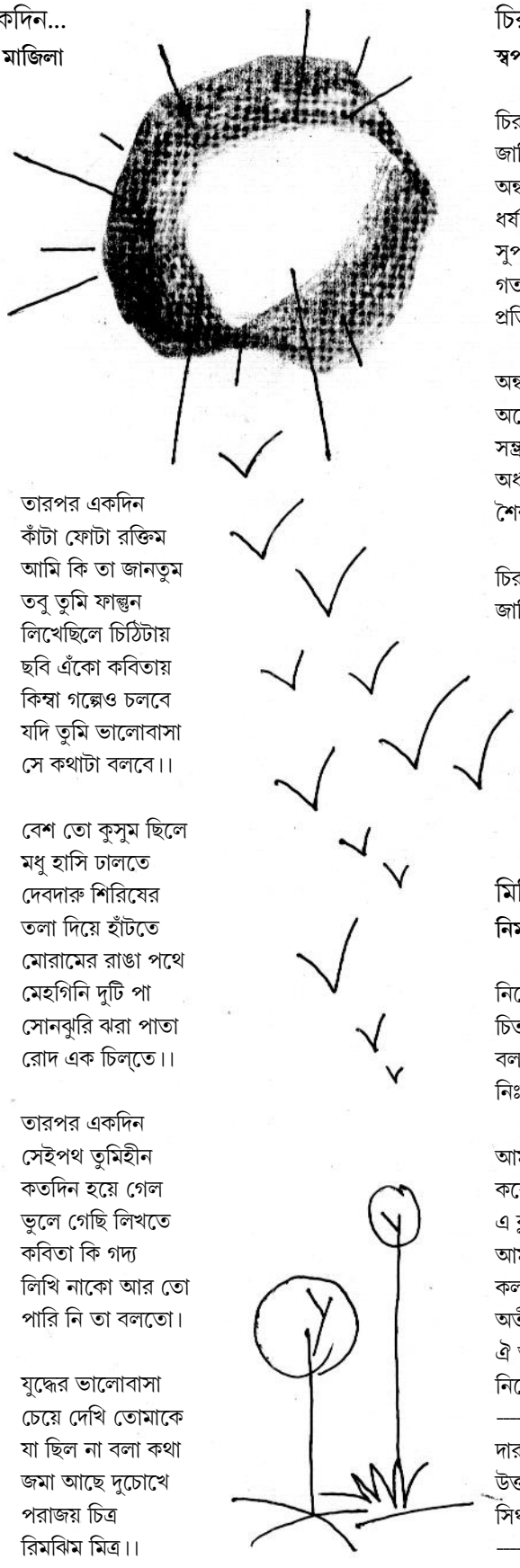

তারপর একদিন
কাঁটা ফোটা রক্তিম
আমি কি তা জানতুম
তবু তুমি ফাল্গুন
লিখেছিলে চিঠিটায়
ছবি এঁকো কবিতায়
কিম্বা গল্পেও চলবে
যদি তুমি ভালোবাসা
সে কথাটা বলবে।।

বেশ তো কুসুম ছিলে
মধু হাসি ঢালতে
দেবদারু শিরিষের
তলা দিয়ে হাঁটতে
মোরামের রাঙা পথে
মেহগিনি দুটি পা
সোনঝুরি ঝরা পাতা
রোদ এক চিল্‌তে।।

তারপর একদিন
সেইপথ তুমিহীন
কতদিন হয়ে গেল
ভুলে গেছি লিখতে
কবিতা কি গদ্য
লিখি নাকো আর তো
পারি নি তা বলতো।

যুদ্ধের ভালোবাসা
চেয়ে দেখি তোমাকে
যা ছিল না বলা কথা
জমা আছে দুচোখে
পরাজয় চিত্র
রিমঝিম মিত্র।।

চিরকাল আমি

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

চিরকাল আমি সূর্যাস্ত দেখলেই ভয় পাই
জানি অন্ধকার নেমে আসবে তখনই,
অন্ধকার মানে পাপের ফিরিস্তি অনন্ত
ধর্ষণ লুঠতরাজ আর অবিরাম আতঙ্ক
সুপরিকল্পিত আক্রমণের নানা কৌশল
গতানুগতিক বন্ধ বুদ্ধিজীবীর মুখ
প্রতিবাদের ভাষা নেই প্রতিহিংসার দাপটে

অন্ধকার মানে অনেক অদৃশ্য কান্নার কথা
অনেক আর্তনাদের বধির বেদনা
সম্ভ্রম খোয়ানো, ক্লেদাক্ত মায়ের শরীর
অর্ধনগ্ন যুবকের দেহ অবৈধ খাদানে
শৈশব নির্বাসিত শৈশবের আড়ালে।

চিরকাল আমি সূর্যাস্ত দেখলেই ভয় পাই
জানি অন্ধকার নেমে আসে ঠিক তখনই।

মিছিলবৃক্ষের মধ্যাহ্ন ছায়ায়

নির্মল নিয়োগী

নিজের বলতে সবটাই খাঁটি
চিতার আগুন আর কবরের মাটি;
বলতে পার—বেঁচে আছি কেন
নিঃস্পৃহ তরুলতা যেন...!

আমার চিতার আগুনে
কবে হবে ছারখার
এ ক্লীব সংসার,
আমার কবরে লুকাবে ব্যর্থ মুখ
কলঙ্ক নির্বিকার
অতীব বর্বরতার...
ঐ আগুনে ঐ মাটির সাথে
নিয়ে যাব সব ক্লেদ
—মিছিলবৃক্ষের মধ্যাহ্ন ছায়ায়
দারুচিনি মিষ্টতায় ডিঙিয়ে গিয়েছি
উত্তাল বৃক্ষবল্কল
সিঞ্চন করেছি যেখানে তীব্র পিপাসা
—অশ্রু নয়, ঈর্ষা নয়, অনুভব ফসল!!

আশার আলো

উজ্জ্বলকুমার ঘোষ

দুয়ার খোলো—দুয়ার খোলো
হৃদয় কোণের বন্ধ দুয়ার এবার খোলো
যা হয়েছে শেষ হয়েছে হা-হুতাশা ঝেড়ে ফেল
দুয়ার খোলো—দুয়ার খোলো।

ভোর আকাশে রঙিন আলো ভরিয়ে দিল
আশার আলো নিয়ে হাতে তোমার দ্বারে
অন্ধকারের আবর্জনা ধুয়ে ফেল
দুয়ার খোলো—দুয়ার খোলো।

পথের পথিক এগিয়ে চলা কোন সুদূরের পথে
কাঁটা পাথর পাবে অনেক রাখবো তোমায় সাথে
ভয় করলেই পিছিয়ে পড়া নিভবে আশার আলো
দুয়ার খোলো—দুয়ার খোলো।

অন্ধকারের দুয়ার খুলে ভোরের আলোয় ভরিয়ে তোলো
যা হয়েছে হা-হুতাশা ঝেড়ে ফেল
বন্ধ ঘরের অন্ধকারে আশার প্রদীপ জ্বালো
দুয়ার খোলো—দুয়ার খোলো।

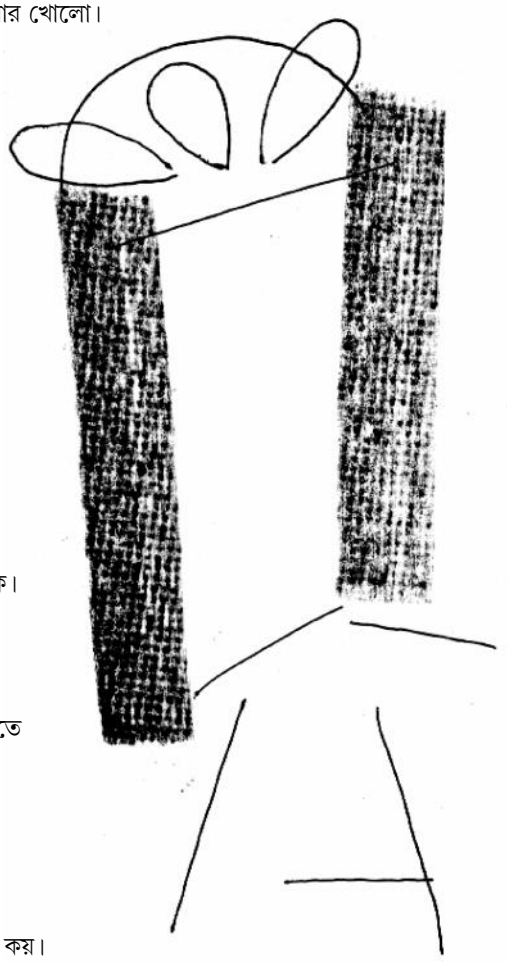

সময়

মিনতি গোস্বামী

লম্পট সময়
ভেঙে দেয়
চৈতন্যের সিন্দুক
লুটেপুটে খায়
ওর সম্বল শুধু বন্দুক।

অসাড় মাংসল দেহ
শুকনো খড়ের
জাবর কাটতে কাটতে
দিন পার হয়।

রাত পাখিরা
কিচির মিচির করে
শলাপরামর্শ সেরে
পুব আকাশের কথা কয়।

বুনকর

মলয়কান্তি মণ্ডল

ওয়াসিমের লাল চোখে আজও স্বপ্ন জাগে
হাজারো বুনকরের আঁতুড়ঘর বেনারসের কচ্চিবাগে।
এখানে গলির ভিতর গলি, দীর্ঘ গাঢ় অন্ধকার
সুতো শিল্পেই ভরসা বেনারসের বুনকর পরিবার।
এক একটা বেনারসী যেন এক টুকরো সোনা
দিনরাত এক করে চলে শুধুই তাঁত বোনা।
অভাবী কচ্চিবাগে জ্বলে টিমটিম মৃদু আলো
ওয়াসিম-বাবুলাল আজ কেউ নেই ভালো।
সূক্ষ্ম-নরম রঙিন সুতোয় ফোটে ঝকঝকে ফুল
ব্যাপারীর কাছে ঋণ, এটাই হয়েছে ভুল।
বুনকরের জীবনে শুধু অভাবই আছে লেখা
বেনারসি গায়ে নিয়ে শুরু নতুন স্বপ্ন দেখা।
প্রতিটি সুতোয় বাঁধা ভাগ্যহীন বুনকরের প্রাণ
কচ্চিবাগের মহল্লায় ভাসে শুধু রেশমের ঘ্রাণ।
ওয়াসিমের লাল চোখ তবু স্বপ্ন আঁকে
আসবে কি নতুন দিন, আঁধার গলির বাঁকে?

প্রতিচ্ছবি

বাসুদেব মণ্ডল

আমি যখন নেহাত কিশোর,
নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে
দুচোখে ছবি আঁকিয়েছি।
আমি যখন সদ্য যুবক
প্রতিবাদের ভাষায় মুখর
আকাশে হাত ঝাঁকিয়েছি।

এখন আমি প্রৌঢ়, কাঁধে
নিরাপত্তার ঝুলি—
যে যা বলে, সমর্থনে
নীরবে হাত তুলি।

ভয়েই থাকি, কেউ জানে না
কখন যে কী ঘটে—
ছা-পোষা লোক, চুপ থাকাটাই
খুব স্বাভাবিক বটে।

তবু যখন চমকে দেখি
মাড়িয়ে ধূলো ঘাস,
কারা যেন হাজার হাতে
ঢেকেছে নীলাকাশ,
অজান্তেই থমকে দাঁড়াই
অবাক হই—একি!
প্রতিবাদী মুখগুলোয় যে
নিজেরই মুখ দেখি।

ঠিকানার খোঁজে
বিকাশ বিশ্বাস

পাখির স্বপ্ন-সবুজ
মূঢ় দিগন্তে ফেরার
শান্তির ললিত বাণীর আর্তি
বেদনা-বিহ্বল।
আসন্নপ্রসবা যন্ত্রণাকাতর
বিষণ্ণ প্রহরে।

গাছেদের শিকড় তবু
অবাধ্যতায় ভূগর্ভ ফাটায়
নদীর প্রবহমানতা
সাগরসঙ্গমা হয়।

বারুদের গন্ধমাখা বাতাস
উন্মত্ত গতিতে ছোটে
মেঘের পাঁচিল টপকে
আকাশের সীমানা ছুঁতে।

রাত্রির নিকষ অন্ধকারে
আতঙ্কিত জনারণ্য
শীতভোরে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে
নতুন ঠিকানায় খোঁজে উন্মুখ।

শপথ
তানিয়া রাজবংশী

আমার বুকের আগুন
ছড়িয়ে পড়লো রাজপথে
রাজপথ থেকে রাজ্যময়
ডাকলে আমায় শপথে

ডাকলে আমাকে কবিতায়
কবিতা লিখেছি বৈশাখে
আমার হৃদয় নীল আকাশ
বাইরে আমায় আজ ডাকে

তোমার দুচোখে অনন্ত
অনুভবে ওই সূর্যোদয়
স্বরলিপি লেখা রাজপথে
শপথে আমার এ সঞ্চয়

বুকের আগুনে প্রার্থনা
ফুল হয়ে ফোটে কবিতায়
বৈশাখে আলো বিপ্লবে
তুমি শাশ্বত চেতনায়।

শরতের নদী
নমিতা রাউত

তামস মেঘের খেলা শেষে
পেঁজা তুলো মেঘের মদালসা আনাগোনা
শরতের সুনীল আকাশে
শিউলির টুপটাপ ঝরে পড়া ভোরে
সোনালী সূর্যের হলুদ আভা
বহতা নদীর জলে
দুপুরের চূর্ণ চূর্ণ খররৌদ্র তির তির ঢেউয়ে
নিঝুম জলে আপন মনে শুধু কথা বলা,
আর যাত্রীহীন নৌকার দুলুনি
অপরাহ্নের অস্তরাগের রক্তিম আলো
আলতা পরায় নদীর পায়ে
পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চন্দ্রের কিরণ
স্রোতে আবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলে
রাতের আঁধারে আঁধারে
নিঃসঙ্গ নদীর বিষণ্ণতায়
কাশফুলের বনে মিশে যায়
শরতের অব্যক্ত বেদনা।।

বর্ষশেষের পাপ
অশোক অধিকারী

অনেক বিষণ্ণ সংলাপ দেওয়ালের ভাষা জানে
একা একা কথা বলে সব মীমাংসার উত্তর আসে না
অন্যপথে সমাধান, সিদ্ধান্ত চুরি করে মধ্যপন্থা
আসলে মানুষ কখন শিকারির তূণবদ্ধ সূচনা

চিরতরুণ মিথ্যেগুলো খাপ খুলে বেপরোয়া ধার
রোদের স্পর্ধা তার কেটে যায় উন্নত চমকে
সিদ্ধিদাতা ব্যবসাকাতর লাভক্ষতি নিত্য গমন
কথকের ধূমজ্বরে তাপহীন অরণ্যরোদন

বিকাশ বিকাশ খেলা শোভিত ক্ষুধার্তের ছবি
গলিপথে নগ্নশরীর ক্ষয় হয় অচেনা শহর
এখন অন্ধকারে প্রপিতামহের পথে স্বপ্ন সফর
বর্ষশেষের পাপে এত নুন শরীরী অবক্ষয়

কোনোদিন তুমি ছিলে দ্বিতীয় যুদ্ধের ঘরণী।

প্লাবন

অশোককুমার বাগ

তবু ভেসেছে শরীর, মেঘ ভুবনে, ফুটেছে চমক,
যে কথা পরে বলা যায়, তাও বললাম এখন,
বরষা দুয়ারে, সে এলো না এখনো, শুধু বাতাসের দমক।
উঠোন ভরে সোঁদাগন্ধে, তরী ছুঁয়ে দূর কিনার তখন।

এইখানে আমাদের কান্না, এইখানে আমাদের প্রবাহ, নিয়ত আকুল—
দিকহারা দুরন্ত বেলাশেষে খুঁজি ধ্রুবতারা, কূল-উপকূল;
মায়াবী আলেয়া দেয় টান, দাঁড় নেমে যায় গভীরে অধীর—
বুকের পাঁজরে কালহরণের খেলা, প্লাবনের ধারা ছুঁয়েছে শরীরে।

ধর্মঘট

তন্ময় ভট্টাচার্য

এতক্ষণ আমরা যা যা কথা বললাম
তা পরপর সাজালে
একটা ইস্তাহার হয়ে যেত।

সামান্য আর্তি, অনেকটা দৃঢ়তা
বলিষ্ঠতা আর আহ্বান
তাকে ঘিরে রাখত সন্তর্পণে।

শোষকের মুখের উপর সপাটে ছুঁড়ে মারলে
গলে যেত সব মেকআপ
ক্লেদাক্ত মুখমণ্ডল জুড়ে হতশ্রী চেহারাটা
নগ্ন প্রকাশে বিধ্বস্ত হত।

পৃথিবীর সমস্ত বন্দুকের ট্রিগারে
হাত রাখত হাজার হাজার চে
বলিভিয়ার জঙ্গল থেকে
এই সেদিন যে কলকাতায় ঘুরে গেল—

কলকাতায়
আমার শহরে
২রা সেপ্টেম্বরে

একদা আকাশ ছিল

কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়

একদা আকাশ ছিল
বাতাস ছিল
সোনাঝরা দিন ছিল—
আজও সেই পৃথিবী ঠিক আছে
বোমা বন্দুকের লড়াই নিয়ে—
—শিশু, নারী, স্নিগ্ধতার কাছে।

গাছ

পঙ্কজ পাঠক

মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ দেখতে দেখতে
গাছটা কখন বড় হয়েছে আমরা খেয়াল করিনি
পার্ক, ময়দান, রাস্তার মোড়ে তুফান উঠেছে অনেক
গাছের পাতা খসে নতুন পাতা গজিয়েছে বসন্ত শেষে
ভার্সাই চুক্তি, লিগ অব নেশনস্, গ্রেট ডিপ্রেসন
তারপর জনগণই তুলে দিয়েছিল পাথরের হাতে ক্ষমতা
এখন ওই গাছটার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে বলি
ক্ষমা করো হে বনস্পতি
ভুল তো আমরাও করলাম
এ কার হাতে ক্ষমতা তুলে দিলাম
এ ছাড়া বলার মতো কী আছে বলুন!
এক বন্ধু অধ্যাপক বলেছিলেন—
আপনি বড় বেইমান
যাদের সঙ্গে এতকাল থাকলেন তাদেরই বদনাম
পিপলস্ মুভমেন্ট শেষ হয় কোনোদিন
শেষ যে হয় না স্যার তার তো উদাহরণ অনেক
আসলে কী করে দেখাব বলুন
বনস্পতির ডানাগুলো জ্যোৎস্নায় মাটিতে নুয়ে পড়ে
এইসব দেখে আমি নিজেও ভয় পাই
ভয়তো আগেও পেয়েছি, যখন বন্ধুরা
আমার বুকের ওপর উঠে নেচেছিল
মাথা ফাটিয়ে ঘিলু খেতে খেতে হেসেছিল
তখন সবাই না দেখার ভান করেছে
ইদানীং অবসরের গান শুনতে ভালোবাসে লোলচর্ম গাছ
আর পাতাগুলো মৌটুসি হয়ে আকাশে উড়ে যাবে ভেবে
কাণ্ড, ডালপালারা রাত জেগে পাহারা দেয়।

জীবন-সন্ধানে

মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি, তোমার কলম ধরো শক্ত হাতে,
শিল্পী, তোমার তুলি ভেজাও আঁধার রাতে।
লেখক, তোমার লেখায় আসুক দেশের কথা
ঝল্‌সে উঠুক, বিশ্বে ছড়াক সেই বারতা।
রক্ত ঝরে গ্রাম শহরে—নৃশংসতায়—
স্বেচ্ছাচারী স্বৈরাচারীর বর্বরতায়।
সব-হারানো মা-বোন ভাসে অশ্রুধারায়
তুলি-কলম সেথায় যেন পথ খুঁজে পায়!
মুক্ত প্রাণে বেঁচে থাকার অধিকারে
করলে হরণ স্বৈরাচারী শেষ বিচারে।
জীবনবাদী—জীবন খোঁজো গ্রাম শহরে
শক্ত হাতে জিয়ন-কাঠি কলম ধরে!

আলবার্ট হল

পম্পা দাস কান্ত

এ শহরে
প্রথম আলাপেই নবাগতকে বলি
'আলবার্ট হল চেনো?' 'আর তার
চিকেন ওমলেট'?
অতঃপর
একটানে পৌঁছে দেওয়া সিঁড়িটার
মুখে... ঠিক যেন
প্রিয় সন্তানের প্রিয়তর মার্কশিট
তুলে ধরা, স্বজনের কাছে

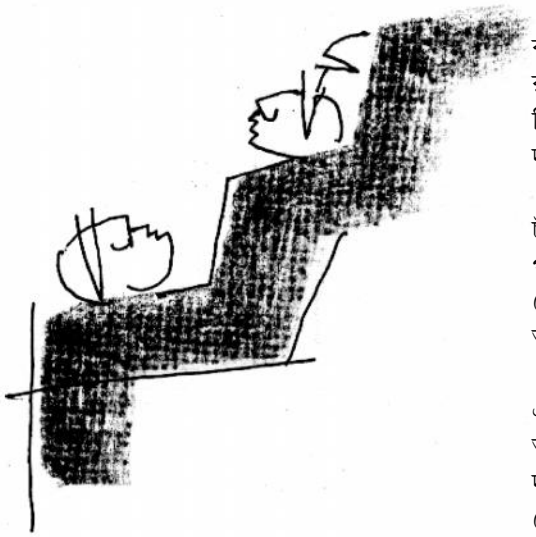

তখন
সারি সারি চারমিনার একতলায়
বুদ্ধির গোড়ায় বেশ খানিকটা
দম...
বিশ্বের যাবতীয় দেখা অ-দেখা বায়োস্কোপ
পড়া না-পড়া সাহিত্য
বোঝা না-বোঝা সংস্কৃতি দিয়ে মগজ
ঋদ্ধ করে
তৃপ্তির সিঁড়ি ভাঙা... একটার পর
একটা

ঢেউ
কথামালার অজস্র ঢেউ আছড়ে পড়ছে
দেয়াল থেকে দেয়ালে
কোথাও কোনো কৌতূহল নেই
টেবিল থেকে টেবিলে
নিজেরই গহিনে ডুবসাঁতার আর
সান্ধ্য বৃত্তে বুঁদ হয়ে থাকা

কখনো তিনতলায় উত্তরণ ঘটে গেলে
রেলিং-ঘেঁষা চেয়ারে বসে
ধোঁয়ার আবর্ত থেকে
স্বর্গচোখে মর্ত্যকে
দেখা...

ঢেউ-ঢেউ-ঢেউ গোনা, আবার
ঢেউ হয়েই মিলিয়ে যাওয়া
এক কাপ ফিউশনে
ঘণ্টার পর ঘণ্টা
আপামর তারুণ্যের চব্বিশ ক্যারেট
নিখাদ স্বাধীনতা

তখন আঠারো ছিল
আজ তবে কত?
মুচকি হেসে এক গ্লাস জল টেবিলে
নামিয়ে দিয়ে গেল
হয়তো চিনেছে, হয়তো নয়...
ডাকাডাকি না করলে ফিরেও তাকাবে না
আজও সে বাধা দেবে না আমার একান্ত
মনন-চরিতায়

এ শহর থেকে
উপড়ে ফেলেছি আমার শরীরসত্তাকে
কতদিন
কত সন্ধ্যা ছোঁয়নি এ হাত
এ চেয়ার, এ টেবিল, এই
কাপডিশ

এ আমার প্রিয়তম বেলাভূমি
প্রতিটি ঝিনুক বুকে মুক্তোর মতো
জ্বলজ্বল করছি আমি
হাজার কলরব ভিড়ে
এখনো তো বেজে চলে আমার
সিম্ফনি।

সবুজ বিপ্লব

বীথি চট্টোপাধ্যায়

বসন্তের গাছে সবুজ বিপ্লব
রাত্রে জ্বলে কতো ছোটো তারা,
কিছুই থাকবে না, শুধুই পড়ে পাওয়া
দু-তিনখানা ঘোর চুমু ছাড়া।

চাঁদনি রাত নামে, সঙ্গে প্রেম নিয়ে
পাবকশিখা হয়ে উঠেছে মন,
নেভাতে পারবে না, বাতাস সরে আসে
আমার ভেঙে পড়া এই জীবন।

একটু তাপ বাড়ে, আকাশ মাঠে মেশে
আকাশ আরো বেশি নীলাভ হয়,
দখিন হাওয়া নিয়ে রঙের কামকলা
কেউ তো পৃথিবীতে কারুর নয়।

কোথাও কিছু নেই, কয়েকদিন পর
সবাই যাবে সে তো জানা কথা,
কিন্তু প্রতিবার অবাক করে দেয়
একটি চুম্বন ব্যাকুলতা...

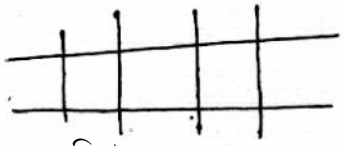

দুনিয়া

মারুত কাশ্যপ

আমার গল্প এখন নিজকে করি
ব্যস্ত দুনিয়া... এ দুনিয়া...
চরাচরে ফুল ফোটার আগেই
ফল ফোটাচ্ছে...
রূপকথা কবে যেন
মিসিং লিংক হয়ে দুলছে
চালের বাতায়!

মনের পাশে মন চাইতেই
এক-আকাশ কালো রং
নোনা জলে নামে
ছায়াজল...
ছলাৎ ঢেউ... হারিয়ে যায়...

আমার গল্প আমি নিজেকেই করি
আর দুনিয়ার কান্না নিয়ে
এ দুনিয়া—
স্মার্টফোনে রিংটোন বাজায়!

মুহূর্ত
রীনা কুণ্ডু

রাত শেষ হওয়ার আগে
যেতে হবে তোমায়।
মধ্যরাত খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়।
এযুগে মানুষ নিজের কথা বেশি ভাবে।
তাই তো প্রিয়ার বুক খালি করে
ভোর হওয়ার আগে
তুমি পালিয়ে যাও—
চামেলির সুবাস ছুঁয়ে আছে
তোমার শরীরে।
মধ্যরাতে জোয়ার এসেছিল
মন্দারমণির বুকে।

মোকামে
আবদুল রশীদ চৌধুরী

শ্বাস টানি, শ্বাস ফেলি
শ্বাস-প্রশ্বাসেই চলমান জীবন।
একটি নালার গঙ্গাযমুনা জল
কখন যে একসাথে মিশে যাবে—
বোধের অকল্পিত আধারে—
মহাঘুমের প্রাদুর্ভাব রহস্যে
মহাসাম্যের আদিগন্ত বিভু শান্তি
আমার চতুর্ভুজ অবয়বের অনেক উপরে
নীলিমায় নীল হয়ে রবে আঘল মোকামে।

সময়ের কথা
কানাইলাল বিশ্বাস

ধর্মচাষিরা পেয়েছে উর্বর মাটি,
রাজনীতির কারবারিরা গেড়েছে ঘাঁটি।
গড়ে উঠছে না শুধু মানুষের প্রতিরোধ,
সবখানেই শুধু নাটুকে প্রতিশোধ।
খুশিখুশি ভাব আর সুখীসুখী মন
কাব্যলিখিয়েরা সভায় সভায়
কাব্যকথা কন।

সাক্ষরতার স্বরলিপি
কাকু (প্রয়াত কমল গায়েন)

রোজ পড়ার গুণ কতটা
ওজন করা যায় না তা।
নিজে শিখে গ্রাম দেখা, নিজে জেনে দেশ দেখা—
নিজেকে ভাই যায় যে দেখা
সামনে ধরলে আয়নাটা।। রোজ...

বই আমার চোখের আয়না—
ভাবনা করা জীয়ন কাঠি—
ফেলে আসা দিনের কথা
বইয়ের পাতায় খুঁজি তা।। রোজ...

বই আমার চোখের আয়না স্বপ্ন দেখা আঁতুর ঘর—
গতর খাটা দেহ পুঁজি
ভাবনার পুঁজি বইএ খুঁজি
আর খুঁজি পৌষের বেলা
স্বপ্ন চোখে বুকের আশা।। রোজ...

হারিয়ে যে যায়
সৈয়দ মুশাররফ আজম

হারিয়ে যে যায় কুসুম কোমল হৃদয় ভরা মন,
হারিয়ে যে যায় উৎফুল্ল, মিশুক জনগণ।
হারিয়ে যে যায় গল্পগাথা, ঠাকুরমার ঝুলি,
শূন্যে উধাও কল্পনামন শিশুর মনের তুলি।

হারিয়ে যে যায় 'অভ্র'-'উপেন'-'সুকু', সুনির্মল,
হারিয়ে যে যায় 'যোগীন', 'অবন', ছড়ার শতদল।
হারিয়ে গেছে শিশুর হাসি আশমানি মেঘভেলা,
হারিয়ে গেছে কাশফুল আর পেঁজা তুলোর খেলা।

হারিয়ে যাবে হাতের লেখা, পোস্টকার্ড আর খাম—
হারিয়ে যাবে শিল্পছোঁয়া হাতের কাজের দাম।

সীমানাহীন

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

এই যে কিছু এড়িয়ে থাকা
কিছুটা পথ একলা আঁকা
সর্বজনীন নীরবতার
আকাশ জুড়ে হেমন্তিকা

এই যে পেছল রঙের বদল
একেই ঘিরে স্বপ্নকমল
আলপনা দাও, শস্য জাগাও
দু-হাত ভরে জীবনকথা

ছড়িয়ে দাও, সীমানাহীন
বিলিয়ে দাও, তুলনাহীন

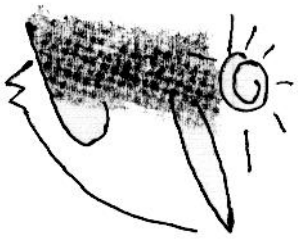

গারদ

গণেশ চৌধুরী

কোলকাতা অথবা বর্ধমানে রাস্তায় মিছিল
পদধ্বনি শোনা যায় দূর থেকে গারদে বসেও
আমরা কুর্নিশ করিনি শোষকদের গারদের দেওয়ালটাকে।

শিকাগোয় সেদিন অথবা প্যারিসের রাস্তায়
অথবা অক্টোবরের ধ্বনিতে শাণিত হাজার
নীল-সাদা দিয়ে ঢাকতে পারেনি রঞ্জিত স্বপ্নকে।

গারদের দেওয়ালগুলো নিতান্তই ভঙ্গুর,
ক্রান্তিকারীদের চেতনার সামনে
তাই, হাঁটু গেড়ে বসছে ওরাই।

অন্ধ বাউলের আওয়াজ থামেনি,
আঠারো বছরের তরুণ ভল্ট দিয়ে লাফায় গারদের মাঠে
একটা বোবা কান্না, নৈঃশব্দের প্রতিবাদ অপ্রতিরোধ্য।

গারদের আনাচে কানাচে গুঞ্জন ধ্বনি প্রতিদিন,
একজন, দশজন একশোজন আবার ওরা অনেকে
দগ্ধ, গলিত, ঘুনেধরা সমাজটার নির্মম যন্ত্রণা।

আসলে শোষণের গোটা সমাজটাই গারদখানা
তাই, কৃষকের লাঙলের বাঁটে ও ফলায়
এবং মজুরের হাতুড়ি-ছেনির শব্দে নতুন কাব্য লেখা হয়

ওদের সকলেরই অনেক অনেক স্বপ্ন আছে চারদেওয়ালের বাইরে
ওরা সবাই তাই মুক্তি চায়। মিলতে চায় আর জগতের সাথে
কিন্তু, প্রশ্ন একটাই, কবে কীভাবে? তারই আয়োজন দিকে দিকে।

(বর্ধমান জেলখানায় ৮.৮.২০১৪ তারিখে লেখা)

কোনোদিকে তাকাব না আর

উৎপল সাহা

কোনো দিকে তাকাব না আর
দিকগুলো এবার আমাকে দেখুক
না, কোনো গভীর বিষয় আমি তরল করছি না
আলো তো নিজেই হাজারো অন্ধকার
আমি সচক্ষে দেখেছি
শ্রদ্ধেয় মানুষ পাক্কা শয়তান হয়ে উঠল
একটু হলেও আমি কেঁদেছি
মুক্তিদাতার হাতেই দেখেছি লুকোনো খাঁচা
ঘর আলো করা সেই কবেকার আহত, রক্তাক্ত ডানার স্তূপ
আমি অন্তহীন কাঁদি, বলি
হাটেবাজারে সবার হাঁড়িই তো লাথিয়ে ভাঙা দেখেছি
নির্বাসনের গল্প তোমরা শুনিও না
পাসপোর্ট, ভিসা, খুনিদের কাছেই হাত পাতা
একা মানুষ হতেই পারে ভয়াবহ বীজব্রহ্ম
সুদিন আসবে না এবং লড়াই মিথ্যে হবেই
এসব জেনেই বলছি
এ শহরেই থাকব
আদ্যিকালের লাঠিটাই ঘোরাব বারবার
কোনোদিকে তাকাব না আর

হ্যালো টেস্টিং

পলাশ দে

শত্রু ফুরিয়ে যাচ্ছে ও বিজ্ঞাপন

একটা মেহেন্দি গাছ লাগাও

চান করাই আমি খিদে দিই মুখে মুখে একার সহ্য
না ভেঙে গলা মেলাই হ্যালো টেস্টিং

যতবার রং করবে আর বসবে মেলা
হারিয়ে যাওয়ার আগে অন্তত অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে যেও

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

আই.পি.জেড কনস্ট্রাকশন

প্রো : সেখ ইমামউদ্দিন

এই প্রথম আই.পি.জেড. কনস্ট্রাকশন বর্ধমানের ওড়গ্রামে গড়ে তুলছে ১০/৫ ইঞ্চি সাইজের ফ্লাই-অ্যাশ ইট তৈরির কারখানা যেটি সাধারণ ইটের তুলনায় বেশি শক্তিশালী, কম সিমেন্ট খরচ করে মজবুত গাঁথনি ও প্লাস্টারের উপযুক্ত। এর জন্য আলাদাভাবে কোনো কৃষিভূমি নষ্ট করে মাটির প্রয়োজন হয় না কারণ এতে আছে ফ্লাই-অ্যাশ—যেটা বিভিন্ন থার্মাল পাওয়ার স্টেশন থেকে আমদানি করা সম্ভব। সম্ভবত ২০১৫-র ডিসেম্বর থেকে এর উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে।

যোগাযোগ
ওড়গ্রাম সাবান ফ্যাক্টরির নিকট
গ্রাম ও পোঃ ওড়গ্রাম, জেলা : বর্ধমান-৭১৩১২৮
ফোন : ৯৪৩৪৩১২৮৯৬

Sl. No. 37

With Best Compliments of

ST. STEPHENS MODEL SCHOOL

Station More, Ukhra, Phone : 9475670890

SOUTH INDIAN BRANDED ENGLISH MEDIUM SCHOOL

সাউথ ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

সাউথ ইন্ডিয়ন ব্রান্ডেড ইংগলিশ মিডিয়ম স্কূল

Sl. No. 28

বর্ধমান শহরে ব্রাহ্মসমাজ

সর্বজিৎ যশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে একদিকে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রকট হিন্দুবিদ্বেষ, ভারতীয় ধর্ম ও সমাজজীবনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই কুপ্রথা দূর না করলে হিন্দুসমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হত। হিন্দুসমাজকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। রামমোহন ধর্মীয় সংস্কার ও মূর্তি পূজার পরিবর্তে বেদান্তের ওপর ভিত্তি করে একেশ্বরবাদী ধর্মের পুনরুজ্জীবন সাধনা করতে এগিয়ে এলেন। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে উপনিষদকে ভিত্তি করে রামমোহন ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামক একেশ্বরবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। উপনিষদকে ভিত্তি করে 'সংস্কৃত' হিন্দুধর্মই হল ব্রাহ্মধর্ম, যার মূল মন্ত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা—'সর্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম'। দলে দলে দেশের শিক্ষিত প্রগতিবাদী মানুষ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বগত পরিবর্তন সাধন করে ব্রাহ্ম ধর্মকে শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি না করে উপাসনা ও হৃদয়ের উদারতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন।[১] রামমোহনের সঙ্গে বর্ধমান রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও তখন তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম উদ্ভাবন করেননি। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় বিষ্ণু কুমারী (বিষণ কুমারী)-র খাস দেওয়ান ছিলেন। জাল প্রতাপ মামলায় প্রতাপের বিধবাদের পক্ষে বড় খুঁটি ছিলেন রামমোহন। কিন্তু তাঁর দ্বারা বর্ধমানরাজ ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে আসেননি।[২]

শহর বর্ধমানে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা

শহর বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। তৎকালীন বর্ধমান শহর এবং কালনায় ব্রাহ্ম ধর্মের বেশ প্রভাব পড়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অন্যতম শিষ্য তৎকালীন বর্ধমান রাজ মহতাব চন্দ্-এর সহায়তায় বর্ধমান শহর ও কালনা শহরে ব্রাহ্ম সমাজপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩] প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে দামোদর বক্ষে বজরা নিয়ে রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গী করে প্রথমবার বর্ধমানে এসেছিলেন ব্রাহ্ম নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৪] পরবর্তীকালে একাধিকবার তিনি বর্ধমানে এসেছিলেন। তৎকালীন বর্ধমানরাজ মহতাব্ চন্দ্-এর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। ১৮৫৫ খিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মহারাজের অতিথি হয়ে পুনরায় বর্ধমানে আসেন। মহারাজের রাজবাড়ির অতিথিশালা উইলবাড়িতে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা হয়। মহারাজ মহর্ষির আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হতে দেননি। সেই বছরই বর্ধমানে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়।[৫] মহতাব চন্দ্ তাঁর কথাবার্তা, ব্যবহার, শাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করেন, দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও নির্দেশে রাজবাড়িতে শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ তর্কবাগীশ ও তারকনাথ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজবাড়ির বৈঠকখানার পাশে ছিল ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, যার ঝাড় লণ্ঠন মেঝে পর্যন্ত ছিল লাল রঙের![৬]

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদের ওপর নানারকম অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিল। এ তথ্য জানা যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা সংগ্রহ ২য় খণ্ড থেকে। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখের সংবাদে জানা যায় কৃষ্ণনগর কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের প্রধান শিক্ষক বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়ে বর্ধমানে আসেন। বর্ধমানের সরকারি বিদ্যালয় ছিল তখন 'Burdwan School'।শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন—'১৮৫১ সালের মার্চ্চ মাসে বদলীর প্রার্থনা করিয়া তিনি বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া যান। পরবর্ত্তী এপ্রেল মাসে দেড়শত টাকা বেতনে হেডমাষ্টার হইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। তাঁহার প্রিয় বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক তখন বর্দ্ধমানে ডেপুটী কালেক্টারী কাজ করিতেছিলেন, তাঁহাও তাঁহার বর্দ্ধমান বদলী হইবার অন্যতম কারণ হইয়া থাকিবে।"[৭] তিনি আরও লিখেছেন—'১৮৫১ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমান গেলেন বটে কিন্তু সেখানেও বহুদিন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর উপবীত পরিত্যাগের গোলযোগ উপস্থিত হইল।[৮] ...হিন্দুসমাজের লোক দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল। দাসদাসীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নবকুমার তখন শিশু, পূর্বে চৈত্র মাসে কলিকাতা শহরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই শিশুপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কার্যনির্বাহের ভার তাঁহার বালিকাবধূর উপর পড়িয়া গেল। যিনি অপরের ক্লেশ দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? তিনি জল বহা, কাষ্ঠ কাটা, বাজার করা প্রভৃতি ভৃত্যের সমুদয় কার্য নিজেই নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের নির্যাতনের সমুদয় ভার বিশেষভাবে তাঁর পত্নীর উপর পড়িত। পাড়ার অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের অবজ্ঞাসূচক বাক্যের ও আত্মীয়স্বজনের আর্তনাদে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাঁর মনস্তাপ দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুব্ধ চিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।"[৯] ...''বর্ধমানের আন্দোলন বশতঃই হউক অথবা শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্ত বশতঃই হউক এক বৎসরের অধিককাল তিনি বর্ধমানে থাকেন না। ১৮৫২ খ্রিঃ তিনি উত্তরপাড়ার ইংরাজী স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া আসিলেন।"[১০] রক্ষণশীল হিন্দুদের এরূপ অত্যাচারে ব্রাহ্ম আন্দোলন বর্ধমানে ভিত্তি স্থাপনের শুরুতেই বেশ ধাক্কা খায়।

শহর বর্ধমানে ব্রাহ্ম মন্দির ও ব্রাহ্ম বিদ্যালয়

পরবর্তীকালে ষাঁড়খানাগলি বা নবাবদোস্ত কায়েম লেনে একটি ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বাধীনতা আন্দোলনকালে এটি একটি বিপ্লবের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। ঐ মন্দিরের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১১] ব্রাহ্ম মন্দিরের কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার না থাকলেও এখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের গুপ্ত সমিতির সভ্যদের পঠন-পাঠনের বই থাকতো। সবার জন্য এই গ্রন্থাগার ছিল খোলা, তবে বই সংরক্ষণ বেশি হত না। কেউ বই ফেরৎ দিত, কেউ বা দিত না। বইয়ের স্টক রাখাটা বড় কাজ নয়, এগুলোর আসল উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনে বিদ্রোহের আগুন ছড়ানো। আদি ব্রাহ্ম সমাজের এটি একটি উপাসনা মন্দির ছিল; মন্দিরের সম্মুখে আচার্যের একটা বেদী ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী জগদীশ ঘোষ এক সময় এঁর আচার্য ছিলেন। 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়' গ্রন্থের লেখক শ্রীফকিরচন্দ্র রায় মহাশয় এখানে কিছুদিন ছিলেন। এই ব্রাহ্ম মন্দিরের অস্তিত্ব আর নেই, মন্দিরটি ঠাকুর বাড়ির সম্পত্তি ছিল, এটা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে বিক্রি হয়ে যায়। তার সব কিছুই আজ অবলুপ্ত। তবুও জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস এই ব্রাহ্ম মন্দিরকে স্মরণ করবে। রাজ পাবলিক লাইব্রেরির কাছেই এটা উপস্থিত ছিল। স্বদেশি আড্ডার বড় ঘাঁটি ছিল এটা।'[১২] বর্ধমান রাজস্কুলের জনৈক প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রাহ্ম। মন্দির তত্ত্বাবধান করতেন ব্রাহ্ম কুমার নাথ মুখোপাধ্যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে উইলবাড়িতে 'ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল' বা 'ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়' গড়ে উঠেছিল। কথিত আছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাহ্ম ভগবানচন্দ্র বসুর পুত্র জগদীশচন্দ্র বসু শৈশবে কিছুদিন ঐ স্কুলে পড়েন।[১৩] কিন্তু স্কুলের ক্যালেন্ডারের কোথাও ব্রাহ্মসমাজ বয়েজ বিদ্যালয়ের নাম নেই বা জগদীশচন্দ্রে ভর্তিরও কোনো রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। বস্তুত ব্রাহ্ম বয়েজ হাইস্কুল ১৮৫৫ থেকে ১৮৮২ খ্রিঃ পর্যন্ত চলেছিল, তবে ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা বরাবরই পরীক্ষা দিয়েছিল 'বর্ধমান ইংলিশ স্কুল' এই নামের ছাত্র হিসাবে। ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলটি পরবর্তীকালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সাথে মিশে যায়।[১৪]

মহারাজ মহতাব্ চন্দ-এর পৃষ্ঠপোষকতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে মহারাজ মহতাব্ চন্দ্ এতটাই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন যে, রমনার বাগানে ব্রাহ্ম আশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনাও নেন। মহর্ষিও মাঝে মাঝে বর্ধমানে এসে রমনার বাগানে উপাসনা করতেন। বিনয় ঘোষ মহাশয়ের 'সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র (১৮৪০-১৯০৫) প্রথম খণ্ড' সংবাদ প্রভাকর-এর ২৪ আষাঢ় ১২৪৮ (জুলাই ১৮৫১) তারিখের এক সংবাদে জানা যায় 'বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার কন্যা ও ভ্রাতৃকন্যাকে বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করায় আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্ধমানের মহারাজা ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সংবাদ থেকেও বর্ধমান-রাজের ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের কথা সমর্থিত হয়। ব্রাহ্ম-আশ্রমের এক স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় ১৩২২ খ্রিঃ আশ্রমটির সংস্কার সাধন করে নব কলেবর দান করা হয়। সে সময় বর্ধমানে কতজন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।[১৫]

মহতাব্ চন্দ্ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহম করার পর একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত সংকলন করেন। উক্ত ব্রাহ্মসঙ্গীত সংকলনের আখ্যাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ—''একমেবাদ্বিতীয়ং / এই ব্রহ্মসঙ্গীত / শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানেশ্বর মহারাজাধিরাজ / মহাতাব চন্দ বাহাদুরের ব্যয়ে সত্যসন্ধ্যায়িনী সভা হইতে / বিতরণার্থে বর্দ্ধমান / খাস প্রেসে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত হইল''। এতে মহতাব রচিত ১১খানি ব্রহ্মসঙ্গীত সংকলিত আছে। মহারাজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের নাম রেখেছিলেন 'সত্যসন্ধ্যায়িনী সভা' আর তাঁর ছাপাখানার নাম দিয়েছিলেন 'সত্য প্রকাশ যন্ত্র'। মহতাব্ চন্দ্-এর অনুপ্রেরণায় অনেক রাজকর্মচারী ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খোসবাগান অঞ্চলের বিখ্যাত কাইগ্রামের বসু পরিবারে বিনোদবিহারী বসু, নিত্যবালা বসু ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী বসু বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন। শেষ জীবনে অবশ্য মহতাব্ চন্দ্-এর ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়ে।[১৬]

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে বিজয় চন্দ্ মহতাব্-এর দৃষ্টিভঙ্গী

১৯০৪ খ্রিঃ জুলাই মাসে বিজয় চন্দ্ মহতাব্ 'Study' শিরোনামে তাঁর স্বলিখিত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির মোট ১৩টি পরিচ্ছদ। তৃতীয় পরিচ্ছদটির নাম হল—'The Brahmos of Bengal' এই পরিচ্ছদটির কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করছি—

> ...In the beginning of the British Rule in India, about 1820 A.D. Rammohan Ray, who should always be remembered with respect by all true friends of Bengal, and who afterwards became a Raja and died at Brighton in England, in A.D. 1833, saw the evil the missionaries had been doing in Bengal (or rather India) by converting ignorant people to Christianity by means that were not always straightforward and worthy of the followers of Christ. It was to thwart these missionaries that the great Rammohan thought and planned out a religion which was called Brahmoism.
>
> Rammohan being a good Hindu had no intention of denouncing Christianity, for, like all true believers in the one Universal religion of Good, he saw true Hinduism in the pure, simple, yet grand teachings of the Prophet of Nazareth. But as a real well-wisher of his country he saw the evil that Christianity would bring upon the masses, who were wholly ignorant of the true religion of Vedas and pitiful idolaters, and, sweating under the dead weight of ceremonies which were meaningless to them, betook themselves to Christianity, not indeed for its vivifying teachings, but simply to escape from an oppressive ritualism, and to enjoy all the different comforts of the Western world.
>
> ...The Brahmos will do well to consider whether or not it is wise to bring up their women entirely in the Western style. It is true that we have many things to learn, to borrow, and to imitate from the Western people, but are we to discard our good institutions along with the bad? The East can never be the West, and it is prudent to remember that what is one man's meat is another man's poison.
>
> The present purdah system most certainly wants pruning and trimming. There is no

> reason why the Brahmo ladies should not move about freely like their Western sisters. Let them drive out with their husbands occasionally to enjoy fresh air or to see interesting sights, etc.; but they should not become entirely Europeanised, nor be ashamed to talk in their mother tongue lest they be thought illiterate.[১৭]

এই লেখনীর মাধ্যমে পশ্চিমি সভ্যতার প্রতি তাঁর অনাস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, একজনের কাছে যা খাদ্য, অন্যের কাছে তা বিষ হতে পারে। তিনি পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করেছেন, আবার বলেছেন, ব্রাহ্মদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের খোলাখুলি না মেশার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে, তিনি যখন এই সকল বক্তব্য লিখছেন, তখন বর্ধমান শহরে ব্রাহ্মরা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ছে।

ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'বর্ধমান সঞ্জীবনী' প্রকাশ ও তার কাজকর্ম

ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে বর্ধমান থেকে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত সেটি হল 'বর্ধমান সঞ্জীবনী'। ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব সংবাদ এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত রচনা নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। পৃষ্ঠা সংখ্যা বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও এটা জানা যায় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উৎসাহে ১৮৭৮-তে প্রকাশিত হয়েছিল 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী',[১৮] সম্ভবত ১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি সবগুলিই ছিল স্বল্প আয়ুর। ব্যতিক্রম মাত্র দুটি। তার একটি এই 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' এবং অন্যটি হল 'পল্লিবাসী'। 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' প্রকাশের প্রায় পাঁচ বছর পর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-র সম্পাদক ছিলেন যোগেশচন্দ্র সরকার, তবে 'বর্ধমান সংস্কৃতি সম্মেলন'-এর একটি বিশেষ পুস্তিকায় কেদারনাথ হাজরা চৌধুরী লিখেছিলেন—''বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী-ই একমাত্র সাপ্তাহিক পত্র। স্বর্গগত অম্বিকাচরণ সরকার মহাশয় এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক। এই পত্রিকা সরকারের সঙ্গে তাল রেখে চলত বলে লোকের চাহিদা মিটত না।

'চিত্রং সঞ্জীবনী মাপি নির্জীবনী ভবেৎক্বচিৎ
বর্দ্ধমানে যথা সঞ্জীবনী নির্জীবনা ধ্রুবম্।।'

একমাত্র এখানেই পাচ্ছি অম্বিকাচরণ সরকার ছিলেন 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-র প্রথম সম্পাদক। তবে এই তথ্যের সূত্র সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র সরকারের নামই প্রথম 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-র সম্পাদক হিসেবে পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র' প্রথম খণ্ডে। সরকার পরিবারের বংশধর বর্ধমান নিবাসী ডা. কিরণশঙ্কর সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই যে, যোগেশচন্দ্র সরকার ছিলেন 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-র প্রথম সম্পাদক এবং প্রবোধচন্দ্র সরকার-এর শেষ সম্পাদক।[১৯]

প্রথম দিকে 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-তে সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হত, পরে পত্রিকাটি প্রধানত ব্রাহ্ম মত প্রচারে ব্রতী হয়।[২০] তবে 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' তার দীর্ঘ জীবৎকালে শুধুমাত্র ব্রাহ্ম মতই প্রচার করত না, তবে প্রকৃতিগতও যে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল সেটা জানা যায় অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' সম্পর্কে সমালোচনা থেকে। কালনা থেকে প্রকাশিত 'পল্লীবাসী'-র ১১ জানুয়ারি ১৮৯৯ সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে—

> সহযোগিনী বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী পল্লীবাসীর অগ্রজা। ... জেলার বুকের মধ্যে কার্য্যালয়, সংবাদ সন্ধান পাইবার সম্পূর্ণ সুযোগ। সম্পাদক একজন উকীল, প্রকাশ্য আদালত তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র, হেলায় শ্রদ্ধায় জেলার জজ ম্যাজিস্ট্রেটগণের কার্য্যকলাপ তাঁর জ্ঞানগোচর হয়। এজন্য আমরা তাঁহার মুখে সর্ব্বদা সত্য সংবাদ ও সঙ্গত কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সহযোগিনী কিন্তু সর্বপ্রকার সহায় ও সুবিধা সত্ত্বেও তাহা করেন না।... অগ্রে মনে করিতাম সহযোগিনী পরমহংস, সকলের দোষভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল গুণেরই আলোচনা করিয়া থাকেন, কোথায় কোন্ কনষ্টেবল একটু দুধের জন্য কোন গোয়ালিনীর সহিত একটু অন্যায় করিয়াছে, কোথায় বাঙ্গালা হাকিম হরিশবাবু কোন আইনের পলাতক আসামীর ৫০ টাকা অর্থ-দণ্ড করিয়াছেন; তাহা তিনি বেশ দেখিতে পান।... বারংবার এইরূপ হইলে, নরমের যম, গরমের গোলাম হইলে লোক তাঁহাকে বকধার্ম্মিক মনে করিবে, সহযোগিনী এগুলি পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।"[২১]

পল্লীবাসীর এই সংবাদ থেকে দুটি তথ্য আমরা জানতে পারি—এক, 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-র সম্পাদক পেশায় ছিলেন উকিল এবং দ্বিতীয় তথ্যটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ—পত্রিকাটি তার মূল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজ থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছিল।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সেকথা জানা যায় রাখালদাস মুখোপাধ্যায় 'বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত' শীর্ষক গ্রন্থের উপসংহারে। সেখানে লেখক উল্লেখ করেছেন—''যে সময়ে বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী প্রেসে মুদ্রিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল, নিয়মিতরূপে কার্য্য হইলে ৭/৮ বৎসর পূর্ব্বেই ইহা মুদ্রিত হইয়া পুরাতন পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হইত। সঞ্জীবনী প্রেসের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষরূপ হৃদ্যতা থাকায়, তাঁহার অনুরোধেই পুস্তকখানি সঞ্জীবনী প্রেসে মুদ্রিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল। কয়েক ফর্ম্মা মুদ্রিত হইবার পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তৎপরেই প্রেসের নানা প্রকার গোলযোগে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইতে এতাধিক কাল বিলম্ব ঘটিয়াছে। ঈদৃশ বিরক্তিজনক কালবিলম্বে অতিশয় বিরক্ত হইয়াও চক্ষুঃ লজ্জা বশতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইয়া, অন্যত্র মুদ্রিত করিতে পারি নাই। ১৯০২ খ্রি. অক্টোবর মাসে পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে দেওয়া হয়, তাহার পর হইতে এ পর্যন্ত যে সকল রাজপারিবারিক ঘটনাসমূহ সংঘটন হইয়াছে, তাহাই এই উপসংহারে লিপিবদ্ধ করা হইল।"[২২] এ থেকেই বোঝা যায় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্ধমান সঞ্জীবনী প্রেসের কাজকর্ম অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল।

বস্তুত, 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-র প্রকাশ নির্ভর করত নিলাম ইস্তাহারের ওপর। শুধু 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-ই নয়, সেই সময়কার বহু পত্রিকাতেই নিলাম ইস্তাহার প্রকাশ করতে দেখা যেত। মুন্সেফি আদালত থেকে জমির নিলাম করার জন্য ডিক্রি জারি করে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত তারই ওপর নির্ভরশীল ছিল 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'। কিন্তু ১৯২৭ খ্রি. 'বর্দ্ধমান বাণী' সাপ্তাহিক নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন সেই সময়কার বর্ধমানের পাবলিক প্রসিকিউটার নাজিরুদ্দিন আহম্মদ। তিনি 'বর্দ্ধমান বাণী'র জন্য নিলাম ইস্তাহার সংগ্রহ করতে শুরু করলে 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' নিলাম ইস্তাহার থেকে বঞ্চিত হয় এবং আর্থিক সংকটে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[২৩] নিলাম ইস্তাহার সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী'-কে যে অনেক পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল,

সেটা জানা যায় ১৯২৭-এ প্রকাশিত 'বর্দ্ধমান বাণী'র ২০ মে সংখ্যার পঞ্চম পৃষ্ঠায় একটি সংবাদের প্রতি নজর দিলে। সংবাদটি হল —

> শক্তির ধৈর্য্যচ্যুতি—অনেক তর্ক করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে বলিবার কিছু না পাইলে রাগিয়া উঠে, কেহ কেহ গালাগালি পর্যন্ত করিয়া জয়লাভের চেষ্টা দেখে। জনৈক প্রবীণ ও দূরদর্শী লেখক 'শক্তি'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান গ্রহণ করিয়া সম্পাদকের আড়ালে থাকিয়া অনেক বাক্য বর্ষণ করিয়াছেন। লেখক অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু আসল কথাটা এই যে 'সঞ্জীবনী' অনেক ক্ষেত্রে 'নীলামের পর' নীলামের বিজ্ঞাপন গ্রাহক ও দেনাদারগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। কয়েক শত ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যাপার হইয়াছে...আমরা 'শক্তি'-র সহিত সম্পর্কে আসিয়া জানিতে পারিয়াছি যে ইতিপূর্ব্বে নীলাম ইস্তাহারগুলি 'শক্তি'-তে পাইবার জন্য 'শক্তি'র তরফ হইতে তদবীর হইয়াছে। অকৃতকার্য হইয়া বর্তমানে 'সঞ্জীবনী'র উপর 'শক্তি'র হঠাৎ সহানুভূতি হওয়া বিচিত্র নহে। তেমনি অস্বাভাবিকও নহে।[২৪]

'বর্দ্ধমান বাণী'র এই সংবাদ থেকে বোঝা যায় যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' প্রকাশিত হয়েছিল এবং আর্থিক সংকটই পত্রিকাটি বনধ হবার কারণ।

বর্ধমান শহরে ব্রাহ্ম সমাজের অবলুপ্তি

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তীকালে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কোনো তথ্য আমি আজ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারিনি। এর পরবর্তীকালে বর্ধমান শহরে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মানুষজন ছিলেন কিনা তা জানার উপায় নেই। যদিও বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় আজও ব্রহ্মসমাজের সদস্যরা রয়েছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সোমনাথ রায় মহাশয়ের ঠাকুরদা ছিলেন ব্রাহ্ম রসিকলাল রায়। তিনি ছাপড়া স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান মহারাজ কর্তৃক আহূত 'অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে' যোগদান করেছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি 'সিতাভোগ সম্মেলন' শীর্ষক একটি রচনাও প্রকাশ করেন। রসিকলালবাবুর পুত্র সুধীন্দ্রনাথ রায় যৌবন পর্যন্ত ব্রাহ্ম রীতি পালন করেন, কিন্তু সোমনাথবাবু ব্রাহ্মরীতি পালন করেননি। তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রিডার পদে যোগদান করেন। তিনি নিজস্ব আগ্রহবশত ঠাকুরদার কাছে শোনা বর্ধমানের কিছু ব্রাহ্ম পরিবার ও ব্যক্তির খোঁজখবর নিতে গিয়ে হতাশ হন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যের খোঁজ করেন, কিন্তু তিনি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একজনেরও খোঁজ পাননি।[২৫]

বর্ধমান শহর থেকে ব্রাহ্ম সমাজ এভাবে লুপ্ত হয়ে যাবার কারণ কী? আমার মনে হয় প্রথমত, এর পিছনে যে কারণটি দায়ি ছিল তা হল বর্ধমান শহরে ব্রাহ্ম সমাজ মূলত রাজ পরিবারে আবদ্ধ ছিল, এবং তা ছিল 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। এর প্রাণপুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবার এবং বর্ধমান রাজপরিবার দুইই পরবর্তীকালে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। ফলে বর্ধমানে তার ভিত শক্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত, ষাঁড়খানাগলিতে যে ব্রাহ্মসমাজ বাটী তৈরি হয় তা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুপ্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়, এখানে মাঝে মাঝে পুলিশি টহলদারি চলত বলে জানা যায়। ফলে ধীরে ধীরে সেখানে সাধারণ মানুষের গতায়াত কমে যায়। তৃতীয়ত, ব্রাহ্মসমাজের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল 'ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল' নামে, পরবর্তীকালে তা বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সাথে মিশে যাওয়ায়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগাযোগের আরও একটি মাধ্যম বন্ধ হয়ে যায়। সবশেষে একথাও মনে রাখা দরকার যে বর্ধমান শহরে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' কোনো শাখা খোলেনি, যদিও 'আব্দুল গনিখান'[২৬] লিখেছেন—''১৮৬০ সালে বর্ধমানে স্থাপিত হয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।'' কিন্তু এটি ঐতিহাসিকভাবে ভুল বক্তব্য, কারণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫ মে, তাই ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান শহরে শাখা খোলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হত, হয়ত ব্রাহ্ম সমাজ বর্ধমানে আরও কিছুকাল তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হত।

তথ্যসূত্র

১. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ১৬১-৬৮
২. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি, *বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫৩
৩. দত্ত, রতনলাল, 'ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ : পটভূমি বর্ধমান', *শারদীয় মুক্তবাংলা*, ২০০৫, পৃ. ১০
৪. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *বর্ধিষ্ণু বর্ধমান*, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৭
৫. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
৬. দত্ত, রতনলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১১১
৮. তদেব, পৃ. ১১৬
৯. তদেব, পৃ. ১১৭
১০. তদেব
১১. দত্ত, রতনলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১২. চৌধুরী, সুবলচন্দ্র, 'বিধিবদ্ধ শিক্ষার বাইরে বর্ধমানের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কয়েকটি গ্রন্থাগার', *নির্বাচিত অভিযান*, প্রথম খণ্ড, বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী, ২০০৬, পৃ. ৪০-৪১
১৩. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
১৪. দত্ত, রতনলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
১৫. চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-৫৪
১৬. দত্ত, রতনলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১
১৭. চ্যাটার্জি, মিতা, *বর্ধমান রাজপরিবারের সংস্কৃতি চর্চা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, পৃ. ৮৭-৮৮
১৮. কোঙার, ড. গোপীনাথ (সম্পাদক ও সংকলক), *পত্র-পত্রিকা পরিচিতি : বর্ধমান*, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৯৪
১৯. মুখোপাধ্যায়, কবিতা, *বর্ধমানের সাময়িক পত্র : মননের দর্পণ*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ২১-২২
২০. দেবশর্মা, বলাই, *বর্ধমানের ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ, বর্ধমান, ১৩৫৫, পৃ. ৭৯
২১. *পল্লীবাসী*, ১১ জানুয়ারি, ১৮৯৯
২২. মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস, *বর্দ্ধমান রাজবংশানুচরিত*, বর্ধমান, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, উপসংহার-১
২৩. তা, দাশরথি, *সাংবাদিকতায় বর্ধমানের অবদান*, নির্বাচিত অভিযান, প্রথম খণ্ড, বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী ২০০৬, পৃ. ১৮-২৩
২৪. মুখোপাধ্যায়, কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২৫. ড. সোমনাথ রায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১ জুন, ২০০৮, কাজিরহাট, বর্ধমান
২৬. খান, আব্দুল গণি, *বর্ধমান রাজ*, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৮

বর্ধমান জেলার প্রাচীনতম সাপ্তাহিক ‘পল্লীবাসী’

রতনলাল দত্ত

ভারতে প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হল জেমস অগস্টাস হিকির ‘বেঙ্গল গেজেট’ (১৭৮০)। তবেসেটি ছিল ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত। প্রথম বাংলা ভাষায় ভারতীয় তথা বাঙালি সম্পাদক দ্বারা প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা হল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে শুক্রবার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ‘বাঙ্গাল গেজেটি’। অংশীদার হরচন্দ্র রায়ের সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কম্পোজিটর বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী বহরা গ্রাম নিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য পত্রিকাটি প্রকাশ করতে থাকেন। কিছুদিন বাদে দু-জনার মধ্যে মনান্তর ও মতান্তর ঘটায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের ‘বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস’ নামক ছাপাখানাটি গঙ্গাকিশোর নিজ গ্রাম বহরায় নিয়ে আসেন এবং এখান থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ‘বাঙ্গাল গেজেটি’র কোনো মুদ্রিত কপির হদিশ না পাওয়ায় বেঙ্গল গেজেটি প্রকাশের ৯দিন পরে প্রকাশিত শ্রীরামপুরের মিশনারি জোসুয়া মার্সম্যান সম্পাদিত ‘সমাচার দর্পণ’কেই প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বলে অধিকাংশ গবেষক ও ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শ্রীরামপুর কলেজে কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত পত্রিকাটির ফটোকপি দেখার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছে। দেখিয়েছেন তৎকালীন লাইব্রেরিয়ান ও কেরী বিশেষজ্ঞ বর্তমানে প্রয়াত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

বর্তমান বর্ধমান তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও প্রচলিত সংবাদ সাপ্তাহিকটি হল বর্ধমান জেলার কালনা শহর থেকে প্রকাশিত ‘পল্লীবাসী’, যোগীন বসুমল্লিকের আর্থিক আনুকূল্যে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রথমে পত্রিকাটি ছিল পাক্ষিক। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। ‘পল্লীবাসী’র প্রথম প্রকাশকাল নিয়ে মতান্তর দেখা যায়। কোথাও ১৮৯৭, কোথাও ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ‘বর্ধমানের সাপ্তাহিক পত্র : মননের দর্পণে’ গ্রন্থের লেখিকা কবিতা মুখোপাধ্যায় এবং প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—‘পল্লীবাসী’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল, বুধবার। পত্রিকাটির সম্পাদনায় ছিলেন শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পরম বৈষ্ণব, সাহিত্য রসজ্ঞ, সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সুদর্শন চেহারা, দৈহিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য বলা হত বর্ধমানের ইন্দ্রসভার ‘কার্তিক ঠাকুর’। পল্লীবাসী-তে প্রকাশিত একটি রচনাকে কেন্দ্র করে কালনায় গোস্বামীদের সঙ্গে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে কালনা আসেন এবং শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এখানেই থেকে যান। প্রসঙ্গক্রমে পল্লীবাসীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শশীভূষণের সাহিত্যকর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।

PALLIBASI Pin—713409 Regd No. R N 2673/57, WB/BDN—61

৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

পল্লীবাসী

বর্দ্ধমান জেলার প্রাচীনতম জাতীয় সাপ্তাহিক

প্রাক্তন সম্পাদক—পণ্ডিত ৺গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ [নমঃ ১২ পঃ বার্ষিক ১৫টাকা

সম্পাদক—শ্রীঅমলেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৯ বর্ষ] কালনা, ৮ই মাঘ বুধবার '৯২ ইং ২২শে জানুয়ারি ৮৬ [৪০ সংখ্যা

তিনি ‘ধর্মপরিচয়’ ও ‘নামমহিমা’ নামে দুটি বই লেখেন। সম্পাদনা করেন ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর সাহায্যে দেনুড় বৃন্দাবন ঠাকুরের পাঠবাড়ি থেকে চৈতন্যভাগবতের অন্তলীলার শেষ তিন অধ্যায়ের হস্তলিখিত পুথি উদ্ধার করে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। আবার ফিরে আসছি ‘পল্লীবাসী’ প্রসঙ্গে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আমলে ‘পল্লীবাসী’র সাইজ ছিল ডবল ক্রাউন। উপরে সচিত্র দেবী সরস্বতীর ব্লক মুদ্রিত থাকত। ১৯১৬-এর শেষের দিক থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র গোবেন্দুভূষণ সংখ্যাতীর্থ। তিনিও ছিলেন পিতার মতো এক কৃতী মানুষ। তিনি একাধারে ছিলেন রাজনীতিক, সাংবাদিক, সমাজসেবী ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সেজন্য পল্লীবাসীর শিরোনামের নিচে মুদ্রিত থাকত ‘বর্দ্ধমান জেলা ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপত্র’ কথাটি। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-র সংস্কৃত গদ্যানুবাদ ও তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’-এর পদ্যানুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। নবদ্বীপের সাথে তাঁর যোগাযোগ বেশি ছিল। সেখানেও বসতবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ‘পল্লীবাসী’ ছাড়াও তিনি ‘আসানসোল হিতৈষী’ নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন।

গোপেন্দুভূষণের সম্পাদনাকালে ‘পল্লীবাসী’র সাইজ হয় হাফ ক্রাউন। পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথমে ছিল চার, পরে হয় ৬। বর্তমানে আবার চার পৃষ্ঠাই আছে। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন শ্রীজীব ন্যায়রত্ন, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন, কবিশেখর কালিদাস রায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোজাম্মেল হক, রেজাউল করিম প্রমুখ কবি ও লেখক। পত্রিকাটি প্রতি বুধবার প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। একসময় স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের জাতীয়তাবাদী

মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা যায়। নিজস্ব সংবাদদাতা প্রদত্ত সংবাদ ছাড়াও সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সংকলিত সংবাদও প্রকাশ করা হত। নীরস সংবাদের মাঝে চুটকি, হাস্যরসাত্মক বিষয়ের অবতারণা করতেন 'গুপ্তকথক' ছদ্মনামধারী জনৈক লেখক। বাজারদর, পাঠকসমাজের চিঠিপত্রের কলম ছিল। পাঠকের কলমে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করতেন। সম্পাদকও তাঁদের চিঠির উত্তর দিতেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'পল্লীবাসী'র বার্ষিক চাঁদা ছিল দেড় টাকা বা এক টাকা আট আনা।

'পল্লবাসী' নিয়মিত প্রকাশের স্বার্থে গোপেন্দুভূষণ কালনার শ্যামগঞ্জ অঞ্চলে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'বিশ্বম্ভর প্রেস' নামে নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। মেসিনম্যান ছিলেন ফকিরচন্দ্র দাস, কম্পোজিটর ছিলেন শান্তিকিঙ্কর ভট্টাচার্য। ম্যানেজার ভূপতিলাল দাস। বলা বাহুল্য, তখন মুদ্রণে অফসেট, কম্পিউটার, ডি.টি.পি. ছিল না। ছিল শিসের অক্ষর, লেটার প্রিন্টিং ট্রেডল মেশিন।

সেকালে সরকারি বিজ্ঞাপন তেমন পাওয়া যেত না। বেসরকারি বিজ্ঞাপনই ছিল প্রধান ভরসা। পত্রিকাটি ছিল বিজ্ঞাপনসর্বস্ব। প্রায় ৬০/৭০ ভাগই ছিল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন আসত কলকাতা, হুগলি, বহরমপুর থেকে। পত্রিকার জনৈক গ্রাহক প্রাপককে না পেয়ে উত্তরবঙ্গের মালদা জেলা থেকে একবার 'পল্লীবাসী' ফেরৎ আসে। এতে বোঝা যায় পত্রিকাটির প্রচার কত বিস্তৃত ছিল।

গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তাঁর পুত্র অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮০ দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত 'পল্লীবাসী' সম্পাদনা করেন। তাঁর আমলে নানা কারণে পত্রিকার মান, ঐতিহ্য ও প্রচারের ক্রমাবনতি লক্ষ করা যায়। সম্পাদকের শারীরিক অসুস্থতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য ঐতিহ্যসম্পন্ন এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি তিনি হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। যদিও বর্ধমানের উদয় অভিযান গোষ্ঠীর বইমেলা কমিটি শতবর্ষ ধরে প্রকাশিত পত্রিকাটির ঐতিহ্য স্মরণে সম্পাদককে 'দেবপ্রসন্ন স্মৃতি পুরস্কার'-এর দশ হাজার টাকা আর্থিক সম্মাননা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সেই অক্সিজেনেও পত্রিকাটিকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠলে তিন পুরুষের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাটি উপযুক্ত কারো হতে পড়ে বেঁচে থাকুক এই উদ্দেশ্য নিয়ে বাধ্য হয়ে পত্রিকাটি বিক্রি করে দেন। কেনেন 'পল্লীবাসী'র প্রতিষ্ঠিত চিত্রগ্রাহক, ছড়াকার ও সাংবাদিক তরুণ সেন। নব উদ্যোগে তাঁর হাত ধরে ১১৯ বছরের সাপ্তাহিক পত্রিকাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে রমরমিয়ে চলছে। সেকালের পুরোনো প্রযুক্তি পরিত্যাগ করে ট্রেডল মেশিন ছেড়ে অফসেট প্রযুক্তির পারফিউম মেখে সেজেগুজে গ্রাহক-পাঠকের মনোরঞ্জন করছে। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও বছর দুয়েক আগে প্রয়াত হয়েছেন। এদিকে বিশ্বম্ভর প্রেসের ট্রেডল মেশিন, অক্ষর টাইপ, কেজ ইত্যাদি ঐতিহ্যসম্পন্ন নিদর্শনগুলি কিনে নিয়েছিলেন বর্ধমান শহরের বহিলাপাড়া নিবাসী সাংবাদিক 'পল্লীবর্ধমান' পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার সেন (বর্তমানে প্রয়াত)।

তথ্যসূত্র

১. মুখোপাধ্যায়, কবিতা, *বর্ধমানের সাময়িক পত্র : মননের দর্পণ*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা
২. চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ, *বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ*, দে-জ প্রকাশনী, সম্পাদক : সুমাল্য দাস
৩. দাস, সুমাল্য (স.), *অম্বিকা কালনার ইতিহাস সমগ্র (২) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, তটভূমি প্রকাশন

With best compliments of

MAA BHABANI MINI RICE MILL

BEST QUALITY

Perboiling Rice Products

250 K.W. Gasification of Rice Husk Pulversed 250 M.S. Rice Husk Ash Base

Vill. Panchsimul, P.O. Keotara (Jhapandanga), Dist. Burdwan, PIN : 713166
Ph : (03451) 279-023/610 (Mill) 279361 (Resi), Mob. 9434021272

Sl. No. 109

Space donated by

M. Dey

B A I D Y A P U R

Sl. No. 135

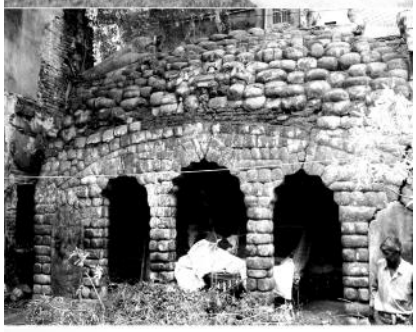

দেওয়ান মানিকচাঁদের মন্দির ও তোরণ

সঞ্জীব চক্রবর্তী

বর্ধমান শহরের হিন্দুস্থাপত্যে ইন্দো-সারাসেনিয় শৈলীর ওপর বাংলা ঘরানার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের উদ্যোগে গড়ে ওঠা মহন্ত-অস্থল, বারোদুয়ারি ও সর্বমঙ্গলা নবরত্ন মন্দিরের কথাই উল্লেখ করতে হয়। সে আলোচনা প্রসঙ্গান্তরের জন্য স্থগিত রেখে পুরাতন মোগলদুর্গের স্থলে গড়ে ওঠা বর্ধমান রাজবাড়ি, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ির পূর্বে পায়রাখানা গলির ধারে প্রাচীন পথের উপর অবস্থিত কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক আরও একটি স্থাপত্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই স্থাপত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পাঞ্জাব থেকে আগত এবং মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের অনুগ্রহভাজন উদ্যমী যুবক মানিকচাঁদের নাম। মানিকচাঁদ দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হবার পর এই বাস্তু গড়ে তোলেন কয়েক বিঘা জমির উপর।

পারিবারিক ইতিহাস আলোচনার ও স্থান অন্যত্র। কিন্তু দেওয়ান মানিকচাঁদের বাস্তুভিটা, মন্দির ও লাগোয়া 'নুরজাহান গেট' নামে পরিচিত তোরণটি স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে। প্রথম প্রশ্নটি হল মৌলিক। দেওয়ান মানিকচাঁদ তাঁর বাস্তু সম্পূর্ণ নতুন করে নির্মাণ করিয়েছিলেন না পুরাতন মোগল দুর্গের কিছু অংশ মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। মহারাজ কীর্তিচন্দ্র প্রয়াত হন ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে এবং তখন ও মোগলদুর্গ ও সংলগ্ন মোগলটুলি বাজার সক্রিয়। মোগল শক্তি দুর্বল হয়ে না পড়লে এবং মহারাজের প্রতাপ প্রবল না হলে এই হস্তান্তর সম্ভব ছিল না। মহারাজ কীর্তিচন্দ্র সর্বমঙ্গলা মন্দির ও মহন্ত-অস্থল দুটি হিন্দু স্থাপত্যই নির্মাণ করান দুর্গের আওতার বাইরে। ১৭৫৭ সালে মোগল দুর্গ হস্তান্তরের পর লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় এমন অনুমান হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়ির বর্তমান দেউড়ি পার হলেই যে পুরাতন স্থাপত্য চোখে পড়ে তা মোগল দুর্গের অংশ এবং ঠাকুরবাড়ির কোনো কার্যকরী অংশ নয়। ঠাকুরবাড়িতে এবং মহিলামহাবিদ্যালয়ের পেছন দিকের অংশে সম্ভবত রাজপরিবার নতুন নির্মাণে বাস করতে থাকেন। ১৮২৯ থেকে ৩২ সালের মধ্যে দুই বিদেশি যথা ভিক্টর জ্যাকমঁ এবং রেভারেণ্ড ওয়াইটব্রেকট বর্ধমান রাজবাড়ির স্থাপত্য বিষয়ে যে নিতান্তই নেতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন তা সম্ভবত এই রাজবাড়ি ঘিরেই। নিও কলোনিয়াল ধাঁচের মহাতাব মঞ্জিল ও অন্যান্য নির্মাণ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে বিরাজ করছে। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুর বাড়িতে মোগল স্থাপত্যের উত্তরাধিকার ছড়িয়ে আছে পর্বে পর্বে। বর্তমানে ভগ্নদশায় পড়ে থাকা বিপুলায়তন রাসমঞ্চে পয়েন্টেড আর্চ ব্যবহৃত। রাসমঞ্চের মূল নকশা জেরুসালেমের বিখ্যাত 'দ্য ডোম অব দ্য রক' এর থেকে পরিবর্তিত আকারে গৃহীত। সামনের অতিথিশালার ছাদ নির্মাণে সেগমেন্টাল আর্চ ব্যবহার করে সমতল ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। নাটমন্দিরে প্রবেশের দেউড়িতে পয়েন্টেড এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি আর্চের আদল এসেছে। স্টাক্কোর কাজেও মোগল ঘরানার উত্তরাধিকার।

মোগল ঘরানা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে গেছে দেওয়াল মানিকচাঁদের ভিটার প্রাচীনতর অংশগুলিতে। বাস্তুজমির অন্দরমহল অংশে প্রাচীনতম নির্মাণের মধ্যে আছে তিনটি পয়েন্টেড ফোর সেন্টারড মোগল আর্চযুক্ত একটি পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ি। আর একটি পয়েন্টেড মোগল আর্চের নিদর্শন হল মন্দির সংলগ্ন ভোগমণ্ডলের ভেঙে পড়া প্রবেশ পথ। তোরণ সংলগ্ন একটি দেওয়াল ও দরজা মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন বলেই মনে হয়।

বাস্তু ভিটার সংলগ্ন জমিতে নির্মিত হয়েছে একটি পঞ্চরত্ন দালান মন্দির। মন্দিরের ছাদ সমতল। সামনে তিনটি রাউন্ড আর্চযুক্ত দালান। রাউন্ড আর্চে চুনবালির কাজের

নকশা দিয়ে সামান্য সূচালোভাব আনা হয়েছে। মন্দিরটি নিজস্বতা দুটি ক্ষেত্রে। এক, এর সর্বাঙ্গে পঙ্খের কাজের বৈভব। চরিত্রে মোগল ঘরানার। দুই, ছাদের পঞ্চরত্ন মন্দিরগুলিতে ছত্রির ব্যবহার। রত্নমন্দিরগুলি চারদিকে উন্মুক্ত এবং ছত্রিগুলি উলটালে পদ্মের আকৃতি। দুর্লভ রচনার নিদর্শন এটি।

পঞ্চরত্ন মন্দিরের সামনে এক চালা কাঠামো পাহাড়ের আদলে গিরি গোবর্ধন পর্বত তৈরি করা হয়েছে। তিনটি আর্চের ওপর পর্বতটি স্থাপিত। আর্চগুলিতে ভাস্কর ও কর্নার স্টোন ব্যবহার করে ট্রু আর্চের চরিত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভিত্তির দুর্বলতা, নির্মাণের ত্রুটি বা গাছপালার আক্রমণে বা সম্মিলিত ভাবে সবগুলি কারণেই এটি ক্ষতিগ্রস্ত। পঞ্চরত্ন মন্দিরের ডানপাশে ভোগমণ্ডপটি বিধ্বস্ত। ভিত্তির গঠন এবং উত্তর দিকের প্রাচীরে একটি এমবেডেড গোল আর্চের বরণ দেখে মনে হয় সমগ্র নির্মাণটিই ছিল গোল আর্চের উপর গঠিত। নির্মাণের দুর্বলতা যে তার ধ্বংসের কারণ তা মোগল আর্চগুলির সঙ্গে তুলনায় প্রমাণিত। বসতবাড়ির একটি ত্রিতল অংশ ছিল মন্দিরের পশ্চিম অংশে। অত্যধিক জীর্ণ হয়ে পড়ায় সেটি ভেঙে ফেলা হয়। একটি ফটোগ্রাফ থেকে বোঝা যায় একতলার ছাদ নির্মাণ হয় দুটি গোল আর্চের ওপর। দোতলার কড়িবরগার ছাদ ধরে রাখে গোল কলাম। তিনতলার কড়িবরগার ছাদ ধরে রাখে সরল গাথনি। একতলার ডান দিকে শিবস্থল বলে চিহ্নিত তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি দালান মন্দিরের ছাদ ধরে রেখেছিল সেগমেন্টাল আর্চ। দুটি ধ্বসে গেছে। তৃতীয়টি ও ধ্বংসের মুখে।

রহস্য ঘিরে আছে নুরজাহান গেট নামে কথিত তোরণটিকে। লোকশ্রুতি অনুসারে মোগল প্রশাসক শের আফগানের সুন্দরী স্ত্রী মেহেরউন্নিসার আবাস ছিল মোগলটুলি বাজার পুরাতনচক অঞ্চলে। মেহের নামটি বিকৃত উচ্চারণে পরিচিত ময়ূর হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে একটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ইতিহাস বলে যে জাহাঙ্গীরের অনুচর কুতুবুদ্দিন কোকা মেহেরউন্নিসার স্বামী শের আফগানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং দু'জনেই মারা যান ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে। মেহেরউন্নিসা পাড়ি দিলেন দিল্লির পথে এবং ভারতসম্রাজ্ঞী নুরজাহান নামে পরিচিত হলেন। তাহলে তাঁর নামে তোরণ নির্মাণ করলেন কে এবং কেন। জাহাঙ্গীর নেশাগ্রস্ত হলেও মেহেরউন্নিসার স্বামীকে হত্যা করে তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার পর্বকে স্মরণীয় করে রাখার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করবেন না। মেহেরউন্নিসাও এ উদ্যোগে সম্মতি দেবেন না। তাহলে মেহেরউন্নিসা তথা নুরমহলের নামে তোরণ নির্মাণ করলেন কে?

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল বর্গীর আক্রমণ থেকে দুর্গকে রক্ষার জন্য এই তোরণ নির্মাণ করা। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য উঁচু প্রাকার প্রয়োজন, এমন বাহারের তোরণ নয়। তৃতীয় সম্ভাবনা হল এটি মোগল দুর্গেই কোনো অংশে যাবার প্রবেশ পথ ছিল। যদি এই তত্ত্ব মেনে নিতে হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে এটি ১৭৫৭ সালে দুর্গ হস্তান্তরের বহু পূর্বেই নির্মিত হয়। কিন্তু সে সময় এতখানি স্প্যান যুক্ত গোল আর্চ নির্মাণের প্রযুক্তি কৌশল আয়ত্ব হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। মনে রাখতে হবে বীরহাটার ব্রিজ ও রাধাগঞ্জের বিশাল আর্চযুক্ত ব্রিজ নির্মিত হতে তখনও ছয় সাত দশক দেরি। উপরন্তু মোগল নির্মাতারা পয়েন্টেড আর্চ নির্মাণের পক্ষেই ঝুঁকতেন। উপরন্তু গেটটিও পার্শ্ববর্তী মোগল যুগের নির্মাণের অঙ্গন নয়, এটি একটি পৃথক চরিত্র যুক্ত নির্মাণ, যদিও ইটের মাপ একই। পুরোনো ছবি দেখে বোঝা যায় যে তোরণের মাথা ব্যাটলমেন্ট নকশায় সজ্জিত ছিল। মেরামতির সময় কেন তা পরিহার করা হল তা বোধগম্য হয়নি। এই বিকৃতি কাম্য ছিল না।

শেষ বিচারে মনে হয় এই তোরণটি মানিকচাঁদের পরিবারের দাবি মত প্রকৃতপক্ষে ভিটায় প্রবেশের পথ। সমৃদ্ধির দিনে সৌভাগ্যের স্মারক হিসাবে এই গেটটি পরে নির্মাণ করা হয়। তবে প্রাচীন পথটির উপর স্বয়ং মানিকচাঁদ এই কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন না তাঁর কোনো উৎসাহী বংশধর নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এই নির্মাণ সম্পন্ন করেছিলেন তা নিতান্তই অনুমানের বিষয়। স্থাপত্যটির গঠন ও স্থায়িত্ব পরবর্তীকালে নির্মাণের দিকেই ইঙ্গিত করে। তোরণের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মোগল স্থাপত্যের উপাদান ব্যাটলমেন্ট ও দেওয়ালে সাজাহান আর্চের প্যানেল ব্যবহার করা হয়।

বর্ধমান শহরের স্থাপত্যের পর্যায়গুলি বুঝতে আর্চের আকৃতি ও ব্যবহার চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করবে। শাহীজুম্মা মসজিদে দীর্ঘ পয়েন্টেড অশ্বক্ষুরাকৃতি আর্চ, মানিকচাঁদের ভিটায় ফোর পয়েন্টেড মোগল আর্চ, লক্ষ্মীনারায়ণজীউ বাড়িতে পয়েন্টেড আর্চ। অশ্বক্ষুরাকৃতি ও স্টিল্টেড আর্চের জমানা পার হয়ে গোল আর্চ, পাল বিল্ডিং এর বাস্কেট আর্চ, ক্রাইইস্টচার্চের ল্যান্সেট আর্চ, মহাতব মঞ্জিলে আর্চের জটিল আলঙ্কারিক প্রয়োগ নির্মাণের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায় সূচিত করে। একই সঙ্গে সেগমেন্টাল আর্চের ব্যবহার চলেছে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

এখন নতুন রূপে সেজে উঠছে বর্ধমান। প্রতিদিন ভাঙা পড়ছে পুরাতন বাড়ি। কোথাও বা সংস্কারের নামে পুরাতনবাড়ি ভেঙে নতুন নির্মাণ করা হচ্ছে। কোথাও বা এমনভাবে প্রসাধিত করা হচ্ছে তাকে যে প্রাচীনত্বের অবশেষটুকুও থাকছে না। পরিবর্তনের এই ঘূর্ণাবর্তে যেটুকু আলোচনা হয়ে থাকবে সেটুকুই আগামী প্রজন্মের কাছে তথ্যভাণ্ডারের মর্যাদা পাবে।

With Best Compliments of

Hamunpur S.K.U.S. Ltd.

Vill. Hamunpur, P.O. Bohar, Dist. Burdwan

Sl. No. 2

আশরফি অরুণ, গিনি রিনি

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

প্রাক্‌কথন

নীরদ সি. চৌধুরী বলেছিলেন ''বাঙালি এক আত্মঘাতী ইতিহাসবিস্মৃত জাতি।'' আমাদের বহু গৌরবময় ইতিহাস আমরা লিপিবদ্ধ করতে আগ্রহী হইনি একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য সেই গরিমা কালের স্রোতে ধুয়ে গেছে এবং বিশ্বে বাঙালির পরিচয় এসে ঠেকেছে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে বসবাসকারী জাতি হিসেবে যারা 'বাংলা' নামে একটি ভাষায় কথা বলে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে প্রথম বিশ্বের দরবারে উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে যান, একথা কঠোর রবীন্দ্র-বিরোধী মানুষকেও ঢোঁক গিলে স্বীকার করতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া আমাদের আত্ম-পরিচয়ের স্থান অত্যন্ত সঙ্কুচিত।

আমি যখন প্রাথমিক স্কুলে এবং ক্লাস টু-তে, তখন স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমার সহপাঠিনী বেলা (পদবি এখন আর মনে নেই) গেয়েছিল 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'। রবিঠাকুরের গানের সাথে আমার সেই প্রথম পরিচয়। তখন তো বোধবুদ্ধি কেমন কাদার মতো তালপাকানো। কিছুই বোঝার ক্ষমতা ছিল না। তবুও সুর আর কথা কেমন যেন ঘুম-পাড়ানিয়া বাঁশির মতো টেনে ধরল। মনের মধ্যে 'সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো' এক ব্যথার অনুরণন বয়ে আনল। বহু পরে বাংলা-ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে শিখেছি 'নিভে' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ 'নির্বাপিত' শব্দটি থেকে 'নিবে' করেছেন উচ্চারণের স্বার্থে। উচ্চমাধ্যমিক ১৯৬৭ সালে এবং ১৯৬৮তে ডাক্তারি পড়তে ঢোকা। ততদিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অসংখ্য শিল্পীর শোনানো গানে রবীন্দ্রনাথের বেশ অনেক গানের সাথে পরিচয় ঘটে গেছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র থাকাকালীন শেখার সৌভাগ্যও হয় প্রথিতযশা ও নিবেদিতপ্রাণ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের কারো কারো কাছে। সে তো অন্য গল্প। বর্ধমানের মাটিতে আমার পদার্পণ ১৯৮০ সালে। রাঢ়বঙ্গর সাংস্কৃতিক পীঠস্থানের অন্যতম বর্ধমান। বীরভূমের শান্তনিকেতনের সন্নিহিত জেলা। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রচর্চায় প্রচারের আলোয় না থেকেও অনেক এগিয়ে। ভাষাচার্য সুকুমার সেন, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বর্ধমান।

মোহরদি ও সুচিত্রা

কবিগুরু সস্নেহে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রেখেছিলেন 'মোহর'। মোহরদি বর্ধমানের সঙ্গে তাঁর জীবনকালে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। অভয়কাননের পশ্চিমে নৈমিষারণ্য। সেখানে অতি সযতনে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। একটি 'বোরহাট রামকৃষ্ণ স্কুল' এবং অপরটি 'রবীন্দ্রভবন'। 'রবীন্দ্রভবন' বর্ধমানবাসীর সাংস্কৃতিক তৃষ্ণার শান্তি হিসেবে অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হয় সব রকমের বাধা ডিঙিয়ে সমগ্র বর্ধমানবাসীর অর্থানুকুল্যে। যে দু-জন চিকিৎসক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁদের একজন বর্ধমান রাজপরিবারের চিকিৎসক ডা. অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সন্তান ডা. সুবোধ মুখোপাধ্যায় ও অন্যজন বিশিষ্ট চিকিৎস ডা. সত্যচরণ মৈত্রের সুযোগ্য সন্তান ডা. নবঘন মৈত্র। মোহরদি এঁদের কাজে অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। বর্ধমান রবীন্দ্রচর্চা ও আদর্শপ্রচারে এঁদের সাথে সহযোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অসংখ্যবার, সেই গোড়ার দিনগুলিতে, রবীন্দ্রভবনে মোহরদি হাসিমুখে অনুষ্ঠান করেছেন বিনা পারিশ্রমিকে।

স্বপ্নের মতো

মোহরদি অসুস্থ হলেই চলে আসতেন বর্ধমানে তাঁর প্রিয় অরুণের খোসবাগানের বাসভবনে। তাঁর প্রাণের আরাম ছিল এই বাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশ। অরুণ ডাক নাম। ডা. অরবিন্দ কোনার, এম.ডি.,এম.আর.সি.পি.। ভারতবিখ্যাত ভেষজ চিকিৎসক ডা. নলিনীরঞ্জন কোনারের সুযোগ্যপুত্র। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী রিনি চৌধুরী, বিখ্যাত রবীন্দ্রানুরাগী শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কন্যা। রিনিদির আগাগোড়া হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ বসানো, অসাধারণ শিল্পী কিন্তু প্রচারের বৃত্তের বাইরে থেকে নীরব সাধনা করা মানুষ। এই গৃহে আমি অন্তত তিনবার মোহরদির সান্নিধ্য লাভ করি।

মোহরদি প্রথমবার অসুস্থ হয়ে অরবিন্দদার বাড়িতে। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র খবর পেয়েছেন। তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। ঠিকানা লেখা : *ডা. অরবিন্দ কোনার, বর্ধমান*। প্রাপকের পরিচিতি এতটাই যে চিঠিটিতে বিস্তারিত কিছুই নেই। অথচ দ্রুত চিঠিটি তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে। ভেতরে মোহরদিকে উদ্দেশ্য করে লেখা—''মোহর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো।—সুচিত্রা''

এই চিঠি প্রমাণ করে 'কণিকা' আর সুচিত্রা-র গভীর বন্ধুত্বের কথা। দু-জনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিরাট গরিমার পরিচয় রেখেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার ও প্রসারে দুজনেরই বিরাট অবদান। গায়নভঙ্গিতে স্বকীয়তা দু-জনকে আলাদা করে চেনায়, সুতরাং দু-জনের অনুগামীরা ভিন্ন দলের। বাঙালি জীবনে এঁদের অনুগামীদের যে দ্বৈরথ আমরা আজও প্রত্যক্ষ করি, তার সমতুল 'উত্তমকুমার-সৌমিত্র' বা 'মোহনবাগান-ইস্টবঙ্গল'-এর সমর্থককুলের আচরণ। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই বেঁচেছিলেন মোহরদি এবং সুচিত্রাদি। তাঁদের বন্ধুত্বের সেতু সেই রবীন্দ্রনাথই। পরিণত বয়সে এই একটি চিঠি আমার উপলব্ধিতে আনল যে সমর্থনের নামে আমরা কত সহজেই মুখের মতো বিভেদ খুঁজি।

১৯৬৬-৬৭ সালে আমার দিদি 'রবিতীর্থ-নর্থ'-এ শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কাছে গান শিখতে যেতেন। এক-আধদিন আমিও যেতাম সঙ্গে। সুচিত্রাদি আমার পরিচয় জেনে আমাকে পাশে

বসালেন একদিন। তারপর সবাইকে অবাক করে 'ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ' গানটি ধরলেন। আমার হাতে স্বরবিতান-৫১ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, কথাগুলো পড়ে পড়ে হৃদয়ে গেঁথে নাও। আর আমার সাথে গলা মেলাও তো দেখি। কী আসাধারণ দক্ষতায় তাঁর আঙুলগুলো খেলা করে চলে হারমোনিয়ামের চাবিগুলার ওপরে। না দেখছেন হারমোনিয়াম। না দেখছেন বই। চোখ বুজে ধ্যান করার ভঙ্গিতে গেয়েই চলেছেন। উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন আমি ঠিক ঠিক গলা মেলাচ্ছি কি না। সেদিন উপস্থিত অন্য ছাত্রছাত্রীরাও স্বীকার করেছেন এত স্বতস্ফূর্ত মেজাজে সুচিত্রাদিকে আবিষ্কার করাও একটা পরম সৌভাগ্য। বাড়ি ফেরার মুখে বললেন, সামনের সপ্তাহে আবার এসো, গানটা বই না দেখে মুখস্থ গাইতে হবে, রবি ঠাকুর তো এই গানেই বলেছেন—'তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো'। তার অবাধ প্রশ্রয়েই উত্তীর্ণ হয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। তারপর দু-চার দিন বাদেই ডাক্তারি পড়তে ঢুকলাম। কিন্তু সুচিত্রাদি ওই যে রক্তে রবীন্দ্রনাথের বীজ বপন করে দিলেন সেই থেকে ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে কবে এক বিরাট মহীরুহ হয়ে উঠেছেন, অনেক বাঙালির মতোই আমিও টের পাইনি।

১৯৮১ সালের মে মাস নাগাদ খোসবাগানে ডাক্তার কোয়ার্টাসের বাঁ দিকে তিনতলায় বসবাস শুরু করি। তখন চারতলায় ডানদিক অরবিন্দদা-রিনিদি থাকতেন ওদের ছোট্ট মেয়ে রানিকে নিয়ে। ঠিক সকাল সাড়ে-আটটা পৌনে ন-টায় অরবিন্দদা নেমে আসতেন ডিউটিতে যাবার জন্য। প্রতিদিনই কোনো জনপ্রিয় হিন্দি গানের কলি গলায় ভাঁজতে-ভাঁজতে নামতেন। অসম্ভব প্রাণচঞ্চল। এর-ওর পেছনে লাগা আর যত রাজ্যের ফচ্‌কেমি। অসম্ভব রকম সফিসটিকেটেড, স্টাইলিস্ট এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। কোনোদিন আত্মপ্রচার করেননি এবং ওনার সাথে রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন এবং বিভিন্ন রবীন্দ্রচর্চায় অগ্রণী ব্যক্তিত্বের কী নিবিড় যোগাযোগ তা কোনোদিন সামনে আনেননি।

যিনি অরবিন্দদার সুযোগ্য ঘরনি, সেই রিনিদিকে আমি 'গিনি' নামে আখ্যাত করতেই পারি। রিনিদি দারুন সুশ্রী। সবসময় অত্যন্ত রুচিপূর্ণ পোষাক পরতেন এবং ভীষণ মৃদুভাষী। গলার আওয়াজ সুরে-সুরে ভরপুর। সোফায় বসে থাকলে মহারানির মতো মহিমান্বিত মনে হত। রিনিদিকে অরবিন্দদা সর্বোচ্চ সাচ্ছন্দ্যে তার সঙ্গীতচর্চার জন্য মুক্ত রেখেছিলেন।

রিনিদি প্রচারবিমুখ, মূলত অন্তঃপুরবাসিনী, হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথকে রেখেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। রিনিদির পিতা শান্তিনিকেতনে যে বাড়ি করেছিলেন তার নাম 'সোনারতরী' সে বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ১৯৮৬ সালের পৌষ মেলার সময়। কী বিচিত্র মিল রবীন্দ্রনাথের উত্তরায়ণের সাথে। দেখেছি যে গৃহকর্ত্রী বাড়ির কাজের মানুষ ও সহায়কদের প্রথমে খাদ্যগ্রহণ করিয়ে তৃপ্ত করে তারপর অন্তঃপুরের সকলকে দিয়ে খেতে বসেন। খাদ্যতালিকা উভয়ক্ষেত্রেই অভিন্ন। নিজে অ্যালার্ম দিয়ে আমাদের ঘুম থেকে সকালে তুলে তৈরি করিয়ে নিয়ে গেছিলেন ছাতিমতলায় প্রার্থনাসভায়। চারিদিকে কী গভীর কুয়াশা। আশ্রমিক শান্তিদেব ঘোষ ওই শীতে মাথা চাদরে ঢাকা অবস্থায় মঞ্চে উঠেছিলেন এবং গেয়েছিলেন 'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'। হারমোনিয়ামে সুযোগ্য সহযোগিতা করেছিলেন গোরাদা—গোরা সর্বাধিকারী। গোরাদা মোহরদির সাথে তো অবশ্যই বাজাতেন। মোহরদি যেমন স্নেহচ্ছায়া দিয়ে গোরাদাকে ঢেকে রেখেছিলেন তেমনি গোরাদাকেও দেখেছি সরল, বিষয়ভাবনার ঊর্ধ্বে থাকা মোহরদির প্রতিটি খুঁটিনাটি প্রয়োজনের দিকে নজর রাখতে।

রিনিদি নিয়ে গেলেন আশ্রমের এক রাস্তার ধারে যেখানে প্রফুল্লচিত্তে সঙ্গীতভবনের ছাত্রছাত্রীরা 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয়' গাইতে গাইতে আসছে। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা নাচছে। আচার্য-শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী-রবীন্দ্রঅনুভবী মানুষের যে এক মহাশোভাযাত্রা তার তুলনা সে নিজেই।

জলখাবার খেতে খেতে রিনিদি বললেন, তোকে এই 'নয়ন তোমারে' গানটা গাইতে হবে। জলখাবার প্রায় গলায় আটকে যাবার উপক্রম।

রিনিদি কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আমার পেছনে পড়ে রইলেন। পরপর পঁচিশে বৈশাখ, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেই লাগলেন।

রিনিদির গৃহে মহলা তো তো হোতই, কখনো হোত ওর ছাত্রী কৃষ্ণা দীক্ষিতের বাড়িতে, উত্তর ফটকের ঠিক উল্টো দিকে। কৃষ্ণার স্বামী কাঞ্চন দীক্ষিতও গুণী মানুষ। এই বাড়িতে দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায়।

রিনিদির পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল 'বাইশে শ্রাবণ'। শেষ পর্যন্ত উতরে গেলাম 'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে' গানটি পরিবেশন করে। কিন্তু ১৯৮৮-র সেই অনুষ্ঠান স্মরণীয় থেকে গেল অরবিন্দদার গান 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি' পরিবেশনার গুণে।

কী নিষ্ঠার সঙ্গে রিনিদির কাছে স্বরবিতান থেকে 'স্বরলিপি' অনুসৃত পথে শিক্ষা করেছেন ও তারপর রিনিদির গান ক্যাসেটবন্দি করে শয়নে-স্বপনে নয় জাগরণে এমনকি রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে সেই ক্যাসেট শুনে গেছেন একটি গান সঠিকভাবে আয়ত্ত করার জন্য। এই সেদিন মান্না দে-র সাক্ষাৎকারে জানলাম 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'র জন্য মান্না দে-র ক্যাসেট নিয়ে উত্তমকুমার মুম্বাইতে রাস্তা পার হচ্ছেন গান শুনতে শুনতে। এখানেই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার তুলনা। আমার জীবনে যে কটি অসাধারণ মঞ্চ পরিবেশনা শুনেছি রবীন্দ্রসঙ্গীতে, অরবিন্দদার সেদিনের সেই গান বেশ আগেই স্থান পাবে। উনি সেদিন গান করেননি, প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। বিস্ময়বিমূঢ় আমি কিছুতেই মেলাতে পারিনি স্যুট-কোট-টাই পরা

'দিলকা হাল শুনে দিলওয়ালা' গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা খোলসওয়ালা লোকটির অন্তরে রবীন্দ্রনাথের গভীর অবস্থিতিকে।

বাস্তব বুদ্ধির আলোয়

মোহরদি আর একবার বিশ্রামের জন্য অরুণ-রিনির বাসগৃহে। উনি দোতলায় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরেই আপনমনে থাকতেন। একতলায় আমরা গান করতে বসতাম রিনিদির কাছে। সেদিন গোরাদা আমাদের শেখালেন 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী'। উঠছি, এমন সময় 'বর্ধমান আয়কর দপ্তরের কর্মীরা এলেন ওঁদের অনুষ্ঠানে মোহরদিকে গান গাইবার অনুরোধ নিয়ে। মোহরদির কাছে ওদের নিয়ে গেলাম। মোহরদি বললেন, ''আমি তো আজকাল গাই কম, শুনি বেশি। শরীরটাও সাথ দেয় না। রিনি যাবে, অরুণ যাবে, গৌতম যাবে, গোরাও যাবে শুনতে। ওর কাছ থেকে শুনে নেব পরে। অনুষ্ঠান তোমাদের খুব ভালো হবে, আশীর্বাদ রইল।'' ওঁরা চলে গেলে, বললেন, ''তোমাদের কিন্তু খুব ভালো গাইতে হবে, ওরা অনেক উপকার করে সময়-অসময়ে।'' আমি গেয়েছিলাম 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে।' রিনিদি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানটিকে অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। অরবিন্দদা গেয়েছিলেন 'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে'। সে এক অপরূপ প্রকাশ যার তুলনা সে নিজেই। রিনিদি গেয়েছিলেন 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ়'। ওঃ সে এক স্বর্ণসময়। পিন-পতনের শব্দ শোনা যায় এমন নীরবতার সাথে হলভর্তি মানুষ রবীন্দ্রনাথকে শুনে শ্রদ্ধা জানালেন।

বলাকার সারি

একে অপরের পরিপূরক জীবনসাথী হতে পারাটা বিরাট ব্যাপার। সেজন্য অরুণ যদি আসরফি হন, তবে রিনিদি গিনি। ওদের মেয়ে রানির কণ্ঠে শোনা 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' জীবনে ভুলব না। ওদের জামাই জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় খুবই উচ্চমানের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী এবং অধ্যাপক।

অপ্রকাশিত তাদের বিরাট অবদান এবং বর্ধমানে এই পরিবারটির সংস্কৃতিচর্চায় বিরাট ভূমিকার ইতিহাস।

এঁরা দুজনেই সুস্থ শরীরে এখনও রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরেই এগিয়ে চলেছেন। এঁদের শ্রদ্ধা জানানো আমার উত্তরাধিকার। যদি কোথাও আত্মপ্রচার ঘটে থাকে তার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। চেয়েছিলাম দেখাতে কাদা-মাটি থেকে কেমন করে ওরা সহজেই রবীন্দ্রমূর্তি তৈরি করেন।

With best compliments of

PRACHESTA SELF HELP GROUP

(Lic. No. 19026/06-07, Dt. 26-06-2006)

All Sorts of Civil, Construction/Mechanical Jobs, Labour & General Order Supplier

Regd. Office : B.B.D. Nagar, Sagarbhanga, P.O. Durgapur-11, Dist. Burdwan
Camp Office : Qr. No. Q-2, Sagarbhanga Colony, P.O. Durgapur-11, Dist. Burdwan
Mob. 9832749263, Ph. 0343-6453962

Sl. No. 150

With Best Compliments of

SK. JAMALUDDIN

Sasanga, Galsi, Burdwan

Sl. No. 185

With Best Compliments of

M/s SREE KHAITAN TRADERS

Hattala Road, Durgapur

Sl. No. 187

সূর্য উঠবে বলে

অনিল মাইতি

চ রি ত্র

জীবনবাবু, পবিত্র, নীলকণ্ঠবাবু, মা, ধ্রুব ও আলো

[যেহেতু এই নাটিকা অভিনীত হবে খোলা মাঠে অথবা রাস্তার ধারে তাই জনতার মাঝেই অভিনয়ক্ষেত্রটি করে নিতে হবে। অভিনয় ক্ষেত্রের একপাশে থাকবে একটি ছোট্ট বেঞ্চ।]

। আসেন জীবনবাবু ।

(বয়স ৭০, পরনে আধময়লা ধুতি পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির হাতের ও বুকের বোতাম খোলা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গোঁফ, অবিন্যস্ত মাথার চুল।

জীবন : (উদাসভাবে চারিদিকে দেখে নিয়ে আবৃত্তি)
যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে।
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।
(ধীরে ধীরে বেঞ্চে বসেন)

(ছাতা মাথায় সামনে দিয়ে হেঁটে যায় পবিত্র।)

জীবন : কে যায়?

পবিত্র : (জীবনবাবুকে দেখে কাছে এসে) স্যার, আমি পবিত্র (ছাতা গোটায়)।

জীবন : কটা বাজছে বলতে পারো?

পবিত্র : (ঘড়ি দেখে) ১২টা বাজতে ১৫ মিনিট বাকি।

জীবন : এখনো ১৫ মিনিট বাকি!

পবিত্র : একথা বলছেন কেন স্যার?

জীবন : দেখছো না সূর্য এখন মধ্যগগন থেকে পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে, একটু পরেই অস্ত যাবে যে।

পবিত্র : স্যার—

জীবন : দেখছো না সূর্যের তাপ কেমন কমে আসছে। আগের তাপ কি আছে?

পবিত্র : কে বলেছে তাপ কমে আসছে। এখনো তো—

জীবন : (মৃদু হেসে) কমছে পবিত্র কমছে। বুঝতে পারছো না, বুঝতে চাইছো না।

পবিত্র : কিন্তু—

জীবন : আসলে অনেকক্ষণ তো উত্তাপটা সহ্য করে আসছো তাই বুঝতে পারছো না।

পবিত্র : স্যার!

জীবন : ওই দেখ পবিত্র, একদল খেতমজুর এই রোদ উপেক্ষা করে কাজ করে চলেছে।

পবিত্র : হ্যাঁ, স্যার।

জীবন : ওদের ওই শক্ত সবল দুটি হাতের স্পর্শে আর শ্রমের ঘামের মধুর গন্ধে উর্বরা হয়ে ওঠে বন্ধ্যা মাটি। হয় ঋতুমতী। জন্ম নেয় মাটি মায়ের সন্তান সোনার ফসল। ওরাই তো এই পৃথিবীকে সাজিয়েছে ফলে ফুলে সুন্দর করে। ওরাই তো এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। অথচ ওরাই থাকে অনাহারে, অর্ধাহারে। এ বৈষম্য চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। (আবার বসেন)। হ্যাঁ, এবার বলো কোথায় যাচ্ছো? স্কুলে?

পবিত্র : না স্যার, আজ তো রবিবার। তাই যাচ্ছি একবার গঞ্জের দিকে। ধানের বাজারটা জানতে।

জীবন : এখনো তোমার ধান বিক্রি হয়নি?

পবিত্র : না স্যার, শুধু আমারই কেন, বহুজনই তো বিক্রি করতে পারেনি। তাই তো মহাজনের তাগাদা আর অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলেন রহমান চাচা।

জীবন : (উঠে রেগে) কাওয়ার্ড, ভীরু, কাপুরুষ।

পবিত্র : স্যার!

জীবন : ভীরু কাপুরষরাই আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

পবিত্র : কিন্তু—

জীবন : প্রতিবাদ কি মরে গেছে? চড়াই, উৎরাই পেরিয়ে উত্তরণের পথ খোঁজাটাই তো প্রকৃত বাঁচার পথ। আত্মহনন মানে তো হেরে যাওয়া। পলায়নী মনোবৃত্তি।

পবিত্র : স্যার—

জীবন : আত্মহননকে আমি ঘৃণা করি।

পবিত্র : আত্মহনকে আমিও ঘৃণা করি। কিন্তু পরিস্থিতি হয়তো—

জীবন : তাই বলে ওই পথ বেছে নিতে হবে? ওই পথ পরিহার করে প্রতিবাদে আমাদের সকলকে মুখর হতে হবে পবিত্র। নইলে মানুষ হিসাবে আমরা পরিচয় দিতে পারব না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ঘৃণা করবে, বিদ্রুপ করবে।

পবিত্র : স্যার!

জীবন : পবিত্র, 'জীবন' শব্দের অর্থ টিকে থাকা নয়, আত্মহননও নয়। বেঁচে থাকা। সম্মান নিয়ে, মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা। সেই বাঁচারই উদ্দীপ্ত কামনায় চলমান পৃথিবীর দেশে দেশে চলছে নিরন্তর সংগ্রাম। এটাই বাঁচার একমাত্র পথ। সেই পথেই হাঁটতে হবে আমাদের সকলকে। কী হলো কিছু বলছ না যে, আমার কথাগুলো ভালো লাগছে না বুঝি?

পবিত্র : না স্যার, আমি ভাবছি অন্য কথা।

জীবন : কী কথা?

পবিত্র : ভাবছি, এই ভরদুপুরে, প্রখর রোদে নদীর ধারে বসে কী করছেন আপনি?

জীবন : (বসে) ঢেউ গুনছি।

পবিত্র : ঢেউ গুনছেন!

জীবন : (ধীরে ধীরে উঠে) হ্যাঁ। জানো, একটু আগে নদীতে এসেছিল জোয়ার। উঠেছিল বিরাট বিরাট ঢেউ। সেই ঢেউয়ের মাতামাতিতে কত নোংরা আবর্জনা মাথায় নিয়ে ছুটছিল উজানে। আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এ জোয়ার বুঝি থামবে না কোনো সময়। অথচ দেখ, আস্তে আস্তে আসছে ভাটার টান, উত্তাল সেই ঢেউ, সেই মাতামাতি কেমন কমে আসছে। দেখতে পাচ্ছো—নদীর ধারে কেমন জমছে আবর্জনা। কিছু পরে ছড়াবে দুর্গন্ধ। বাতাস ভারি হবে। পরিবেশ হবে দূষিত।

পবিত্র : এবার আপনি বাড়ি যান স্যার।

জীবন : হ্যাঁ যাবো। ১২টা বাজলেই যাবো।

পবিত্র : (ঘড়ি দেখে) এই দেখুন ১২টা বেজে গেছে।

জীবন : না, এখনো কিছুটা সময় লাগবে। তবে একটা সময় ১২টা বাজতেই হবে।

পবিত্র : আপনার কথাগুলো ঠিক—

জীবন : (মৃদু হেসে) বুঝতে পারছ না কেমন? বুঝবে পবিত্র, বুঝবে। হয়তো একটু সময় লাগবে।

পবিত্র : তাহলে ওই বটগাছটার নিচে গিয়ে বসুন।

জীবন : ভালো করে চেয়ে দেখ পবিত্র গাছটার ডাল, পালা, পাতা কি আস্ত আছে? দুমড়ে-মুচড়ে কি শেষ করে দেয়নি?

পবিত্র : তাই তো!

জীবন : অথচ ওই গাছটা একদিন কত মানুষকে ছায়া দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে।

পবিত্র : কী করে এমন হল স্যার?

জীবন : একদল মত্ত বুনো হাতি গাছটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা পারেনি। মনে রেখো পবিত্র, গাছটা যখন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, উপড়ে ফেলতে পারেনি। শিকড়গুলো এখনো রয়েছে মাটির গভীরে, আছে মাটি কামড়ে ধরে। ওই গাছে আবার পাতা গজাবে, নতুন পাতায় ভরে যাবে গোটা গাছ। ওই দেখ, নতুন পাতা অঙ্কুরিত হচ্ছে। আবার ছায়া দেবে, আশ্রয় দেবে।

পবিত্র : স্যার!

জীবন : শুধু গাছটাই নয়, ওই দেখ, নদীর ধারের ওই খেটেখাওয়া মানুষদের পাড়াটাও তছনছ করে দিয়েছে ওই মত্ত বুনোহাতির দল।

পবিত্র : হ্যাঁ, তাইতো!

জীবন : একটু আগে আমি ওখান থেকে ঘুরে এসেছি, আবার যাবো। ওই মানুষের পাশে সমব্যথী হয়ে দাঁড়াতেই হবে।

পবিত্র : স্যার!

জীবন : ওই মত্ত বুনো হাতির মুখোমুখি হতেই হবে। জীবনে বহুবার তো ওই বুনো হাতির মুখোমুখি হয়েছি, এই শেষ বয়সে না হয়—

পবিত্র : আপনি যাবেন এটা তো জানা কথা।

জীবন : আর তুমি?

পবিত্র : আ—আ—আমি—

জীবন : হ্যাঁ, তুমি। তুমি কি এই সমাজের মানুষ নও? তুমি তো একজন শিক্ষক, তোমার কি কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই? এতো স্বার্থপর তুমি?

পবিত্র : (ঢোঁক গিলে) স্যার—স্যার—

জীবন : কী শিক্ষা দাও তোমার ছাত্রদের?

পবিত্র : (স্বগত) মহা মুশকিলে পড়লাম রে বাবা। কী যে বলি—

জীবন : কী ভাবছো? ভয় করছে?

পবিত্র : ভয়? না, না। ভয় করবে কেন স্যার? আসলে আমাকে একবার—

জীবন : গঞ্জে যেতে হবে। বেশ তো যাও, যাও।

পবিত্র : হ্যাঁ স্যার, আমি ঘুরে আসি। (তাড়াতাড়ি চলে যায়)

জীবন : হাঃ হাঃ হাঃ পালিয়ে গেল, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পবিত্র পালিয়ে গেল। ভয় পেয়ে গেছে, ভয়। ভয় একটা মারাত্মক ব্যাধি। ক্যান্সারের চেয়েও মারাত্মক। এরা শিক্ষক, সমাজের মেরুদণ্ড। এরা ইতিহাস পড়েছে, কিন্তু ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি।

(ছুটতে ছুটতে আবার আসে পবিত্র।)

পবিত্র : (চিৎকার করে) স্যার..., স্যার... (হাঁফাতে হাঁফাতে কাঁপতে থাকে)

জীবন : কী হল পবিত্র, কী হল? অমন করে কাঁপছ কেন?

পবিত্র : সে আমি বলতে পারব না স্যার। সে আমি—উঃ উঃ

জীবন : (ধমক দিয়ে পবিত্রর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে) বলো, কী দেখলে বলো।

পবিত্র : (জীবনবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে) এক ধর্ষিতা যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ।

জীবন : (চিৎকার করে) পবিত্র—

পবিত্র : (সরে গিয়ে) দুর্বৃত্তরা ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করেছে যুবতীকে। (মাথার চুল খামছে ধরে) উঃ কী বীভৎসতা! চাপ চাপ রক্ত। রক্ত আর রক্ত। আমি যাবো স্যার। (প্রস্থানোদ্যত)

জীবন : মেয়েটি যদি তোমার বোন হতো, পারতে পালিয়ে যেতে?

পবিত্র : (চিৎকার করে) না.....

জীবন : পবিত্র!

পবিত্র : আমার মাথাটা ঘুরছে স্যার। আমি বোধহয়, আমি—

জীবন : এখানে একটু বসো। (পবিত্রকে ধরে বেঞ্চে বসিয়ে দেন। একপাশে সরে গিয়ে)—

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,

গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

(নেপথ্যে নারী কণ্ঠের আকুল ডাক : সোমা... সোমারে... তুই কোথায় মা। একবার সাড়া দে)

জীবন : শুনতে পাচ্ছো পবিত্র, সন্তানহারা মায়ের করুণ আর্তনাদ?

পবিত্র : (উঠে) ওই মায়ের সামনে আমি দাঁড়াতে পারব না স্যার। আমি পালাই, আমি পালাই। (প্রস্থানোদ্যত)

জীবন : দাঁড়াও পবিত্র। (পবিত্র দাঁড়ায়)

(ডাকতে ডাকতে আসেন মা। পরনের শাড়ি লুটোচ্ছে। বাতাসে উড়ছে মাথার চুল। পবিত্র জীবনবাবুর পেছনে লুকোয়)

মা : সোমা... সোমারে... আমি যে তোকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না মা। তুই কোথায় আছিস একটিবার সাড়া দে মা। (দর্শকদের উদ্দেশ্যে) আপনারা কি আমার সোমাকে দেখেছেন? বলুন না, বলুন না। আপনারা সবাই কি বোবা হয়ে গেছেন? ভীরু কাপুরুষের মতো কি অন্ধকারে মুখ ঢেকেছেন? ছিঃ ছিঃ। না না, আমার সোমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। সোমা... সোমা... সোমারে... (ডাকতে ডাকতে চলে যান)

জীবন : পবিত্র—

পবিত্র : (জীবনবাবুর পেছন থেকে বেরিয়ে এসে) স্যার—

জীবন : শুনলে সন্তানহারা মায়ের কথা? কেমন চাবুক মেরে গেলেন আমাদের সবার পিঠে। চোখের সামনে এত বড় একটা অন্যায় দেখেও আমরা কেমন নির্বিকার হয়ে আছি বলো। আমরা ভুলে যেতে বসেছি সমস্ত প্রতিবাদের ভাষা। ভাবীকাল আমাদের ক্ষমা করবে না পবিত্র।

পবিত্র : স্যার—

জীবন : মনে রেখো পবিত্র, প্রতিবাদহীন মানুষ কখনও মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে না।

পবিত্র : কিন্তু—

জীবন : ওসব 'কিন্তু-সুতরাং-তবে' বলে কোনো লাভ নেই পবিত্র। আজ একটা ছবি দেখে তুমি আঁতকে উঠলে, কিন্তু এই ছবি তো এই বাংলার সর্বত্র (পবিত্র মাথা নত করে)। কী হল? মাথা নত করলে কেন?

পবিত্র : না মানে—

জীবন : স্বার্থপরের মতো একা একা বাঁচা যায় না পবিত্র। হয়তো দু-চারদিন টিকে থাকা যায়।

(আসেন নীলকণ্ঠবাবু)
(পরনে ছেঁড়া প্যান্ট-শার্ট, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। হাতে একটি ছোটো লাঠি)

নীলকণ্ঠ : (দু-পা এগিয়ে লাঠি উঁচিয়ে)। প্রেস্টিজ, প্রেস্টিজ। (আবার দু-পা এগিয়ে গিয়ে লাঠি উঁচিয়ে) প্রেস্টিজ, প্রেস্টিজ। আই ওন্ট ফরগেট দ্যাট ডে। নো, নো, আই ওন্ট ফরগেট দ্যাট ডে। আই ওন্ট ফরগেট—আই ওন্ট—(লাঠি উঁচিয়ে বসে যান)

জীবন : ভদ্রলোককে চিনতে পারলে পবিত্র?

পবিত্র : কেন পারবো না স্যার, কলেজ জীবনে আমি তো ওনার ছাত্র ছিলাম।

জীবন : হ্যাঁ, অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মজুমদার। অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করার জন্য ওনার ওপর হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন ওনারই ছাত্রছাত্রীদের সামনে।

পবিত্র : জানি স্যার।

জীবন : ক্ষোভে, দুঃখে আর অপমানে নীলকণ্ঠবাবু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

(নেপথ্যে মা— সোমা... সোমারে...)

পবিত্র : আবার উনি আসছেন।

জীবন : পালিয়ে যাবে না?

পবিত্র : (দৃঢ়ভাবে) না।

জীবন : গঞ্জে যাবে না?

পবিত্র : (দৃঢ়ভাবে) না স্যার, না।

জীবন : (পবিত্রর বুকে হাত দিয়ে) বুক কাঁপবে না?

পবিত্র : না স্যার, ভয়কে জয় করার মন্ত্র যে পেলাম আপনার কাছে।

জীবন : পবিত্র!

পবিত্র : দেখলাম এবং শিখলাম।

(ডাকতে ডাকতে আবার আসেন মা)

মা : সোমা... সোমারে..., না কোথাও খুঁজে পেলাম না আমার সোমাকে। তবে কি আমার সোমা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল? (চিৎকার করে) না—না—না, ওকে হারিয়ে যেতে দেব না। সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজবো তাকে। সোমা... সোমারে... (প্রস্থানোদ্যত)

(আবার আসেন নীলকণ্ঠবাবু)

নীলকণ্ঠ : নো, নো, আই ওন্ট ফরগেট, আই ওন্ট ফরগেট... (মায়ের মুখোমুখি হয়ে) কে তুমি মা?

মা : আ—আ—আমি মা।

নীলকণ্ঠ : হ্যাঁ, তুমি মা, ধরিত্রী মা। আমি তোমায় চিনি না। হ্যাঁ, তুমি যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ মা?

মা : আমার মেয়ে সোমাকে। কলেজ থেকে ফেরার পথে কোথায় যে হারিয়ে গেল।

নীলকণ্ঠ : না। না, না। হারিয়ে গেলে চলবে না। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। সবাই যদি হারিয়ে যাবে তাহলে—না, না হারালে চলবে না। চলো মা, আমি তোমার সোমাকে খুঁজে দেব। (উভয়ে প্রস্থানোদ্যত, হঠাৎ থেমে) তোমার সোমাকে হয়ত খুঁজে পাবে, কিন্তু—

মা : কিন্তু কী বাবা?

নীলকণ্ঠ : হায়না দেখেছো, হায়না

মা : না।

নীলকণ্ঠ : বড় বীভৎস তাদের দেখতে। দু-কষ বেয়ে ঝরে শুধু রক্ত, রক্ত আর রক্ত।

মা : বাবা—!

নীলকণ্ঠ : তোমার হারিয়ে যাওয়া সন্তান যদি ওই হায়নার কবলে পড়ে—

মা : (আর্ত চিৎকার) না...

নীলকণ্ঠ : মা, তোমার হারিয়েছে সন্তান আর আমার হারিয়েছে সম্মান। আমার হারিয়ে যাওয়া সম্মান হয়তো কোনোদিন ফিরে পাবো, কিন্তু তোমার সন্তান?

মা : তবে কি আমার সোমা...

নীলকণ্ঠ : না, না, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চলো তোমার সোমাকে

খুঁজে দেখি। চলো চলো, সোমা...

মা : সোমা, সোমারে.... (ডাকতে ডাকতে উভয়ে চলে যায়)

জীবন : পবিত্র!

পবিত্র : বলুন স্যার!

জীবন : কী ভাবছো?

পবিত্র : খুঁজতে খুঁজতে এক সময় তো ওনারা খুঁজে পাবেন, কিন্তু ওই দৃশ্য দেখার পর মা কী করবেন?

জীবন : সব সন্তানহারা মায়েরা যা করেন তাই করবেন।

পবিত্র : স্যার, তবে কি—

জীবন : এখন গভীর রাত, জমাট অন্ধকার দু-পায়ে মাড়িয়ে সূর্য ওঠার লক্ষ্যে নতুন সকালের দিকে এগিয়ে যেতে হবে পবিত্র।

(নেপথ্যে মা ও নীলকণ্ঠবাবু পর্যায়ক্রমে ডাকতে থাকেন—
সোমা, সোমারে....)

জীবন : পবিত্র!

পবিত্র : বলুন স্যার।

জীবন : তোমার ছাতাটা গুটিয়ে রেখেছো কেন? ছড়াও।

পবিত্র : ছাতা আর ছড়াবে না স্যার।

জীবন : কেন?

পবিত্র : তাহলে ওই প্রখর রোদের তাপটা যে অনুভব করতে পারব না।

জীবন : পবিত্র!

পবিত্র : আজকের এই সময়টুকু আমাকে যে অনেক শিক্ষা দিল স্যার। তাই—

জীবন : জানো পবিত্র, শুধু মেয়েটি একা পালিয়ে বাঁচতে পারতো, কিন্তু ও তা করেনি, সবাইকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

(নেপথ্যে আবার মা ও নীলকণ্ঠবাবু পর্যায়ক্রমে ডাকতে থাকেন)

পবিত্র : এখনো ওনারা খুঁজে পাননি। আমি যাব স্যার?

জীবন : না। ওনাদেরই খুঁজতে দাও। ওনারা ঠিক খুঁজে বার করবেন। (দূরে তাকিয়ে) আচ্ছা পবিত্র ওই দূরে দেখ তো কারা যেন নদীর ধারে ধারে ছুটতে আসছে না?

পবিত্র : (দূরে তাকিয়ে) হ্যাঁ স্যার, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

জীবন : ওদের এদিকে ডাক তো।

পবিত্র : কী বলে ডাকবো স্যার?

জীবন : কেন, ভাই বলে ডাকো, বোন বলে ডাকো।

পবিত্র : ও ভাই... ও বোন, একবার এদিকে এসো তো।

জীবন : ওই দেখ, ওরা এদিকেই আসছে।

(ছুটতে ছুটতে আসে ধ্রুব ও আলো)

উভয়ে : আমাদের ডাকছিলেন?

জীবন : হ্যাঁ। (ধ্রুবকে) তোমার নাম কী বাবা?

ধ্রুব : আজ্ঞে, ধ্রুব।

জীবন : ধ্রুব। 'ধ্রুব' শব্দের অর্থ স্থির। অনন্ত সত্য। (আলোকে) তোমার নাম কী মা?

আলো : আজ্ঞে আমার নাম আলো।

জীবন : আলো, আলো। 'আলো' মানে দীপ্তি। যা অন্ধকারে পথ দেখায়। আজ অনন্ত সত্যের হাত ধরে তাই আলোর যাত্রা।, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সূর্যের সন্ধানে যাত্রা। সূর্যের সন্ধানে।

ধ্রুব : শুধু আমরা দু-জনই নই, ওই দেখুন। ওই পাড়াটার কাছে জমা হয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। আরও আসছে পিছনে।

জীবন : আসবে, আসবে। আসতেই হবে। কারণ, মানুষ যে আলো চায়। অন্ধকারে থাকতে পারে না।

আলো : ওদিকে চেয়ে দেখুন, মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

জীবন : বাড়বে, বাড়বে মা, বাড়বে। অব্যক্ত এক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মানুষ থমকে ছিল কিছুদিন। আজ সমস্ত যন্ত্রণা বুকে চেপে যন্ত্রণাকাতর মানুষ বেরিয়ে এসেছে প্রতিবাদে মুখর হয়ে।

আলো : পৃথিবীর কোনো পশুশক্তি পারেনি প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠকে চেপে রাখতে। আজও পারবে না।

জীবন : দেখি, দেখি আর একবার তোমার মুখটা দেখি তো মা। (দু হাত দিয়ে আলোর মুখটা ধরে)। এই জন্যই তো তোমার নাম আলো—দীপ্তি। পারবে, পারবে, তোমরাই পারবে নতুন পথের দিশা দেখাতে। (আবেগ) কে বলে যুবশক্তি প্রতিবাদ হারিয়েছে? মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

পবিত্র : স্যার—

জীবন : তুমি কী করবে পবিত্র?

পবিত্র : জীবনের গতি তো সামনের দিকে। পিছনে কি হটে যাওয়া যায় স্যার?

জীবন : সাবাস পবিত্র। 'পবিত্র' মানে তো নিষ্কলুষ। তাই তুমিও পারবে সামনে দিকেই এগিয়ে যেতে। কিন্তু—

পবিত্র : কী স্যার?

জীবন : ভাবছি, ওঁরা তো এখনো কেউ এলেন না। তবে কি...

(শান্ত, ধীর নীলকণ্ঠবাবু আসেন)

নীলকণ্ঠ : আমি এসেছি মাস্টারমশাই।

জীবন : নীলকণ্ঠবাবু আপনি—

নীলকণ্ঠ : হ্যাঁ, কয়েক মিনিট আগের সে নীলকণ্ঠ মজুমদার আমি নই মাস্টারমশাই।

জীবন : নীলকণ্ঠবাবু!

নীলকণ্ঠ : সম্মানের ওপর চরম আঘাত আমাকে সাময়িক উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু ধর্ষিতা সোমার ক্ষতবিক্ষত দেহ আর তাকে ঘিরে প্রতিবাদী মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ আমার সম্বিত ফিরিয়ে দিয়েছে মাস্টারমশাই।

(আসেন মা)

মা : (ডাকতে ডাকতে) মাস্টারমশাই... মাস্টারমশাই... (জীবনবাবুর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েন? ওরা আমার সোমাকে... (কান্নায় ভেঙে পড়েন)।

জীবন : জানি মা, আমি সব জানি।

মা : এখন আমি কী করব, কাকে নিয়ে আমি থাকব মাস্টারমশাই। আমি যে—

আলো : (কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে) মা—

মা : (ধীরে ধীরে উঠে) কে—কে তুই?

আলো : আমি মা—

মা : কী বললি, মা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মা, তুইই তো আমার সোমা। সোমারে (আলোকে জড়িয়ে ধরে) আর আমার বুক থেকে তোকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। না, না, না।

জীবন : পবিত্র—

পবিত্র : বলুন স্যার।

জীবন : দেখ তো ওই গাছটা আগের চেয়ে সজীব মনে হচ্ছে না?

পবিত্র : হ্যাঁ, স্যার, হ্যাঁ।

জীবন : আবার ওই গাছে পাতা গজাবে, আবার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছায়া দেবে অজস্র মানুষকে।

পবিত্র : দেবে স্যার, দেবে।

জীবন : ওই শোনো জনকল্লোল, ওখানে স্পন্দিত হচ্ছে প্রাণের স্পন্দন। ওই শোনো ওরা বলছে— (নেপথ্যে বহু কণ্ঠে—আর আমরা কোনো সোমাকে এমনিভাবে হারিয়ে যেতে দেব না।)

মঞ্চে সকলে : না, হারিয়ে যেত দেব না। দেব না।

জীবন : এবার চলো আমরা মিশে যাবো ওই জনতার মাঝে। ওখানে ঘোষিত হচ্ছে নতুন বার্তা। ওখানেই উঠবে সূর্য, নতুন সূর্য।

নীলকণ্ঠ : *ফায়ার উই নিড*
ইনস্টেড অব ফ্লাওয়ার,
অন আওয়ার মার্চ টু দ্য সান,
অ্যালং দ্য হার্ডি উইন্টার নাইট
এ হ্যান্ডসাম মর্নিং সিওর টু কাম।

জীবন : *সূর্য সন্ধানে—সূর্য প্রাপণে*
ফুলের বদলে চাই অগ্নিদাহন,
কঠিন শীতার্ত রাত্রি শেষে
পাওয়া যাবেই বসন্তের সূর্যতোরণ।

(সকলে হাতে হাত ধরে বজ্রমুঠি তুলে দাঁড়ায়। নেপথ্যে গান : 'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে এ পথ চেনা।' পারলে শিল্পীরাও গাইবে।

বি.দ্র. : ইংরেজি কবিতাটি সত্তরের দশকে 'টিচার্স জার্নাল'-এর একটি সংখ্যা থেকে নেওয়া। বঙ্গানুবাদ : সংকটতারণ মণ্ডল)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

করন্দা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ করন্দা, জেলা : বর্ধমান

স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণের সুব্যবস্থা করা হয়।
রাসায়নিক সার সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

Sl. No. 5

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সরকার সাপ্লায়ার

এখানে সিমেন্ট, বালি, পাথর ও স্যানিটারি সরঞ্জাম সুলভে পাওয়া যায়।
প্রোঃ সুভাষ সরকার

সারগড়িয়া, অষ্টঘড়িয়া, কালনা

Sl. No. 136

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

প রি তৃ প্তি র শে ষ ক থা

ফ্রেন্ডস ক্যাটারার

(আমাদের কোনো শাখা নেই)
প্রোঃ সুজিত দে

ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯০৯৩৬০৯০৪৮, ৯৪৩৪৫৭৬৪২৯

Sl. No. 137

With best compliments of

Nivedita Rice Mill

Ph : (Office) 0342-2664248, 2664389
Fax : 0342-2560386
Factory : 0342-2454250, 2454760
Mob : 9434003339, 9434188670, 9434015583

Sl. No. 93

সাহেবগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত পাঠাগার

স্থাপিত : ১৯৭৮ : গ্রাম ও পোঃ ওড়গ্রাম, বর্ধমান

গ্রন্থাগার হল জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারে আসুন।। বই পড়ুন ।। বই পড়ান

বইয়ের বিকল্প বইই। মিডিয়া নয়।

ননীগোপাল রায়	**সুকান্ত ভট্টাচার্য**	**কাজী গোলাম মোবিন**
সভাপতি	*সম্পাদক*	*গ্রন্থাগারিক*

Sl. No. 93

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

BRM

Bhadreswar Rice Mill

....WE CARE FOR YOUR HEALTH....

পারাজ, গলসী, বর্ধমান-৭১৩০৪৩, প.ব., কাস্টমার কেয়ার : ৯৯৩৩৩৪৬১১৭

Sl. No. 66

With best compliments of

CHAND BRAND

STONELESS SILKY SORTEX RICE

Mfg. & Mktd. by:
DESHBANDHU RICE MILL
Bhasapool, Pursa, Galsi, Dist. Burdwan
Contact : 9153123223, 9153335523, 9153095292

Sl. No. 57

কোঙ্কন উপকূলের কোল ঘেঁষে

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

লোনা বাতাস ও লোনা ঢেউয়ের বিরামহীন প্রতিশ্রুতি নিয়ে সুনীল সাগর অপাঙ্গে বিছিয়ে নাগালের ঠিক কাছটিতে। ছবি আঁকার খাতারই কোনও প্যাস্টেল রঙ ছেঁড়া পাতাটাই যেন হুবহু চোখের সামনে। দুপুরের চেনা বিহ্বলতা গড়িয়ে যাচ্ছে। মাধুর্যের আছে বিকেল নামছে। আমরাও ভেসে যাচ্ছি এই মুহূর্তে প্রকৃতির অবিলতায়। পায়ের পাতায় ধেয়ে আসছে খুনসুটি প্রবণ দুরন্ত ঢেউগুলো। বালুতট ছেড়ে পর্যটকদের পদক্ষেপগুলি মুখে নিয়ে একান্তে ফিরে যায় ঢেউয়ের অনন্ত কোলাহল।

কখনও কখনও আনকোরা অচেনা ভালোলাগা একটা মিহি সুবাস বুকে এসে ধাক্কা মারে। ঋদ্ধ করে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ মুম্বাই মহানগরে থাকার সুবাদে, ফ্ল্যাটবাড়ির এই চেনা চৌহদ্দিটাই যখন নিতান্ত গতানুগতিক ও তুচ্ছ মনে হয় তখনই মনপবনের নাওয়ে ভেসে যাওয়ার উস্কানি দেয় প্রকৃতিপাগল মন। দুদণ্ড জিরেন নেওয়ার ঠেক তো কতই রয়েছে মুম্বাইয়ের কাছে পিঠে। সহ্যাদ্রীর চুড়ান্ত সবুজ, কোথাও কবিতার মত আদিগন্ত উপত্যকা। উছল নদী বাঁক কিংম্বা বন্যপ্রাণী ঘেরা অভয়ারণ্য। পুরাতনী কেল্লা অথবা ইতিহাস। সফেদ অথবা সোনালী বালির উঠোন পেরিয়ে সমুদ্র শরীরের একান্ত স্পর্শ জড়িয়ে উপভোগ করে যাওয়া ঢেউ ভাঙার ছলাৎছল।

কোঙ্কন উপকূল নিয়ে লিখতে যেয়ে এটা মনে হল যে, আপাত নাম না জানা, কিংবা আবছা জানা আবছা শোনা কত দর্শনীয় স্থানই তো মহারাষ্ট্রের পর্যটন মানচিত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। তার কতটুকুই বা খোঁজ রাখি আমরা? ব্যক্তিগত কথায় বলি, নেহাৎই বছর চারেক মুম্বাইতে পরিবারের কর্মসূত্রে রয়েছি। সেজন্যই বোধহয়, একান্ত ভ্রমণরসিক মন নিয়ে আমাদের এই খোঁজ না রাখার দ্বিধা সরিয়ে কখনও সেই আবছা শোনা জায়গাগুলোয় পৌঁছে যাই। আমাদের সুরেলা সফরনামায় সেই স্থানটাই তখন মনের কুঠুরিতে চিরকালীন জায়গা করে নেয়।

কোঙ্কন উপকুলের এমনই সব অ-দেখা অপাপবিদ্ধা সমুদ্র সৈকত—যেখানে দূরের গহিন নীলাভ আর নিরবচ্ছিন্ন মিহি বালুতটে সাগরের ঢেউগুলোর নিরন্তর খেলাধুলো। ভ্রমণের ছাড়পত্র নিয়ে কোঙ্কন উপকুলের মানচিত্র হাতরাই। মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকূল বরাবর অনাঘ্রাতা অনেকগুলি সৈকত। দু-চার দিনের ছোট্ট ছুটিতে লালিত ইচ্ছে সকল জড়ো করে বাউন্ডুলে মন মুখিয়ে তো থাকেই বেরিয়ে পড়ার নানা বাহানা নিয়ে। জীবনের কিছু কিছু অপ্রাপ্তিকে সাময়িক মলম হিসেবেই লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়া দারুণ ফল দেবে। ওই পশ্চিমঘাট-আরব সাগর নদী জঙ্গল উপত্যকা মুহূর্তগুলো অকপটে নিজের সাথে ভাগ করে নেওয়া আর কী।

কোঙ্কন উপকূলে এমনই এক চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে গণপতিপুলে শান্ত নিরালা প্রকৃতির সাথে সোনালী সৈকত ও ধর্মীয় পরিমণ্ডল। এই ত্রয়ী স্পর্শে গণপতিপুলের চিত্তাকর্ষক বৈভব। মুম্বই থেকে কোঙ্কনকন্যা এক্সপ্রেসে দারুণ যাত্রাপথের পুরোটাই। মুম্বই থেকে রত্নগিরি হয়ে গণপতিপুলে পর্যন্ত সমস্ত সফরনামাই সাজানো চিত্রনাট্যের খাতা। সেখানে সবুজ আছে, নীল আছে, রোমান্স আছে, রম্যতা আছে, শৈল্পিক বনেদিয়ানা আছে। প্রায় শ'খানেক বাড়ি ঘর নিয়ে সবুজে ছাওয়া ছোট্ট এই গ্রাম।

চারশো বছরের প্রাচীন 'স্বয়ম্ভু' দেবতা গণপতি থেকে এসেছে স্থানটির নাম। মারাঠি শব্দ 'পুলে' মানে হল বেলাভূমি। সহ্যাদ্রীর পাদদেশে পবিত্র মন্দির। ভক্তদের ভিড়ে সদাই ব্যস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ। পরিব্যপ্ত মন্দির প্রাঙ্গণের প্রধান ফটক ছাড়াও সাগরপানে একটা দ্বার আছে। ভারতীয় হিন্দু সমস্ত মন্দিরই সাধারণত পুবমুখী হয়। ব্যতিক্রমী গণপতিপুলের পশ্চিমমুখী গণপতি বাপ্পার অধিষ্ঠান। প্রথামত ভক্তরা সমগ্র মন্দির ও প্রায় একশো মিটার উঁচু পাহাড়ি অধিত্যকা প্রদক্ষিণ করেন।

কোঙ্কন উপকুলের লাবণ্য ও সাগরজলের রূপকথা নিয়ে মনোহর রূপে এলিয়ে আছে গণপতিপুলে সৈকত। সাগরের কাছটিতে এলেই পায়ে পায়ে মেতে থাকে নিপাট নির্জনতা। কখনও ঢেউয়ের কোমল বাচালতা। তারপরই স্বচ্ছ স্ফটিক জল। মাঘ, চতুর্থী গৌরী গণপতি উৎসব এবং 'অঙ্গার-কি-চতুর্থী' উৎসব শুধু দেখা নয়, মন ক্যামেরায় টুকে রাখার মতো উৎসব। গণপতিপুলে থেকে প্রায় ৩৫ কিমি দূরে রয়েছে সতেরোশ শতকে নির্মিত জয়গড় দুর্গ। সঙ্গমেশ্বর নদী ও কোঙ্কন উপত্যকা ও সাগরবেলার নিসর্গ ঝলক অপরূপ দেখায় দুর্গ থেকে। সঙ্গমেশ্বর ও জয়গড় খাঁড়ি ধরে জলজ মহিমার সাথে গল্প করেই নৌবিহারের কিছুটা সুন্দর সময় কেটে যাবে।

নারকেল গাছের বিজন ছায়ায় সাগরতটের আবহমান চেনা ছবি নিয়ে কোঙ্কন উপকূলের আরও একটি নিভৃত সৈকত ভেলনেশ্বর। তরঙ্গ তরঙ্গে খেলাচ্ছলে ওই সাগর নীল। এখানে দো-চালা একটি শিবমন্দির রয়েছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলাও হয় এখানে। সেই উৎসবের শুভক্ষণে অফুরান আলোকিত হয়ে ওঠে ভেলনেশ্বর নামের নিরালা গ্রামটি। আরবসাগরের নিরালায় পুরোদস্তুর মায়াময় পর্যটন নিয়ে দু-এক রাতের অবকাশ কেটে যাবে ভেলনেশ্বর সৈকতের সাথে, সফর ও প্রকৃতিপাঠ যেখানে সমার্থক হয়ে ওঠে।

রত্নগিরির সবুজ পাহাড়স্থলির প্যালেটে নানাবিধ সবুজের বুনন। পুব দিকে ঘন সবুজাভার বর্ণময়তায় ছাওয়া পশ্চিমঘাট, পশ্চিমে অতলান্ত আরবসাগর। দুইয়ের মাঝে বিস্তীর্ণ কোঙ্কন উপত্যকায় মহারাষ্ট্রের অন্যতম সৈকতশহর রত্নগিরি নিজস্ব রম্যতায়। মহাভারতের পাতায় উল্লেখ আছে পান্ডব ভ্রাতারা তাদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস পর্ব শেষে এইস্থানে এসেছিলেন। ভারতের অন্যতম স্বতন্ত্র্য সংগ্রামী বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মভূমি রত্নগিরিতে। লোকমান্য তিলক স্মারক ভবনটি এক বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থান যেটিকে স্থানীয় প্রশাসন অতি সুন্দরভাবে পরিচর্যা করে রেখেছেন। বাড়ির বাঁদিকে তিলক-এর পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তি রয়েছে এবং বাড়ির ভেতর তিলক স্মারক সংগ্রহশালাও রয়েছে। মারাঠা রাষ্ট্রবিপ্লবী বীর সাভারকর প্রধানত স্থানীয় অব্রাহ্মণদের জন্য রত্নগিরিতে পতিত পাবন মন্দিরটি নির্মাণ করেন। দুই পাহাড় জুড়ে প্রাচীন রত্নগিরি কেল্লাটিও ইতিহাসের স্বাক্ষবহন করে চলেছে। রত্নগিরির শহর ও শহরতলিতে আরও অনেকগুলি অপরূপ সৈকত রয়েছে—মান্ডভি সৈকত, হোয়াইট সৈকত, ব্ল্যাক সৈকত, ভাটে সৈকত। প্রতিটি সৈকতই নিজস্ব সুষমায় অপরূপ।

মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলার ভেনগুরলা তালুকে আরবসাগরের কোল জুড়ে কাব্যময় রাত্রিদিনের মতো নিরালায় বিছিয়ে আছে সাগরতীর্থ নামের অচেনা সৈকত-সমৃদ্ধ ছোট্ট গ্রামের ঠিকানা। অনুচ্চ পাহাড়টিলা, কাজু ক্ষেত, নারকেলবীথির নুয়ে পড়া ছায়ায় সে গ্রামটির পথ গেছে আরবসাগরের স্ফটিক স্বচ্ছ জলগাথায়।

লোনা হাওয়ায় মাখামাখি শরীর। চোখের সামনে নীল জলরাশির রঙ বদলানোর খেলা, নারকেল বীথি ঘেরা নিঃসীম নির্জনতায় সামিল হবো বলেই তো মুম্বইয়ের ব্যস্ত জীবন থেকে সামান্য অবকাশে অচেনা এই সাগর তল্লাটে আসা।

জেলে বসতি নিয়ে কয়েক ঘর পরিবার। সামুদ্রিক শস্যই যাদের রুজি-রুটি। রাত থাকতেই যে নৌকাগুলি অতল সাগরে পাড়ি জমিয়ে ছিল, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই তারা ফিরে আসে তীরে। নৌকা বোঝাই রূপালী শস্য। পাশের ঝুড়িতে জমা পড়ছে নানা প্রজাতির লোনাজলের মাছ—বাংরা, বম্‌বিল, জিঙ্গা, মুরমাঈ।

ভেনগুরলা তালুক

কোঙ্কনি কোস্টাল কারি হিসেবে খুবই উপাদেয় এই মাছগুলি। মৎসজীবী পুরুষগুলির পরণে তিনকোনা, রঙিন, খেটো লুঙ্গি। মাথায় ফেট্টি দেওয়া রঙচঙে রুমাল। কানে মাকড়ি, গলায় মোটা গহনা। একদম গোয়ানিজ লুক।

যমজ গ্রাম সারাভলি-সিরোদা, সাগরতীর্থ সৈকতের কাছেই। মন্দিরশহরও বলা হয় এই যমজ শহরকে। শতাব্দী প্রাচীন পবিত্র রাভলনাথজী মন্দির ও বিঠোবা মন্দির রয়েছে, মারাঠি হিন্দু অধ্যুষিত এই অঞ্চলটিতে। যথেষ্ট সমৃদ্ধ এখানকার প্রাচীন ইতিহাসও। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীর নেতৃত্বে 'লবণ আন্দোলন' হয়। তার শুভসূচনাও এই সিরোদা অঞ্চলে।

খুব কাছেই আরও কিছু অনাঘ্রাতা সৈকত। এমনও হতে পারে, মাত্র একটি বেলার নৌসফরে সারেঙ্গদের সাথে গল্প জুড়ে সাগরের বুকে পাড়ি জমিয়ে ঘুরে আসা—মোচেমার বিচ, দেওবাগ বিচ, নিভাতি বিচ, ভাগাতোর বিচ, রেডি বিচ। মাঝ সাগর থেকে দুরের ওই সৈকতগুলি যেন ক্যালেণ্ডারের ছবি। সাগরজলের গহিনে সামুদ্রিক নীল রঙেরই নানান শেড শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা নিখুঁত ছবির মতই মনোলোভা।

আলিবাগ সৈকতে ঢেউয়ের সাথে গল্প করতে করতেই নৈঃশব্দের অতলে পৌঁছে যাওয়া। যদিও নৈঃশব্দ তো শুধুমাত্র একান্ত মনে। ওদিকে সৈকত জুড়ে হুল্লোরে মাতোয়ারা তামাম পর্যটক। দুর তো তেমন কিছু নয়। নিজস্ব বাহনে অথবা গাড়ি ভাড়া করেই চলে আসা যায় দক্ষিণ মুম্বই থেকে শ'খানেক কিমি দূরে আলিবাগ সৈকতে।

মারাঠি শব্দ 'আলিচি বাগ' অর্থাৎ আলিসাহেবের বাগান। একসময় এখানে অতি সম্ভ্রান্ত বেনে ইসর‍্যাইলি জিউস আলি নামে এক ব্যক্তির বাগিচা ভরা আম ও নারকেলের গাছ ছিল। স্থানীয়রা সেই থেকেই 'আলিচি বাগ' থেকে ক্রমে অপভ্রংশ হয়ে 'আলিবাগ' বলতে থাকেন। আলিবাগ এলাকাটি 'শ্রীবাগ' নামেও পরিচিত।

যে সাগরজল, জোয়ারের সময়ে এক্কেবারে ছাপিয়ে আসে পাড়ে, ভাটার টানে আবার সরেও যায় অনেক পিছিয়ে। সমুদ্রের জলে এমন জোয়ারভাটার খেলা উদায়াস্ত চলতেই থাকে। তখন ওই ভেজা বালুকাবেলা পেরিয়ে, সামনের হাঁটুজল ভেঙে সাগরপানে খানিক সেঁধিয়ে যাওয়া যায়।

আলিবাগের অন্যতম আকর্ষণ তো সেখানেই। আলিবাগ বেলাভূমি থেকে প্রায় দেড় কিমি দূরে সাগরের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজি নির্মিত কোলাবা দুর্গ। ব্রিটিশ, পর্তুগীজ নৌ-সেনাদের ওপর নজরদারি ও জলদস্যুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শিবাজি ১৬৫২ সালে দুর্গটি নির্মাণ করেন। সাগরের নোনা জলের মাঝে কোলাবা দুর্গটি ভেসে থাকলেও, দুর্গ অভ্যন্তরে মিষ্টি জলের কুঁয়ো আছে। ভাঁটার সময় ঘোড়ার গাড়িতে চড়েও দুর্গতে যাওয়া যায় আবার জোয়ারের সময় নৌকায় যাতায়াতের প্রয়োজন হয়।

আলিবাগে মুম্বই, পুনে ও নগরতলির রহিস আদমিরা মহার্ঘ সব বাংলো বানিয়ে রেখেছেন। এখানে কিছুটা দূরে দূরেই আরও অনেকগুলো সৈকত আছে। যেমন ৩ কিমি দূরে আকাশি বিচ যেখানে সোমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও আছে। নারকেলবীথি ছাওয়া রেওয়ান্দা বিচ, ১৩ কিমি, ৭ কিমি দূরে নাগাঁও বিচ, কিংবা ১১ কিমি দূরে কিহিম, ১৮ কিমি দূরে মান্ডয়া বিচ। লোনা চর জুড়ে যেখানে সাগরের গা ঘেঁষাঘেঁষি প্রেম।

পায়ের পাতায় আলতো চুম্বন করে লাজুক মৃদুতায় সরে যায় নেহাতই ছোট্ট ঢেউগুলো। নিরীহ ঢেউরা জোয়ারের জল মাখতেই উতলা হয়ে ওঠে। তিন দিক সাগর ঘেরা আলিবাগকে পর্যটকরা আহ্লাদে বলেন—'মহারাষ্ট্রের গোয়া'।

আলিবাগ সৈকত

দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকূলের তারকারলি সৈকতকে 'সৈকতের রানি' বলা হয়—কথাটি যে একেবারেই অত্যুক্তি নয়, সাগরতটে এসেই বোঝা গেল। স্বচ্ছ নীল জল আর ছোট ছোট ঢেউ এসে আপনমনে খেলা করে যাচ্ছে বালিয়াড়ির বুকে। মাল ভান থেকে দেওবাগ ৮ কিমি টানা এই বালুকাবেলা। চোখ জুড়ানো সৈকত। তারকারলির সমুদ্র দুর্নিবার হাতছানি এক আদুরে ঢংয়ে। নীল আকাশের নিচে ফিরোজা নীল সমুদ্র, প্রশস্ত বেলাভূমির আকর্ষণ উপেক্ষা করা যায় না। বাড়ির বাইরে বেড়াতে এসে যাঁরা নির্জনতা পছন্দ করেন তাঁদের জন্য আদর্শ গন্তব্য মহারাষ্ট্রের এই অনাঘ্রাতা সৈকত। সমুদ্র এখানে একেবারেই উত্তাল নয়। বালিয়ারিতে পর্যটকদের জন্য প্যারাগ্লাইডিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া উটের পিঠে সওয়ার হয়েও সহিসের তত্ত্বাবধানে কয়েক পাক ঘুরে নেওয়া যায়। ঢেউয়ের আসা-যাওয়া দেখতে দেখতেই কেটে যায় সময়ের অনেকখানি।

'ভার্জিন বিচ' নামেও খ্যাত তারকারলি সৈকত। অনাঘ্রাতা এই সৈকতের ৩ কিমি দূরেই ঘন নীল জলের কারলি নদী। দুই তীরে তার নারকেল-বীথি আর লাল টালি দেওয়া ঘরবাড়ি। সিন্ধুদুর্গ জেলার কসাল নদী, কালি নদী, সুকাইভর নদী, পীতধবল নদীরা এসে একে অন্যের সাথে মিশে কারলি নদী নামে আরও ব্যপ্ত হয়েছে এবং কারলি নদীটিও এসে নিজেকে সঁপে দিয়েছে সাগরের বুকে। সাগরের বেলাভূমিতে বাঁশ ও শুকনো নারকেল পাতার ছাউনি ঘেরা বসার জায়গায় ধূমায়িত কফির ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে কফি ঢেলে, আয়েসি চুমুক দিতে দিতে চেয়ে থাকতাম স্বচ্ছ সাগরের দিকে, নির্নিমেষ। সাদা মিহি বালির চর জুড়ে সাগরের অবিরাম গুণগুণ গান। মন ভালো লাগায় মেদুর হতে থাকে। সাধেই কী আর তারকারলি সৈকতকে পর্যটকরা ভালোবেসে বলেন—'তাহিতি অব ইন্ডিয়া'।

মধ্যাহ্ন বা নৈশাহারে রিসর্টের ডাইনিং হলে কাঠের বেঞ্চ ও টেবিলে বসে খেতে খেতেও অপলক তাকিয়ে থাকা সাগরের দিকে। এখানে প্রায় সমস্ত খাবারই সনাতনী মালভনি রন্ধনশৈলীতে তৈরি। এসব অঞ্চলের প্রতিটি রান্নায় এক ধরনের 'মালভনি মশলার' ব্যবহার হয়। মশলার প্রলেপে মাখোমাখো মালভনি 'কোলম্বি' মানে চিংড়ির পাদ, কোলম্বি তাওয়া ফ্রাই, কোলম্বি পুলাও, খেক্‌ড়া মশালা, জওলা শুখি চট্‌নি, তিখচ্যা মশলা—প্রতিটি মালভানি রেসিপি বেশ স্পাইসি। এদের ভেজ কোলাহপুরী, মশালা ভেন্ডি, ঔল্যা কাজুচি ওসল্ বা ওয়ালাচি ওসল, পিথালে, বরণ (ডাল), ভরলেলি ভাংগি সমস্ত মালভনি খাবারেরই স্বাদ নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। খাওয়ার মাঝে নিয়ম করে পরিবেশিত হয় ছোট্ট স্টিলের বাটিতে 'সোল কারি'। নারকেলের দুধ দেওয়া এই পানীয় হজমে সহায়তা করে। গোলাপি রঙা 'কোকম' তরল চাটনিও এর সঙ্গে পরিবেশিত হয়। এছাড়া ফ্রায়েড পমফ্রেট, ম্যাকারেল, ক্লামস্, লবস্টার এবং শ্রিম্পস্ এগুলোতো সনাতনী মালভনি রান্নার এক একটা চমৎকার পদ। প্রধানত নারকেল দুধ, ডাবের শাঁস বেটে টাটকা সামুদ্রিক মাছের রান্নাগুলো নিজস্ব মালভনি প্রথায় তৈরি করা হয়।

রিসর্ট থেকে অটোরিক্সায় ২ কিমি দুরেই তারকারলি খাঁড়ি। সেখান থেকে নৌকা ভাড়া করে ঘুরে আসা যায় দেওবাগ সৈকত, তারকারলি মোহনা, নিভাতি সৈকত, সুনামি আইল্যাণ্ড। গভীর সাগর মাঝে মোটরবোট যখন ঢেউয়ের উদ্দাম তালে স্রেফ মোচার খোলের মতো দুলতে থাকে, ভয় হয় বেজায়। অজানা আশঙ্কায়। তবে ঢেউয়ের তালে তালে মোটরবোটে বিনোদনী নৌ-সফরের রসদটুকুও থেকে যায় জীবনভর। এই যেমন, সে কথা খাতার পাতায় লিখতে যেয়েও হঠাৎই টের পাই আবার সলিল-সাগরে সেই দুলুনির আভাষ।

সন্ধের আলোয়ান মুড়ে আঁধার ঘনিয়ে আসে তারকারলির বুকে। দিকচক্রবাল থেকে উড়ে আসা সামুদ্রিক পাখিগুলো পাম ও ক্যাসুরিনার ডালে এসে থিতু হয়। সৈকতের নিরিবিলি প্রাকৃতিক নির্জনতা আর ঢেউ ভাঙার ছন্দ উৎসবের সঙ্গেই লেগে থাকে লোনা সামুদ্রিক ঘ্রাণ। রাত বাড়ে। তারকারলি ঘুমিয়ে পড়ে। লোনা হাওয়া ও সাগরপাড়ের ঢেউ-বালিয়াড়ির মৃদু সংলাপ গুঞ্জরণ লেগে থাকে পর্যটক কানে। তারকারলি সাগরের ঢেউ ও চাঁদ এখন চুম্বন সহবাসে...।

With best compliments of

Leasership
through innovation

SRMB SRIJAN LIMITED

DURGAPUR WORKS
Sagarbhanga, Durgapur 713211, Dist. Burdwan
Phone + 91(0343) 6450788 / 645 0877
Fascimile : +91 (0343) 255 9206 / 255 9205

Sl. No. 152

With Best Compliments of

FRIENDS CONSTRUCTION

DURGAPUR, BURDWAN

Sl. No. 148

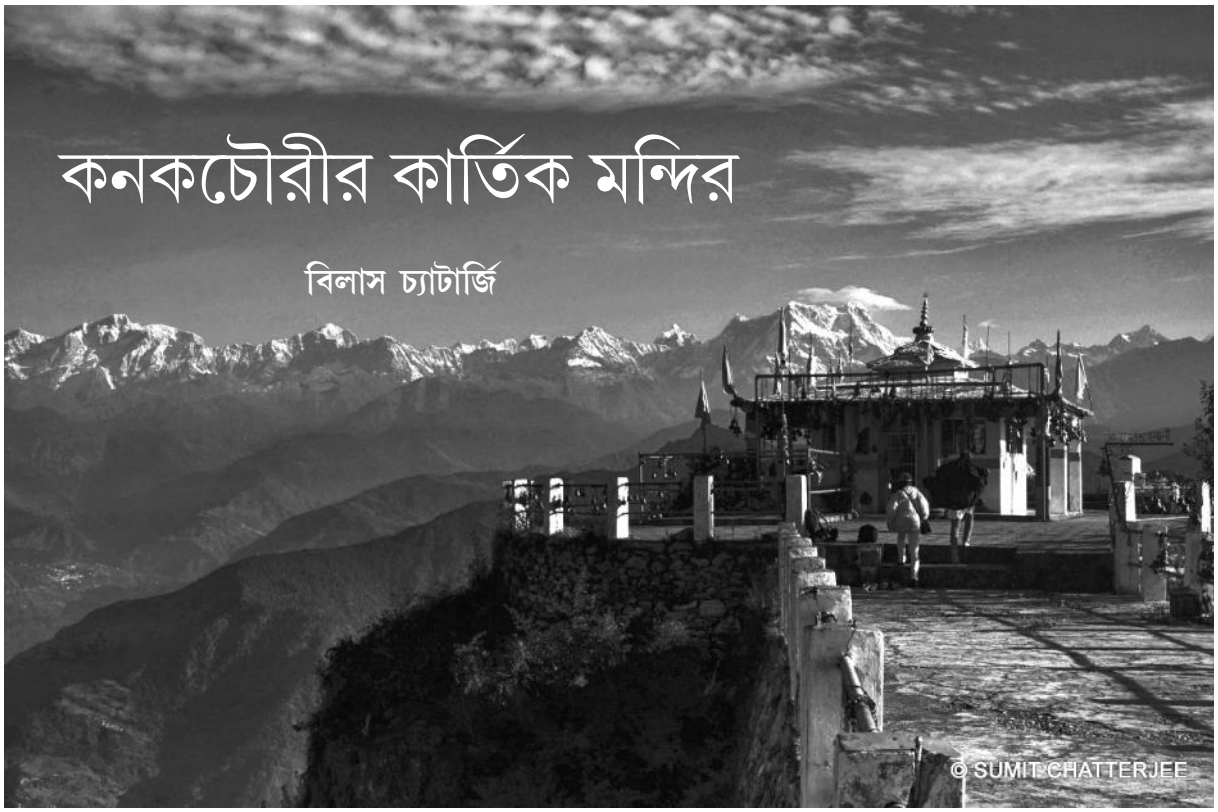

কনকচৌরীর কার্তিক মন্দির

বিলাস চ্যাটার্জি

কৈলাসে মা দুর্গা একদিন তাঁর দুই ছেলে কার্তিক ও গণেশের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে তাঁদের আদেশ দিলেন বিশ্ব পরিক্রমা করে আসতে। কে আগে এই পরিক্রমা শেষ করে ফিরে আসতে পারে তা তিনি দেখবেন এবং বিজয়ী ঘোষণা করবেন। কার্তিক প্রায় সাথে সাথেই তাঁর ময়ূর বাহনে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু গণেশ অনেক চিন্তা করে এটা বুঝল যে তাঁর পক্ষে কার্তিকের সাথে এই যাত্রায় পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন পিতামাতাই তাঁর কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাঁদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করলেই বিশ্ব পরিক্রমা হয়ে যায়। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। গণেশ পিতা-মাতাকে ডেকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তাঁদের প্রদক্ষিণ করে এসে মাকে বলল তাঁর বিশ্ব পরিক্রমা সমাপ্ত হল, কারণ পিতামাতাই তাঁর কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কার্তিক বিশ্বপরিক্রমা করে কয়েকদিন পর কৈলাসে ফিরে মায়ের কাছে তাঁর জয়লাভের স্বীকৃতি চাইলেন। মা গণেশের বুদ্ধির প্রশংসা করে তাঁকে জয়ী ঘোষণা করলেন।

পৌরাণিক এই কাহিনি বহুল প্রচলিত। কিন্তু তারপরের কাহিনি আমাদের জানা ছিল না। জানলাম কনকচৌরীর কার্তিকস্বামী মন্দিরের পুরোহিতের কাছে। গণেশের এই স্বীকৃতিতে কার্তিক নিজের বুদ্ধির অভাবের কথা বুঝতে পারল। নিজেকে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ করতে হিমালয়ের এক নির্জন স্থানে কঠিন তপত্যায় বসবে ঠিক করল। মা-বাবার অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে হিমালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি পর্বতচূড়ায় সাধনায় বসেন এবং সিদ্ধিলাভ করেই কৈলাসে মা-বাবার কাছে ফিরে আসেন।

কথিত আছে, গাড়োয়াল হিমালয়ের কনকচৌরীর পাহাড়ের চূড়ায় নির্জন স্থানে কার্তিক সেই কঠিন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাই সেই পাহাড়চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কার্তিকস্বামীর মন্দির।

পৌরাণিক এই কাহিনি যাই হোক না কেন, বর্তমান এই কার্তিকস্বামীর মন্দিরের স্থান নির্বাচন কিন্তু সত্যিই বিরল।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বামদিকের সেতু পেরিয়ে অপরদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে যে পথ গেছে, সেই পথে যাওয়া যায় পোখরি নামে একটি বড় জনপদে। পোখরির ৪ কিমি আগেই একটি ছোট্ট জনপদ পাহাড়ের গিরিশিরার ওপর গড়ে উঠেছে কনকচৌরী। রুদ্রপ্রয়োগ থেকে দূরত্ব ৩৬ কিমি। আবার কর্ণপ্রয়াগ থেকেও পোখরি হয়ে কনকচৌরী পৌঁছানো যায়। দূরত্ব প্রায় ৩৯ কিমি। যে

গিরিশিরাটির ওপর এই ছোট্ট জনপদটি গড়ে উঠেছে তার একটি প্রান্ত উঠে গেছে উপর দিকে প্রায় আড়াই কিমির মতো। সেই পাহাড়ের মাথায় তৈরি হয়েছে কার্তিকস্বামীর মন্দির। এই পথে পর্যটকদের যাতায়াত খুবই কম। তবে বাস বা ট্রেকার চলে স্থানীয় মানুষজনের যাতায়াতের জন্য।

বাসরাস্তা থেকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সুন্দর চড়াই পথ উঠে গেছে ওপরের দিকে। চড়াই ভেঙে উঠতে হলেও কঠিন চড়াই নয়। আর এই জঙ্গলের পথের চার পাশের দৃশ্য যা সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি, তা অবলোকন করা পথচলার ক্লান্তি নিমেষেই ভুলিয়ে দেয়। ডান দিকে চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ সহ এক ঝাঁক তুষারশৃঙ্গ গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় সমস্ত পথেই। বামদিকে স্তরে স্তরে সাজানো পাহাড়ের দৃশ্যও মনের ক্লান্তি দূর করে। আড়াই কিমি পথ চলতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টার মতো।

দু-কিমি উঠে এসে জঙ্গলের মাঝে একখণ্ড সমতল জায়গায় কয়েকটি ঘরের দেখা পাওয়া যায়। এখানেই মন্দিরের পুরোহিত বাস করেন। এছাড়াও সাধুসন্ত মানুষেরা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে কয়েকদিন থেকে যান। দু-তিনটি ঘর ধর্মশালা হিসেবে পর্যটক বা পুণ্যার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনে কম্বলও পাওয়া যাবে পুরোহিতের কাছে। এই পাহাড়ের আশপাশের ১৭টি গ্রামের বাসিন্দাদের তৈরি করা কমিটিই এই মন্দিরের পরিচালনা করে থাকেন।

এখান থেকে পরের আধ-কিমি পথ একটু বেশি চড়াই বেয়েই উঠতে হবে। শুধু চড়াই-ই নয়, পথও সংকীর্ণ। তাই একটু ভয়ভয় লাগলেও সাবধানে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলেই কার্তিকস্বামীর মন্দিরে পৌঁছানো যায়।

পাহাড়ের এই মাথাটাই মন্দির প্রাঙ্গণ। বেশ প্রশস্ত জায়গাটির চারদিক রেলিং দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের ঠিক পিছনেই প্রায় ১৮০ ডিগ্রি কৌণিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক ঝাঁক তুষারশৃঙ্গ। বামদিক থেকে পরপর জাঁওলি, গঙ্গোত্রী-৩, থলাইসাগর, কৃত্তিস্তম্ভ, কেদারনথি, কেদারডোম, মেরু, মন্দানী, জুনাকোট, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, নন্দাদেবীর মতো শৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

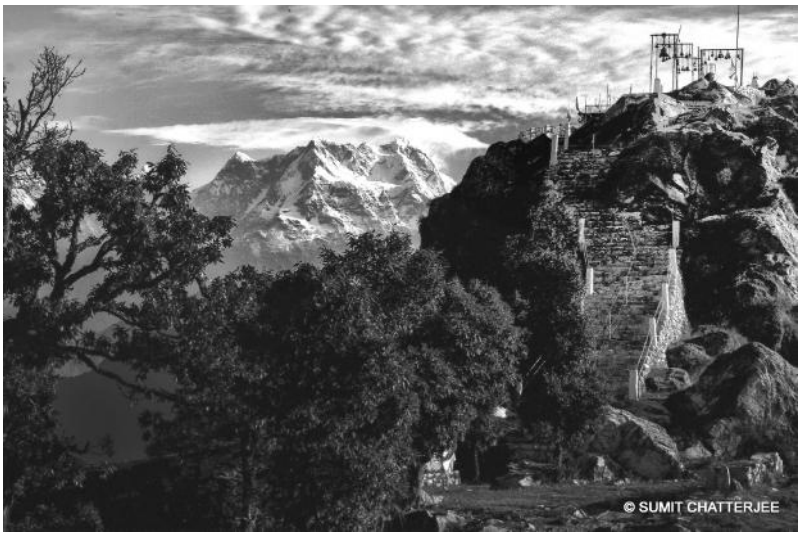

আবার বাকি ১৮০ ডিগ্রি কৌণিক কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত নজরে আসে। স্তরে স্তরে সাজানো পাহাড়ের সারি নানান রংয়ে সেজে দাঁড়িয়ে আছে। সে এক মনোরম মোহময় রূপ হিমালয়ের।

পর্যটক বেশি না আসায় সারাদিনই প্রায় মন্দিরচত্বর ফাঁকাই থাকে। নির্জন, নিরিবিলিতে এমন সুন্দর জায়গায় একটা দিন কাটাতে পারলে প্রতি মুহূর্তে কতভাবে প্রকৃতি তার রূপসজ্জা পাল্টে নতুন সাজে সেজে ওঠে তা দেখার বিরল অভিজ্ঞতা নেওয়া যেতে পারে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সূর্যের আলোয় প্রকৃতি নানান রঙে রঙিন হয় যেমন, ঠিক রাতে অন্ধকারেও পাহাড় সেজে ওঠে সভ্যতার আলোকে। তারও সৌন্দর্য নিশ্চয় আছে। আর সেই আলোকশোভায় সেজে ওঠা পাহাড়ি জনপদগুলিকে সহজেই চিনিয়ে দেয় পুরোহিত এক লহমায়। তাকে দেখার বা উপভোগ করার বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করা যেতে পারে কনকচৌরীর কার্তিকস্বামীর মন্দির চত্বরে গিয়ে।

বছরের যে-কোনো সময়েই যাওয়া যায় এই মন্দিরে। সারা বছরই খোলা থাকে মন্দির। বাসরাস্তার কাছে একটি মাত্র রিসর্ট আছে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা সহ। নাম মায়াদীপ হলিডে হোম, যদিও খরচ একটু বেশি।

বিপন্ন নারী

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

শীতের সন্ধে খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার ঘনায়। অন্ধকার গলির ক্লিনিকের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে, প্রাণপণে, প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে মিঠু। এই অন্ধকার থেকে পথে বেরিয়ে আসতে তাকে সাহায্য করেছে তারই মতো একজন অসহায়া। এই নিয়ে তিনবার তার এখানে আসা। এবার তাকে বাঁচতেই হবে। 'তাকে' বাঁচাতে হবে। স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে সোজা মায়ের কাছে। বাড়ির ভিতু মানুষগুলো কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দেয়। এইভাবে চলতে চলতে একদিন হয়তো ওরা মিঠুকে মেরেই ফেলত। তার শ্বশুর-স্বামী দু-জনেই ডানলপে চাকরি করে। শাশুড়ি-মা সমাজসবিকা। দিবারাত্র তার কাটে সভাসমিতিতে। অথচ ঘরের চারদেওয়ালে সে-ই একজন সাধারণ নারী হয় ওঠে, হয়ে ওঠে মনুষত্বহীন মানুষ। একজন অত্যাচারী শাশুড়ি। যে তার বংশের ধারক হিসেবে একজন মেয়েকে মেনে নিতে পারে না। মিঠু তাদের বোঝাতে পারেননি এরজন্য সে দায়ী নয়। ওর মন মা হতে চাইছিল। কিন্তু পরপর দু-বার অন্ধকার ক্লিনিকে তার মাতৃত্ব বিসর্জিত হয়েছে। কিন্তু আর নয়। তাই সে পালিয়েছে। এখানে এসেও শান্তি নেই। নিত্য ফোনে হুমকি। বাবার প্রাণনাশের হুমকি। তাকে ফিরে যেতেই হবে। সমাজে ওদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে যে, আজ ওরা আসছে মিঠুকে নিতে। অতএব আবার পালানো।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে দৌড়চ্ছে মিঠু। তাকে বাঁচতেই হবে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক আশ্রমের আশ্রয়ে ওঠে মিঠু। ক্লান্ত দেহ, অপুষ্টির শরীর ভেঙে পড়ে। অবশেষ 'সে' এল। মিঠু জীবনের দাম দিয়ে বাঁচাল তাকে। সাদা কাপড়ে মোড়া মিঠুর দেহ। কাপড়ে তাল পাকানো সদ্যজাত মেয়েটা কাঁদে আশ্রমিকদের হাতে। আরও একটা বিপন্ন নারী, আরও একটি বিপন্ন নারীর জন্ম। আর একজন ভবিষ্যতের মিঠু।

With Best Compliments of

J. Kundu

Denha, P.S. Memari, Dist. Burdwan

Sl. No. 103

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দুর্গামাতা হিমঘর

কমলনগর, গুসকরা, বর্ধমান

চাষিদের আলুবীজ সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 121

With best compliments of

BURDWAN SPUN PIPE INDUSTRIES

Manufacturer of
RCC SPUN PIPE • COLLARS & S PIGOT TYPE NP2 / NP3 / NP4

Contact : Natun Pally, P.O. & Dist. Burdwan, Ph : 0342-2544640, Fax : 2662232
Office & Factory : Vill. P.O. Hossainpur, Maldanga, Burdwan, Phone : 0342-2324644

Sl. No. 53

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উন্নত মানের সর্টেক্স
মুড়ির চাল প্রস্তুতকারক
পারাজ স্টেশন রোড, বর্ধমান

ফোন : ০৩৪২-২৪৫৪৩৩৪,
৯৪৩৪১২৩৫১৩, ৯৭৩২২৭৬৪৯২

Sl. No. 32

আগন্তুক

স্বপন ঘোষচৌধুরী

গোলদীঘির পাড় ঘেঁষে ঘাসের ওপর একা বসতেন রতু চন্দ। একটু দূরে বিদ্যাসাগরের মূর্তি। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবতেন, কী বিশাল মানুষ!

কিছুদিন ঘসে বসে থাকার পর মনে হল বাড়ি ফিরে পা দুটো কুটকুট করে, কারণ ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে চলাফেরা করা পিঁপড়েগুলো কামড়ে দেয়। এরপর পিঠে হেলান দেওয়া একটা বেঞ্চ দখল করলেন। বেঞ্চে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি রতুবাবুর বয়সীই। হয়তো বা দু-এক বছরের এদিক-ওদিক হতে পারে। রতুবাবু দেখলেন লোকটার বিশাল গোঁফজোড়া টাঙির মতো দুদিকে ঢেউ খেলেছে। রঙ সাদা ধবধবে। মাথায় বিলকুল সাদা বাবরি চুল। বাঙলার ডাকাত পড়েছেন রতুবাবু। ডাকাতরা সব বাবরি চুল রাখত। গালপাট্টা রাখত। এই লোকটার গালপাট্টা নেই। তাছাড়া কলকাতা শহরে বিকেলবেলা কোনো ডাকাত পার্কে বেড়াতে আসে না। সুতরাং নির্ভয়ে তাঁর পাশে গিয়ে বসে পড়লেন রতুবাবু। ভদ্রলোকের গোঁফ আর মাথার চুলই শুধু সাদা নয়, তাঁর সার্ট ধপধপে সাদা, ধুতি প্যাটপ্যাটে সাদা এবং পায়ে সাদা কেডস। এমন সাদাময় পুরুষটির গায়ের রঙ কিন্তু বিপরীত।

রতুবাবু তাঁর পাশে বসে রইলেন চুপচাপ। যে বয়সের যা ধর্ম, এক এক জনের যা স্বভাব—চুপচাপ থাকতে পারেন না। রতুবাবু শুনলেন পাশের লোকটি বলছেন, তা মশাইকে আগে তো এখানে দেখিনি।

রতুবাবু ঘাড় ঘোরালেন। হাসি হাসি মুখের ভদ্রলোককে দেখে বললেন, পার্কে অনেকদিন ধরে আসছি। ঘাসে বসতুম। কুটুস কুটুস পিঁপড়ে কামড়াতো, তাই বেঞ্চে চলে এলুম।

—খুব ভালো, খুব ভালো। একা একা আমারও বসে থাকতে ভালো লাগত না। দুজনে যা হোক গল্পগুজব করে বিকেলটুকু কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

—আমিও বিকেলটা কথা বলার মানুষ খুঁজছিলুম। নামটা যদি বলেন!

—আমি বলরাম দত্ত। নবীন কুণ্ডু লেনে থাকি। স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি করতুম। বছর আষ্টেক হল অবসর নিয়েছি। মশাই কী করতেন?

—এক মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করতুম। সাত বছর হল রিটায়ার করেছি। আমার নাম রতু চন্দ। আদি বাড়ি বাগনান। ওসব পাট চুকিয়ে

বহুকাল আগে কলকাতায় খুঁটি গেড়েছি। বেনেটোলা লেনে আপাতত বাস।

এরপর প্রতিদিন দুজনে গল্পগুজব করে সময় কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। ছোটো দিনের বেলা হলে একটু তাড়াতাড়ি এসে তাড়াতাড়ি যাওয়া, বড় দিনের বেলা হলে রোদ্দুর পড়লে এসে সন্ধের মুখে বাড়ি ফেরা।

সংখ্যা দুই থেকে তিনে পৌঁছতে লাগল সাত মাস সময়।

উচ্চতা তেমন নয়, বেঁটে খাটোই বলা যায়। মাথায় এখনও একরাশ সাদাকালো চুল, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। বুশশার্ট এবং ঢলা পাজামা পরা নিপাট ছিমছাম। বাঁ হাতে সোনালী ব্যান্ডে চকচক করছে সোনালী ঘড়ি। কিঞ্চিত লাজুক লাজুক চোখ।

সেদিন তাকে আবিষ্কার করলেন রতুবাবু। একটু আগেভাগেই চলে এসেছিলেন। বলরাম তখনও আসেননি। রতুবাবু দেখলেন খালি বেঞ্চে একজন বসে আছেন। ভালোই হল, পরিচয় হল। তিনি আগে ছিলেন দমদমে, ছেলে বার বার খবর পাঠাচ্ছিল কলকাতায় চলে এসো। এত করে বলল, আসতেই হল। নাম আনন্দ মজুমদার। আদি বাড়ি রাজশাহী জেলায়। দেশ ভাগ হতে চলে এসেছেন। এখন বয়স পঁচাত্তর ছুঁতে চলেছে। শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর সঙ্গে খুদঘাঁটা সেদ্ধ শুধু নুন দিয়ে খেতেন। অপুষ্টিতে বড়দিদি মারা গেল। আজও সেকথা ভাবলে চোখ ছলছল করে ওঠে।

রতু চন্দ বলেছিলেন—আহা!

তার মধ্যেই বলরাম এসে হাজির। নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে গল্পে জমে উঠলেন।

এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, এরপর হয়ত তিন থেকে চার হবে। রতুবাবুর বেশ ভালো লাগছিল। বিকেলের আড্ডাটা ভালোই জমবে।

মনের কথাটা মুখ ফুটে বলেই ফেললেন,—এই আমরা তিনজন হলুম, তে শত্তুর। এটা চারজন হলে বেশ হতো। আমাদের বেঞ্চিটায় দিব্যি চারজন এঁটে যাবে।

—চারজন হলে তো অতি উত্তম!—বললেন বলরাম।

সঙ্গে সঙ্গে উদয়,—আমি এসে গেছি, আমি এসে গেছি।

তিন জনতো অবাক! সত্যিই এসে গেছেন। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় বুরুশছাটা চুল, অর্ধেকের ওপর পাকা, চিরুনি পড়েনি। ঘরে কাচা হাফ হাতা শার্ট, খাটো ধুতি। পায়ে রবারের চটি। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। মুখটি বেশ হাসিহাসি কিন্তু আড়ালে কোথায় যেন বিষাদ লুকিয়ে আছে।

রতু বললেন,—আপনি?

—আপনি মানে আমি! যেমন আপনি ঠিক তেমনই আমি। অবসর নেওয়া এক বৃদ্ধ। তিনি চোখ নাচালেন।

বলরাম বললেন, আমরা অবশ্যি একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম বিজোড় কাটাবার জন্যে।

আনন্দ মজুমদারেরও কিছু বলতে ইচ্ছে করল,—তা মশায়ের নাম?

—অনাদিনাথ হালদার।

—হালদার?—রতুর প্রশ্ন।

—হালদার। খাঁটি হালদার। দফাদার নয়, জমাদার নয়, জমিদার নয়, সমাদ্দার নয়—স্রেফ হালদার। বিশ্বাস না হয় ইস্কুলের সার্টিফিকেট এনে দেখিয়ে দিতে পারি।

শুনে তিনজন তো হেসেই ফেললেন।

এবার তিনি বললেন, নামটা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমার পরিচয় তো জানতে চাইলেন না?

—পরিচয় তো ফলেন!—বলেন আনন্দ।

—না, ফলেন নয়, বচনেন, ব্যবহারেন আর ওই কী যেন বলে আচরণেন। বোয়েচেন?

—বিলক্ষণ।—উত্তর রতুবাবুর।

—তাহলে বলি। আমি অনাথ। পিতৃমাতৃহীন এক বালক—যাচ্চলে, ভুল হল, বৃদ্ধ। আমি সঙ্গীতশিল্পী। চিত্রশিল্পী, লিপিশিল্পী, সর্বোপরি তবলা বাজাতাম। এককালে বাজাতাম। তবলা, খোল, মাদল—সব বাজাতাম।

—কী তাল বাজাতেন? বলরামের অবাক প্রশ্ন।

—সে এক তাল—ধা ধিন ধিননা না তিন তিননা খা তিন তিননা, হা তিন তিননা, মা তিন তিননা, বাবা তিন তিননা।

—আর না, আর না।—তিনজনের সমস্বরে আবেদন।

—আঃ, তাল কাটবেন না,—খা তিন তিননা, হাঁ তিন তিননা, দিদি তিন তিননা, দাদা তিন তিননা, তেরে কেটে মেরে কেটে, হাত কেটে, পা কেটে, দাড়ি কেটে, গোঁফ কেটে, চুল কেটে, নাক কেটে, কান কেটে, গলা কেটে—ধা ধা ধা।

তিনজন বাঃ বাঃ বাঃ বলে হাততালি দিলেন। তাল শুনে নয়, থামার জন্য হাততালি।

তিনি সন্তর্পণে এদিক এদিক তাকালেন। এখনও বেশ বেলা। ঝিরঝির বাতাস বইছে। একটু চাপা গলায় বললেন, আমার পিছনে সি আই এ লেগেছে।

—অ্যাঁ, চমকে উঠলেন তিনজন, —কোলকাতায় সি আই এ!

—হ্যাঁ, কলকাতায় সি আই এ। থাকে অবশ্য দিল্লিতে। এই কদিন হল এসেছে। আমার সঙ্গে মোটামুটি ভালো ব্যবহার করে। আমাকে খুব চোখে চোখে রাখে। আজ একটু চান্স পেয়েছি, মার কাট্। এখন আড়ালে আড়ালে থাকতে হচ্ছে।

—তার মানে আপনি পলাতক? বললেন রতু।

—অবশ্যই! সি আই এ—কর্নেল ইন্দু আইচ। আমার বড় জামাই। মিলিটারির লোক, দিল্লিতে থাকে। প্রায় একমাস থাকবে। গেলে বাঁচি। জানেন তো আমি আমার জামাইয়ের পূর্বপুরুষদের কথা শুনে মোহিত হয়ে গেছিলুম। ওরা কনৌজ থেকে চার পুরুষ আগে বাংলায় এসেছে। এরা পশুপাখি পুষত। জীবজন্তু পুষত। বেশি পুষত হনুমান। শোনা যায় একটা হনুমান বাংলা, হিন্দি আরও কী কী ভাষায় কথা বলত। সে সবকথা শুনে ইংরেজ সাহেবরা চৈ চৈ করে উঠত।

—ভারি অদ্ভুত কথা শোনালেন তো!

—অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! হুঁ হুঁ, দস্তুর মতো অবাক করা ব্যাপার। সে যে কী হনুমান, সে যে কী হনুমান চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। লালমুখো নয়, মুখপোড়া। পিট পিট করে তাকায়, খচর খচর করে দুহাত দিয়ে পিঠ চুলকায়, গা থেকে বেছে বেছে উকুন ধরে খপাৎ খপাৎ মুখে পুরে দেয়।

—বুঝলেন আনন্দবাবু। এই রকম একজন গল্‌পে লোক আমাদের দরকার ছিল।—বলরাম বললেন।

রতু বললেন, মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন। তিনিই জুটিয়ে দিয়েছেন। দেখুন আজ সাত মাস ধরে এই গোলদীঘির পাড়ে শত মানুষের মাঝেও আমি ছিলুম একা। হপ্তাখানেকের মধ্যে চারজন হয়ে গেলুম। সব তাঁরই ইচ্ছা।

আনন্দ বললেন, তো তো বটেই। সবকিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। সময় হলে ঠিকই পাওয়া যাবে। তা মহাশয়ের নিবাস জানা হল না তো?—তাকালেন অনাদির দিকে।

অনাদি চোখ নাচালেন,—যার পুঁজিপাটা নেই সে কোথায় যায় বলুন তো?

তিনজন এ ওর মুখের দিকে তাকান।

অনাদি দ্বিগুণ গতিতে চোখ নাচালেন।—বলতে পারলেন না তো? যার নেই পুঁজিপাটা সে যায় বেলেঘাটা। আমি বেলেঘাটায় থাকি, রাসমণি বাজারের কাছে।

বাঃ বাঃ—আনন্দ প্রায় হাততালি দিয়ে ফেললেন—খুব মজাদার লোক আপনি।

—কে বলল?—অনাদির চোখ এবার অন্য রকম।

আনন্দ থতমত খেলেন,—বলবে আর কে। এই আপনার সুন্দর এবং সরস কথাবার্তাই আপনি যে মজাদার এবং খোশ মেজাজের মানুষ তা জানিয়ে দিচ্ছে।

—কিছু জানায়নি। আপনার স্বল্প বুদ্ধি দিয়ে আপনি যা বুঝেছেন তা আগাগোড়া অর্থাৎ বিলকুল ভুল। আমি মজাদার লোক নই, আমি এক হতভাগ্য, সম্পূর্ণ একা, প্রিয়জনের কাছ থেকে বিতাড়িত, ব্রাত্য এক মানুষ। যাদের আমি আজও আমার আপনজন, আমার অন্তরাত্মা বলে মনে করি, বিশ্বাস করি, যে সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আমি তাদের পিতা বলে গর্ব অনুভব করি সেই তারাই আমাকে আবর্জনা জ্ঞানে দশদিক ঘেরা এক কারাগারে বন্দি করে রাখতে চায়।—অনাদির চোখ ছলছল করে উঠল, —দুই মেয়ের পর আমার এক পুত্রসন্তান হল। মা আর দুই দিদির আদরে বেশ বড়টি হয়ে উঠল। সে এক ভীষণ দুর্যোগের রাত, রিক্সা করে ফিরছিল মা আর ছেলে, মৌলালির মোড়ে গেল বাসের চাকার তলায়। তিন দিন আমার কিছু মনে ছিল না, যখন জ্ঞান ফিরল ওরা তখন তো ছাই হয়ে গেছে। রূপান্তর। মানুষ থেকে ছাইয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর আমি—আমি ক্রমে ক্রমে এক পাষাণ, কঠিন, হৃদয়হীন এক অমানুষে রূপান্তরিত হতে লাগলুম। কেউ আমার আপনজন নয়, প্রিয়জন নয়। আমার সবকথা হারিয়ে গেছে ওই দশদিক ঘেরা এক খাঁচার মধ্যে বন্দি হয়ে। খুব জোর আজ আমি বেরিয়ে পড়েছি। কেউ টেরটিও পায়নি। ব্যাস, আমার মধ্যে শতকথা ফেনার মতো উপচে উঠতে লাগল, আপনাদের পেয়ে প্রাণ ভরে কথা বললুম, এমন সুখ পাঁচ পাঁচটা বছর পাইনি। হঠাৎ অনাদি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন,—ওরে ব্বাবা, ওই আসছে। এক্ষুনি কেটে না পড়লে খপ করে ধরে নেবে। ওই দেখুন ওই নীল জামাপরা লোকটা আমাকে খুঁজছে—সি আই এ। বলেই অনাদি সর্পিল গতিতে রেলিঙের ছোট্ট দরজার পাল্লা টেনে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেলেন।

দ্রুত পায়ে নীল জামা পরা মানুষটি এই তিনজনের সামনে এসে বলে উঠল—এই মাত্র যে লোকটা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, কোন দিকে গেল?

তিনজন নিঃশব্দে এদিক ওদিক ঘাড় নাড়লেন। তিনজনেরই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালনা থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান

Sl. No. 138

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অম্বিকা হিমঘর প্রা. লি.

জিউধারা, কালনা, বর্ধমান

Sl. No. 131

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

এস.বি.এম. ইট ভাটা

উৎকৃষ্ট মানের ইট প্রস্তুতকারক

সৈদপুর, সিঙ্গারকোণ, বর্ধমান, ফোন : ৯৪৩৪৬৬১৫৯৬, ৯৯৩৩৯৬৩৪৯৩, ৯৭৩৫৮১৪৫৩০

Sl. No. 130

With best compliments of

MODERN PUBLIC SCHOOL

E N G L I S H M E D I U M
From Nursery to Class IV
Second Language Bengali / Hindi

We impart education with the help of various toys and new technology.
Our teachers take individual care to all students.

***Address* : Near Shibshankar Seba Samiti, Baburbag, Burdwan**

Sl. No. 77

With best compliments of

BELLA IMPEX

EXPORT IMPORT

Prop. *Arindam Ghosh*

Jewdhara, Kalna, Burdwan, W.B.-713409
bellaimpex.india@gmail.com, Ph : +91 8335823058, +91 70440 97466

Sl. No. 133

মাছের চোখ

সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রতি বছরের মতো আজও সমস্ত রাস্তা গিয়ে মিশেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে। শুধু তেলিঘাটা বা জামালপুর নয়, গোটা দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগের দিন সন্ধের আগেই এসে হাজির হয়েছে প্রতিযোগীরা। সকাল থেকেই খেলা শুরু হওয়ার কথা। সেই খেলা দেখার জন্য শুধু উৎসাহীরাই নয়, এমনি ছেলেমেয়েরাও ভিড় করেছে।

কালী এসে তাপসকে বলল, কী রে, যাবি না?

কোথায় যাবার কথা বলছে বুঝতে পেরে তাপস বলল, বাবাকে আগে খাবারটা পৌঁছে দিয়ে আসি।

কালী জানে, ওর বাবা সকাল হলেই খেতে কাজ করতে চলে যান। এই সময় তাপস ওর বাবার জন্য নুন, লঙ্কা, পেঁয়াজ সমেত এক থালা পান্তা নিয়ে যায় মাঠে। কিন্তু আজ যে খেলা আছে। তাই বলল, তোর বোন আছে না? ওকে দিয়ে পাঠিয়ে দে না। তাপসের মা উঠোনের এক ধারে মাটির পাতা উনুনে ধান সেদ্ধ করছিলেন। তিনি শুনে বললেন, কোথায় যাবি রে তোরা?

কালী বলল, আশ্রমে।

—আশ্রমে? পুরো নাম বনবাসী কল্যাণ আশ্রম হলেও স্থানীয় লোকেরা ওটাকে সংক্ষেপে শুধু আশ্রমই বলে। চারিদিকে বনবাদাড় আর জঙ্গল। দশ মাইলের মধ্যে পিচের রাস্তা নেই। এখনও বিদ্যুৎ ঢোকেনি। ফোনের লাইনের কথা না-হয় বাদই দিলাম। এখানে মূলত আদিবাসীরাই থাকে। তাদের জীবন জীবিকা অত্যন্ত নিম্নমানের। ওদের স্বনির্ভর করতেই আশ্রমের লোকেরা আদিবাসী মেয়েদের নানা রকম হাতের কাজ শেখায়। বেতের কাজ, আসন বোনা, ধূপকাঠি তৈরি থেকে আচার বানানো। শেখার সময়েই তাদের কিছু কিছু হাতখরচা দেয়। আর শিখে নিজেরাই বাড়ি থেকে বানিয়ে নিয়ে এলে, সেগুলি আশ্রমই কিনে নিয়ে কলকাতায় সাপ্লাই করে। কয়েকদিন ধরে নাকি বয়স্কদের পড়াশোনাও শেখানো হচ্ছে ওখানে। কিন্তু সেব সব তো শুরু দুপুরের পরে। এই সময়ে ওরা আশ্রম যাবে শুনে ওর মা ভ্রু কোঁচকালেন।

কালী বলল, আজ খেলা আছে না...

'খেলা' শব্দটা ও কেমন করে বলল, যেন নবান্ন, দুর্গাপুজো আর প্রতিবার শীতের শুরুতে তিন ক্রোশ দূরে বসা বারো ভূতের মেলার মতো এটাও একটা বিশাল উৎসব।

ওর মাও জানেন, এখানকার লোকেদের কাছে এটা একটা উৎসব। গোটা গ্রাম তো বটেই, আশপাশের গ্রামও ভেঙে পড়ে। তাই ভাবলেন, ও তো রোজই পড়াশোনা করে। দু-দিন ছাড়া ছাড়াই বাবার সঙ্গে খেতের ঢেঁড়স, বেগুন, গাছের নারকেল, এটা ওটা সে পেড়ে বিক্রির জন্য হাটে নিয়ে যায়। ছেলেমানুষ, একটা দিন যদি খেলা দেখতে যেতে চায় তো যাক না... আজ না হয় মেয়েই ওর বাবার জন্য খাবার নিয়ে গেল। না হলে সে-ই যাবে ফাঁকে। মাঠ তো আর বেশি দূরে নয়।

কালী বলল, তাড়াতাড়ি চল। নটার

মধ্যে ওখানে পৌঁছাতে হবে কিন্তু।

—ন-টার মধ্যে কেন? খেলা তো দশটার পরে শুরু হবে শুনলাম।

—না। ওরা তো বলল, খেলা শুরু হওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে এসে প্রতিযোগীদের রিপোর্ট করতে হবে।

—সে তো, যারা প্রতিযোগী, তাদের করতে হবে। আমাদের কী?

—আমাদের কী মানে? তোকে সেদিন বললাম না, তোর নামটা এবার দিয়ে দেব...

—হ্যাঁ, বলেছিলি। কিন্তু আমি তো তোকে বারণ করে দিয়েছিলাম।

—বারণ করলেই হল? চল চল চল... তীর-ধনুকটাও নিয়ে নে।

দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো ছিল ধনুক। আর তেলকষ্টি পড়া আদ্যিকালের আলমারিটার মাধার ওপরে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়ানো ছিল কতগুলি তির। তাপস সেগুল ঘর থেকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

কয়েক বছর আগে মা বাবার সঙ্গে তাপস আর ওর বোন গিয়েছিল বারো ভূতের মেলায়। সেখানে ঘুরে ঘুরে ওরা নাগরদোলা চড়েছিল। 'ইলেকট্রিক মেয়ে' দেখেছিল। তার গায়ে ঠেকালেই টিউবলাইট জ্বলে উঠছিল। 'মানুষ-রাক্ষস'ও দেখেছিল ওরা। লোকটা সব কাঁচা কাঁচা খাচ্ছিল। কুমড়ো, লাউডাঁটা, কলাগাছ, বালিশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুলো, এমনকি শিশি বোতল, বাল্‌ব্‌ পর্যন্ত ভেঙে ভেঙে খাচ্ছিল। ওরা পরোটা ঘুঘনি খেয়েছিল, বরফ জল খেয়েছিল। ফুচকা খেয়েছিল। ঘুরে ঘুরে বাবা কিনেছিলেন তালপাতার পাখা, দা, ধামা। ওর মা কিনেছিলেন চিরুনি, কাচের ফ্রেমে বাঁধানো কালীঠাকুরের ছবি, ডালের কাঁটা। ওর বোন কিনেছিল চুলের ব্যান্ড, টিপের পাতা, নখপালিশ। আর ও কিনেছিল তির-ধনুক।

তির-ধনুক দেখে ও আর ঠিক থাকতে পারেনি। তার কদিন আগেই দাদুর সঙ্গে ও বেলডাঙা গিয়েছিল। পিসির বাড়ি। তার কিছু দূরেই সাত দিন ধরে হচ্ছিল যাত্রা উৎসব। শেষ দিনে ওর পিসেমশাই ওদের নিয়ে গিয়েছিল যাত্রা দেখাতে—রামের বনবাস।

না। টিকিট কাটতে হয়নি। প্রথম ছ-দিন কলকাতার দল করলেও শেষ দিনেরটা করছিল উৎসব কমিটির আয়োজকরা। তাদের নাকি একটি শখের যাত্রাদল আছে। সেই দলে অভিনয় করছিল পিসেমশাইয়ের এক বন্ধু। সে-ই নাকি ওদের পাস দিয়েছিল।

রাম-লক্ষ্মণের হাতে তির-ধনুক দেখে তাপসের খুব লোভ হয়েছিল। সোনার হরিণের রূপ ধরে আসা ভয়ঙ্কর মায়াবি মারীচকে কীভাবে এক তিরে মেরে দিল রাম! মন্ত্র পড়ে ছাড়তেই একটা তির কী রকম দশটা হয়ে গেল! যে ছুঁড়ল, সে চাইতে তির একেবারে এঁকেবেঁকে গিয়ে তার লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধল! কই, বন্দুকের গুলি তো এ রকম হয় না।

তাই যাত্রা ভেঙে যাওয়ার পর যখন ওর পিসেমশাই তার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করানোর জন্য সাজঘরে নিয়ে গেল, ওর দাদুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, ও কিন্তু তখন তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা তিরটাকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। কী সুন্দর রংচঙে! মনে হচ্ছে রংতা দিয়ে মোড়া!

এই তিরের জন্য কত কী না হয়েছে! অন্ধমুনির ছেলে বাবা-মায়ের জন্য খাবার জল আনতে গিয়ে নদীতে কলসি ডোবাতেই বগ্‌বগ্‌ করে এমন শব্দ হয়েছিল যে, দশরথ ভেবেছিলেন, কোনো হরিণ বুঝি জল খাচ্ছে। তাই শিকার করার জন্য সেই শব্দ লক্ষ করে তিনি এরকমই একটি শব্দবাণ ছুঁড়েছিলেন। আর তাতেই ঘটেছিল মহাবিপত্তি। আর একটু হলেই লঙ্কায় যাবার জন্য রাম এই তির ছুঁড়েই সমুদ্র শুকিয়ে দিচ্ছিলেন আর কী! এই তির দিয়েই মাছ নয়, জলে মাছের প্রতিবিম্বর দিকে তাকিয়ে মাছের চোখ বিদ্ধ করেছিলেন অর্জুন! ভাবা যায়!

তির দিয়ে কী না হয়! ভাবতে ভাবতে তিরটার কাছে চলে গিয়েছিল ও। দেখার জন্য হাতে নিতেই ড্রেস ছাড়তে থাকা যাত্রার জাম্বুবান ও পাশ থেকে রে রে করে উঠেছিল। তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দু-চার ধমকও দিয়েছিল সে। বলেছিল, এখানে কী করছিস রে? যা।

তির-ধনুকটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখাও হয়নি তার। উনি বকার সঙ্গে সঙ্গে দাদুর কাছে চলে না গেলে হয়তো সাজঘর থেকে তাকে সে বেরই করে দিত। মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। তাই বারো ভূতের মেলায় তির-ধনুকটা দেখেই ও বাবার কাছে বায়না করেছিল। ওর বাবা আর আপত্তি করেন নি। ওকে একটা কিনে দিয়েছিলেন।

একটা ধনুকের সঙ্গে একটাই তির। কিন্তু ওর নাছোড়বান্দা স্বভাবের কাছে হার মেনে গিয়েছিলেন দোকানদার। শেষ পর্যন্ত বাড়তি একটা তির তিনি তাপসকে দিয়েছিলেন। সেই তির-ধনুক ওর সব সময়ের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বারবার শক্ত জায়গায় মারলে যদি তিরের মাথাটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই গাছের কাণ্ডে বেশ পুরু করে মাটির দলা লাগিয়ে ও সেটাকে তাক করে মারত। প্রথম প্রথম কাণ্ডের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। তারপর আস্তে আস্তে সোজা গিয়ে বিঁধতে শুরু করল কাণ্ডের গায়ে লাগানো মাটির মধ্যে। প্রথম দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাটি লাগাতে হলেও পরের দিকে আর অতটা লাগাতে হত না। ঘুঁটের মতো একটা চাপড়া লাগিয়ে নিলেই হত। তিরের ফলায় মাটি লেগে গেলে এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ে খুব ভালো করে মুছে নিত। কিন্তু দুটো তির আর ক-দিন চলে! তাই নিজেই বাঁশ কেটে বানিয়ে নিয়েছিল বেশ কয়েকটা।

মারতে মারতে ওর এমন টিপ হয়ে গিয়েছিল যে, পেয়ারা পাড়তে গেলে ওর কোনো বন্ধুকেই আর গাছে উঠতে হত না। ও চার পাঁচটা তির ছুঁড়লেই একটা না একটা পেয়ারায় ঠিক লাগত। কিন্তু লাগলেই যে পেয়ারা পড়ত তা নয়। তাই ওর বন্ধু কালীই ওকে বুদ্ধি দিয়েছিল, তিরের ফলাটা টিনের টুকরো দিয়ে মুড়ে পাথরে ঘষে ঘষে চোখা করে নিতে। ও তাই করেছিল।

তারপর থেকে সরাসরি আমে মারলে ধারালো ফলা আমের গায়ে গেঁথে যেত। সেটা পাড়ার জন্য সেই গাছেই উঠতে হত ওকে বা ওর কোনো বন্ধুকে। তাই কে যেন ওকে বুদ্ধি দিয়েছিল, তিরের পেছন দিকে ফুটো করে অ..নে..ক..টা লম্বা নায়লনের সুতো বেঁধে দিতে। ও তাই করেছিল। তাতে আম বা পেয়ারার গায়ে তির গেঁথে গেলেও ধনুকের লেজে বাঁধা সুতোর শেষ প্রান্তটা ধরে জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেই তির শুদ্ধ আম পেয়ারাও চলে আসত। সব সময়ই যে তিরের সঙ্গে ফলাটাও আসত তা নয়, তাই ও আর ফলে মারত না। মারত, ফল ধরে রাখা বোঁটায়। ফলে ও তির চালানো মানেই নির্ঘাত ফলের পতন।

ওর ওই অব্যর্থ টিপ দেখেই কদিন আগে কালী বলেছিল, এত ভাল টিপ তোর, তুই নাম দিচ্ছিস না কেন? এবার আশ্রমে যে আর্চারি কম্পিটিশন হবে, তোর নামটা আমি দিয়ে দেব।

ও গাঁইগুঁই করলেও ওর নামটা লিখিয়ে এসেছিল কালী। সে জানে, তার বন্ধু কেমন। হয়তো মনেই নেই তার। তাই সকালেই ওকে নিতে এসেছে সে। সে-ই জোর করে ওকে নিয়ে গেল আশ্রমের

মাঠে।

মাঠটা খুব বড়। তার এক দিকে সার সার ঘর। ঘরগুলিতে ঢালাও বিছানা পাতা। দূর দূর থেকে আসা প্রতিযোগীরা এখানে থাকছে। ঘরের সামনে দিয়ে টানা লম্বা বারান্দা। মাথার ওপরে টিনের ছাউনি। সেখানে লোকে লোকারণ্য। তার এক কোণে চায়ের ব্যবস্থা। এই দাওয়ার সামনে দিয়েই শুরু হয়েছে মাঠ। মাঠের ওদিকে পর পর অনেকগুলো টার্গেট ফেস লাগানো। কয়েকটা কাছে। কয়েকটা দূরে। কয়েকটা আবার আরও দূরে। টার্গেট ফেসগুলি ভারি অদ্ভুত, একটার পর একটা বিভিন্ন রঙের বৃত্ত। ও বুঝতে পারছে, ওটার মাঝখানে মারতে হবে। অতগুলি রং কেন?

ওর প্রশ্নের উত্তর কালীরও জানা নেই। তাই আয়োজকদের একজনের কাছে তাপসকে নিয়ে গেল সে। সেই আয়োজকের পাশেই বসেছিল আমন্ত্রিত হয়ে আসা এক কোচ—রাজেন্দ্র গুইয়া। তখনও প্রতিযোগিতা শুরু হয়নি। ওর প্রশ্ন শুনে তিনি ওকে নিয়ে গেলেন মাঠের ওদিকে টাঙানো টার্গেট ফেসের কাছে। একটার পর একটা বিভিন্ন রঙের বৃত্ত। একদম মাঝখানে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তিনি বললেন, এই দ্যাখো, এখানে এই যে হলুদ রংয়ের একটা বৃত্ত দেখছ, এই বৃত্তটাকে কিন্তু কালো সরু লাইন দিয়ে তিনটে ভাগে ভাগ করা আছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বৃত্তের যে-কোনো জায়গাতেই তির মারো না কেন, লাগলেই পুরো দশ পয়েন্ট পাবে। তৃতীয় বৃত্তে লাগলে ন-পয়েন্ট।

তাপস বলল, তাই যদি হয়, তাহলে শুধু শুধু আলাদা একটা লাইন টেনে এই দশ পয়েন্টের হলুদ বৃত্তটাকে দু-ভাগ করা হয়েছে কেন?

উনি বললেন, এই দুটো বৃত্তের যে-কোনো জায়গায় লাগলে দশ পয়েন্ট পাবে ঠিকই, কিন্তু খেলার শেষে যদি দেখা যায়, দু-জন বা তিনজনের একই স্কোর, তখন দেখা হয় কে ক-টা এক্স-এ মেরেছে।

—এক্স মানে?

—এই দ্যাখো মাঝখানে এই যে চিহ্নটা আছে...

তাপস এতক্ষণ খেয়াল করেনি। উনি বলাতে ও দেখল, বৃত্তটার একদম মাঝখানে ছোট্ট একটা যোগ চিহ্ন। ও কিছু বলতে যাবার আগেই তিনি বললেন, এটাকে বলে এক্স। এটাকে ঘিরে যে হলুদ বৃত্ত, এখানে মারলে পয়েন্ট হিসেবে দশ নম্বর পেলেও এটার মূল্য কিন্তু আলাদা। একদম আলাদা। এটাকে এক্সেলেন্টও বলতে পারো।

—আর এই লালটা?

—হ্যাঁ, হলুদের পরেই যে গোলাকার লাল বৃত্তটা দেখছ, এখানে খেয়াল করে দ্যাখো, এখানে কিন্তু একটার পর একটা অনেকগুলো রঙের বৃত্ত আছে। প্রত্যেকটা রঙের বৃত্তই কিন্তু সরু একটা কালো রেখা দিয়ে দু-ভাগে ভাগ করা আছে। তোমাকে তো আগেই বললাম, হলুদের প্রথম দুটো বৃত্তের যে-কোনোও জায়গায় লাগলেই দশ পয়েন্ট। তৃতীয় বৃত্তে লাগলে ন-পয়েন্ট। এর পরেই প্রথম যে লাল বৃত্তটা দেখছ, সেটায় মারলে আট পয়েন্ট। তার পরের লালটায় মারলে সাত পয়েন্ট। ঠিক এইভাবেই এর পরের প্রথম নীলে লাগলে ছয় পয়েন্ট। দ্বিতীয়টায় লাগলে পাঁচ পয়েন্ট। তার পরের কালোটায় লাগলে চার এবং তিন পয়েন্ট। আর সব শেষের বৃত্ত এই সাদাটায় লাগলে দুই আর এক পয়েন্ট। প্রত্যেকটা বৃত্তই কিন্তু আট সেন্টিমিটার করে চওড়া।

—কত পয়েন্ট হলে জিতব?

—তোমাকে এখানে পর পর ছটা তির মারতে হবে। যে তির যেখানে লাগবে, সেই অনুযায়ী পয়েন্ট পাবে। তারপর সেগুলি যোগ করে যার নম্বর সবচেয়ে বেশি হবে, সে-ই ট্রফি জিতবে।

—কিন্তু আমার কাছে তো অতগুলি তির নেই।

—কটা আছে?

—তিনটে।

—তিনটে! কোথায়?

—ওই যে, আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে, ওর কাছে।

সার সার ঘরগুলির সামনের দাওয়ায় প্রচুর ভিড় থাকলেও দূর থেকে তাপসের দেখিয়ে দেওয়া কালীকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না রাজেন্দ্রর। কালীর হাতের ধনুক দেখে তাপসের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, তুমি কি এই তির দিয়ে লড়বে নাকি?

ও বলল, হ্যাঁ। কেন?

রাজেন্দ্র থ হয়ে গেল। বাঁশের তির তো কান ছাড়, বাতাসে বাঁক খেতে খেতে যায় দেখে অ্যালুমিনিয়ামের তিরও এখন আর কেউই প্রায় ব্যবহার করে না। অনেকদিন আগেই ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে! আর এ কিনা এই তির দিয়ে লড়বে!

ও এখানে মূলত বিচারক হিসেবে এলেও ওর আসল উদ্দেশ্য সত্যিকারের একটা দুটো তিরন্দাজকে খুঁজে বের করা। সে জন্য নিজে থেকেই বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ঘুরে বেড়ায় ও। কখনও চলে যায় পুরুলিয়ায়। কখনও বাঁকুড়ায়। আর আজ এসেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের এই তেলিঘাটায়। ও জানে, জিন একটা বড় ফ্যাক্টর। এই আদিবাসী উপজাতিদের রক্তেই মিশে আছে তির-ধনুক। তাদের যদি ঠিক মতো প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তাহলে তারা অনেক সহজেই নিজেদের একটা জায়গা করে নিতে পারবে। যেভাবে পেরেছিল লিম্বারাম, শ্যামলালেরা।

সেই কবে কোন প্রস্তর যুগে শিকার করার জন্য পাইন গাছের ডাল কেটে তির-ধনুক বানাত লোকেরা। তাম্রযুগে তো ইজিপ্টের লোকেরা রীতিমত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত তির-ধনুক। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, চৌষট্টি হাজার বছর আগে পাথরের মাথা ঘষে ঘষে তিরের ফলা বানানো হত আফ্রিকাতে। যিশু খ্রিস্টের জন্মেরও আট ন-হাজার বছর আগে ইউরোপের অ্যাহেনসবার্গ উপত্যকার স্টেল মুর-এ প্রথম 'ডি' আকৃতির ধনুক বানাতে শুরু করে প্যালিওলিথিক ম্যাসোলিথিকরা। এই তো সেদিন, উনিশশো চল্লিশ সালে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এক ধরনের দুটো ধনুক পাওয়া গিয়েছিল ডেনমার্কের হোমগার্ডে।

তির-ধনুক কী আজকের কথা! সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে চলে আসছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পরেই উইল এবং মরিস থমসনকে সামরিক-বাহিনী থেকে অবসর নিতে হয়। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। অবসরের সময় তাঁদের বন্দুকগুলিও জমা দিয়ে দিতে হয়েছিল। ফলে শিকারের জন্য তারা বেছে নেন তীর-ধনুককেই। আর তির ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাঁরা তির-ধনুকের এতটাই প্রেমে পড়ে যান যে তাঁরা এটাকে খেলা হিসেবে প্রচলন করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। এই দুই ভায়ের সঙ্গে এসে গাঁটছড়া বাঁধেন তাঁদের এক ভৃত্য। তিনি আবার ইংলিশ স্টাইলের তিরন্দাজি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তাঁর কাছ থেকে এসব শুনে মরিস একটা বইই লিখে ফেললেন—দ্য উইচেরি অব আর্চারি। যা অনেক দিন পর্যন্ত বেস্ট সেলারের জায়গাটা দখল করে রেখেছিল।

১৯৭২ সালে মিউনিখ গেমসে তিরন্দাজিকে খেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ দেশে উনিশশো তিয়াত্তর সালে তৈরি হয় আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অব

ইন্ডিয়া। তালিম দেওয়া শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠে বরানগর আর্চারি ক্লাব আর কলকাতা আর্চারি ক্লাব। তারপর কত কী অদলবদল হয়েছে। কত আধুনিক হয়েছে তির-ধনুক। আর এ কি না বলছে এই বাঁশের তির-ধনুক দিয়ে লড়বে!

রাজেন্দ্র ওকে মাঠ থেকে নিয়ে এলেন সার সার ঘরের শেষ দিকের একটা ঘরে। সেই ঘর পর পর রাখা আছে অনেকগুলি ধনুক। ওগুলি দেখে তাপস চমকে উঠল। এগুলি ধনুক! কোনওটার দু-দিকে কী সব চাকা টাকা লাগানো। কোনওটার সামনে দূরবিনের মতো কী সব, তো কোনওটায় আবার মিটারের মতো ছোট্ট কী একটা লাগানো। মারবে তো তির, তার জন্য আবার এত কী! ও কিছু বলতে যাবার আগেই রাজেন্দ্র সেখান থেকে একটি গ্লাস ফাইবারের ধনুক ওর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তুমি যে তির-ধনুক নিয়ে এসেছ, সেটা দিয়ে এদের সঙ্গে তুমি লড়বে কী করে? তোমাকে খেলতে হবে এই তির-ধনুক নিয়ে। এ দিকে এসো... বলে, ওকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসে বলল, ওই টার্গেট ফেস লক্ষ করে একটা তির ছোঁড়ো তো দেখি।

তাপস ধনুক তুলল ঠিকই, কিন্তু এরকম ধনুক এর আগে ও কখনও হাতে নেয়নি। এতে হাজার রকম ফ্যাচাং। ফলে কী ভাবে তির মারতে হবে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। তবু তাক মারতেই তিরটা টার্গেট ফেসের অনেক উঁচু দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাজেন্দ্র বলল, তুমি কীভাবে টিপ করেছ?

ও বলল, যেভাবে করি, সেভাবে।

রাজেন্দ্র বলল, এটা বাঁশের ধনুক নয় যে তিরের মাথা দিয়ে টার্গেটটাকে লক্ষ করে মারবে। ওভাবে মারলে হবে না। এই ধনুক ব্যবহার করার একটা কৌশল আছে। আগে ধনুকটাকে ঠিকভাবে ধরো। বলেই উনি নিজে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যান্ডেলটার এখানে আঙুল দিয়ে এইভাবে ধরো। তিরের উপরের দিকটা অ্যারো রেস্টে রেখে এবার স্ট্রিংয়ের এই নকিং পয়েন্টে তিরের পেছনটা আটকে ছিলাটাকে টেনে, যেটাকে মারতে চাও, দূরবিনের মতো এই লাল রংয়ের সাইট পিন দিয়ে সেটাকে তাক করে তারপর ছেড়ে দাও। তবে তার আগে এই আর্ম গার্ড আর ফিংগার ট্যাপটা পরে নাও।

পরা তো দূরের কথা। এর আগে এগুলো ও কোনোদিন চোখেই দেখেনি। নামও শোনেনি। মারবে তির, তার জন্য আবার এসব পরা কেন? ও জিজ্ঞেস করল, এগুলো পরতে হবে?

রাজেন্দ্র বলল, খুব জোরে ছিলাটাকে টানতে হয় তো, এগুলো না পরলে আচমকা পেশিতে লেগে যাতে পারে। আচ্ছা, নাও, চালাও দেখি...

এতদিন ধরে তির চালাচ্ছে সে, অথচ আজকে এই নতুন ধনুকটা তুলে হাতটাকে ও ঠিক মতো স্থিরই রাখতে পারছে না। থর থর করে কাঁপছে। তবু চালিয়ে দিল তাপস। কিন্তু ওর তির হলুদ, লাল, নীল, কালো, সাদা কোনো বৃত্তেই লাগল না। টার্গেট ফেসের অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ সব কটাই তাই হল। পঞ্চমটা সাদা বৃত্তের বাইরে টার্গেট ফেসের চতুষ্কোণের একটা কোণে গিয়ে লাগল। তার পরেরটাও তাই। যারা ওর তির ছোড়া দেখছিল, তারা ওকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। হাসছিল বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও। একজন তো রাজেন্দ্রকে বলেই ফেলল, আগে ধনুক ধরা শেখান স্যার, তার পরে হাতে তির দেবেন।

রাজেন্দ্র বলল, তুমি বরং নামটা তুলে নাও। এখানে কারা নাম দিয়েছে জানো?

কে নাম দিয়েছে, তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ওই নেই। ওর মনে হল, যে লোকটা নিজে থেকে এগিয়ে এসে ওর হাতে তিরধনুক তুলে দিয়েছিলেন, তিনি যখন একথা বলছেন, তখন নিশ্চয়ই ওকে হাস্যকর হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই বলছেন। ওনাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। তবু ও মুখে কোনো কথা বলল না। ও তখন পালাতে পারলে বাঁচে। তাই রাজেন্দ্রর হাতে তির-ধনুকটা কোনো রকমে দিয়েই পাশে দাঁড়ানো কালীর দিকে তাকিয়ে ও বলল, না রে, আমার দ্বারা হবে না।

তাপসের থমথমে মুখ দেখে কালী ওকে আর প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে না নেওয়ার জন্য চাপ দেয়নি। শুধু বলল, ঠিক আছে, তোকে খেলতে হবে না, চল। তবে, তার আগে কথা দে, দুপুরবেলা তুই আমাকে অনেকগুলো আম পেড়ে দিবি!

আম পাড়া আর এমনকি! একটা তির ছুঁড়লেই তো একটা আম। তাই বলেছিল, ঠিক আছে, পেড়ে দেব।

দুপুরে কালী আসেনি। তাই আম পাড়তে যাওয়াও হয়নি তার। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হওয়ার মুখে, তখন কালী এসে হাজির। ওর পীড়াপীড়িতেই কালীর সঙ্গে ও গেল লক্ষ্মীদের আমবাগানে। যেখানে অনেকগুলো আমগাছ পর পর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কালী বলল, আমি তোকে যে আমগুলি পাড়তে বলব, তুই শুধু সেগুলিই পাড়বি। অন্য আম পাড়লে কিন্তু হবে না।

ও বলল, ঠিক আছে।

তারপর কালী যে আমটাকেই দেখিয়ে দেয়, ও সেটাকেই লক্ষ করে তির ছোঁড়ে। আর চোখের পলক পড়ার আগেই সেটা মাটিতে এসে পড়ে। একটা নয়, দুটো নয়, টপাটপ পড়তে লাগল একটার পর একটা আম। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ঝুড়ির ওপর হয়ে গেল।

কালী বললে হয়তো আরও পাড়ত। কিন্তু তার আগেই পিছনের একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়াল থেকে রুমা ম্যাডাম বলে উঠলেন, এক্সলেন্ট।

পেছন ফিরে দেখল, একজন ভদ্রমহিলা। যাকে ও আজ সকালেই বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে দেখেছিল। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষেই তিনি নাকি কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি ওকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

তাপস বলল, কোথায়?

উনি বললেন, কলকাতায়।

সেদিন সন্ধ্যাতেই ওদের বাড়ি গিয়ে রুমা ম্যাডাম আর রাজেন্দ্র ওর বাবা-মাকে কী বুঝিয়েছেন, তাপস জানে না। শুধু জানে, তার বাবা-মা রাজি হয়ে গেছেন। তার পরদিন সকালে একটা কিডস ব্যাগে কয়েকটা জামা প্যান্ট নিয়ে ওদের সঙ্গেই কলকাতার পথে পা বাড়িয়েছিল তাপস। ওদের দু-জনের সঙ্গেই নাকি খুব ভালো সম্পর্ক ক্যালকাটা আর্চারি ক্লাবের। তাপসকে সেখানে ভর্তি করে দিলেন রুমা ম্যাডাম। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন রাজেন্দ্র। ওখানে যেমন ট্রেনিং হয়, হত। ওরা নিজেরা গিয়েও মাঝে মাঝে তালিম দিয়ে আসতেন।

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে কুড়ি কি তিরিশ মিটার দূর থেকে তির ছুঁড়তে হত। এখন ও সত্তর মিটার দূর থেকে ছোঁড়ে। সাব জুনিয়ারে এক ফিটার রাউন্ড ওকে খেলতে হবে। এক ফিটার রাউন্ড মানে সত্তর মিটার, ষাট মিটার, পঞ্চাশ মিটার আর তিরিশ মিটার দূর থেকে পর পর ছটা করে ছ বার, মানে এক একটা দূরত্ব থেকে ছত্রিশটা করে, মোট চারটি দূরত্ব থেকে একশো চুয়াল্লিশটা তির ছুঁড়তে হবে।

তার বয়স যখন কুড়ি বছর পেরিয়ে যাবে, তখন সে জুনিয়র বা তারও পরে যখন সিনিয়ারে যাবে, তখন তাকে তিরিশ, পঞ্চাশ, সত্তর আর নব্বই মিটার থেকে তির ছুঁড়তে হবে। মেয়ে হলে অবশ্য একটা দুটো ক্ষেত্রে দশ মিটার করে দূরত্ব কমে যেত। কিন্তু সে তো আর মেয়ে নয়। তাই সেটা ভেবে তার কোনো লাভ নেই।

এখন তার একটাই লক্ষ্য, ওই একশো চুয়াল্লিশটা তির ছুঁড়ে যত বেশি নম্বর তোলা যায় সে তুলবে। ওই একশো চুয়াল্লিশটা তির ঠিক ঠিক জায়গায় মারতে পারলে নাকি একেবারে চোদ্দশো চল্লিশ পয়েন্ট তোলা যায়। অনেকদিন আগে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে সাবজুনিয়র ন্যাশনালে খেলতে গিয়ে কার কাছে যেন ও শুনেছিল, দু-হাজার দশের এশিয়ান গেমসে নাকি কোরিয়ার একটি ছেলে—কিম মু জিম, তেরোশো সাতাশি পয়েন্ট করেছিল। এখন অবধি ছেলেদের মধ্যে ওটাই হাইয়েস্ট স্কোর। তবে এখনও পর্যন্ত সর্বকালের রেকর্ড পয়েন্টের অধিকারী কিন্তু কোরিয়ার একটি মেয়ে—পার্ক সান হুম। দু-হাজার চার সালে সে করেছিল চোদ্দোশো নয়। যেটা কল্পনা করাও মুশকিল।

তবু আজকাল তাপসের মনে হচ্ছে, ওরা যদি পারে, কেন আমি পারব না? এখন তো সাই থেকে আমাকে কোরিয়ান উইন অ্যান্ড উইন-এর ধনুক দিয়েছে। এক লাখ টাকাতেও যা পাওয়া যাবে না। এটা দিয়ে তির ছুঁড়লে যেমন সোজা যায়, তেমনি ছোটেও ভীষণ জোরে। তির ছোঁড়ার জন্য শক্তিও লাগে কম। ইপ্সিত লক্ষ্যেও পৌঁছানো যায় অনেক সহজে। তা ছাড়া মাঝে মাঝেই ধর্মেন্দ্র তেওয়ারি, পূর্ণিমা মাহাতোর মতো জগদ্বিখ্যাত কোচেরাও এখানে এসে আমাদের ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে আমরা পারব না কেন।

একেবারে জানপ্রাণ লাগিয়ে দিয়েছিল তাপস। সেই গেমসে ফাটাফাটি পয়েন্ট পেয়েছিল ও। আর সেটার জন্যই আগামী অলিম্পিকের জন্য যে বত্রিশ জন ছেলেমেয়েকে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় নাম উঠেছে ওর। পরে ও জেনেছে, নির্বাচন কমিটিতে নাকি সেই রুমা ম্যাডাম আর রাজেন্দ্রও ছিলেন।

এখন প্রত্যেক দিন সাইতে তার দু-বেলা অনুশীলন চলছে। সক্কালবেলায় জ্যাম বা মাখন দিয়ে ছ-পিস রুটি, এক গ্লাস দুধ, একটা কলা আর দুটো ডিম খেয়ে মাঠে চলে আসে। নটা থেকে বারোটা অবধি টানা প্র্যাকটিস করে। তারপর ফিরে যায় ক-হাত দূরের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। গ্যালারির নিচের একটা ঘরে কয়েকজন তিরন্দাজির সঙ্গে ও থাকে। সেখানে স্নান-টান সেরে হয় মাছ, নয়তো ডিম দিয়ে ডাল ভাত তরকারি খেয়ে একটু বিশ্রাম। এক গ্লাস দুধ খেয়ে ফের সাড়ে তিনটের মধ্যে মাঠে। সাড়ে পাঁচটা ছ-টা পর্যন্ত অনুশীলন। রাত হওয়ার আগেই ভাত কিংবা রুটি, হয় তরকা, নয়তো ঘুঘনি, সঙ্গে একটা ডিম, কোনো কোনো দিন অবশ্য মাংসও হয়, খেয়ে টানা ঘুম। এটা এখন সপ্তাহের ছ-দিনের রুটিন হয়ে গেছে ওর। মাঝেমাঝেই একঘেয়েমি লাগে। তবু আর্চারি মাঠে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ওর শরীর যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ওদের যে বত্রিশ জন অলিম্পিকের জন্য তৈরি হচ্ছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল রাহুল। তাই ওকে দেখিয়ে ক-দিন আগে রুমা ম্যাডাম বলেছিলেন, ওকে দ্যাখো, একটা ছেলে ক্যারাটে শিখতে শিখতে বারো বছরের মধ্যে তিরন্দাজির কোন জায়গায় পৌঁছে গেছে। ওর মতো হতে পারবে?

ওকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করলে কিংবা অন্য কারও মতো হতে বললেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়। ও তো ও-ই। ও অন্যের মতো হতে যাবে কেন? তাই একটু রেগেই গিয়েছিল ও। মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, ও যা হয়েছে, ওর দিদির জন্য হয়েছে। মাথার ওপর ও রকম একটা দিদি থাকলে বারো বছর নয়, আমি বারো মাসে ওর জায়গায় পৌঁছে যেতাম।

রুমা ম্যাডমের হাতে তৈরি হয়েছিল ওর দিদি দোলা ব্যানার্জি। এখন তিরন্দাজিতে এক নম্বর। ওর দোহাই দিতেই তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ওর দিদি যে-ই হোক। কম্পিটিশনের সময় কিন্তু ওর দিদি তির ছুঁড়তে আসবে না। মাঠে দাঁড়িয়ে ওকেই মারতে হবে। জানবে, পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই কোনো না কোনো কাজের জন্য জন্মায়। বেশির ভাগ লোক সারা জীবনেও জানতে পারে না, সে কীসের জন্য জন্মেছে। যদি জানতে পারত, আর সেটাতেই মনপ্রাণ সঁপে দিত, তাহলে প্রত্যেকেই সফল হত।

যার মূর্তি গড়ার কথা, সে টেবিল টেনিস খেলছে। যার নেতা হবার কথা, সে সাঁতার শিখে সময় নষ্ট করছে। সচিন তেন্ডুলকর যদি ক্রিকেট না খেলে ছবি আঁকতেন, তাহলে কি সফল হতেন? অভিনয়ে না এসে অমিতাভ বচ্চন যদি ওঁর বাবার মতো কবিতাই লিখতেন, তাহলে কি ওঁকে নিয়ে এইভাবে কেউ নাচানাচি করত? আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আসলে নিজেকে জানতে হয়, কীসের জন্য তার জন্ম। আর সেটা জানতে পারলেই, কেল্লা ফতে। আমার তো মনে হয়, রাহুলের জন্মই হয়েছে তিরন্দাজি করার জন্য। সেজন্য তাক করার সময় ও অন্য কোনো রং দেখে না। শুধু হলুদটা দ্যাখে, শুধু হলুদটা।

সেদিন ঘরে ফিরে গিয়ে সারা রাত আর দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি ও। শুধু ভেবেছে, কীসের জন্য তার জন্ম! কীসের জন্য! কীসের জন্য!

অলিম্পিক গেমসের এখনও অনেক দিন বাকি। গতকাল শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সকালে চোখ খুলতেই পারছিল না। তবু প্রতিদিনকার মতো নটা বাজার আগেই আর্চারি গ্রাউন্ডে চলে এল ও। টার্গেট ফেসের দিকে তাকাতেই ও দেখল, কোথায় পিছনের বিশাল বিশাল সবুজ গাছপালা! কোথায় তারও পেছন থেকে উঁকি মারতে থাকা আকাশ ছুঁই ছুঁই স্টেডিয়ামের গ্যালারি! কোথায় তার ওপরের আকাশ! ও কিচ্ছু দেখতে পেল না। কিচ্ছু না। সব কেমন যেন হলুদ হয়ে গেছে। আর সেই হলুদের মাঝখানে বিশাল একটা যোগ চিহ্ন। যেটাকে দেখিয়ে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মাঠে রাজেন্দ্র গুইয়া তাঁকে বলেছিলেন, এটাকে বলে এক্স। এটাকে ঘিরে যে প্রথম হলুদ বৃত্ত, এখানে মারলে পয়েন্ট হিসেবে দশ নম্বর পেলেও মূল্য কিন্তু আলাদা। একদম আলাদা। কারও সঙ্গে ড্র হয়ে গেলে তখন দেখা হয়, কে ক-টা এক্স-এ মেরেছে। এটাকে এক্সিলেন্টও বলতে পারো।

ও কদিন ধরেই তির মারার সময় সাদা নয়, কালো নয়, নীল নয়, লাল নয়, শুধু হলুদ দেখছিল। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আর ও হলুদ দেখছে না। হলুদের মাঝখানে যে আকাশজোড়া যোগ চিহ্নটা জ্বলজ্বল করছে, ও কেবল সেটাই দেখছে, শুধু সেটাই। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর মনে হল, ওটা কোনো চিহ্ন নয়, ওটা একটা চোখ। মাছের চোখ। জলে যার প্রতিবিম্ব দেখে অর্জুন তির ছুঁড়েছিলেন, সেই চোখ।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সকলকে সহায়তা করুন।

কাজী জয়নাল মুস্তাহার (দুলাল কাজী)

চুরুলিয়া, বর্ধমান

সভাপতি

মৎস্যজীবী সমিতি, জামুড়িয়া

Sl. No. 11

With Best Compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 9

With Best Compliments of

CHATTERJEE ENTERPRISE

GOVT. CIVIL CONTRACTOR

Sripally, Asansol, Dist. Burdwan

Sl. No. 10

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

কালেশ্বর এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড

রেজি. নং : ৫৪, তারিখ : ১৪-৪-৩০ ।। পোঃ কুচুট, জেলা : বর্ধমান, দূরভাষ : ৯৭৩৪২১৭০৬১

আমাদের ব্যবসা ব্যাঙ্কিং, এল.আই.সি., কে.ভি.পি.-র মাধ্যমে বন্ধকী ঋণ, পিতল কাঁসার বন্ধকী, সাবমার্সিবল দ্বারা সেচ, সার, কীটনাশক, বীজ, স্প্রেয়ার, থ্রেসার ভাড়া দেওয়া হয়।

অশোককুমার মণ্ডল	সুনীল নন্দী	বিপিন রায়চৌধুরী
সভাপতি	সহ-সভাপতি	সম্পাদক

Sl. No. 12

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

আপনার স্বপ্নের ইমারত গড়তে **দামোদর ইটভাটা**র উন্নত মানের পগ্‌মিল ইট ব্যবহার করুন

দামোদর ব্রিক ফিল্ড

শম্ভুপুর, চক্ষণজাদি, বর্ধমান

যোগাযোগ : ৯৭৩২১৬১২০৬, ৮০০১৭৬৯১৫০

Sl. No. 16

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মহাশক্তি হিমঘর

চকদীঘি, জামালপুর, বর্ধমান

Sl. No. 17

শারদ অভিনন্দন জানাই

রবীন্দ্রনাথ নন্দী অ্যান্ড কোং

জামালপুর, বর্ধমান

Sl. No. 18

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

পিপলন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি

গ্রাম ও পোঃ পিপলন, থানা : মন্তেশ্বর, বর্ধমান

কৃষকদের সুবিধার্থে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুব্যবস্থা আছে। • রাসায়নিক সার, বীজ ও কীটনাশক চাষিদের সরবরাহ করা হয়। • সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থা চালু আছে।

হাজু ঘোষ	গোপাল দত্ত	কার্তিক হাজরা
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

Sl. No. 14

With Best Compliments of

Shyamsundarpur Colliery Employee's Cooperative Society Ltd.

Reg. No. 74 of 1984-85 • P.O. Ukhra, Dist. Burdwan

A SYMBOL OF COOPERATION, GROWTH AND TRUST

Sl. No. 19

With Best Compliments of

Madhabpur Naba Kajora Colliery Employees Co-operative Credit Society Ltd.

Reg. No. 367 Dt. 26-04-1977 • P.O. Kajora Gram, Dist. Burdwan

Krishna Bouri
Secretary

Bhikari Kurmi
Chairman

Sl. No. 20

With Best Compliments of

A.R. ENGINEERING CO.

21, Goabagan Street, Kolkata

Sl. No. 21

With Best Compliments of

M/s. NATIONAL TRADING

P.O. Sripur Bazar, Dist. Burdwan, W.B., PIN : 713373

Sl. No. 22

With Best Compliments of

Bengal Electrical Enterprise

Pandaveswar, Burdwan

Sl. No. 24

With Best Compliments of

M/S. SIXER ENTERPRISE

GOVT. CIVIL CONTRACTOR

Andal Gram, Burdwan

Sl. No. 23

With Best Compliments of

Hari Om Enterprise

GOVT. LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

Vill. Konda, P.O. Pandaveswar, Burdwan

Sl. No. 27

With Best Compliments of

Mahadev Rice Mill (P) Ltd.

Manaik Bazar, NH-2, Burdwan, Mob. 9434190490

B A B A R I C E

Sl. No. 33

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

আবহমানকাল থেকে সমবায় দেশের আর্থসামাজিক উন্নতির সূতিকাগার

সৌজন্যে

উখড়া রিজিওন্যাল ওয়ার্কশপ এমপ্লয়িজ
কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

পোঃ খাঁদরা, জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩৬৩

Sl. No. 25

KN Aqua

- Sterilized
- Activated Carbon
- Reverse Osmosis
- Ultra Violet Ray
- Ozonized
- Added Mineral

Mfd. by Parulia Samaj Kalyan NGO (Seba Samity)

Parulia, Purbasthali, Burdwan, Help Line : 9475853611, 8946077631

Sl. No. 41

With Best Compliments of

হমারে যহां গোল্ড টু গোল্ড ফুল রিটর্ন মিলতে হৈ।
২২ কৈরেট গোল্ড যা শুদ্ধ চাংদি কে লিএ

Dukhilal Jewellers

Moonlight Market, Bastin Bazar, Asansol-1

Prop. **Dhiraj Barman**

Sl. No. 75

With Best Compliments of

Shivam Meltech Pvt. Ltd.

Bamunara Industrial Area, Durgapur-15

Sl. No. 78

With Best Compliments of

Subhendu Roy

GOVT. CONTRACTOR

Monteswar, Dist. Burdwan, Mob. 9434576360

Sl. No. 90

With Best Compliments of

PROGATI ASSOCIATE

GOVT. CONTRACTOR

Monteswar, Dist. Burdwan, Mob. 9434576358

Sl. No. 91

With Best Compliments of

SHUVANKAR RICE MILL

Vill. Bhirsan More, Bud Bud, Burdwan, Mob. : 9434177608

Contact for : EXPORT QUALITY SUPER FINE SILKY SORTEX RICE

Sl. No. 81

With Best Compliments of

SREE BISHNU RICE MILL

Mankar, Burdwan, Mob. : 8629992188, 9153343945

Contact for : EXPORT QUALITY SUPER FINE SILKY SORTEX RICE

Our Brand : **NARAYAN BHOG, NARAYAN BHOG GOLD, ANMOL RICE, CHIEF & BEST**

Sl. No. 82

With Best Compliments of

MONDAL CONSTRUCTION

CIVIL CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIERS

Vill. & P.O. Kajoragram, Dist. Burdwan, PIN : 713338, Ph : (0342) 2250639

Sl. No. 74

With Best Compliments of

MAGRA BRICK FIELD & CO.

Vill. Dehna Magra, P.o. Ghosh, Dist. Burdwan

Sl. No. 102

With Best Compliments of

RAJA AUTOMOBILES

Authorised Dealer of TVS Motor Co.

Sehara Bazar Annapurna Market
D.V.C. More, Sehara Bazar Burdwan

Mob. 9153331571, 8653868065, PH. 03451-253236
e-mail : raja.chandan.automobiles@gmail.com

Sl. No. 111

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

কেন্না সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

কেন্না, মেমারি, জেলা : বর্ধমান

স্বপনকুমার মল্লিক
ম্যানেজার

Sl. No. 104

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দে পেপার অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন সেন্টার

সাতগেছিয়া, কালনা রোড, বর্ধমান, মোবাইল : ৯৩৩৩১৫৫০৮৮, ফোন : (০৩৪২) ২৭০০৬০৫

এখানে যাবতীয় স্কুল, অফিস ও উপহার সামগ্রী পাইকারি ও খুচরা ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যায়

Sl. No. 107

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

দেনুর গ্রাম পঞ্চায়েত

নির্মল গ্রাম গড়ে তোলা।। বনসৃজনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা ।। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা ।। পুকুর খননের মাধ্যমে জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	**কৃষ্ণা ঘোষ**	**বিধান মাঝি**
নির্বাহী সহায়ক	*উপপ্রধান*	*প্রধান*

Sl. No. 113

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

মাহেশ্বরী রাইস মিল

পোঃ হাটগাছা, মন্তেশ্বর, বর্ধমান

Sl. No. 116

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ মালডাঙ্গা, বর্ধমান

গৌরপদ দাস	**কাবলু মণ্ডল**	**শম্পা মণ্ডল**
নির্বাহী সহায়ক	*উপপ্রধান*	*প্রধান*

Sl. No. 115

With Best Compliments of

Durgapur Petrol Pump Employees Union

Sahid Bimal Dasgupta Bhavan, Durgapur-12

Sl. No. 79

With Best Compliments of

DAUDAR RAHAMAN MIA

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Village : Masdanga, P.O. Kaigram, Dist. Burdwan, Mob. 9732219419

Sl. No. 55

With Best Compliments of

B.S. CONSTRUCTOR

GOVT. CONTRACTOR & MATERIAL SUPPLIER

Village : Mulgram, P.O. Malamba, Dist. Burdwan, PIN : 713426

Mob. 9830318560, 9804236863, E-mail : bidyutkundu65@gmail.com

Sl. No. 56

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

লোহাচুড়-বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ২১ কে. টি, তাং : ৩০-০৩-৬৩ ।। বড়গাছি, পোঃ মোয়াইল, জেলা : বর্ধমান, মোবাইল : ৮৯০০৫০২৪৩৪

অত্র সমিতির নিজস্ব এলাকার চাষিভাইদের উন্নয়ন ও সেবায় নিয়োজিত। চাষিদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়। অত্র সমিতিতে সমস্ত রকম আমানত গ্রহণ করা হয়। ১৯টি সাবমার্সিবল দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
সভাপতি

জগন্নাথ মণ্ডল
ম্যানেজার

বাবলু মাহাতো
সম্পাদক

Sl. No. 40

With Best Compliments of

United Agri Tech. Pvt. Ltd.

Galsi (East) NH-2, Dist. Burdwan

Sl. No. 65

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

চাকতেঁতুল এস.কে.ইউ.এস. লি.

রেজি. নং ২৫০৩/২২-০৫-৫৯ ।। দূরভাষ : ০৩৪৩-২৬৪৪৫১৩

আমাদের সমিতির মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ কে.সি.সি., এফ.ডি, এস.এইচ.জি লোন দাদন করি।
সার ও সহায়ক মূল্যে ধান ব্যবসা করে থাকি।

ভৈরব রুইদাস	শিশুচরণ মেটে	সত্যদুলাল হাজরা
সভাপতি	*ম্যানেজার*	*সম্পাদক*

Sl. No. 83

With Best Compliments of

RENUKA FURNITURE & SAW MILL

Amtala, Golapbag More, Saraitikar Road, Dist. Burdwan-713104
Office : 0342-2657605, Anil Dalui : 9434133134, Abhijit : 9932494929, Subhajit : 9732297222
Website : www.renukaa.in

Prop. ***Anil Kumar Dalui***

Sl. No. 125

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সৈয়দ মজাফ্‌ফর হোসেন

গ্রাম : দাদপুর, পোঃ হাবাসপুর, থানা : জামালপুর, জেলা : বর্ধমান

স্যান্ড সিন্ডিকেট, দাদপুর ঘাট

Sl. No. 125

With Best Compliments of

RADHAKRISHNA AGRO PRODUCTS

Belari, Bonpas Rly. Station Road, Dist. Burdwan

Dilip Kr. Shaw, Pradip Kr Shaw, Mob. 7797278672, 7797278671

Manufacturer of '**RADHA SHREE RICE**' a popular name in Rice World

Sl. No. 124

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

মানিক ট্রেডার্স

প্রো. সেখ আমীরচাঁদ

গুসকরা (মুসলিমপাড়া), বর্ধমান, মোবাইল : ৯৪৩৪৩১১৬৩৫

Sl. No. 122

With Best Compliments of

A Well Wisher

Guskara, Burdwan

Sl. No. 120

With Best Compliments of

Debi Das Sharma

Whole Sale Cement Dealer : **BIRLA, AMBUJA, LAFARG**

Vill. P.O. Kajora Gram, P.S. Andal, Burdwan

Mob. 8116887050, 9332673011

Sl. No. 73

With Best Compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 72

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

ফোন : ০৩৪৫২-২৫৪৪১৯

আউশগ্রাম ১নং ব্লক ল্যাম্পস্ সোসাইটি লিমিটেড

গ্রাম : শোকাডাঙ্গা, পোঃ করটিয়া, জেলা : বর্ধমান • রেজি. নং : ৮০৯ তাং : ২০-০৩-১৯৮৯ • অফিস : আউশগ্রাম

অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের এক গুচ্ছ প্রকল্পে কাজ করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ

ডিপোজিট মোবিলাইজেশন • মা মহিলাদের স্ব-শক্তি ঋণ • শালপাতা সংগ্রহ ও প্লেট তৈরি এবং মহিলা গ্রুপ

বুদ্যিনাথ মুর্মু	রূপলাল সোরেন	মাগারাম টুডু
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

Sl. No. 64

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

অন্নপূর্ণা কোল্ড স্টোরেজ

গ্রাম ও পোঃ দীঘা, জেলা : বর্ধমান

Sl. No. 63

With Best Compliments of

GAGAN FERRO TECH. LTD.

Sl. No. 62

With Best Compliments of

B.R.M.
TAJ BENGAL RICE

PREMIUM QUALITY SILKY SORTEX, GRADED AND STONELESS RICE

Vill. & P.O. : Pursa, P.S. Galsi, Dist. Burdwan, Ph. 9153533505

Sl. No. 58

With Best Compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 51

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

সবার আশিষে

প্রোঃ সেখ তাজউদ্দিন

তিরেঙ্গে মোড়, গলসী, বর্ধমান, মোবাইল : ৯৩৩২০৫৪৯৭২, ৯৮৩২১৮৫৪১১

এখানে সিমেন্টের খুটি, পায়খানার পাট, ইট, বালি, পাথর ও কারী পাওয়া যায়।

Sl. No. 49

With Best Compliments of

M/S ASFAR HOSSAIN & CO.

Wholesale Supplier of Chemical Fertilizer and Pesticides

Baramuria (NH-2), Burdwan-713406

Sl. No. 50

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

কৃষি ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য

দেউলিয়া এস.কে.ইউ.এস. লি.

রেজি. নং ৩২ তারিখ : ২৩-০৭-৪১

সেখ আবদুল আজিজ
সভাপতি

আবদুল মজিদ মল্লিক
ম্যানেজার

আবদুল আলিম মণ্ডল
সম্পাদক

Sl. No. 99

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

মান আয়রন অ্যান্ড স্টিল

জামুড়িয়া, বর্ধমান

Sl. No. 94

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

পল্লীশ্রী নার্শারি

প্রোঃ পরেশ মিত্র

সকলপ্রকার ফুল, ফল ও বৃক্ষজাতীয় চারা পাওয়া যায়।

বিঃদ্রঃ এখানে বাগান তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

সগড়াই বাজার, বর্ধমান

Sl. No. 43

With Best Compliments of

Sankar Mahadeb Nursery

Accredited by National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture, Govt. of India

Purbasthali Rail Station (South Railgate), Purbasthali, Burdwan (WB)
M: 8972113824, 9433261072, 9734250028, E-mail : sankarmahadebnursery@gmail.com

Prop. SANKAR DUTTA

শংকর-মহাদেব নার্সারী

Sl. No. 96

With Best Compliments of

G.M. CO.

BRICK FIELDS

Jotram, Dist. Burdwan, Phone : 9332124989

Sl. No. 118

With Best Compliments of

RAJ MEDICAL AND SURGICAL CENTRE

R.B. Ghosh Road, Burdwan (Near IMA Building)

For Contact:

Dr Biplab Chatterjee (Orthopedic)

Monday to Friday

Contact No. 8514048438

Sl. No. 47

With Best Compliments of

Manab Seba Prokalpa & Constructions

Dealer : Birla Gold Cement, Dalmia Cement, Ramco Cement, Burnpur Cement etc.

Asbestos : Konarock, Jamba

G.C. Sheet : Moti Bhusan & Tuki Fly Ash Bricks

Contact : 9475854944

Sl. No. 127

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

কৃষ্ণেন্দু রায়

গ্রাম : বিল্লগ্রাম, পোঃ বড়বেলগনা, জেলা : বর্ধমান

ইট, বালি, সিমেন্ট, রড পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা

Sl. No. 123

With Best Compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 52

With Best Compliments of

LAKSHMI KANTA DAS

TUBEWELL MATERIAL SUPPLIER

GOVT. CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIER

Village & P.O. : Shyamdasbati, P.S. Raina, Dist. Burdwan

Sl. No. 112

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

সোনাতনি রাইস মিল

বোলপুর, পারাজ, গলসী, মোবাইল : ৯৭৩২৫৬৩১৮৫

উৎকৃষ্ট মানের কাঁকরবিহীন ভাতের চাল প্রস্তুতকারক

Sl. No. 67

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত

গলসী-২ ব্লক যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

গলসী বাজার সন্তোষ শপিং সেন্টারের পাশে, গলসী, জেলা : বর্ধমান

যোগাযোগ : ৯৭৩৪২৪৪৬৬২, ৯৪৭৬৪৯৪৬০৪, (০৩৪২) ২৪৫১৪৩৩

Sl. No. 70

With best compliments of

Saradamayee Rice Mill

Factory : 0342-2454228, 2454220
Mob. 9434003431

Sl. No. 30

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

সুবর্ণ রাইস মিল

খেতুড়া, গলসী, বর্ধমান, ফোন : ০৩৪২-২৪৫১৩২৬, ২৪৫১৩২৭

উৎকৃষ্ট মানের মুড়ির চাল বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 68

With best compliments of

M/s Rakona Rice Mill

NH-2 (G.T. Road)
Rakona, Jharul, Galsi, Burdwan

Contact
Mill : 0342-2454569
Production : 9434100215, 9434108122
Sales : 9434225267, 9475375814, 9232380323

Sl. No. 87

With best compliments of

Paraj Trading Mini Rice Mill

NH-2 (G.T. Road), Paraj More, Galsi, Burdwan
Contact : (0342) 2454560 / 360 (Fact.)
(0342) 2664248 / 389 (Bdn. Office)

Sales : 9434008380, 9933390095, 9332298287

Sl. No. 86

With best compliments of

Sl. No. 31

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বাদল রাইস সুপার
পারবয়েলড চাউল

STONE	কাঁকড়
LESS	বিহীন
SORTEX	SILKY

J.R.M

পারাজ স্টেশন রোড, গলসী, বর্ধমান
মোবাইল : ৯৪৭৪৭৮৬৪২৭, মিল : ০৩৪২-২৪৫৪৯৭১

Sl. No. 114

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেখাঁতলা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ পারুলিয়া, জেলা-বর্ধমান : পূর্বস্থলী-২ পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা : বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫৪) ২৬৪২২২, ২৬৪৩৮৮

২০১৪ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত আমাদের পঞ্চায়েত।

পঞ্চায়েতের সার্বিক উন্নয়নে সামিল হোন। সুলভে বাড়ি বাড়ি শৌচাগার নির্মাণ করুন।
পঞ্চায়েতের কর পরিশোধ করুন। উন্নয়নে সহযোগিতা করুন

জয়ন্তী মজুমদার (কুরী)
উপপ্রধান

শিপ্রা দাস
প্রধান

Sl. No. 95

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

জামনা গ্রাম পঞ্চায়েত

মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি ।। পোঃ জামনা, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : বর্ধমান-৭১৩৪২২
পঞ্চায়েতকে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।
সামাজিক বনসৃজন, শৌচাগার নির্মাণ ও নিকাশি ব্যবস্থাকে চালু রাখা আমাদের অঙ্গীকার।

আজফর সেখ
উপপ্রধান

নবীনচন্দ্র দাস
নির্বাহী সহায়ক

রেখারানি ঘোষ
প্রধান

Sl. No. 54

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

গোপগন্তার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লি.

গন্তার, বর্ধমান ।। রেজি. নং ৪০ তাং : ১২-০২-১৯৪৯

সোসাইটির কার্য সমূহ

আমানত : সেভিংস, ২. মেয়াদি, ৩. পৌনঃপুনিক ।। ঋণদাদন : ১. স্বল্পমেয়াদি, ২. মধ্যমেয়াদি, ৩. বন্ধকী, ৪. ব্যবসায়ী, ৫. সাইকেল/মোটর সাইকেল, ৬. পিতল-কাঁসা বন্ধকী, ৭. স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। ব্যবসা : ১. সমস্ত প্রকার রাসায়নিক সার, ২. খইল, ৩. কীটনাশক, ৪. উচ্চফলনশীল আলু এবং ধানবীজ, ৫. গানি ব্যাগ, ৬. স্বল্প ভাড়ায় ট্রাক্টর এবং ৪৭টি সাবমার্সিবল কৃষকের সেবায় নিয়োজিত, ৭. অ্যারিজ ডিস্ট্রিবিউটর

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন। আসুন আমরা এক সাথে এগোই এবং সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

Sl. No. 101

With best compliments of

BABA KALURAY HEEMGHAR (P.) LTD.

Regd. Office
Burdwan Road, Tarakeswar, Hooghly, Ph : 03212-276323

Cold Storage
Vill. P.O. Jaragram, Dist. Burdwan, Phone : (03213) 258556

Sl. No. 108

With best compliments of

NARAYANI RICE MILL

Paraj More, NH-2, Burdwan-713403, Ph : 9332082128

Sl. No. 84

With Best Compliments of

Sethia Jain & Co. (P.) Ltd.

Debipur, Memari, Dist. Burdwan, Phone : (0342) 2263270

Sl. No. 100

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কুবাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ কুবাজপুর, বর্ধমান • রেজিস্ট্রেশন নং : ৩৪১২ তাং ২০-০৮-৬৯

আমাদের পরিষেবা সমূহ

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় • ইফকো কর্তৃক অধিকৃত 'ওয়ার হাউস' প্রাপ্ত • সমস্তরকম ব্যাঙ্কিং পরিষেবা • স্বল্প সুদে কৃষকদের কৃষিঋণ প্রদান • এন.এস.সি/কে.ভি.পি. জমা রেখে ঋণ প্রদান

পার্থ মজুমদার
স্পেশাল অফিসার

শাহাজামাল মণ্ডল
সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী

Sl. No. 35

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা ও সর্বস্তরের উন্নয়নের প্রতীক

সাহেবগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

ওরগ্রাম, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫২) ২৬২২৩৭

ভাতাড় পঞ্চায়েত সমিতি

সাতকড়ি মাজি
উপ-প্রধান

রহিমা বেগম
প্রধান

Sl. No. 36

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

খণ্ডঘোষ জাগরণ

রেজিস্ট্রেশন নং : এস/১১/১৬৩২

অফিস : সগড়াই, পোঃ সগড়াই, বর্ধমান

Sl. No. 42

কুলুট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম ও পোঃ কুলুট, ব্লক : মন্তেশ্বর, বর্ধমান • রেজি. নং : ৬১৫, তাং : ১২-০৮-১৯২০

সমিতির অফিস সমূহ • প্রধান অফিস : গ্রাম ও পোঃ কুলুট, ফোন ০৩৪২-২৭৫০৫৫১

শাখা অফিস (ব্যাঙ্কিং) : কুসুমগ্রাম সুপার মার্কেট, দ্বিতল, ফোন ০৩৪২-২৭৫০৫৯৫ ।। শাখা অফিস (সার ও কীটনাশক) : চুয়াডাঙ্গা, পোঃ পুটশুড়ি, ফোন : ০৩৪২-২৭৫৫৩৯৬

কার্যাবলী : ১. সভ্যদের কে.সি.সি./এম.টি. ঋণদাদন, ২. গ্রাহকদের জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা (সেভিংস, রেকারিং, টাইম), ৩. ন্যায্য মূল্যে খুচরা সার ও কীটনাশক বিক্রয়, ৪. ৪৮টি সাবমার্সিবল পাম্প দ্বারা এলাকায় কৃষিকাজে জলসেচ, ৫. ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার-এর মাধ্যমে কৃষি ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করা, ৬. আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান

সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করতে আসুন সকলে মিলে অগ্রসর হই।

সেখ মহম্মদ আলি
সভাপতি

সেখ সরিফউদ্দিন আহাম্মদ
সম্পাদক

Sl. No. 6

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

খড়দত্তপাড়া এস.কে.ইউ.এস. লি.

পোঃ হাপানিয়া, জেলা : বর্ধমান

Sl. No. 163

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

তিরুপতি হিমঘর

কালাড়াঘাট, জামালপুর, জেলা বর্ধমান

Sl. No. 171

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

চণ্ডীমাতা হিমঘর

আঝাপুর, জেলা : বর্ধমান

এখানে যত্নসহকারে আলু সংরক্ষণ করা হয়। চাষিদের বীজ আলুর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

Sl. No. 170

With Best Compliments of

ARUP AROGYA NIKETAN

Surekalna, Burdwan

Sl. No. 162

মাটি এবং মানুষ নিয়ে আমাদের পৃথিবী। মাটিতেই তৈরি হয় কৃষি ও শিল্প। আর ভারতের শতকরা ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই সেই মাটিকে রক্ষা করে উৎপাদনকে বাড়ানোর লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং উৎপাদন খরচকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই প্রয়োগ করতে হবে কৃষকের চিরাচরিত উপকারী বন্ধু কেঁচো সার **এ.টি.সি. গোল্ড**।

আপনার জমির মাটিকে দূষণ মুক্ত করে

এ.টি.সি. গোল্ড

কেঁচো সার

সরকারিভাবে পরীক্ষিত

অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ

মাধবপুর, বর্ধমান, যোগাযোগ : ০৩২১৩-২৫৮২১৯, ৯৭৩২৮০২২৬৪, ৯৭৪৮৭৪২৮৩৫, ৯১৫৩৫৪২৪৫৩

Sl. No. 173

With Best Compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 141

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মহাচান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত

চাঁদমণি মার্ডি
উপপ্রধান

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান

Sl. No. 164

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

লোদনা গ্রাম পঞ্চায়েত

সেখ আরিফ উল্লা
উপপ্রধান

পম্পা ঘোষ
প্রধান

Sl. No. 165

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েত

মমতা মালিক
উপপ্রধান

অনুপ দত্ত
নির্বাহী আধিকারিক

অসীমকুমার নায়েক
প্রধান

Sl. No. 186

Sl. No. 161

With Best Compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 181

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জয় বাংলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

দুর্গাপুর স্টেশন

Sl. No. 180

With Best Compliments of

JMD ENGINEERING

FABRICATOR AND MECHANICAL ENGINEERS
Specialist in : **Castings, Machining jobs etc**.

Office : BK-32, 'Shyamali', RabindraPally (B Block), Durgapur-713201, Ph : 2553590
Durgapur Works : RIP Industrial Estate, Durgapur-713212
Howrah Works : P-292/1, Benaras Road, Belgachia, Howrah-711108

Sl. No. 160

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

তিরুপতি কোল্ড স্টোরেজ

বিষ্ণুপুর, রসুলপুর, মেমারি, বর্ধমান

Sl. No. 179

With Best Compliments of

SINGH TRANSPORT

HARIPUR, BURDWAN

Sl. No. 184

With Best Compliments of

A Well Wisher

CIVIL CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIER

Vill. Sirsa, P.O. Jhanjra Colony, Burdwan

Sl. No. 177

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিউ কুন্তলিকা স্টেশনার্স

দত্ত সেন্টার, বর্ধমান

সমস্ত রকম খাতা, কলম, কাগজ, বিয়ের কার্ড ও স্টেশনারি দ্রব্য সুলভে পাওয়া যায়

Sl. No. 176

With Best Compliments of

Graphite India Limited
Officers' Club

Sl. No. 144

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বিপুল ঘোষ

বামুনিয়া বাজার, বর্ধমান

Govt. Contractor & General Order Supplier

Sl. No. 181

Hero

With Best Compliments of

Anjali Automobiles

Bahula Bazar (Anjali Bazar Building)
Near : Panchayat Office, High School Road
Contact : +91 7031324065, +91 7031324056

Sl. No. 182

With Best Compliments of

Arati Furniture & Electronics

Authorised Dealers

Philips India Ltd., Samsung India Electronics, SONY, Sharp, Kelvinator, Whirlpool, Godrej, L.G.

Bahula Bazar (Hear Telephone Exchange)
Bahula, Dist. Burdwan, Mob. 9851450707, 9851878429

Sl. No. 183

With Best Compliments of

Manoranjan Mukherjee

CIVIL CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIER

Vill & P.O. Balijuri, Burdwan

Sl. No. 178

With Best Compliments of

A
Well Wisher

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মা সর্বমঙ্গলা কোয়ালিটি স্যান্ড

রেজিস্ট্রেশন নং : L-80647

ওয়ার্কিং অফিস : **জামনা, মাছখাণ্ডা, বর্ধমান**
রেজিস্টার্ড অফিস : **ছোটো নীলপুর, আমতলা, শ্রীপল্লী, বর্ধমান**